





উৎসর্গ

তাজউদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক

এবং

ড্রিউ এ এস ওডারল্যান্ড

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসী অবদানের জন্য বীরপ্রতীক  
উপাধিপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক

## মুক্তিযুদ্ধের কবিতা

### বন্দী শিবির থেকে শামসুর রাহমান



ঈর্ষাতুর নই, তবু আমি  
তোমাদের আজ বড় ঈর্ষা করি। তোমরা সুন্দর  
জামা পরো, পার্কের বেঞ্চিতে বসে আলাপ জমাও,  
কখনো সেজন্যে নয়। ভালো খাও দাও,  
ফুর্তি করো সবান্ধুব  
সেজন্যেও নয়।

বন্দুরা তোমরা যারা কবি,  
স্বাধীন দেশের কবি, তাদের সৌভাগ্যে  
আমি বড়ো ঈর্ষান্বিত আজ।

যখন যা খুশি  
মনের মতো শব্দ কী সহজে করো ব্যবহার  
তোমরা সবাই।  
যখন যে শব্দ চাও, এসে গেলে সাজাও  
পয়ারে,  
কখনো অমিত্রাক্ষরে, ক্ষিপ্র মাত্রাব্তে  
কখনো-বা।  
সেসব কবিতাবলী, যেন রাজহাঁস  
দৃশ্টি ভঙিমায় মানুষের  
অত্যন্ত নিকটে যায়, কুড়ায় আদর।

অথচ এদেশে আমি আজ দমবন্দ  
এ বন্দী-শিবিরে  
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ  
মনের মতন শব্দ কোনো।  
মনের মতন সব কবিতা লেখার  
অধিকার ওরা  
করেছে হরণ।

প্রকাশ্য রাস্তায় যদি তারস্বরে চাঁদ, ফুল, পাখি  
এমনকি নারী ইত্যাকার শব্দাবলী  
করি উচ্চারণ, কেউ করবে না বারণ কখনো।  
কিন্তু কিছু শব্দকে করেছে  
বেআইনী ওরা  
ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে।

স্বাধীনতা নামক শব্দটি  
ভরাট গলায় দীপ্তি উচ্চারণ করে বারবার  
তৃপ্তি পেতে চাই। শহরের আনাচে কানাচে  
প্রতিটি রাস্তায়  
অলিতে-গলিতে,  
রঙিন সাইনবোর্ড, প্রত্যেক বাড়িতে  
স্বাধীনতা নামক শব্দটি আমি লিখে দিতে চাই  
বিশাল অঙ্করে।  
স্বাধীনতা শব্দ এত প্রিয় যে আমার  
কখনো জানিনি আগে। উঁচিয়ে বন্দুক,  
স্বাধীনতা, বাংলাদেশ- এই মতো শব্দ থেকে ওরা  
আমাকে বিছিন্ন করে রাখছে সর্বদা।

অর্থচ জানেনা ওরা কেউ  
গাছের পাতায়, ফুটপাতে  
পাখির পালকে কিংবা নারীর দুচোখে  
পথের ধূলায়  
বস্তির দুরস্ত ছেলেটার  
হাতের মুঠোয়  
সর্বদাই দেখি জুলে স্বাধীনতা নামক শব্দটি।

‘বন্দী শিবির থেকে’ শিরোনামে শামসুর রাহমানের (ছদ্মনাম : মজলুম আদিব) কবিতাটি কলকাতার ‘দেশ’-এ প্রকাশিত  
হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২১ জুলাই।



প্রথম ইন্টারনেট সংস্করণ  
ঢাকা, ১২ জুলাই ২০০৮

সম্পাদক, প্রকাশক ও শিল্প নির্দেশক  
লোকালটক

মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে গেরিলাদের একটি লড়াইয়ের  
ভিডিওচিত্র

বিশেষ কৃতজ্ঞতা  
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব  
নেমেসিস

যোগাযোগ  
localtalk@gmail.com

'Phire Dekha 71', Edited & Published by  
LocalTalk, First Internet Edition Published  
on 12 July 2008



# জ্যোতিম প্রক্ষেপণ

## লোকালটক

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে  
ইন্টারনেটের মহাসমুদ্রে। বাংলাভাষার সবচেয়ে  
জনপ্রিয় রূগ্ন সামহোয়্যারইন্সুরেন্সে মুক্তিযুদ্ধের ওপর  
প্রচুর লেখা আছে- যার বেশিরভাগই ভালো লেখা।  
এই লেখাগুলোকে আমরা এক মলাটের ভেতরে  
নিয়ে আসার একটা তাগিদ অনুভব করেছি  
আমরা। ই-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ মূলত এ  
কারণেই।

লক্ষ্য ছিল, আগাগোড়া প্রামাণ্য থাকা। তারপরও  
পারা যায়নি শেষপর্যন্ত। আবেগমথিত দীর্ঘ  
গল্পকাহিনীর চাইতে নিউইয়র্ক টাইমস বা দৈনিক  
বাংলার ছোট ক্লিপিংস্টাকে বেশি গুরুত্ব দিতে  
চাই। অর্থহীন আলাপের চাইতে স্বজনের মুখে  
শোনা মুক্তিযুদ্ধের সত্যি ঘটনাকে বেশি মূল্য দিতে  
চাই। মূলত একটি বিশেষ সময়কে আমরা ধরতে  
চেয়েছি লেখায়-রেখায়। ফলে মুক্তিযুদ্ধকে আশ্রয়  
করে অনেক গল্প-কবিতা রূপে প্রকাশিত হলেও তা  
নেওয়া সম্ভব হয়নি। যদিও রূগ্ন থেকে পাওয়া  
লেখাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মৌলিক  
কাজ কিংবা গবেষণা খুবই কম। বলতে দিধা নেই,  
এ খুবই হতাশার।

## সম্পাদনা বিষয়ে

কিছু লেখার শিরোনাম, হঠাত চোখে পড়া দু একটি  
ভুল শব্দ বদলে দেওয়া আর বর্ণবিন্যাসের  
প্রয়োজনে সামান্য সম্পাদনা ছাড়া লেখকের মূল  
লেখাকে অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছি আমরা।  
অন্যদিক থেকে আবার সম্পাদনার সবচেয়ে বড়ে  
গলদণ্ড এটি। অভিন্ন বানানরীতি অনুসরণ করাও  
সম্ভব হয়নি। তবে লেখক নয়, আমরা বিষয়বস্তুকে  
প্রাধান্য দিতে চেয়েছি। সেভাবেই সাজানোর চেষ্টা  
করেছি সংকলনের পৃষ্ঠাগুলো। দেশের পাঠকদের  
কথা ভেবে ই-সংকলনের আকার নিয়ে একটা  
উদ্দেশ সবসময়ই ছিল। ইচ্ছে থাকলেও এ দিকটা  
ভেবে খুব বেশি ছবি রাখা হয়নি এ সংকলনে।  
ফন্টের আকারও খুব বেশি বড়ো রাখা হয়নি  
পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে।

এটা ঠিক যে, যা হয়েছে তার চেয়েও আরো ভালো  
করা সম্ভব ছিল- সম্পাদনা, অঙ্গজা, বর্ণবিন্যাস  
আর প্রযুক্তিগত দিক থেকে। যিনি পরিকল্পনা  
করেছেন, তিনিই আবার ইলাস্ট্রেটরে কাজ  
করেছেন। তাকেই আবার টুকটাক সম্পাদনা  
করতে হয়েছে বর্ণবিন্যাসের প্রয়োজনে,



## নির্দেশনা

অ্যাক্রোবেট রিডার ৬ বা তার ওপরের ভাস্কেনে এই ই-বুকটি ভালোভাবে দেখা যাবে। ফস্টিট কিংবা সুমাত্রা ব্যবহার করেও এই ই-বুক দেখা যাবে। মাইক্রোসফট উইন্ডোজের ৯৮, এক্সপি, ২০০০ ও ভিস্টায় ই-বুকটি পরীক্ষা করে ভালো ফল পাওয়া গেছে।

পুরো ই-বুকটিতে মাত্র দুটি ফন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে- বাংলার জন্য সুতৰ্ষী এমজে এবং ইংরেজির জন্য এরিয়াল। ফন্ট দুটি ই-বুকের সঙ্গে এমবেডেড থাকবে। তারপরও যদি দেখতে সমস্যা হয়, তাহলে ই-বুকের সঙ্গে একই প্যাকেজে দেওয়া সুতৰ্ষী এমজে ফটটি ইনস্টল করে নেওয়া যাবে।

আর প্রচন্ডে ব্যবহৃত সচলচিত্র দেখার জন্য অবশ্যই এডবি ফ্লাশ প্লেয়ার ইনস্টল করে নিতে হবে। ডাউনলোড করা যাবে এখান থেকে।

কনভার্টারের অলজ্ঞনীয় বাগগুলোও তাকেই ঠিক করতে হয়েছে একেক করে।

### ইউনিকোড বনাম প্রচলিত বাংলা

ইউনিকোড কেন বর্জন করা হল- এ প্রশ্ন উঠ স্বাভাবিক। বাংলা ইউনিকোড এখনো বলতে গেলে আঁতুড়ঘরে। ফলে তাতে সীমাবদ্ধতাও প্রচুর। ইউনিকোডে বর্ণবিন্যাস ভালোভাবে করা যায় না। প্রধান প্রধান ডেক্সটপ প্যাবলিশিং সফটওয়্যারগুলো ইউনিকোড সমর্থন করে না। এডবি ফটোশপ, ইলাম্যেটর, কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের মতো প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলোও ইউনিকোড সমর্থন করে না। এ কারণে প্রচলিত বাংলায় কাজ করা ছাড়া উপায় নেই। তাতে জায়গার সাশ্রয় হয়। কম জায়গায় অনেক টেক্সট ঢোকানো যায়। প্রচলিত বাংলাও আবার সমস্যামুক্ত নয়, বিশেষ করে পিডিএফ করার ক্ষেত্রে। বিএন ওয়েব টুলস ব্যবহার করে বেশকিছু টেক্সট প্রচলিত বাংলায় কনভার্ট করে কিছু সমস্যা দেখা গেছে।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেক্সটের বেশ কিছু শব্দ বদলে যায়। যেমন "ক্ষ" অক্ষর ডকুমেন্ট থেকে উধাও হয়ে যায়। 'রেফ' হয়ে যায় য'ফলা। অনেক যুক্তাক্ষরও অপার্য অক্ষরে রূপ নেয়। বিশাল ডকুমেন্ট থেকে এরকম ত্রুটি খুঁজে বের করা খুবই কষ্টসাধ্য। তারপরও যতোটা সম্ভব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আবার লেখা পিডিএফে কনভার্ট করার সময় কোনো শব্দই বোল্ড কিংবা ইটালিক হরফে থাকেনি। সুতৰ্ষী এমজে ফন্টের কপিরাইটজনিত সমস্যা এটি।

### কী কেন কিভাবে

এই ই-সংকলনটি বিনামূল্যে বিতরণ করা যাবে। তবে কোনোক্রমেই এটি বিক্রি করা যাবে না। প্রকাশিত সব লেখার স্বত্ত্ব লেখকরা সংরক্ষণ

করেন। আর এই ই-সংকলনের সঙ্গে সাময়িক্যারইন কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই জড়িত নন। ই-বুকে লাইভ লিংক রাখা হয়েছে। এর ফলে ই-বুক থেকেই সরাসরি সংশ্লিষ্ট ওয়েবপেজে যাওয়া যাবে। সূচিপত্র, ব্লগারের নাম ও অনেক লেখার ভেতরে ভেতরে হাইপারলিংক যুক্ত করা হয়েছে। ফলে যেমন সূচিপত্রে ক্লিক করেই সরাসরি নির্দিষ্ট লেখায় যাওয়া যাবে।

### কৃতজ্ঞতা

প্রত্যৃপন্নমতিত্বের আড়ালে টুটুল নামের যে তরুণটি নিজে উদ্যোগী হয়ে পোস্ট দিয়ে, প্রস্ত াবিত তালিকার প্রায় অর্ধেক লেখকের অনুমতি এনে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এ উদ্যোগটিকে, তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রয়োজনের মুহূর্তে পাওয়া গেছে নেমেসিসের সহায়তা। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। ব্লগারদের মধ্যে আরো যারা নানাভাবে সহায়তা করেছেন, এ উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

### আশা-প্রত্যাশা

মুক্তিযুদ্ধ কপিরাইটের শেকলে বন্দি থাকতে পারে না। লেখকদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ- বাংলা উইকিপিডিয়া, বাংলাদেশ ৭১ ডট অর্গসহ ওয়েবের ভূবনে আপনাদের লেখাগুলো ছড়িয়ে দিন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আরো লেখালেখি হোক, গবেষণা হোক এবং বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস প্রণয়নে আসুন আমরা অধিকতর মনোযোগী হই। আর এই ই-সংকলন একটা সূচনামূল্য। আগামী অন্য ব্লগাররা আরো চমৎকারভাবে এ কাজটি এগিয়ে নেবেন ধারাবাহিকভাবে- এ প্রত্যাশা রইলো।



## হৃদয়ে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র  
মুক্তিযুদ্ধের সাত বীরশ্রেষ্ঠ  
মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক  
পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা  
বীর উত্তম  
বীর বিক্রম  
বীর প্রতীক

## বিশেষ রচনা

গণহত্যা/ মূল : অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস  
ফিরে দেখা ইতিহাস : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ  
কেইস স্টাডি : জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ  
যুদ্ধকালীন রোজনামচা : যাদের রক্তে মুক্ত এ দেশ  
বাঙালির শ্লোগানমালা : ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১

## রণাঙ্গনে সূর্য সৈনিক

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী  
মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ  
ভিন্দেশী মানুষ, আমাদের বীরপ্রতীক  
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী যোদ্ধা শহীদ গিরীসু সিংহ  
বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা : স্বীকৃতিহীন এক অধ্যায়  
অপারেশন মোনায়েম খান কিলিং  
১৯৭১ টাইজেডি : মুক্তিযুদ্ধে চা শ্রমিকদের ঐতিহাসিক দলিল  
সেক্টর কমান্ডার মেজর জালিলের লেখায় খুলনার আত্মসমর্পণ

১৮ ডিসেম্বর '৭১ : একটি ছবির গল্প

## পঁচিশের আগে ও পরে

৩ মার্চ ১৯৭১ : পল্টনে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ  
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা  
সেই কালোরাতে ইথারে খুনীরা যা বলেছিলো.....  
গেরিলা ম্যানুয়েল (১৯৭১) : মেজর এমএ মঙ্গুর  
রাজাকার-আলবদরদের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের লিফলেট

## একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি

বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা  
প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাত্কার :  
রেবা রাণী রায় . তারাবান বেওয়া . তুনদুরন বেওয়া  
৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি যেভাবে রেডিওতে প্রচার হলো...  
সাতই মার্চের ভাষণ প্রচারের নেপথ্যে : শব্দসৈনিকের স্মৃতিচারণ  
প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি  
বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাত্কার : জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত  
যুদ্ধ শেষ করতে পারেননি আজম খান!

## স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র

স্বাধীনতা পূর্বাপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দলিলসমূহ  
পূর্ব পাকিস্তান সরকারের গোপন দলিল : নিজামী মুজাহিদ তৎপর  
মুজিবনগর সরকার, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল দলিল এবং  
মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক



## নারীর যুদ্ধ : যুদ্ধের নারীরা

বীভৎস যৌন নির্যাতন, কিষ্ট এড়িয়ে গেছেন সবাই  
একান্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন :

কয়েকজন সাক্ষীর বয়ন

যুদ্ধের সাক্ষী হওয়ার সম্মান কজন পায় : ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী  
রোশেনারা : মুক্তিযুদ্ধের এক মিথ  
যুদ্ধ শিশু '৭১ : মাদার তেরেসা  
সেইসব মা জননীকে আমাদের প্রণাম

## গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ

একান্তরে টাইম ম্যাগাজিনের তিনটি আলোচিত প্রতিবেদন  
বিদেশী সংবাদপত্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন  
বিদেশী পত্রিকার রিপোর্টে একান্তরের নৃশংসতা

## মুক্তিযুদ্ধ : ইথারে-ময়দানে

চরমপত্র : ইথারে এক অন্য মুক্তিযুদ্ধ  
দুই কর্তৃবীরের গল্প

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল : অন্যরকম একদল মুক্তিযোদ্ধা  
কনসার্ট ফর বাংলাদেশ  
লাল সবুজ পতাকার প্রথম নকশা-প্রণেতা  
পতাকার প্রথম নকশাবিদ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি  
বিবিসি বাজার : মুক্তিযুদ্ধের অজানা কাহিনী  
এ টিবিউট টু কিশোর পারেখ

## মুক্তিযুদ্ধের শোনা ঘটনা

মায়ের মুখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

আমাদের টমি আর শের আলীর গল্প

একটি নির্বিকার নৃশংসতার গল্প

বাবার মুখে শোনা মুক্তিযুদ্ধ

একটি সাধারণ ঘটনা, যা একটি পরিবারের জন্যই শুধু অসাধারণ  
ভুঁইয়া বাড়ির দোতলায় আনোয়ারের শেষ দিনটি

'৭১ এর বুড়ি : সাধারণ কিছু মানুষের গল্প

একান্তরের ঘটনা : এক বুড়ি কামরাঙ্গ...

এক রাত্রির গল্প

লাশ ঘিরে শকুনের বিকৃত উল্লাস

একজন মুক্তিযোদ্ধা বাবা ও তাঁর সন্তান

বাবার খোঁজে

বাবার কাঁধে বন্ধুর লাশ

জরিনা পাগলীর গল্প

'বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান'

## যুদ্ধাপরাধের বিচার

দালাল আইন ও রাজাকারণের ক্ষমা : বঙ্গবন্ধুর কস্টলি ভুল  
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও যুক্তি : শিশুর সাথে আলাপচারিতা  
সিমলা চুক্তিতে যুদ্ধাপরাধ থেকে মুক্তির কথা নেই

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং প্রাসঙ্গিক আইনের বিশ্লেষণ

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না কেন, হবে ...

পশ্চিমা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আর যুদ্ধাপরাধের বিচারবিষয়ক ভাবনা  
যে আইনে ঘাতক-দালালদের এখনো বিচার সম্ভব  
যে কারণে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ব্যর্থ হলাম



## একান্তরের ঘাতক-দালাল

'৭১ এর ঘাতক-দালাল : রাজাকার পরিচিতি  
বুদ্ধিজীবি হত্যার রূপকার আল-বদর

গোলাম আয়ম : একজন খুনীর প্রতিকৃতি  
পাকিস্তানের জন্য গোলাম আয়মের আক্ষেপ ফুরাবে না!  
গণতন্ত্র কমিশনের রিপোর্ট : যুদ্ধাপরাধী কামারুজ্জামান  
চট্টগ্রাম গণহত্যার নায়ক মীর কাশেম আলী

## মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস

বেগমগঞ্জ কালো পুলের বধ্যভূমি  
গোপালপুরে গণহত্যা

চন্দ্রগঞ্জ ও সোনাইমুড়ির মুক্তিযুদ্ধ  
শ্রীপুরের গণহত্যা

শক্রসেনার বিরুদ্ধে নোয়াখালীর চার যুদ্ধ  
স্মৃতিতে নোয়াখালীর মুক্তিযুদ্ধ

## মুক্তিযুদ্ধ : ননা প্রসঙ্গ

একজন পাকিস্তানির দৃষ্টিতে একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ  
সংখ্যা ব্লগ : আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

কখনও স্মৃতি পাহারা দেবার সময় আসে  
বুলত প্রশ্ন থেকে অঙ্গপতনের শব্দ শুনি

একান্তরে মহান আল্লাহ কি পাকিস্তানীদের পক্ষে ছিলেন না?

## সম্পাদকীয়

ওয়েবলগ থেকে নেওয়া...

## বিতর্ক

ত্রিশ লক্ষ শহীদ : মিথ নাকি বাস্তবতা?  
মুক্তিযুদ্ধে শহীদের বাস্তব সংখ্যা : কিছু পরিসংখ্যান

## মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য বই  
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, গল্প ও কবিতা সংকলন  
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের তালিকা

## মুক্তিযুদ্ধের গান

জয় বাংলা, বাংলার জয়

## মুক্তিযুদ্ধের কবিতা

বন্দী শিবির থেকে/ শামসুর রাহমান

## মুক্তিযুদ্ধের নাটক

মাটির কানা

## তালিকা

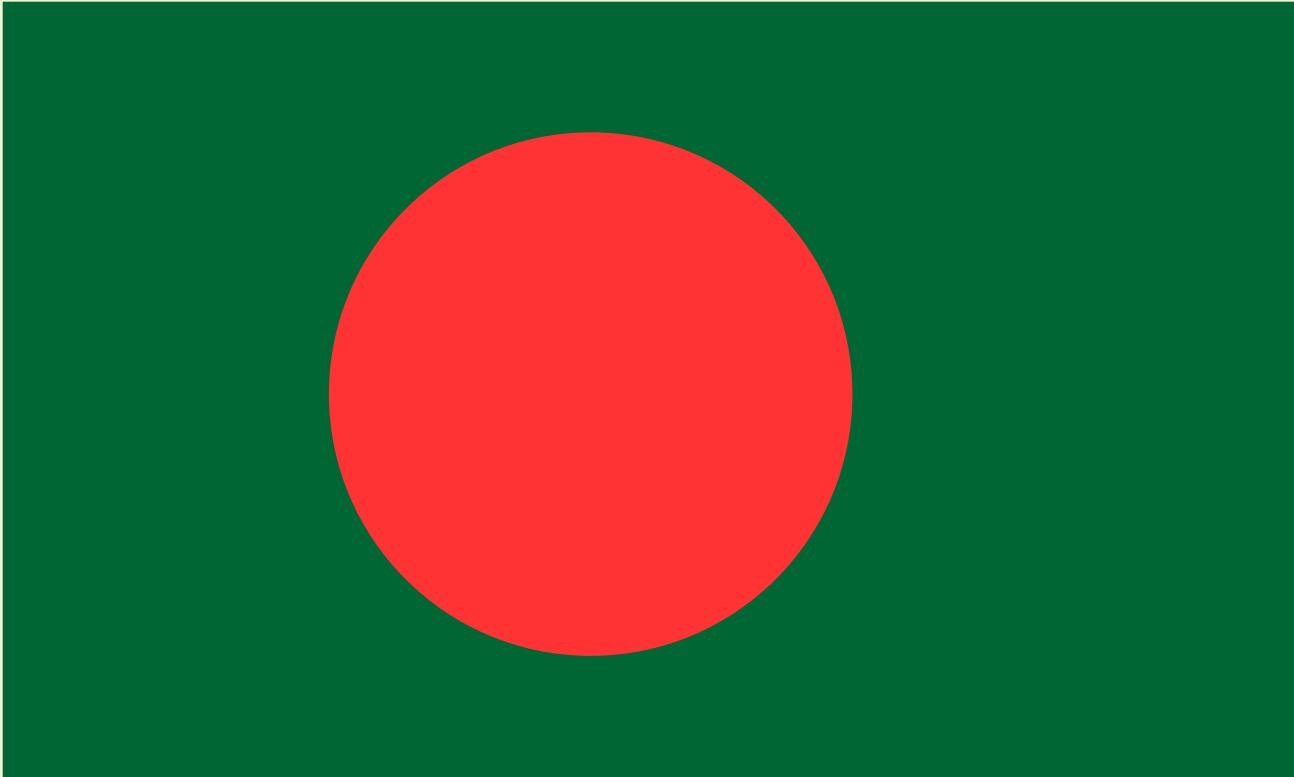
ই-সংকলনের লেখক-তালিকা

# বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালের এপ্রিল ১৭ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত একটি ঘোষণাপত্র। যতদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছে ততদিন মুজিবনগর সরকার পরিচালনার অন্তর্ভুক্তাগীন সংবিধান হিসেবে এই ঘোষণাপত্র কার্যকর ছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য হওয়ার পরও এই ঘোষণাপত্র সংবিধান হিসেবে কার্যকর ছিল। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর ১৬ তারিখে যখন দেশের নতুন সংবিধান প্রণীত হয় তখন সংবিধান হিসেবে এর কার্যকারিতার সমাপ্তি ঘটে।

## ইতিহাস

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ঢাকা এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যার প্রাক্কালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দ, গণপরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ৩০ মার্চের মধ্যেই তাদের অনেকে কলকাতায় সমবেত হন। প্রাদেশিক পরিষদের যেসকল সদস্য ১০ এপ্রিলের মধ্যে কলকাতায় মিলিত হতে সমর্থ হন তারা তারা এদিনই একটি প্রবাসী আইন পরিষদ গঠন করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন। এপ্রিল ১৭ তারিখে মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী স্থান বৈদ্যনাথতলায় (প্রবর্তী নাম মুজিবনগর) এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপরিষদের সদস্য এম ইউসুফ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে নবগঠিত প্রবাসী আইন পরিষদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। এদিনই ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দেয়া হয় এবং একই সাথে ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারও বৈধ বলে স্বীকৃত হয়। এ ঘোষণায় মুক্তিযুদ্ধে



অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে চেইন অফ কমান্ড স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়।

## ঘোষণাপত্রের পূর্ণ বিবরণ

মুজিবনগর, বাংলাদেশ

তারিখ: ১০ এপ্রিল ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭

জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল; এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল; এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩৩ মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন; এবং যেহেতু তিনি আহুত এই অধিবেশন স্বেচ্ছার এবং বেআইনীভাবে

অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন; এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রূতি পালন করার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতি বির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন; এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভৃত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতো শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং বাংলাদেশের অর্থ তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান; এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এখনও বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরন্তর জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে; এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা এবং নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনার দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের পক্ষে একত্রিত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রগরাম করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করে তুলেছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাদের কার্যকরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে;

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সে ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে

বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছি এবং এর দ্বারা পূর্বাহো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি; এবং এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন; এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশন্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন; ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন; এবং তাঁর কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকবে; এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধান প্রদত্ত সকল দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তেছে তা যথাযথভাবে আমরা পালন করব। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতাৰ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করলাম।

**স্বাক্ষর:** অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলী

বাংলাদেশ গণপরিষদের ক্ষমতা দ্বারা  
এবং ক্ষমতাবলে যথাবিধি সর্বাধিক ক্ষমতাধিকারী।

আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ ১৯৭১

বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একটি দিনে আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ নামে একটি আদেশ জারি করেন। ঘোষণাপত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সকল আইন চালু ছিল, তা রক্ষার্থে এই আদেশ বলবৎ করা হয়।

## পূর্ণ বিবরণ

আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ ১৯৭১  
মুজিবনগর, বাংলাদেশ, ১০ এপ্রিল ১৯৭১, শনিবার ১২  
চৈত্র ১৩৭৭

আমি বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে এ আদেশ জারি করছি যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সকল আইন চালু ছিল, তা ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একইভাবে চালু থাকবে, তবে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য করা যাবে। এই রাষ্ট্র গঠন বাংলাদেশের জনসাধারণের ইচ্ছায় হয়েছে। এক্ষণে, সকল সরকারি, সামরিক, বেসামরিক, বিচার বিভাগীয় এবং কূটনৈতিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছেন, তারা এতদিন পর্যন্ত নিয়োগবিধির আওতায় যে শর্তে কাজে বহাল ছিলেন, সেই একই শর্তে তারা চাকুরিতে বহাল থাকবেন। বাংলাদেশের সীমান্যায় অবস্থিত সকল জেলা জজ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সকল কূটনৈতিক প্রতিনিধি যারা অন্যত্র অবস্থান করেছেন, তারা সকল সরকারি কর্মচারীকে স্ব স্ব এলাকায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

এই আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে।

**স্বাক্ষর:-** সৈয়দ নজরুল ইসলাম  
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

## তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, তৃতীয় খন্দ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৪-৭
২. বাংলাপিডিয়া নিবন্ধ: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। লেখক: সাজাহান মিয়া

- বাংলা উইকিপিডিয়া হতে জিএফডিএল এর অধীনে প্রদত্ত। রাগিব হাসানের পোস্ট থেকে সংগৃহীত।

# মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম  
বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ৭ জন শহীদ  
মুক্তিযোদ্ধাকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ  
বীরত্বের খেতাব - বীর শ্রেষ্ঠ  
উপাধি প্রদান করা হয়।

জীবনী নিবন্ধসমূহ বাংলা উইকিপিডিয়ার  
কর্মীরা বিভিন্ন তথ্যসূত্র দ্বারা সংকলন  
করেছেন। রাগিব হাসানের পোস্ট।

## বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান



বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান (২৯ অক্টোবর ১৯৪১ - ২০ আগস্ট ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত হন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে চৰম সাহসিকতা আৱ বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সাতজন বীরকে সর্বোচ্চ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত কৰা হয় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান তাদের মধ্যে অন্যতম।

### জীবনী

মতিউর ১৯৪১ সালের ২৯শে অক্টোবর পুরান ঢাকার ১০৯ আগা সাদেক রোডের পৈত্রিক বাড়ি 'মোবারক লজ'-এ জন্মগ্রহণ কৰেন। ৯ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে মতিউর থষ্ঠ। তাঁর বাবা মৌলভী আবদুস সামাদ, মা সৈয়দা মোবারকুল্লেসা খাতুন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পাস কৰার পর সারগোদায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। ডিস্টিংক্স মেটিক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ সালে বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে রিসালপুর পিএএফ কলেজ থেকে কমিশন লাভ কৰেন এবং জেনারেল ডিউটি পাইলট হিসাবে নিযুক্ত হন। এরপৰ কৰাচির মৌরীপুরে জেট কনভার্সন কোর্স সমাপ্তি কৰে পেশোয়ারে গিয়ে জেট পাইলট হন। ১৯৬৫তে ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ফ্লাইট অফিসার অবস্থায় কৰ্মৱত ছিলেন। এরপৰ মিগ কনভার্সন কোর্সের জন্য পুনৱায় সারগোদায় যান। সেখানে ১৯৬৭ সালের ২১ জুলাই তাৰিখে একটি মিগ-১৯ বিমান চালানোৰ সময় ফ্লাইট অফিসার অবস্থায় কৰ্মৱত ছিলেন। এরপৰ মিগ কনভার্সন কোর্সের জন্য পুনৱায় সারগোদায় যান। সেখানে ১৯৬৭ সালের ২১ জুলাই তাৰিখে একটি মিগ-১৯ বিমান চালানোৰ সময় আকাশে সেটা হাতৰ বিকল হয়ে গেলে দক্ষতার সাথে প্যারাস্যুটযোগে মাটিতে অবতৰণ কৰেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্তি লাভ কৰেন। ইৱানের রানী ফারাহ দিবার সম্মানে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত বিমান মহড়ায় তিনি ছিলেন একমাত্র বাঙালি পাইলট। রিসালপুরে দু'বছর ফ্লাইট

ইস্টার্টের হিসাবে কাজ কৰার পৰ ১৯৭০ এ বদলি হয়ে আসেন জেট ফ্লাইট ইস্টার্টের হয়ে। ১৯৭১ এৱে ফেব্রুয়াৰি মাসে ঢাকায় ছুটিতে আসেন।

যেতাবে শহীদ হলেন

২৫ মার্চের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মৰ্মাহত হন। পৰে তিনি দোলতকান্দিতে জনসভা কৰেন এবং বিরাট মিছিল নিয়ে ভৈরব বাজারে যান। পাক-সৈন্যৰা ভৈরব আক্ৰমণ কৰলে বেগল রেজিমেন্টে ইপিআর-এৰ সঙ্গে থেকে প্ৰতিৱেধ বৃহৎ তৈৰি কৰেন। এৰ পৰই কৰ্মসূলে ফিরে গিয়ে জিস বিমান দখল এবং সেটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰেন। ২০ই আগস্ট সকালে কৰাচিৰ মৌরিপুৰ বিমান ঘাঁটিতে তাৰই এক ছাত্ৰ রশীদ মিনহাজেৰ কাছ থেকে একটি জিস বিমান ছিনতাই কৰেন। কিষ্টি মিনহাজ এ ঘটনা কঠোল টাওয়াৰে জানিয়ে দিলে, অপৰ চাৱাটি জিস বিমান মতিউৱেৰ বিমানকে ধাওয়া কৰে। এ সময় মিনহাজেৰ সাথে মতিউৱেৰ ধৰ্মসাধনিত চলতে থাকে এবং এক পৰ্যায়ে মিনহাজ ইজেন্ট সুইচ চাপলে মতিউৱেৰ বিমান থেকে ছিটকে পড়েন এবং বিমান উড়োনেৰ উচ্চতা কম থাকায় রাশেদসহ বিমানটি ভাৱতীয় সীমান্ত থেকে মাত্ৰ ৩৫ মাইল দূৰে থাট্টা এলাকায় বিধৰণ হয়। মতিউৱেৰ সাথে প্যারাসুট না থাকাতে তিনি নিহত হন। তাঁৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থল হতে প্ৰায় আধ মাইল দূৰে পাওয়া যায়। রশীদ মিনহাজকে পাকিস্তান সৱকাৰ সম্মানসূচক খেতাৰ দান এবং মতিউৱেৰ কৰাচিৰ মাসৱৰ বেসেৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰবস্থানে সমাহিত কৰা হয়। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউৱেৰ রহমানেৰ স্ত্ৰী মিলি রহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউৱেৰ রহমান শহীদ হৰাৰ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। পাকিস্তানিৰা তাঁকে এক অন্ধকাৰ কক্ষে তাঁৰ শিশু বাচ্চা ও কাজেৰ পৰিচারিকাসহ দীৰ্ঘদিন বন্দী কৰে রাখে ও অত্যাচাৰ কৰে। মুক্তি পাবাৰ পৰ তিনি বাংলাদেশে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধেৰ সাথে একাত্মতা প্ৰকাশ কৰেন। ২০০৬ সালেৰ ২৩ জুন মতিউৱেৰ রহমানেৰ দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁকে পূৰ্ণ মৰ্যাদায় ২৫ জুন শহীদ বুদ্ধিজীবী গোৱস্থানে পুনৱায় দাফন কৰা হয়।

## বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

# সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

তিনি পাহাড়ি খালের  
মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে  
গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ  
শুরু করেন। দুটি  
গ্রেনেড সফলভাবে  
মেশিনগান পোস্টে  
আঘাত হানে, কিন্তু তার  
পরপরই হামিদুর  
রহমান গুলিবিদ্ধ হন।  
সে অবস্থাতেই তিনি  
মেশিনগান পোস্টে  
গিয়ে সেখানকার দুই  
জন পাকিস্তানি সৈন্যের  
সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু  
করেন।

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (ফেব্রুয়ারি ২, ১৯৫৩- অক্টোবর ২৮, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মাত্র ১৮ বছর বয়সে শহীদ হওয়া হামিদুর রহমান সাত জন বীর শ্রেষ্ঠ পদকপ্রাপ্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

### সংক্ষিপ্ত জীবনী

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি যশোরের মহেশপুর উপজেলার খোরাদা খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১ তাঁর পিতা আবাস আলী মন্ডল, মাতা মোসাম্মাঁ কায়সুন্নেসা। খালিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় নাইট স্কুলে সামান্য লেখাপড়া করেন। ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন। যোগদানের পরই চট্টগ্রামের সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেল সেন্টারে প্রশিক্ষণের জন্য যান। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে চাকরিস্থল থেকে নিজ গ্রামে চলে আসেন। বাড়িতে একদিন থেকে পরদিনই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য চলে যান সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার ধলই চা বাগানের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ধলই বর্ডার আউটপোস্টে।

### যেভাবে শহীদ হলেন

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষভাগে হামিদুর রহমান ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানির হয়ে ধলই সীমান্তের ফাঁড়ি দখল করার অভিযানে অংশ নেন। ভোর চারটায় মুক্তিবাহিনী লক্ষ্যস্থলের কাছে পৌঁছে অবস্থান নেয়। সামনে দু প্লাটুন ও পেছনে এক প্লাটুন সৈন্য অবস্থান নিয়ে অগ্সর হতে থাকে শক্ত অভিযুক্তে। শক্ত অবস্থানের কাছাকাছি এলে একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। মুক্তিবাহিনী সীমান্ত ফাঁড়ির খুব কাছে পৌঁছে গেলেও ফাঁড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত হতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলিবর্ষণের জন্য আর অগ্সর হতে পারছিলো না। অক্টোবরের ২৮ তারিখে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পাকিস্তান বাহিনীর ৩০ এ ফট্টিয়ার রেজিমেন্টের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে অংশ নেয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর মেশিনগান পোস্টে গ্রেনেড হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রেনেড ছোড়ার দায়িত্ব দেয়া হয় হামিদুর রহমানকে। তিনি পাহাড়ি খালের মধ্য

দিয়ে বুকে হেঁটে গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। দুটি গ্রেনেড সফলভাবে মেশিনগান পোস্টে আঘাত হানে, কিন্তু তার পরপরই হামিদুর রহমান গুলিবিদ্ধ হন। ২ সে অবস্থাতেই তিনি মেশিনগান পোস্টে গিয়ে সেখানকার দুই জন পাকিস্তানি সৈন্যের সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করেন। এভাবে আক্রমণের মাধ্যমে হামিদুর রহমান একসময় মেশিনগান পোস্টকে অকার্যকর করে দিতে সক্ষম হন। এই সুযোগে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল উদ্যমে এগিয়ে যান, এবং শক্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে সীমানা ফাঁড়িটি দখল করতে সমর্থ হন। কিন্তু হামিদুর রহমান বিজয়ের স্বাদ আসাদান করতে পারেননি, ফাঁড়ি দখলের পরে মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হামিদুর রহমানের লাশ উদ্ধার করে।

হামিদুর রহমানের মৃতদেহ সীমান্তের অন্ত দূরে ভারতীয় ভূখণ্ডে ত্রিপুরা রাজ্যের হাতিমেরছড়া গ্রামের স্থানীয় এক পরিবারের পারিবারিক গোরহানে দাফন করা হয়। ৩ নিচু স্থানে অবস্থিত কবরটি একসময় পানিতে তলিয়ে যায়।

২০০৭ সালের ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হামিদুর রহমানের দেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। ৪ সে অনুযায়ী ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাইফেলসের একটি দল ত্রিপুরা সীমান্তে হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ গ্রহণ করে, এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে কুমিল্লার বিবিরহাট সীমান্ত দিয়ে শহীদের দেহাবশেষ বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানকে ঢাকার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

### তথ্যসূত্র

- ‘Birshreshtha Hamidur Rahman Laid To Rest’, The Daily Star, ১২ ডিসেম্বর ২০০৭।
- ‘বীর হামিদুরের ঘরে ফেরা’, প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭।
- ‘Bangladesh takes home teenage war hero’, রয়টার্স, ১০ ডিসেম্বর ২০০৭।
- ‘বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুরের দেহাবশেষ দেশে এনে সমাহিত করা হবে’, প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০০৭।
- ‘Home they brought warrior dead: Bir Shreshtha Hamidur to be buried at Martyred Intellectuals’ Graveyard today’, The New Nation, ১১ই ডিসেম্বর, ২০০৭।

## বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি ইঞ্জিন আর্টিফিসার রঞ্জল আমিন

স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য মোহাম্মদ রঞ্জল আমিনকে (১৯৩৫ - ডিসেম্বর ১০, ১৯৭১) বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রঞ্জল আমিন ১৯৩৫ সালে নোয়াখালীর বাঘচাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আজহার পাটোয়ারী, মাতা জোলখা খাতুন। রঞ্জল আমিন বাঘচাপড়া প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে আমিষাপড়া হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৩-তে জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে যোগদান করেন।

আরব সাগরে অবস্থিত মানোরা দ্বাপে পিএনএস বাহাদুর-এ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পিএনএস কারসাজে যোগদান করেন। ১৯৫৮-তে পেশাগত প্রশিক্ষণ শেষ করেন। ১৯৬৫-তে

মেকানিশিয়ান কোর্সের জন্য নির্বাচিত হন। পিএনএস কারসাজে কোর্স সমাপ্ত করার পর আর্টিফিসার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৮-তে চট্টগ্রাম পিএনএস বখতিয়ার নৌ-ঘাটিতে বদলি হয়ে যান। ১৯৭১-এর এপ্রিলে ঘাটি

থেকে পালিয়ে যান। ভারতের প্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে ২ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে থেকে বিভিন্ন

স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী গঠিত হলে কলকাতায় চলে আসেন। ভারত সরকার

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে দুটি গানবোট উপহার দেয়। গানবোটের নামকরণ করা হয় পদ্মা ও পলাশ।

রঞ্জল আমিন পলাশের প্রধান ইঞ্জিনর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।



যেভাবে শহীদ হলেন

৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী যশোর সেনানিবাস দখলের পর

পদ্মা, পলাশ এবং ভারতীয় মিআবাহিনীর একটি গানবোট 'পানভেল' খুলনার মংলা বন্দরে পাকিস্তানি নৌ-ঘাটি পিএনএস তিতুমীর দখলের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-এ প্রবেশ করে। ১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২ টার দিকে

গানবোটগুলো খুলনা শিপইয়ার্টের কাছে এলে অনেক উচুন্তে তিনটি জঙ্গি বিমানকে উচুন্তে দেখা যায়। শক্রর

বিমান অনুধাবন করে পদ্মা ও পলাশ থেকে গুলি করার অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু অভিযানের সর্বাধিনায়ক ক্যাপ্টেন মনেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিমান মনে করে গুলিবর্ষণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এর কিছুক্ষণ পরে

বিমানগুলো অপ্রত্যাশিত ভাবে নিচে নেমে আসে এবং আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করে। গোলা সরাসরি 'পদ্মা'

এর ইঞ্জিন রংমে আঘাত করে ইঞ্জিন বিধ্বস্ত করে। হতাহত হয় অনেক নাবিক। পদ্মা-র পরিণতিতে পলাশের

অধিনায়ক লে. কমান্ডার রায় চৌধুরী নাবিকদের জাহাজ ত্যাগের নির্দেশ দেন। রঞ্জল আমিন এই আদেশে

ক্ষিপ্ত হন। তিনি উপস্থিত সবাইকে যুদ্ধ বন্ধ না করার আহ্বান করেন। কামানের ক্ষেত্রে বিমানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা

হয়নি। বিমানগুলো উপর্যুক্ত বোমাবর্ষণ করে পলাশের ইঞ্জিনর ধ্বংস করে দেয়। শহীদ হন রঞ্জল

আমিন। রূপসা নদীর পাড়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

## বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি ল্যান্সনায়েক মুসি আব্দুর রউফ

মুসি আব্দুর রউফ (১৯৪৩ - এপ্রিল ৮, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুসি আব্দুর রউফ ১৯৪৩ সালের মে মাসে ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার (পূর্বে বোয়ালমারী উপজেলার অন্তর্গত) সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুসি মেহেদী হোসেন এবং মাতার নাম মকিদুর্রেসা। কিশোর বয়সে রউফ-এর পিতা মারা যান। ফলে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৬৩-৮ মে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ ভর্তি হন। তাঁর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ১৩১৮৭। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে চট্টগ্রামে ১১ নম্বর উইং এ কর্মরত ছিলেন। সে সময় তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

মুসি আব্দুর রউফ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীর সাথে বুড়িঘাটে অবস্থান নেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাসামাটি-মহালছড়ি জলপথ প্রতিরোধ করার জন্য ৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের দুই কোম্পানী সৈন্য, সাতটি স্প্রিড বোট এবং দুটি লেংকে করে বুড়িঘাট দখলের জন্য অগ্রসর হয়। তারা প্রতিরক্ষা বৃহারে সামনে এসে ৩ ইঞ্চি মটর এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র দিয়ে হঠাত অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু করে। গোলাবৃষ্টির তীব্রতায় প্রতিরক্ষার সৈন্যরা পেছনে সরে বাধ্য হয়। কিন্তু ল্যান্সনায়েক মুসি আব্দুর রউফ পেছনে হটতে অস্থীকৃতি জানান। নিজ পরিখা থেকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু করেন। মেশিনগানের এই পাল্টা আক্রমণের ফলে শক্রদের স্প্রিডবোটগুলো ডুবে যায়।

হতাহত হয় এর আরোহীরা। পেছনের দুটো লঞ্চ দ্রুত পেছনে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে শুরু করে দূরপাল্লার ভারী গোলাবর্ষণ।

মটারের ভারী গোলা এসে পরে আব্দুর রউফের উপর। লুটিয়ে পড়েন তিনি, নীরের হয়ে যায় তাঁর মেশিনগান। ততক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সক্ষম হন তাঁর সহযোদ্ধারা।

শহীদ ল্যান্সনায়েক মুসি আব্দুর রউফের সমাধি পার্বত্য জেলা রাঙামাটির নানিয়ারচরে। তাঁর অপরিসীম বীরত্ব, সাহসীকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ থেকে ভূষিত করে।

## বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (১৯৪৮- ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।



সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ১৯৪৮ সালে বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল মোতালেব হাওলাদার।

জাহাঙ্গীর ১৯৬৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ১৯৬৬ তে আইএসসি পাশ করার পর বিমানবাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করেন, কিন্তু চোখের অসুবিধা থাকায় ব্যর্থ হন। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৮-র ২ জুন তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে কর্মশীল লাভ করেন। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তিনি পাকিস্তানে ১৭৩ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ানে কর্তৃব্যরত ছিলেন। মাত্র ভূমির স্বাধীনতার জন্য তিনি ঝুঁটে এসেছিলেন পাকিস্তানের দুর্গম এলাকা অতিক্রম করে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। তুলাই পাকিস্তানে আটকেপড়া আরো তিনজন অফিসারসহ তিনি পালিয়ে যান ও পরে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মেহেদীপুরে মুক্তিবাহিনীর ৭৯ সেক্টরে সাব সেক্টর কমান্ডার হিসাবে যোগ দেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখানোর কারণে তাঁকে রাজশাহীর চাঁপাইনবাৰগঞ্জ দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। স্বাধীনতার উষালগ্নে বিজয় সুনিশ্চিত করেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে চাঁপাইনবাৰগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ আঙিনায় সমাহিত করা হয়।

## যেভাবে শহীদ হলেন

১০ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম, লেফটেন্যান্ট আউয়াল ও ৫০ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধা চাঁপাইনবাৰগঞ্জের পশ্চিমে বারঘারিয়া এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর ভোরে মাত্র ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বারঘারিয়া এলাকা থেকে ৩-৪ টি দেৌৰি মৌকায় করে রেহাইচর এলাকা থেকে মহানন্দা নদী অতিক্রম করেন। নদী অতিক্রম করার পর উত্তর দিক থেকে একটি একটি করে প্রত্যেকটি শক্র অবস্থানের দখল নিয়ে দক্ষিণে এগোতে থাকেন। তিনি এমনভাবে আক্রমণ পরিকল্পনা করেছিলেন যেন উত্তর দিক থেকে শক্র নিপাত করার সময় দক্ষিণ দিক থেকে শক্র কোনকিছু আঁচ করতে না পারে। এভাবে এগুতে থাকার সময় জয় যখন প্রায় সুনিশ্চিত তখন ঘটে বিপর্যয়। হঠাৎ বাঁধের উপর থেকে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের ৮/১০ জন সৈনিক দৌড়ে চৰ এলাকায় এসে যোগ দেয়। এরপরই শুরু হয় পাকিস্তান বাহিনীর অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষণ। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর জীবনের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যান। ঠিক সেই সময়ে শক্র একটি গুলি এসে বিন্দু হয় জাহাঙ্গীরের কপালে। শহীদ হন তিনি।

## বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

নূর মোহাম্মদ শেখ (ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৩৬- সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

## সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহেশখোলা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে নূর মোহাম্মদ শেখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আমানত শেখ, মাতা জেলাতুন্নেসা। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার লেখাপড়া শেষ না করে ১৯৫৯-এর ১৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এ যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে নূর মোহাম্মদকে দিনাজপুর থেকে যশোরে বদলি করা হয়। বদলি স্থানে যোগদানের আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন।

## যেভাবে শহীদ হলেন

১৯৭১- এর ৫ সেপ্টেম্বর সুতিপুরে নিজস্ব প্রতিরক্ষার সামনে গোয়ালহাটি গ্রামে নূর মোহাম্মদকে অধিনায়ক করে পাঁচজনের সমস্যে গঠিত একটি স্ট্যান্ডিং পেট্রোল পার্টানো হয়। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পেট্রোলটি তিনি দিক থেকে ধীরে ফেলে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পেছনে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা থেকে পাল্টা গুলিবর্ষণ করা হয়। তবু পেট্রোলটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। একসময়ে সিপাহী নারু মিয়া গুলিবিন্দু হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে নূর মোহাম্মদ নারু মিয়াকে কাঁধে তুলে নেন এবং হাতের এলএমজি দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করলে শক্রপক্ষ পশ্চাপসারণ করতে বাধ্য হয়। হঠাৎ করেই শক্র মর্টারের একটি গোলা এসে লাগে তাঁর ডান কাঁধে। ধরাশয়ী হওয়া মাত্র আহত নারু মিয়াকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। হাতের এলএমজি সিপাহী মোস্তকাকে দিয়ে নারু মিয়াকে নিয়ে যেতে বললেন এবং মোস্তকার রাইফেল চেয়ে নিলেন যতক্ষণ না তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সক্ষম হন ততক্ষণে এ রাইফেল দিয়ে শক্রসৈন্য ঠেকিয়ে রাখবেন এবং শত্রুর মনোযোগ তাঁর দিকেই কেন্দ্রীভূত করে রাখবেন। অন্য সঙ্গীরা তাদের সাথে অনুরোধ করলেন যাওয়ার জন্যে। কিন্তু তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে গেলে সবাই মারা পড়বে এই আশঙ্কায় তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। বাকিদের অধিনায়োকোচিত আদেশ দিলেন তাঁকে রেখে চলে যেতে। তাঁকে রেখে সন্তর্পণে সরে যেতে পারলেন বাকিরা। এদিকে সমানে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন রক্তাক নূর মোহাম্মদ। একদিকে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী, সঙ্গে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, অন্যদিকে মাত্র অর্ধমৃত সৈনিক (ইপিআর), যারা সম্মল একটি রাইফেল ও সীমিত গুলি। এই অসম অবিশ্বাস্য যুদ্ধে তিনি শতুপক্ষের এমন ক্ষতিসাধন করেন যে তারা এই মৃত্যুপথযাত্রী যোদ্ধাকে বেয়নেট দিয়ে বিকৃত করে চোখ দুটো উপড়ে ফেলে। পরে প্রতিরক্ষার সৈনিকরা এসে পাশের একটি বাড় থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

## বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি সিপাহী মোস্তফা কামাল



মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৪৭- এপ্রিল ১৭, ১৯৭১)  
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে  
অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

### সংক্ষিপ্ত জীবনী

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভোলা জেলার দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজীপুর থামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাবিবুর রহমান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার ছিলেন। শৈশব থেকেই দুঃসাহসী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। পড়াশোনা বেশিরভাগ করতে পারেননি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর উচ্চ বিদ্যালয়ে দু-এক বছর অধ্যয়ন করেন। ১৯৬৭-র ১৬ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক। ১৯৭১-এর প্রথম দিকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্রাক্ষণবাড়িয়াকে ঘিরে তিনটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তোলে এন্ডারসন খালের পাড়ে। আখাউড়ায় অবস্থিত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দক্ষিণ দিক থেকে নিরাপত্তার জন্য দরজাইন থামের দুই নম্বর প্লাটুনকে নির্দেশ দেয়। সিপাহী মোস্তফা কামাল ছিলেন দুই নম্বর প্লাটুনে। কর্মতৎপরতার জন্য যুদ্ধের সময় মৌখিকভাবে তাঁকে ল্যাঙ্গনায়েকের দায়িত্ব দেয়া হয়।

### যেতাবে শহীদ হলেন

১৬ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুমিল্লা-আখাউড়া রেললাইন ধরে উত্তর দিকে এগুতে থাকে। ১৭ই এপ্রিল পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনী দরজাইন থামে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর মর্টার ও আর্টিলেরীর গোলাবর্ষণ শুরু করলে মেজের শাফায়াত জামিল ১১ নম্বর প্লাটুনকে দরজাইন থামে আগের প্লাটুনের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। ১১ নম্বর প্লাটুন নিয়ে হাবিলদার মুনির দরজাইনে পৌছেন। সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল তার নিকট থেকে গুলি নিয়ে নিজ পরিখায় অবস্থান গ্রহণ করেন। বেলা ১১ টার দিকে শুরু হয় শত্রুর গোলাবর্ষণ। সেই সময়ে শুরু হয় মুষলধারে ব্রহ্ম। সাড়ে ১১টার দিকে মোগরা বাজার ও গঙ্গা সাগরের শত্রু অবস্থান থেকে গুলি বর্ষিত হয়।

১২ টার দিকে আসে পশ্চিম দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ। প্রতিরক্ষার সৈন্যরা আক্রমণের তীব্রতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। কয়েকজন শহীদ হন। মোস্তফা কামাল মরিয়া হয়ে পাল্টা গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর পূর্বদিকের সৈন্যরা পৈছনে সরে নতুন অবস্থানে সরে যেতে থাকে এবং মোস্তফাকে যাবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তাদের সবাইকে নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগের জন্য মোস্তফা পূর্ণেদ্যমে এলএমজি থেকে গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর ৭০ গজের মধ্যে শত্রুপক্ষ চলে এলেও তিনি থামেননি। এতে করে শত্রুরা তাঁর সঙ্গীদের পিছু ধাওয়া করতে সাহস পায়নি। একসময় গুলি শেষ হয়ে গেলে, শত্রুর আঘাতে তিনিও লুটিয়ে পড়েন।

## সাত বীরশ্রেষ্ঠের স্থায়ী ঠিকানা ও স্মৃতিস্তম্ভের স্থান

১. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ইতারই মোহাম্মদ রঞ্জন আমিন  
গ্রাম : বাঘচাপড়া, ইউনিয়ন : দেউটি, উপজেলা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালী।  
স্মৃতিস্তম্ভের স্থান : লাকপুর সি ফুড, রূপসা ঘাট, রূপসা, খুলনা।
২. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যাঙ্গনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ  
গ্রাম : মহেশখোলা, ইউনিয়ন : চত্তিবারপুর, উপজেলা : নড়াইল সদর, জেলা : নড়াইল।  
স্মৃতিস্তম্ভের স্থান : কাশিরপুর, শার্ষা, যশোর।
৩. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর  
গ্রাম : রাহিমগঞ্জ, ইউনিয়ন : আগরপুর, উপজেলা : বাবুগঞ্জ, জেলা : বরিশাল।  
স্মৃতিস্তম্ভের স্থান : সোনা মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৪. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যাঙ্গনায়েক মুস্তী আবদুর রউফ  
গ্রাম : সালামতপুর, ইউনিয়ন : কামারখালী, উপজেলা : মধুখালী, জেলা : ফরিদপুর।  
স্মৃতিস্তম্ভের স্থান : বুড়িরঘাট, নানিয়ারচর, রাঙামাটি।
৫. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল  
গ্রাম : মৌটুপি, ইউনিয়ন : আলীগঠ, উপজেলা : ভোলা সদর, জেলা : ভোলা।  
স্মৃতিস্তম্ভের স্থান : মোগরা, আখাউড়া, ব্রাক্ষণবাড়িয়া।
৬. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান  
গ্রাম : খোরদা খালিশপুর, ইউনিয়ন : এসকেবি (সুন্দরপুর, বজরাপুর এবং খালিশপুর), উপজেলা : মহেশপুর, জেলা : খিলাইহাট।  
স্মৃতিস্তম্ভের স্থান : ধলই, বিওপি, করলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
৭. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফাহিট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান  
গ্রাম : রামনগর, ইউনিয়ন : মুসাপুর, উপজেলা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংহদেৱ।  
স্মৃতিস্তম্ভের স্থান : বিএএফ শাহীন কলেজ ক্যাম্পাস, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

উৎস : মুক্তিযুদ্ধবিময়ক মন্ত্রনালয়ের ওয়েবসাইট

# মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্নজনকে তাদের অবদানের ভিত্তিতে বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন। এর মধ্যে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের পুরস্কার ‘বীর উত্তম’ পান ৬৮ জন, তৃতীয় সর্বোচ্চ উপাধি ‘বীরবিক্রম’ পেয়েছেন ১৭৫ জন। চতুর্থ সর্বোচ্চ ‘বীর প্রতীক’ লাভ করেন মোট ৪২৬ জন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর ৮/২৫/ডি-১/৭২-১৩৭৮ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩-এ তালিকাগুলো প্রকাশিত হয়।

এই তালিকাই উঠে এসেছে মাসআটেক আগে যাত্রা শুরু করা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আর্কাইভ ‘মুক্তিযুদ্ধ উইকিয়া’তে। আর তা বাংলা উইকিপিডিয়া ও মুক্তিযুদ্ধ উইকিয়াতে যোগ করতে সাহায্য করেছেন বাংলা উইকিপিডিয়ার কর্মী খান মুহাম্মদ বিন আসাদ ও রাজিবুল হাসান। আর তা ব্লগের পাতায় তুলে এনেছেন রাগিব হাসান।

শহীদ বীরদের নামের পাশে তারকা (\*) চিহ্ন উল্লেখ করা আছে।

## পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর উত্তম

ক্রম	নাম	সেক্টর	পদবি
০১	আবদুর রব	সেনা প্রধান, সেনা সদর	লে. কর্নেল
০২	কে. এম. শফিউল্লাহ	অধিনায়ক, এস. ফোর্স	মেজর
০৩	জিয়াউর রহমান	অধিনায়ক, জেড. ফোর্স	মেজর
০৪	চিন্দ্রঞ্জন দত্ত	সেক্টর অধিনায়ক-৪	মেজর
০৫	কাজী নূরজামান	সেক্টর অধিনায়ক-৭	মেজর
০৬	মীর শওকত আলী	সেক্টর অধিনায়ক-৫	মেজর
০৭	খালেদ মোশাররফ	অধিনায়ক, কে. ফোর্স	মেজর
০৮	আব্দুল মঞ্জুর	সেক্টর অধিনায়ক-৮	মেজর
০৯	আবু তাহের	সেক্টর অধিনায়ক-১১	মেজর
১০	এ. এন. এম. নূরজামান	সেক্টর অধিনায়ক-৩	ক্যাপ্টেন
১১	রফিকুল ইসলাম	সেক্টর অধিনায়ক-১	ক্যাপ্টেন
১২	আব্দুস ছালেক চৌধুরী	সেক্টর অধিনায়ক-২	ক্যাপ্টেন
১৩	আমিনুল হক	অধিনায়ক, ৮ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
১৪	খাজা নিজাম উদ্দিন*	সেক্টর-৪ লিডার	গণবাহিনী
১৫	হারুন আহমেদ চৌধুরী	সেক্টর-১	ক্যাপ্টেন
১৬	এ. টি. এম. হায়দার	সেক্টর অধিনায়ক-২	মেজর
১৭	এম. এ. গাফফার হালদার	অধিনায়ক, ৯ ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
১৮	শরীফুল হক (ডালিম)	সেক্টর-৪	মেজর
১৯	মোহাম্মদ শাহজাহান ওমর	সেক্টর-৯	ক্যাপ্টেন
২০	মাহবুবুর রহমান	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন
২১	মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন	অধিনায়ক, ১ম ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
২২	আফতাব কাদের*	সেক্টর-১	ক্যাপ্টেন
২৩	মাহবুবুর রহমান*	জেড ফোর্স	ক্যাপ্টেন
২৪	সালাহউদ্দিন মমতাজ	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
২৫	আজিজুর রহমান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
২৬	এস. এম. ইমদাদুল হক*	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
২৭	আনোয়ার হোসেন*	১ম ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
২৮	এ. এম. আশফাকুস সামাদ*	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
২৯	আফতাব আলী		সুবেদার
৩০	ফয়েজ আহমেদ*		সুবেদার
৩১	বেলায়েত হোসেন*		নায়েব সুবেদার
৩২	ময়নুল হোসেন*		নায়েব সুবাদার
৩৩	হাবিবুর রহমান		নায়েব সুবাদার
৩৪	শাহ আলম*		হাবিলদার

## পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর উত্তম

ক্রম	নাম	সেক্টর	পদবী
৩৫	নূরুল আমিন		হাবিলদার
৩৬	নাসির উদ্দিন*		হাবিলদার
৩৭	আব্দুল মাল্লান*		নায়েক
৩৮	আব্দুল লতিফ*		ল্যান্স নায়েক
৩৯	আব্দুস ছাত্তার		ল্যান্স নায়েক
৪০	নূরুল হক*		সিপাহী
৪১	মোহাম্মদ শামসুজ্জামান*	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাহী
৪২	শাকিল মিন	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	সিপাহী
৪৩	ফজলুর রহমান*		সুবেদার
৪৪	মজিবুর রহমান		নায়েব সুবেদার
৪৫	শফিকুর্রাজ চৌধুরী*		নায়েক
৪৬	আবু তালেব		সিপাহী
৪৭	সালাহ উদ্দিন আহমেদ		সিপাহী
৪৮	আনোয়ার হোসেন*		সিপাহী
৪৯	এরশাদ আলী*		সিপাহী
৫০	মোজাহার উল্লা	এম এফ, সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো
৫১	জালাল উদ্দিন		এল এস
৫২	আফজাল মির্জা		ই আর এ
৫৩	বদিউল আলম		এম ই আর
৫৪	শফিউল মাওলা		এ বি
৫৫	আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী		সাব/লে.
৫৬	মতিউর রহমান		নৌ কমান্ডো
৫৭	শাহ আলম		নৌ কমান্ডো
৫৮	এ. কে. খন্দকার	এম এফ, সেক্টর-১	গু. ক্যাপ্টেন
৫৯	এম. কে. বাসার	বিমানবাহিনী প্রধান	গু. ক্যাপ্টেন
৬০	সুলতান মাহমুদ	সেক্টর অধিনায়ক-৬	উইং কমান্ডার
৬১	শামসুল আলম	অধিনায়ক, কিলো ফ্লাইট	ক্ষেয়ার্ডেন লিডার
৬২	বদরুল আলম	সদর দফতর, মুজিবনগর	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
৬৩	লিয়াকত আলী খান	কিলো ফ্লাইট	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
৬৪	শাহাবুদ্দিন আহমেদ	সদর দপ্তর, জেড. ফোর্স	ফ্লাইট অফিসার
৬৫	আকরাম আহমেদ	কিলো ফ্লাইট	ক্যাপ্টেন
৬৬	শরফুদ্দিন	কিলো ফ্লাইট	ক্যাপ্টেন
৬৭	এম. এইচ. সিদ্দিকী	সেক্টর-৮	ক্যাপ্টেন
৬৮	আব্দুল কাদের সিদ্দিকী	সেক্টর-১১	মুক্তিবাহিনী

## পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর বিক্রম

ক্রম	নাম	সেক্টর	পদবী
০১	খন্দকার নাজমুল হুদা	সেক্টর-৮	ক্যাপ্টেন
০২	আবু সালেহ মোঃ নাজিম	অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
০৩	সাফায়াত জামিল	অধিনায়ক, ৩য় ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
০৪	ময়নুল হোসেন চৌধুরী	অধিনায়ক, ২য় ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
০৫	গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	সেক্টর-৭	মেজর
০৬	মহসীন উদ্দিন আহমেদ	জেড ফোর্স	ক্যাপ্টেন
০৭	আমিন আহমেদ চৌধুরী	জেড ফোর্স	ক্যাপ্টেন
০৮	এম. এ. আর আজম চৌধুরী	সেক্টর-৮	মেজর
০৯	মোস্তাফিজুর রহমান	সেক্টর-৮	মেজর
১০	হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	১ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
১১	অলি আহমেদ বি. এম.	জেড ফোর্স	ক্যাপ্টেন
১২	জাফর ইমাম	অধিনায়ক, ১০ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর
১৩	এ. ওয়াই. মাহফুজুর রহমান	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	ক্যাপ্টেন
১৪	মেহদী আলী ইমাম	সেক্টর-৯	ক্যাপ্টেন
১৫	এস. এইচ. এম. বি. নূর চৌধুরী	এ.ডি.সি., প্রধান সেনাপতি	ক্যাপ্টেন
১৬	ইমামজুরামান	কে. ফোর্স	ক্যাপ্টেন
১৭	এস. আই. বি. নূরজাহি খান	৩য় ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
১৮	মতিউর রহমান	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
১৯	আব্দুল মাল্লান	জেড ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
২০	গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান	২য় ইস্ট বেঙ্গল	লেফটেন্যান্ট
২১	শমসের মবিন চৌধুরী	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট
২২	আব্দুর রউফ	সেক্টর-৫	লেফটেন্যান্ট
২৩	খন্দকার আজিজুল ইসলাম*	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
২৪	মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
২৫	আব্দুল জব্বার পাটোয়ারী		সুবেদার মেজর
২৬	আব্দুল ওহাব		সুবেদার
২৭	আব্দুস শুকুর		সুবেদার
২৮	আব্দুল করিম		সুবেদার
২৯	ওয়ালিউল্লাহ		নায়েব সুবেদার
৩০	মোহাম্মদ আমানুল্লাহ*		সুবেদার
৩১	মোহাম্মদ ইরাহীম		নায়েব সুবেদার
৩২	ভুলু মির্জা		নায়েব সুবেদার
৩৩	আব্দুস সালাম*		নায়েব সুবেদার
৩৪	এম. এ. মাল্লান		নায়েব সুবেদার
		২য় ইস্ট বেঙ্গল	

# পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর বিক্রম

ক্রম	নাম	সেক্টর	পদবী			
৩৫	আবদুল হক ভূইয়া		নায়েব সুবেদার	৬৯	তারা উদ্দিন*	সিপাই
৩৬	ইয়ার আহমেদ*		নায়েব সুবেদার	৭০	আবদুল আজিজ	সিপাই
৩৭	আবদুল মালেক	ই.পি.আর. সেক্টর-৩	নায়েব সুবেদার	৭১	মোহাম্মদ সানাউল্লাহ*	সিপাই
৩৮	শহীদুল্লাহ ভূইয়া*		নায়েব সুবেদার	৭২	গোলাম মোস্তফা কামাল*	সিপাই
৩৯	আবদুল হাসেম		নায়েব সুবেদার	৭৩	খন্দকার রেজানুর হোসেন*	সিপাই
৪০	আবদুল হক		নায়েব সুবেদার	৭৪	হায়দার আলী	সিপাই
৪১	নূর আহমেদ গাজী*		নায়েব সুবেদার	৭৫	আবুল কালাম আজাদ*	সিপাই
৪২	আশরাফ আলী খান*	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার	৭৬	জামাল উদ্দিন*	সিপাই
৪৩	শামসুল হক	সেক্টর-৪	নায়েব সুবেদার	৭৭	আবদুর রহিম*	সিপাই
৪৪	জোনাব আলী	২য় ইস্ট বেঙ্গল	নায়েব সুবেদার	৭৮	নূরুল ইসলাম ভূইয়া*	সিপাই
৪৫	নূরুল হক		হাবিলদার	৭৯	আবদুল মাল্লান*	সিপাই
৪৬	আবদুল হালিম*		হাবিলদার	৮০	আলী আশরাফ*	সিপাই
৪৭	নূরুল ইসলাম*		হাবিলদার	৮১	মজিবুর রহমান*	সিপাই
৪৮	রফিকুল ইসলাম*		হাবিলদার	৮২	আবদুল হক	সিপাই
৪৯	রঞ্জল আমিন*		হাবিলদার	৮৩	রমজান আলী*	সিপাই
৫০	আফজাল হোসেন (সৈয়দ)		হাবিলদার	৮৪	হেমায়েত উদ্দিন	হাবিলদার
৫১	রাস্তা মিয়া*		হাবিলদার	৮৫	নূরুল ইসলাম*	মোজাহিদ
৫২	সাকিমুল্লিন*		হাবিলদার	৮৬	আবদুল খালেক	মোজাহিদ
৫৩	গোলাম রসূল*	সেক্টর-৪	হাবিলদার	৮৭	সিরাজুল হক*	মোজাহিদ
৫৪	তাহের		হাবিলদার	৮৮	রামিজ উদ্দিন	মোজাহিদ
৫৫	আফসার আলী		হাবিলদার	৮৯	তামিজ উদ্দিন*	মোজাহিদ ক্যাপ্টেন
৫৬	আবদুল হক		নায়েক	৯০	এলাহী বক্র পাটোয়ারী*	আনসার
৫৭	আবদুল মোতালেব*		নায়েক	৯১	ফকরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	সুবেদার মেজর
৫৮	নূরজামান*		নায়েক	৯২	খন্দকার মতিয়ার রহমান	সুবেদার
৫৯	তোহিদুল্লাহ		নায়েক	৯৩	মনিরুজ্জামান*	সুবেদার
৬০	আবদুর রহমান		নায়েক	৯৪	সুলতান আহমেদ	নায়েব সুবেদার
৬১	মোহর আলী*		নায়েক	৯৫	সৈয়দ আমিরুজ্জামান	নায়েব সুবেদার
৬২	আবদুল খালেক		নায়েক	৯৬	আবদুল হাকিম	হাবিলদার
৬৩	আবদুর রব চৌধুরী	সেক্টর-২	নায়েক	৯৭	জামান মিয়া*	হাবিলদার
৬৪	মোহাম্মদ মোস্তফা		ল্যাপ্টনায়েক	৯৮	আবদুস সালাম	হাবিলদার
৬৫	সিরাজুল ইসলাম*		ল্যাপ্টনায়েক	৯৯	নাজিমুল্লিন	হাবিলদার
৬৬	আবদুল বারেক		ল্যাপ্টনায়েক	১০০	ইউ কে সিং	হাবিলদার
৬৭	আবদুল কালাম আজাদ		ল্যাপ্টনায়েক	১০১	আনিস মোল্লা	হাবিলদার
৬৮	দেলোয়ার হোসেন*		ল্যাপ্টনায়েক	১০২	কামরুজ্জামান খলিফা*	হাবিলদার

# পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

## বীর বিক্রম

ক্রম	নাম	সেক্টর	পদবি	ক্রম	নাম	সেক্টর	নৌ-কর্মান্ডো
১০৫	তারিক উল্লাহ*		হাবিলদার	১৩৯	মোহাম্মদ শাহজাহান সিদ্দিকী	সেক্টর-২	নৌ-কর্মান্ডো
১০৬	দেলোয়ার হোসেন*		নায়েক	১৪০	কবিরঞ্জামান*	সেক্টর-২	নৌ-কর্মান্ডো
১০৭	আজিজুল হক*		নায়েক	১৪১	মোফাজ্জল হোসেন (মায়া)	সেক্টর-২	গণবাহিনী
১০৮	মোজাফফর আহমেদ*		নায়েক	১৪২	আবুল কাশেম ভুঁইয়া	সেক্টর-২	গণবাহিনী
১০৯	আবুল কাশেম*		নায়েক	১৪৩	আব্দুস সালাম	সেক্টর-২	গণবাহিনী
১১০	আব্দুল মালেক*		নায়েক	১৪৪	আব্দুস সবুর খান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
১১১	শাহ আলী*		নায়েক	১৪৫	কামরূল হক (স্পন)	সেক্টর-২	সেনা-ক্যাডেট
১১২	মফিজ উদ্দিন আহমেদ*		ল্যাস নায়েক	১৪৬	কাজী কামাল উদ্দিন	সেক্টর-২	সেনা-ক্যাডেট
১১৩	জিলুর রহমান*		ল্যাস নায়েক	১৪৭	শাফী ইমাম (রুমী)*	সেক্টর-২	গণবাহিনী
১১৪	লিলু মি এগ্রা*		ল্যাস নায়েক	১৪৮	আব্দুল হালিম চৌধুরী (জুয়েল)*	সেক্টর-২	গণবাহিনী
১১৫	নিজাম উদ্দিন*		ল্যাস নায়েক	১৪৯	বদিউল আলম (বদি)*	সেক্টর-২	গণবাহিনী
১১৬	আবুল খায়ের		ল্যাস নায়েক	১৫০	মোহাম্মদ আবু বকর	সেক্টর-২	গণবাহিনী
১১৭	আব্দুস ছান্তার*		ল্যাস নায়েক	১৫১	মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন*	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
১১৮	আবুল বাসার*		সিপাই	১৫২	মাহমুদ হোসেন*	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
১১৯	আব্দুল মজিদ		সিপাই	১৫৩	নিলমণি সরকার*	সেক্টর-৪	গণবাহিনী
১২০	আনসার আলী*		সিপাই	১৫৪	জগত জ্যোতি দাস*	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
১২১	মোহাম্মদ উল্লাহ*		সিপাই	১৫৫	সিরাজুল ইসলাম*	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
১২২	আতাহার আলী মজিজক*		সিপাই	১৫৬	ইয়ামিন চৌধুরী	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
১২৩	আব্দুল মোতালিব		সিপাই	১৫৭	মতিউর রহমান	সেক্টর-৫	গণবাহিনী
১২৪	সেরাজ মি এগ্রা*		সিপাই	১৫৮	আব্দুস সামাদ*	সেক্টর-৬	গণবাহিনী
১২৫	আব্দুল আজিয়		সিপাই	১৫৯	এ.টি.এম হামিদুল হোসাইন	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
১২৬	মোহাম্মদ মহসীন		সিপাই	১৬০	আবুবকর সিদ্দিকী*	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
১২৭	আমিনউল্লাহ শেখ	নৌ বাহিনী	এ বি	১৬১	মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী খান	সেক্টর-৭	গণবাহিনী
১২৮	এম. এইচ. মোল্লা*	নৌ বাহিনী	এ বি	১৬২	মোহাম্মদ খালিদ সাইফুদ্দিন*	সেক্টর-৮	গণবাহিনী
১২৯	মহিবুল্লাহ*	নৌ বাহিনী	এ বি	১৬৩	এ.ম.এ. মাঝান	সেক্টর-৮	গণবাহিনী
১৩০	ফরিদ উদ্দিন আহমেদ*	নৌ বাহিনী	আর ই এন	১৬৪	তোফিক এলাহী চৌধুরী	সেক্টর-৮	মহকুমা অফিসার
১৩১	মোহাম্মদ আব্দুল মালেক	নৌ বাহিনী	সিম্যান	১৬৫	খিজির আলী	সেক্টর-৯	গণবাহিনী
১৩২	মোহাম্মদ আব্দুর রহমান	নৌ বাহিনী	এস টি ড্রিউ ডি	১৬৬	আলতাফ হোসাইন*	সেক্টর-৯	গণবাহিনী
১৩৩	এ. ড্রিউ. চৌধুরী	নৌ বাহিনী	সাবমেরিনার	১৬৭	মোহাম্মদ ইউসুফ	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
১৩৪	আব্দুর রকিব মি এগ্রা*	নৌ বাহিনী	এম ই	১৬৮	মোহাম্মদ খুররাম*	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
১৩৫	সৈয়দ মনসুর আলী	বিমানবাহিনী	ফ্লাইট সার্জেন্ট	১৬৯	মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন*	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
১৩৬	আব্দুল মাঝান*		কনস্টেবল পুলিশ	১৭০	আমানুল্লাহ কবির*	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
১৩৭	তোহিদ*		কনস্টেবল পুলিশ	১৭১	নূর ইসলাম	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
১৩৮	মাহবুব উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-৮	মহকুমা পুলিশ অফিসার	১৭২	শওকত আলী সরকার	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
				১৭৩	আবুল কালাম আজাদ	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
				১৭৪	মোহাম্মদ শাহজাহান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী
				১৭৫	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	সেক্টর-১১	গণবাহিনী

# পদক্ষেপ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর প্রতীক

ক্রম	নাম	সেক্টর	পদবী	৩৫	ওয়াকার হাসান	জে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
০১	মোহাম্মদ আবদুল মতিন	সদর দপ্তর এস ফোর্স	মেজর	৩৬	মাসুদুর রহমান	সেক্টর-৬	লেফটেন্যান্ট
০২	আবু তাহের সালাউদ্দিন	সেনা সদর	মেজর	৩৭	জহিরুল হক খান	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট
০৩	মোহাম্মদ আবদুল মতিন	অধিনায়ক, ১১ ইস্ট বেঙ্গল	মেজর	৩৮	ওয়ালীউল ইসলাম	জে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
০৪	মোহাম্মদ মতিউর রহমান	সেক্টর-৩	মেজর	৩৯	শওকত আলী	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট
০৫	এম. আইনউদ্দিন	অধিনায়ক, ৯ম ইস্ট বেঙ্গল	মেজর	৪০	মোসাদ্দির হোসাইন খান	জে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
০৬	আকবর হোসেন	সেক্টর-২	মেজর	৪১	রওশন ইয়াজদানী ভুঁইয়া	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট
০৭	নজরুল হক	সেক্টর-৬	মেজর	৪২	জাহাঙ্গীর ওসমান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট
০৮	বজ্রুল গনি পাটোয়ারী	জেড. ফোর্স	মেজর	৪৩	মোহাম্মদ নূরুল হক		সুবেদার মেজর
০৯	আবদুর রশিদ	সেক্টর-৭	ক্যাপ্টেন	৪৪	হারিস মিএঞ্চ		সুবেদার মেজর
১০	শহীদুল ইসলাম	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন	৪৫	আবদুল মজিদ		সুবেদার মেজর
১১	সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ	এস. ফোর্স	ক্যাপ্টেন	৪৬	মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া		সুবেদার মেজর
১২	আকতার আহমেদ	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন	৪৭	নূরুল আজিম চৌধুরী		সুবেদার মেজর
১৩	আনোয়ার হোসেন	জেড. ফোর্স	ক্যাপ্টেন	৪৮	মোহাম্মদ আলী		সুবেদার মেজর
১৪	দেলোয়ার হোসেন	সেক্টর-৬	ক্যাপ্টেন	৪৯	মোহাম্মদ আবুল বাসার*		সুবেদার
১৫	সিতারা বেগম	সেক্টর-২	ক্যাপ্টেন	৫০	আবদুল জবাবার		সুবেদার
১৬	দিদারুল আলম	জেড ফোর্স	ক্যাপ্টেন	৫১	আলী নেওয়াজ		সুবেদার
১৭	এ.এম. রাশেদ চৌধুরী	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৫২	মোহাম্মদ হাফিজ		সুবেদার
১৮	সৈয়দ মোহাম্মদ ইবাহিম	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৫৩	জালাল আহমেদ		সুবেদার
১৯	এম. হারংনুর রশীদ	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৫৪	মোহাম্মদ শামসুল হক		সুবেদার
২০	ইবনে ফজল বদিউজ্জামান*	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৫৫	আবদুল হাকিম		সুবেদার
২১	নজরুল ইসলাম ভুঁইয়া	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৫৬	করম আলী হাওলাদার		সুবেদার
২২	হুমায়ুন কবির চৌধুরী	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৫৭	বদিউর রহমান		সুবেদার
২৩	মোহাম্মদ শফিউল্লাহ	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট	৫৮	আবদুল জবাবার		সুবেদার
২৪	কাজী সাজাদ আলী জহির	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৫৯	আবুল হাশেম সেক্টর-২		সুবেদার
২৫	মাহবুব আলম	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৬০	চাঁচ মিয়া		সুবেদার
২৬	সাঈদ আহমেদ	এস. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৬১	এম.এ. মতিন চৌধুরী	২য় ইস্ট বেঙ্গল	সুবেদার
২৭	অলিক কুমার গুপ্ত	সেক্টর-৮	লেফটেন্যান্ট	৬২	রছিব আলী	সেক্টর-৪	সুবেদার
২৮	মমতাজ হাসান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৬৩	আফতাব হোসাইন	সেক্টর-৪	সুবেদার
২৯	কে.এম. আবুবকর	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৬৪	আবদুল লতিফ	সেক্টর-১১	সুবেদার
৩০	মিজানুর রহমান মিএঞ্চ	সেক্টর-১১	লেফটেন্যান্ট	৬৫	আবুল হাসেম		নায়েব সুবেদার
৩১	তাহের আহমেদ	সেক্টর-১	লেফটেন্যান্ট	৬৬	মোহাম্মদ আবদুল মতিন*		নায়েব সুবেদার
৩২	মনজুর আহমেদ	জেড. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৬৭	আলতাফ হোসাইন খান		নায়েব সুবেদার
৩৩	সামসুল আলম	লেফটেন্যান্ট	লেফটেন্যান্ট	৬৮	মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন		নায়েব সুবেদার
৩৪	জামিল উদ্দিন আহসান	কে. ফোর্স	লেফটেন্যান্ট	৬৯	মোহাম্মদ হোসাইন		নায়েব সুবেদার
				৭০	মঙ্গল মিয়া		নায়েব সুবেদার

৮ম ইস্ট বেঙ্গল

২য় ইস্ট বেঙ্গল

২য় ইস্ট বেঙ্গল

# পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর প্রতীক

৭১	আবদুল জব্বার খান	নায়েব সুবেদার	১০৭	সাইদুল আলম	নায়েক
৭২	কবির আহমেদ	নায়েব সুবেদার	১০৮	আবদুল ওহাব	নায়েক
৭৩	মোহাম্মদ আবদুল কুন্দুস	নায়েব সুবেদার	১০৯	শহীদুল্লাহ	নায়েক
৭৪	গিয়াস উদ্দিন	নায়েব সুবেদার	১১০	আবদুল বাতেন	নায়েক
৭৫	মোহাম্মদ রেজাউল হক	নায়েব সুবেদার	১১১	সিরাজুল হক*	নায়েক
৭৬	মনসুর আলী	নায়েব সুবেদার	১১২	আবদুল নূর*	নায়েক
৭৭	আবদুল জব্বার	নায়েব সুবেদার	১১৩	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	নায়েক
৭৮	হোসাইন আলী তালুকদার	নায়েব সুবেদার	১১৪	সিকান্দর আহমেদ	নায়েক
৭৯	মুসলিম উদ্দিন	নায়েব সুবেদার	১১৫	গোলাম মোস্তফা	নায়েক
৮০	মনির আহমেদ খান	নায়েব সুবেদার	১১৬	আবুল কালাম	নায়েক
৮১	কাজী আকমল আলী	নায়েব সুবেদার	১১৭	আবুল বাশার	ল্যাস নায়েক
৮২	আলী আকবর	নায়েব সুবেদার	১১৮	তাজুল ইসলাম	ল্যাস নায়েক
৮৩	আবুল কালাম	নায়েব সুবেদার	১১৯	আবদুর রাজ্জাক	ল্যাস নায়েক
৮৪	আবদুল হাই	নায়েব সুবেদার	১২০	অলিম্বুল ইসলাম	ল্যাস নায়েক
৮৫	তোফায়েল আহমেদ	নায়েব সুবেদার	১২১	আলিমূল ইসলাম	ল্যাস নায়েক
৮৬	সাইফুল্লাহ	হাবিলদার	১২২	মতিউর রহমান	ল্যাস নায়েক
৮৭	রঞ্জুল আমিন	হাবিলদার	১২৩	শাহাবুদ্দিন*	ল্যাস নায়েক
৮৮	আবদুল গফুর	হাবিলদার	১২৪	শাহজালাল আহমেদ	ল্যাস নায়েক
৮৯	আবদুস সোবহান	হাবিলদার	১২৫	আলী আহমেদ	ল্যাস নায়েক
৯০	ওয়াজেদ আলী মিএঁ	হাবিলদার	১২৬	আবদুল মালান	ল্যাস নায়েক
৯১	সফিকুল ইসলাম	হাবিলদার	১২৭	মোহাম্মদ ইদ্রিস	ল্যাস নায়েক
৯২	আবদুল লতিফ	হাবিলদার	১২৮	আবদুল মালান	সিপাই
৯৩	মোজাম্মেল হক	হাবিলদার	১২৯	বসির আহমেদ	সিপাই
৯৪	আবু তাহের	হাবিলদার	১৩০	আবুল হাসেম	সিপাই
৯৫	সিরাজ মিএঁ	হাবিলদার	১৩১	আবদুল বাতেন	সিপাই
৯৬	আবদুল আওয়াল	হাবিলদার	১৩২	আবদুল খালেক	সিপাই
৯৭	মনিরুল ইসলাম	হাবিলদার	১৩৩	আবদুল মজিদ	সিপাই
৯৮	মুসলেহ উদ্দিন	হাবিলদার	১৩৪	মোহাম্মদ আমিনউল্লাহ	সিপাই
৯৯	আবদুল মালেক	হাবিলদার	১৩৫	গোলাম মোস্তফা	সিপাই
১০০	সাহেব মিএঁ	হাবিলদার	১৩৬	মোহাম্মদ সিদ্দিক	সিপাই
১০১	নূর মোহাম্মদ*	হাবিলদার	১৩৭	এ.বি.এম. মশিউল আলম	সিপাই
১০২	মোহাম্মদ মকবুল হোসাইন	হাবিলদার	১৩৮	মোহাম্মদ ইসমাইল*	সিপাই
১০৩	মনির আহমেদ	হাবিলদার	১৩৯	খলিলুর রহমান	সিপাই
১০৪	মিজানুর রহমান	হাবিলদার	১৪০	মোহাম্মদ মোস্তফা	সিপাই
১০৫	সোনা মিএঁ	হাবিলদার	১৪১	আবদুল ওয়াহিদ	সিপাই
১০৬	মোহাম্মদ বিলাল উদ্দিন	হাবিলদার	১৪২	ফারঞ্জ আহমেদ পাটোয়ারী	সিপাই
		নায়েক ক্লার্ক			

# পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর প্রতীক

১৪৩	এনামুল হক	সিপাই	১৭৯	খুরশেদ আলম	সুবেদার
১৪৪	মোহাম্মদ এজাজুল হক খান	সিপাই	১৮০	মোহাম্মদ আবদুল গাজী	সুবেদার
১৪৫	আসাদ মিএঁ	সিপাই	১৮১	এস.এ. সিদ্দিক	নায়েব সুবেদার
১৪৬	দেলোয়ার হোসাইন	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	১৮২	আহসান উল্লাহ	নায়েব সুবেদার
১৪৭	আবদুল কাদের	১ম ইস্ট বেঙ্গল	১৮৩	শেখ সুলেমান	নায়েব সুবেদার
১৪৮	আবদুল বাসেত*	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	১৮৪	আইনুন্দিন আহমেদ	নায়েব সুবেদার
১৪৯	কাজী মোরশেদুল আলম*	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	১৮৫	মোহাম্মদ রাউফ মজুমদার	নায়েব সুবেদার
১৫০	আবদুল কুন্দুস*	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	১৮৬	মোহাম্মদ লিনি মিয়া দেওয়ান	নায়েব সুবেদার
১৫১	আবু মুসলিম	সেক্টর-২	১৮৭	আবদুল মালেক চৌধুরী	নায়েব সুবেদার
১৫২	রফিকুল ইসলাম	সেক্টর-২	১৮৮	নূরগুল হুদা নায়েব	সুবেদার
১৫৩	বজ্রু মিএঁ*	সেক্টর-৮	১৮৯	মকবুল আলী	নায়েব সুবেদার
১৫৪	কামাল উদ্দিন	সেক্টর-৮	১৯০	মমতাজ মিয়া	হাবিলদার
১৫৫	আমির হোসেন*		১৯১	লালু মিয়া	হাবিলদার
১৫৬	মোহাম্মদ ইসহাক*	১০ ইস্ট বেঙ্গল	১৯২	আবু তাহের	হাবিলদার
১৫৭	বাদশা মিএঁ	১০ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৩	মোহাম্মদ ইবাহিম	হাবিলদার
১৫৮	হারুন-অর-রশিদ	সেক্টর-৩	১৯৪	মোবারক হোসেন	হাবিলদার
১৫৯	আজিজুল হক		১৯৫	আবদুল হালিম	হাবিলদার
১৬০	মোশাররফ হোসেন	বাঙ্গাল সেক্টর-২	১৯৬	সায়েদ আলী	হাবিলদার
১৬১	জুলফু মিএঁ	৯ম ইস্ট বেঙ্গল	১৯৭	আবদুর রাউফ শরীফ	হাবিলদার
১৬২	আবদুল কুন্দুস গাজী*	সেক্টর-২	১৯৮	আবদুল হাসেম	হাবিলদার
১৬৩	ওয়ালিল হোসেন*		১৯৯	আবদুল হালিম	হাবিলদার
১৬৪	সেরাজুল ইসলাম*	সেক্টর-২	২০০	আবদুল আউয়াল	হাবিলদার
১৬৫	আলী আকবর		২০১	আজিজুর রহমান	হাবিলদার
১৬৬	বাচু মিএঁ	সেক্টর-২	২০২	ফজলুল হক	হাবিলদার
১৬৭	আবদুস সালাম*	৪৪ ইস্ট বেঙ্গল	২০৩	ওয়াজিউল্লাহ	হাবিলদার
১৬৮	মোহাম্মদ ওসমান গনি	৮ম ইস্ট বেঙ্গল	২০৪	লুৎফর রহমান	হাবিলদার
১৬৯	মুজাফফর আহমেদ	ই পি আর	২০৫	আবদুর রহমান	হাবিলদার
১৭০	তোবারক উল্লাহ		২০৬	ওয়াহিদুর রহমান	হাবিলদার
১৭১	আবদুল জলিল শিকদার		২০৭	আসাদ আলী	হাবিলদার
১৭২	খায়রুল বাসার		২০৮	আবদুর রশিদ	হাবিলদার
১৭৩	হাসান উদ্দিন আহমেদ		২০৯	আবদুল হোসেন	হাবিলদার
১৭৪	গোলাম মোস্তফা		২১০	আবদুল গাফফার*	হাবিলদার
১৭৫	আহমেদ হোসেন		২১১	কাছেম আলী হাওলাদার	হাবিলদার
১৭৬	আবদুল মালেক		২১২	মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী	নায়েক
১৭৭	গোলাম হোসেন		২১৩	সায়েদুল হক	নায়েক
১৭৮	মাজহারুল হক		২১৪	মোহাম্মদ লোকমান*	নায়েক

# পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর প্রতীক

২১৫	আবদুল মান্নান খান
২১৬	আবদুল ওয়াহিদ
২১৭	সফিক উদ্দিন আহমেদ
২১৮	নজরুল ইসলাম
২১৯	আতাহার আলী
২২০	আহমাদুর রহমান
২২১	আবদুল মালেক
২২২	জাকির হোসেন
২২৩	মুকতার আলী
২২৪	রশিদ আলী*
২২৫	আবদুল ওয়াজেদ
২২৬	হাবিবুর রহমান
২২৭	তোফায়েল আহমেদ
২২৮	দুর্দ মিএঁ
২২৯	আলী আকবর সেক্টর-৫
২৩০	আতাউর রহমান
২৩১	আবদুল হক
২৩২	সফিকুর রহমান
২৩৩	দেলোয়ার হোসেন
২৩৪	দেলোয়ার হোসেন
২৩৫	মফিজুর রহমান
২৩৬	নামু মিয়া
২৩৭	মোস্তফা কামাল
২৩৮	গাজী আবদুল ওয়াহিদ
২৩৯	ফোরকান উদ্দিন
২৪০	আবদুল জব্বার
২৪১	সিরাজুল ইসলাম
২৪২	রবি উল্লাহ
২৪৩	তাজুল ইসলাম
২৪৪	ইউসুফ আলী
২৪৫	আবদুর রহমান
২৪৬	আবদুল হাই
২৪৭	মোহাম্মদ মাখন খান
২৪৮	মোহাম্মদ শাহজাহান
২৪৯	সামসুল হক
২৫০	রবিউল হক*

১ম ইস্ট বেঙ্গল  
১ম ইস্ট বেঙ্গল

১ম ইস্ট বেঙ্গল  
১ম ইস্ট বেঙ্গল  
১ম ইস্ট বেঙ্গল  
১ম ইস্ট বেঙ্গল  
১ম ইস্ট বেঙ্গল  
১ম ইস্ট বেঙ্গল  
১ম ইস্ট বেঙ্গল  
১ম ইস্ট বেঙ্গল

নায়েক	২৫১	মোহাম্মদ শরিফ*
নায়েক	২৫২	নূরুল হক*
নায়েক	২৫৩	গুল মোহাম্মদ ভুইয়া*
নায়েক	২৫৪	আবদুল মান্নান
নায়েক	২৫৫	ইলিয়াসুর রহমান
নায়েক	২৫৬	আবদুল জালিল
নায়েক	২৫৭	সাজিদুর রহমান
নায়েক	২৫৮	ফারাক লক্ষ্মণ
নায়েক	২৫৯	আবদুল মালেক*
নায়েক	২৬০	জাহান্নাম হোসেন
নায়েক	২৬১	বাচু মিএঁ
নায়েক	২৬২	আবদুল ওয়াহাব
নায়েক	২৬৩	আবদুল হাসেম*
নায়েক	২৬৪	আলী আকবর
নায়েক	২৬৫	আবু সালেক
নায়েক	২৬৬	হযরত আলী
নায়েক	২৬৭	আশরাফ আলী খান
নায়েক	২৬৮	তারিকুল ইসলাম
নায়েক	২৬৯	সফিউদ্দিন
নায়েক	২৭০	সাইদুর রহমান
নায়েক	২৭১	মোহাম্মদ ইদিস
নায়েক	২৭২	নজরুল ইসলাম
নায়েক	২৭৩	মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ
নায়েক	২৭৪	মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
নায়েক	২৭৫	আবদুল আউয়াল
নায়েক	২৭৬	মোফাজ্জল হোসেন
নায়েক	২৭৭	এ.এস. ভুইয়া
নায়েক	২৭৮	আহসানউল্লাহ
ল্যাস নায়েক	২৭৯	এম. সদর উদ্দিন
ল্যাস নায়েক	২৮০	এম. হামিদউল্লাহ খান
ল্যাস নায়েক	২৮১	সহিদ উল্লাহ
ল্যাস নায়েক	২৮২	মি. হক
ল্যাস নায়েক	২৮৩	রঞ্জন আলী
ল্যাস নায়েক	২৮৪	সৈয়দ রফিকুল ইসলাম
সিপাই	২৮৫	জয়নাল আবেদীন
সিপাই	২৮৬	নজরুল ইসলাম

সিপাই	২৮৭	মুক্তিবাহিনী
সিপাই	২৮৮	এম ই আর এ
সিপাই	২৮৯	চীফ আর ই এ
সিপাই	২৯০	এ বি
সিপাই	২৯১	বি.ও.আর.এস.
সিপাই	২৯২	এল টি ও
সিপাই	২৯৩	এল টি ও
সিপাই	২৯৪	এম ই আর
সিপাই	২৯৫	ক্ষোয়ার্ডেন লিডার
সিপাই	২৯৬	ক্ষোয়ার্ডেন লিডার
সার্জেন্ট	২৯৭	সার্জেন্ট
কর্পোরাল	২৯৮	কর্পোরাল
এল ও সি	২৯৯	এল ও সি
সার্জেন্ট	৩০০	সার্জেন্ট
কর্পোরাল	৩০১	কর্পোরাল
কর্পোরাল	৩০২	কর্পোরাল

# পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর প্রতীক

২৮৭	আলী আশরাফ	বিমানবাহিনী	কর্পোরাল	৩২৩	নওয়াব মিএগ্র*	সেক্টর-২	এফ এফ
২৮৮	শেখ আজিজুর রহমান	বিমানবাহিনী	কর্পোরাল	৩২৪	মানিক*	সেক্টর-২	এফ এফ
২৮৯	রেজওয়ান আলী	বিমানবাহিনী	কর্পোরাল	৩২৫	সামসুল আলম ফিটার	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯০	হেলালউজ্জামান	বিমানবাহিনী	কর্পোরাল	৩২৬	আনোয়ার হোসেন	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯১	রতন শরীফ	বিমানবাহিনী	কর্পোরাল	৩২৭	আলমগীর করিম*	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯২	মোহাম্মদ সুলাইমান		কন্টেক্টেবল	৩২৮	মিমিন*	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯৩	নিজামুদ্দিন*		কন্টেক্টেবল	৩২৯	আবুল হোসেন*	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯৪	ফারুক-ই-আজম	সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো	৩৩০	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ*	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯৫	মোহাম্মদ খোরশেদ আলম	সেক্টর-১০	নৌ-কমান্ডো	৩৩১	নুরুল হক*	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯৬	মোঃ নুরুল হক	সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো	৩৩২	রফিকুল ইসলাম	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯৭	মোঃ আমির হোসেন	সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো	৩৩৩	মিমিনুল হক ভুঁইয়া	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯৮	এস.এম. মাওলা	সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো	৩৩৪	মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান	সেক্টর-২	এফ এফ
২৯৯	এ.কে.এম. ইসহাক	সেক্টর-১	ইঞ্জিনিয়ার	৩৩৫	সেরাজ উদ্দিন আহমেদ	সেক্টর-২	এফ এফ
৩০০	মোহাম্মদ হোসেন*	সেক্টর-১	নৌ-কমান্ডো	৩৩৬	মোঃ তৈয়ব আলী	সেক্টর-২	এফ এফ
৩০১	মোহাম্মদ মতিউর রহমান	সেক্টর-৯	নৌ-কমান্ডো	৩৩৭	আবদুস সামাদ	সেক্টর-২	এফ এফ
৩০২	মোহাম্মদ শাহজাহান কবির	সেক্টর-২	নৌ-কমান্ডো	৩৩৮	বাহারউদ্দিন রেজা	সেক্টর-২	এফ এফ
৩০৩	মিমিনউল্লাহ পাটোয়ারী	সেক্টর-২	নৌ-কমান্ডো	৩৩৯	জামাল	সেক্টর-২	এফ এফ
৩০৪	এ.এস.এম.এ. খালেক	বিমানবাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ	৩৪০	মোহাম্মদ আশরাফ	সেক্টর-৩	এফ এফ
৩০৫	আলমগীর আবদুস সাত্তার	বিমানবাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ	৩৪১	আবদুস সালাম	সেক্টর-৩	এফ এফ
৩০৬	আবদুল মুকিত	বিমানবাহিনী	প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পিআইএ	৩৪২	রফিকুল হক	সেক্টর-৩	এফ এফ
৩০৭	গিয়াসউদ্দিন	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৪৩	নুরুল ইসলাম খান পাঠান	সেক্টর-৩	এফ এফ
৩০৮	গোলাম দস্তগীর গাজী	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৪৪	শাহজাহান মজুমদার	সেক্টর-৩	এফ এফ
৩০৯	মুসুরুল আলম দুলাল	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৪৫	এ.কে.এম. মিরাজউদ্দিন	সেক্টর-৩	এফ এফ
৩১০	জয়নুল আবেদিন খান	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৪৬	মাহফুজুর রহমান*	সেক্টর-৩	এফ এফ
৩১১	মুহাম্মদ জিযা	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৪৭	আমির হোসেন	সেক্টর-৩	এফ এফ
৩১২	মুহাম্মদ জাকির	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৪৮	মফিজুল ইসলাম	সেক্টর-৪	এফ এফ
৩১৩	মাহমুদ	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৪৯	এ.কে.এম. অতিকুল ইসলাম	সেক্টর-৪	এফ এফ
৩১৪	শেখ আবদুল মাঘান	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫০	আশরাফুল হক	সেক্টর-৪	এফ এফ
৩১৫	হাবিবুল আলম	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫১	মাহবুবুর রব সাদী	সেক্টর-৪	এফ এফ
৩১৬	এ.এম. মোহাম্মদ ইসহাক	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫২	রফিক উদ্দিন*	সেক্টর-৪	এফ এফ
৩১৭	ডরিউ.এ.এস. ওয়াডারল্যান্ড	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫৩	নুরুদ্দিন আহমেদ*	সেক্টর-৪	এফ এফ
৩১৮	মোহাম্মদ এ. আজিজ	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫৪	সিরাজুল ইসলাম	সেক্টর-৫	এফ এফ
৩১৯	খায়রুল জাহান*	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫৫	মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	সেক্টর-৫	এফ এফ
৩২০	সেলিম আকবর*	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫৬	ফখরুরদিন চৌধুরী	সেক্টর-৫	এফ এফ
৩২১	আব্দুল্লাহেল বাকী*	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫৭	এম.এ. হালিম	সেক্টর-৫	এফ এফ
৩২২	মোজাম্মেল হক	সেক্টর-২	এফ এফ	৩৫৮	ইনামুল হক চৌধুরী	সেক্টর-৫	এফ এফ

# পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বীর প্রতীক

৩৫৯	মোহাম্মদ ইদিস	সেক্টর-৫	এফ এফ	৩৯৫	ভুইয়া	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৬০	মোহাম্মদ বদরঞ্জামান	সেক্টর-৫	এফ এফ	৩৯৬	নর ইসলাম	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৬১	হাছির উদ্দিন সরকার	সেক্টর-৫	এফ এফ	৩৯৭	বশির আহমেদ	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৬২	আবদুল হাই সরকার	সেক্টর-৫	এফ এফ	৩৯৮	আনিষ্টুল হক আখন্দ	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৬৩	এম.এ. সরকার	সেক্টর-৬	এফ এফ	৩৯৯	মতিউর রহমান	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৬৪	এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান	সেক্টর-৭	এফ এফ	৪০০	মোহাম্মদ জহরুল হক মুসি	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৬৫	মোহাম্মদ মহসীন আলী সরদার	সেক্টর-৭	এফ এফ	৪০১	আবুল কালাম		এফ এফ
৩৬৬	মোহাম্মদ আজাদ আলী	সেক্টর-৭	এফ এফ	৪০২	মোহাম্মদ মাহবুব এলাহী রঞ্জু		এফ এফ
৩৬৭	মোঃ নূর হামিম	সেক্টর-৭	এফ এফ	৪০৩	এ.টি.এম. খালেদ		এফ এফ
৩৬৮	মোঃ বাদিউজ্জামান	সেক্টর-৭	এফ এফ	৪০৪	মোহাম্মদ নূরুল হক	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৬৯	গোলাম আজাদ	সেক্টর-৮	এফ এফ	৪০৫	আবদুল্লাহ আল মাহমুদ	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭০	সদর উদ্দিন আহমেদ*	সেক্টর-৮	এফ এফ	৪০৬	বাহার	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭১	আব্দুর রহিম*	সেক্টর-৮	এফ এফ	৪০৭	সৈয়দ সদরঞ্জামান	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭২	নাছির উদ্দিন*	সেক্টর-৮	এফ এফ	৪০৮	বেলাল হোসেন	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭৩	হাবিবুর রহমান*	সেক্টর-৮	এফ এফ	৪০৯	মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭৪	নজরুল ইসলাম*	সেক্টর-৮	এফ এফ	৪১০	ওয়ারেছাত হোসেন	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭৫	হারুনুর রশীদ*	সেক্টর-৮	এফ এফ	৪১১	সাখাওয়াত হোসেন	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭৬	আবদুল মালেক	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪১২	মিজানুর রহমান খান	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭৭	হাজারী লাল তরফদার	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪১৩	হাবিবুর রহমান তালুকদার	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭৮	শামসুন্দিন আহমেদ*	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪১৪	খোরশেদ আলম তালুকদার	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৭৯	ইশতিয়াক হোসেন	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪১৫	ফজলুল হক	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮০	কে.এম. রফিকুল ইসলাম*	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪১৬	আবদুল গফুর মিয়া	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮১	দিদার আলী*	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪১৭	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮২	মোহাম্মদ গোলাম ইয়াকুব	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪১৮	আবদুল হাকিম	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮৩	আবদুল আলীম	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪১৯	সৈয়দ গোলাম মোস্তফা	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮৪	কুন্দুস মোল্লা	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪২০	আনন্দোয়ার হোসেন পাহাড়ী	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮৫	আনন্দোয়ার হোসেন	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪২১	ছায়েন্দুর রহমান	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮৬	রফিকুল আহসান	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪২২	হামিদুল হক	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮৭	কে.এস.এ. মহিউদ্দিন (মানিক)	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪২৩	ফয়েজুর রহমান	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮৮	রফিকুল ইসলাম	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪২৪	মোহাম্মদ খসরু মিয়া	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৮৯	দেবদাস বিশ্বাস(খোকন)	সেক্টর-৯	এফ এফ	৪২৫	শহীদুল ইসলাম	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৯০	এ.টি.এম. খালেদ	সেক্টর-১১	এফ এফ	৪২৬	আনিষ্টুল রহমান	সেক্টর-১১	এফ এফ
৩৯১	জহিরুল হক মুসী	সেক্টর-১১	এফ এফ				
৩৯২	মোহাম্মদ আনিষ্টুল রহমান	সেক্টর-১১	এফ এফ				
৩৯৩	আবদুল মজিদ	সেক্টর-১১	এফ এফ				
৩৯৪	মোসাম্মৎ তারামন বেগম	সেক্টর-১১	এফ এফ				

সূত্র : বাংলা উইকিপিডিয়া ও মুক্তিযুদ্ধ উইকিয়া

# গণহত্যা

মূল : অ্যাহুনি ম্যাসকারেনহাস  
অনুবাদ : ফাহমিদুল হক



পাঁচ মিলিয়ন লোক বাস্তিটা ছেড়ে কেন পালিয়ে গেছে সে মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে পাকিস্তান থেকে এসেছেন সানডে টাইমসের রিপোর্টার।

মার্চের শেষ থেকে পাকিস্তানের পরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার লোককে হত্যা করে চলেছে। মার্চের শেষ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংবাদ-ধার্মাচাপা-দেয়ার পেছনের মর্মান্তিক কাহিনী হলো এই। কলেরা আর দুর্ভিক্ষ নিয়েও পাঁচ মিলিয়ন লোকের পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে ভারতে চলে আসার এই হলো কারণ।

সানডে টাইমসের পাকিস্তান-প্রতিনিধি অ্যাহুনি ম্যাসকারেনহাস এই প্রথমবারের মতো নিরবাতার পর্দা উন্মোচন করলেন। তিনি সেখানে পাকিস্তানের কীর্তিকলাপ দেখেছেন। তিনি পাকিস্তান ছেড়ে এসেছেন বিশ্ববাসীকে সেসব জানানোর জন্য। সেনাবাহিনী শুধু স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ ধারণার সমর্থকদেরই হত্যা করছে না। স্বেচ্ছাকৃতভাবে খুন করা হচ্ছে হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান সবাইকে। হিন্দুদের গুলি করে বা পিটিয়ে মারা হচ্ছে তারা কেবল হিন্দু বলেই। জুলিয়ে দেয়া হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। অ্যাহুনি ম্যাসকারেনহাসের রিপোর্টের পেছনেও রয়েছে একটি দার্শণ গল্প।

মার্চের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে দুই ডিভিশন পাকিস্তান গোপনে পাঠানো হয় বিদ্রোহীদের 'খুঁজে বের করা'র জন্য। কিন্তু দু-সপ্তাহ পরে পাকিস্তান সরকার আটজন পাকিস্তানী সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানায় পূর্ব পাকিস্তানে উড়ে যাবার জন্য। সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে এই ধারণা দেয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল যে, দেশের পূর্বাংশে 'সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে'। সাতজন সাংবাদিক তাদের কথামতো কাজ করেছেন। কিন্তু তা করেননি একজন—তিনি হলেন করাচির মর্নিং নিউজ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও সানডে টাইমসের পাকিস্তান-প্রতিনিধি অ্যাহুনি ম্যাসকারেনহাস।

১৮ মে মঙ্গলবার তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হন লক্ষ্মনসুন্দি সানডে টাইমসের কার্যালয়ে। আমাদের জানালেন, পূর্ব বাংলা ছেড়ে পাঁচ মিলিয়ন লোককে কেন চলে যেতে হয়েছে তার পেছনের কাহিনী। তিনি সোজাসাপ্তিভাবে জানালেন এই কাহিনী। এই কাহিনী লেখার পর তার পক্ষে আর করাচি ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তিনি জানালেন তিনি পাকিস্তানে আর ফিরে না-যাবার ব্যাপারে মনস্থির করেছেন; এজন্য তাকে তার বাড়ি, তার সম্পত্তি, এবং

পাকিস্তানের সবচেয়ে সম্মানীয় একজন সাংবাদিকের মর্যাদার মায়া ত্যাগ করতে হবে। তার মাত্র একটি শর্ত ছিল: পাকিস্তানে গিয়ে তার স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা যেন তার রিপোর্ট প্রকাশ না করি।

সানডে টাইমস রাজি হয় এবং তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান। দশ দিন অপেক্ষা করার পর সানডে টাইমসের এক এক্সিকিউটিভের ব্যক্তিগত ঠিকানায় একটি বৈদেশিক তারবার্তা আসে। তাতে লেখা ছিল, "আসার প্রস্তুতি সম্পর্ক, সোমবার জাহাজ ছাড়বে।" দেশত্যাগ করার ব্যাপারে স্ত্রী ও সন্তানদের অনুমতি পেতে ম্যাসকারেনহাস সফল হন। তার দেশত্যাগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে তিনি কোনোরকমে একটা রাস্তা পেয়ে যান। পাকিস্তানের ভেতরে যাত্রার শেষ পর্যায়ে তিনি প্রেমে একজন তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাকে দেখতে পান যাকে তিনি ভালোমতোই চিনতেন। এয়ারপোর্ট থেকে একটি ফোনকল তাকে গ্রেফতার করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে কোনো ফোনকল হয়নি এবং তিনি মঙ্গলবার লক্ষ্মনে এসে পৌঁছান।

পূর্ব পাকিস্তানে ম্যাসকারেনহাস বিশেষ কর্তৃত- ও নিরপেক্ষতা-সহকারে যা দেখেছেন তা লিখেছেন। তিনি গোয়ার একজন ভদ্র প্রিস্টান, তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোনোটাই নন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন পাকিস্তানে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের উত্তরের পর থেকেই তিনি পাকিস্তানের পাসপোর্টধারী। সেসময় থেকে তিনি পাকিস্তানের অনেক নেতার আঙ্গ অর্জন করেছেন এবং এই রিপোর্ট লিখেছেন সত্যিকারের ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকে।

তিনি আমাদের কাছে বলেন, "তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আমাদের জানান সেনাবাহিনী যে বিরাট দেশপ্রেমের কাজ করছে, ব্যাপারটা সেভাবে উপস্থাপন করতে।" তিনি তার প্রতিবেদনের জন্য যা দেখেছেন এবং রিপোর্ট করেছেন সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তাকে একটি রিপোর্ট লেখার অনুমতি দেয়া হয় যা সানডে টাইমসে ২ মে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটিতে কেবল মার্চ ২৫/২৬-এর ঘটনার বিবরণ ছিল, যখন বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং অবাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এমনকি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার প্রসঙ্গ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সেপর করেছিল। এ-ব্যাপারটিই তার নীতিবোধকে পীড়া দিচ্ছিল। কিছুদিন পরে, তার ভাষায়, তিনি স্থির করলেন যে, "হয় যা দেখেছি তার পুজ্জানুপুজ্জ বিবরণ লিখবো, নয়তো লেখাই বন্ধ করে দেবো; নইলে সততার সঙ্গে আর লেখা যাবে না।" তাই তিনি

প্রেনে চেপেছেন এবং লন্ডন চলে এসেছেন।

পূর্ব বাংলা থেকে আসা শরণার্থী ও নিরপেক্ষ কূটনীতিবিদদের মধ্যে যাদের এসব ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা রয়েছে তাদের দ্বারা তার প্রতিবেদন আমরা বিস্তৃতভাবে ঘাটাই করতে সমর্থ হয়েছি।

## উদ্বাস্তুরা কেন পালিয়েছে: সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যাবার পরের বিভীষিকার প্রথম প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

আবদুল বারী ভাগ্যের ভরসায় দৌড় দিয়েছিল। পূর্ব বাংলার আরো হাজার মানুষের মতো সেও একটা ভুল করে ফেলেছিলো-সাংঘাতিক ভুল- ও দৌড়াচ্ছিলো পাকসেনাদের একটি টহল-সেনাদলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে। পাকসেনারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে এই চরিবশ বছরের সামান্য লোককে। নিশ্চিত গুলির মুখে সে খরখরিয়ে কঁাপে। ‘কেউ যখন দৌড়ে পালায় তাকে আমরা সাধারণত খুন করে ফেলি’, ৯ম ডিভিশনের জি-২ অপারেশনস-এর মেজর রাঠোর আমাকে মজা করে বলেন। কুমিল্লার বিশ মাইল দক্ষিণে মুজাফরগঞ্জ নামে ছোট একটা গ্রামে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ‘ওকে আমরা চেক করছি কেবল আপনার খাতিরে। আপনি এখানে নতুন এসেছেন, এছাড়া আপনার পেটের পীড়া রয়েছে।’

“ওকে খুন করতে কেন?” উদ্বেগের সঙ্গে আমি ওকে জিজেন করলাম।

‘কারণ হয় ও হিন্দু, নয়তো বিদ্রোহী, মনে হয় ছাত্র কিংবা আওয়ামী লীগার। ওদের যে খুজিছি তা ওরা ভালমতো জানে এবং দৌড়ের মাধ্যমে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে।’

‘কিন্তু তুমি ওদের খুন করছা কেন? হিন্দুদেরই বা খুঁজছ কেন?’ আমি আবার জিজেন করলাম। রাঠোর তীব্র কষ্টে বলেন: ‘আমি তোমাকে অবশ্যই মনে করিয়ে দিতে চাই, তারা পাকিস্তান ধ্বংস করার কী রকম চেষ্টা করেছে। এখন যুদ্ধের সুযোগে ওদের শেষ করে দেয়ার চমৎকার সুযোগ পেয়েছি।’

‘অবশ্য,’ সে তাড়াতাড়ি ঘোগ করে, ‘আমরা শুধু হিন্দুদেরই মারিছি। আমরা সৈনিক, বিদ্রোহীদের মতো কাপুরুষ নই। তারা আমাদের রমণী ও শিশুদের খুন করেছে।’

পূর্ব বাংলার শ্যামল ভূমির ওপর ছড়িয়ে দেয়া রক্তের কলঙ্কচিহ্নগুলি আমার চোখে একে একে ধরা পড়ছিল। প্রথমে ব্যাপারটা ছিল বাঙালিদের প্রতি বন্য আক্রমণের বাহিংপ্রকাশ হিসেবে অবাঙালিদের হত্যা। এখন এই গণহত্যা ঘটানো হচ্ছে পাকসেনাদের দ্বারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এই সুসংগঠিত হত্যাকান্ডের শিকার হিন্দুরাই শুধু নয়, যারা ৭৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার ১০ শতাংশ, বরং হাজার

হাজার বাঙালি মুসলমানরাও। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যসহ সবাই এর মধ্যে রয়েছে। এমন কি ১৭৬,০০০ জন বাঙালী সৈনিক ও পুলিশ যারা ২৬শে মার্চে অসময়োপযোগী ও দুর্বল-সূচনার একটা বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করতে চেয়েছিল, এর ভেতরে তারাও আছে।

এপ্রিলের শেষ দিকে পূর্ব বাংলায় দশদিনে চোখ আর কানে অবিশ্বাস্য যাকিছু আমি দেখেছি ও শুনেছি তাতে এটা ভয়াবহভাবে পরিষ্কার যে এই হত্যাকান্ড সেনা কর্মকর্তাদের বিচ্ছিন্ন কোনো কার্যকলাপ নয়। পাক সেনাদের দ্বারা বাঙালিদের হত্যাকান্ডই অবশ্য একমাত্র সত্য নয়। ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানী সৈন্যরাই একমাত্র হত্যাকারী ছিল না, পূর্ব পাকিস্তানের সৈন্য ও প্যারামিলিটারির সদস্যদের বন্য আক্রমণের শিকার হয়েছে অবাঙালিরা। কর্তৃপক্ষের সেসর আমাকে এই তথ্য জানানোর সুযোগ দিয়েছে। হাজার হাজার অভাগা মুসলিম পরিবার, যাদের অধিকাংশই ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের সময় বিহার থেকে শরণার্থী হিশেবে পাকিস্তানে এসেছিল, প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রমণীরা ধর্ষিত হয়েছে, বিশেষ ধরনের ছুরি দিয়ে কেটে নেয়া হয়েছে তাদের স্তন। এই ভয়াবহতা থেকে শিশুরাও রক্ষা পায়নি। ভাগ্যবানরা বাবা-মার সঙ্গেই মারা গেছে; কিন্তু চোখ উপরে ফেলা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্মূরভাবে ছিঁড়ে নেয়া হাজার হাজার শিশুর সামনে তবিয়ত এখন অনিষ্টিত। চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোরের মতো শহরগুলো থেকে ২০,০০০-এরও বেশি অবাঙালির মৃতদেহ পাওয়া গেছে। নিহতদের সত্যিকারের পরিমাণ, পূর্ব বাংলার সর্বত্র আমি শুনেছি ১০০,০০০-এর মতো হতে পারে; কারণ হাজার হাজার মৃতদেহের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পাক-সরকার ওই প্রথম ভয়াবহতা সম্পর্কে পৃথিবীকে জানতে দিয়েছে। কিন্তু যা প্রকাশ করতে দেয়া হয়নি তা হলো, তাদের নিজেদের সেনাবাহিনী যে-হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তা ছিল দ্বিতীয় এবং ভয়াবহতম হত্যাকান্ড। পাক-কর্মকর্তারা উভয় পক্ষ মিলিয়ে নিহতদের সংখ্যা ২৫০,০০০-এর মতো বলে গণনা করেছে- এর মধ্যে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারিতে মৃতদের ধরা হয়নি। দেশের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত প্রদেশে সফল ধ্বংসকান্ড চালানোর মাধ্যমে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান-সমস্যাকে তার নিজস্ব ‘চৱম সমাধানের’ দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

‘আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে একেবারে সংশোধন করতে চাই এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার সব হৃষিকিকে রদ করার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

এর অর্থ যদি হয় ২০ লক্ষ লোককে হত্যা করা এবং প্রদেশটিকে ৩০ বছর ধরে কলোনি বানিয়ে রাখা, তবুও,’ আমাকে বারবার এ-কথা শুনিয়েছেন ঢাকা ও কুমিল্লার উত্থবর্তন সামরিক ও সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ। পূর্ব বাংলায় পাকসেনারা ব্যাপকভাবে ও ভয়াবহভাবে ঠিক এই কাজটিই করে চলেছে।

চাঁদপুর ভ্রমণ শেষে অস্তায়মান সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি (কারণ, বুদ্ধিমান পাক সেনারা পূর্ববাংলায় ভবনের ভেতরে রাত্রি যাপন করে)। টয়োটা ল্যান্ড ক্লাজারের পেছন থেকে হাঁঠৎ এক জওয়ান চেঁচিয়ে উঠল, ‘একটা লোক দৌড়িয়ে যাচ্ছে, সাহেব।’ মেজের রাঠার মুহূর্তেই গাড়ি থামিয়ে দিলেন, একই সঙ্গে চীনা এলএমজি তাক করলেন দরজার বিপরীতে। দুশো গজেরও কম দূরে হাঁটু-সমান উঁচু ধানক্ষেতের মধ্যে একটা লোককে ছুটে পালাতে দেখা গেল।

‘আল্লাহর দোহাই, ওকে গুলি কর না,’ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ‘ও নিরস্ত্র। ও একজন গ্রামবাসী মাত্র।’

আমার দিকে বাজেভাবে তাকিয়ে রাঠোর একটা সতর্কতামূলক গুলি করলেন। সবুজ ধানের গালিচায় লোকটা কুঁকড়ে ধুকে যেতেই দু’জন জওয়ান এগিয়ে গেল তাকে টেনে-হিঁচড়ে আনতে। বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাতের পর জিজাসাবাদ শুরু হল। ‘তুম কে?’

‘মাফ করে দিন সাহেব, আমার নাম আব্দুল বারী। ঢাকায় নিউ মার্কেটে দর্জিত কাজ করি।’

‘মিথ্যে বলবে না। তুমি হিন্দু। না হলে দৌড়াচ্ছিলে কেন?’

‘কারফিউয়ের সময় প্রায় হয়ে এসেছে, সাহেব, আমি আমার গ্রামে যাচ্ছিলাম।’

‘সত্য কথা বল। দৌড়াচ্ছিলে কেন?’  
প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বেই তাকে একজন জওয়ান দেহ-তলাসী শুরু করল এবং আরেকজন দ্রুত তার লুঙ্গি টেনে খুল। হাড়জিরজিরে নগ শরীরে সুস্পষ্ট খণ্ডনার চিহ্ন দেখা গেল, যা মুসলমানদের অবশ্যই করতে হয়।

## ট্রাকভর্তি মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়

অসংগতপক্ষে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হল যে বারী হিন্দু নয়। তারপরও জিজাসাবাদ চলছিল।

‘বল তুমি দৌড় দিয়েছিলে কেন?’

এতক্ষণে ওর চোখ বুনো হয়ে উঠল। ওর শরীরও কাঁপছিল প্রচন্ডভাবে। সে উত্তর দিতে পারছিল না, সে হাঁটু চেপে ধরল।

“স্যার, মনে হচ্ছে ও ফৌজি।” বারী পা খামচে ধরায় এক জওয়ান মন্তব্য করে। (ফৌজি সৈনিকের উর্দু শব্দ, বাঙালি বিপ্লবীদের পাকসেনারা এই নামে চিহ্নিত করে থাকে।)

“হতে পারে।” আমি শুলাম রাঠোর হিস্তভাবে বিড়বিড় করল। রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচন্ডভাবে পিটিয়ে আবুল বারীকে ভীষণ জোরে ছুঁড়ে দেয়া হল একটি দেয়ালের দিকে। তার আর্তনাদের পর কাছের কুঁড়েঘরের আড়াল থেকে এক তরঙ্গকে উঁকি দিতে দেখা গেল। বাংলায় কী যেন চঁচিয়ে বলল বারী। মাথাটি সঙ্গে সঙ্গে অস্তর্হিত হল। কিছুক্ষণ পরেই খোঁড়াতে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল এক বুড়ো মানুষ। রাঠোর তাকে খামচে টেনে আনলো।

“এই লোকটাকে তুমি চেন?”

“হ্যাঁ সাহেব। ও আবুল বারী।”

“সে কি ফৌজি?”

“না সাহেব। ও ঢাকায় দর্জির কাজ করে।”

“সত্যি কথা বল।”

“খোদার কসম, সাহেব, ও দর্জি।”

হঠাতে নিরবতা নেমে এলো। রাঠোর অপ্রস্তুত হয়ে তাকালে আমি বললাম, “আ঳াহর দোহাই, ওকে যেতে দাও। ওর নির্দোষতার আর কত প্রমাণ চাও?”

জওয়ানরা তবু সন্তুষ্ট হয় না, তারা বারীকে ঘিরে রাখে। আরো একবার বলার পর রাঠোর বারীকে ছেড়ে দেবার আদেশ দিলেন। ইতোমধ্যে সে ভয়ে জড়োসড়ো ও কুঁচিত হয়ে গেছে। তার জীবন বেঁচে গেল। অন্য সবার ভাগ্যে এমন সুযোগ আসে না।

৯ম ডিভিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমি ছয়দিন কুমিল্লায় ঘূরেছি। আমি কাছ থেকে দেখেছি গ্রামের পর গ্রাম, বাড়ির পর বাড়ি ‘অস্ত্র অনুসন্ধান’-এর ছলে খৃত্ব করা হয়নি এমন লোকদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে। কুমিল্লার সাকিট হাউসে (বেসামরিক প্রশাসনের হেড কোয়ার্টার) মানুষদের মৃত্যুবন্ধনার আর্তনার আমি শুনেছি। কার্ফিউর নামে আমি দেখেছি ট্রাক বোঝাই লোক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খুন করার জন্য। সেনাবাহিনীর ‘হত্যা ও অগ্নিসংযোগ মিশন’-এর পাশবিকতার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। দেখেছি বিপ্লবীদের খতম করার পর কীভাবে গ্রাম-শহরে ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে।

‘শাস্তিমূলক পদক্ষেপ’ নিয়ে কীভাবে পুরো গ্রামকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে তাও আমি দেখেছি। আর রাত্রিবেলা শুনেছি তাদের সারাদিনব্যাপী চালানো হত্যাকাণ্ডের অবিশ্বাসযোগ্য, বর্বর রোমস্থন। “তুমি কয়টা খতম করেছ?” তাদের উত্তর এখনও

আমার শ্মৃতিতে জুলস্ত।

যেকোনো পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার বলবে এর সবই করা হয়েছে ‘পাকিস্তানের আদর্শ, সংহতি ও অখন্ততা অক্ষুণ্ণ রাখা’-র জন্য। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাবরতের দ্বারা হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত দুই অংশকে একত্রে রাখার জন্য এই তথাকথিত সামরিক কার্যক্রমই আদর্শের পতনকে প্রমাণ করেছে। পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত রাখা সম্ভব একমাত্র কঠোর সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। আর পাকসেনাদল পাঞ্জাবীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যারা ঐতিহাসিকভাবেই বাঙালিদের অপছন্দ করে, ঘৃণা করে।

পরিস্থিতি এমন অবস্থায় এসেছে যে কিছু বাঙালিকেও পশ্চিম পাকিস্তানী দলের সঙ্গে দেখা গেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ঢাকায় এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় এ-রকম আশ্র্য

## মৃত্যুর ত্রি আদেশ দেয়া হলো নারকেলের দুধ খেতে খেতে। আমাকে জানানো হল যে বন্দিদের দুজন হিন্দু, তৃতীয়জন ‘ছাত্র’ এবং চতুর্থজন এক আওয়ামী লীগ নেতা

অত্যুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি আমি। “দৃঢ়থিত”, সে আমাকে বলল, “ছক পাল্টে গেছে। আমি তুমি যে পাকিস্তানকে জানি, তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাকে পেছনেই থাকতে দাও।”

ঘণ্টাখানেক বাদে এক পাঞ্জাবী সেনা-কর্মকর্তা পাকসেনারা পদক্ষেপ নেয়ার আগের অবাঙালিদের ওপর চালানো হত্যাকাণ্ডের কথা বলা আরম্ভ করল। সে আমাকে বলল, “১৯৪৭-এর দেশবিভাগের সময়কার শিখদের চাইতে পাশবিক আচরণ করেছে তারা। কীভাবে আমরা তা ভুলতে বা মাফ করতে পারি?” সেনাবাহিনীর এই উম্মত ধ্বংসকার্যের দু’টো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটিকে কর্তৃপক্ষ ‘শুন্দি অভিযান’ নামে চিহ্নিত করতে পছন্দ করেন যা মূলত ধ্বংসলীলাকেই নরমভাবে উচ্চারণ করা। অপরটি হল ‘পুনর্বাসন-উদ্যোগ’। পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের বশীভূত উপনিবেশ বানানোর প্রচেষ্টাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়। এই চালাও অভিযন্তি এবং ‘দুর্ক্ষিতকারী’ ও ‘হামলাকারী’ হিসেবে বারংবার উল্লেখ বিশ্বকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়াস। কিন্তু

প্রচারণার অন্তরালে হত্যা ও উপনিবেশীকরণই হলো বাস্তবতা।

হিন্দুদের হত্যালীলার যৌক্তিকতা বিষয়ে ১৮ এপ্রিল রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারি গর্ভন্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের বক্তব্য আমি শুনেছি। তিনি বললেন “পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা পাকিস্তানের অভুদয়ে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল, তারা পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিজ্ঞ। কিন্তু হিন্দু ও আগ্রাসী সংখ্যালঘুরা জীবন ও ধনসম্পদ ধ্বংস করার ভূমিকি দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠদের দমন করেছে, আওয়ামী লীগকে বাধ্য করেছে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করতে।”

অন্যরা যৌক্তিকতা খোঁজার ব্যাপারে আরো বোধ-বুদ্ধিহীন। “টাকার জোরে হিন্দুরা মুসলমান জনগণকে একেবারে খাটো করে দেখেছে।” কুমিল্লার অফিসার্স মেসে ৯ম ডিভিশনের কর্নেল নাইম আমাকে জানান। “শুয়ে পুরো শহরকে ওরা রক্ষণ্য করে ফেলেছে। টাকা অর্থ পণ্য সব ভারতে চলে যায় সীমান্ত পার হয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুল-কলেজে অর্ধেকেরও বেশি নিজেদের লোক ঢুকিয়ে আপন ছেলেদের পড়াশোনার জন্য পাঠিয়ে দেয় কলকাতায়। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যে বাঙালি সংস্কৃতি আসলে হিন্দু সংস্কৃতি এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে পরিচালনা করেছে কলকাতার মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ীরা। জনগণের কাছে তাদের দেশকে ফিরিয়ে দিতে হল এবং বিশ্বাসের কাছে জনগণকে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদের তাদের খুঁজে বের করতে হবে।”

অথবা মেজের বশিরের কথাই ধরা যাক। তিনি কিপদ পার হয়ে এ পর্যায়ে এসেছেন। কুমিল্লার ৯ম ডিভিশনের এই এসএসও-র নিজস্ব হত্যার খতিয়ান ২৮ বলে দস্তও আছে। পরিস্থিতি সম্পর্কে তার আছে একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা। “এটা হল শুন্দি আর অশুন্দির মধ্যে যুদ্ধ”, এক কাপ কাঁচা চা খেতে খেতে তিনি আমাকে কথাটা বলেন। “এখানকার লোকদের নাম হয়তো মুসলমানের, পরিচয়ও দেয় হয়তো মুসলমান বলে, কিন্তু মানসিকতায় এরা হিন্দু। আপনার বিশ্বাস হবে না, শুন্দিবার এখানকার ক্যাটনমেন্ট-মসজিদের মৌলিবি ফতোয়া দিচ্ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের খুন করলে বেহেশতে যাওয়া যাবে। ওই জারজটাকে আমরা খুঁজে বের করেছি, বাদবাকিদেরও খুঁজছি। যারা ওতে অংশ নেয়ানি তারা হল খাঁটি মুসলমান। আমরা এমন কি ওদের উর্দু শেখাবো।”

আমি প্রত্যেক জায়গার কর্মকর্তাদের দেখেছি তাদের হত্যালীলার পেছনে কল্পনামিশ্রিত যথেষ্ট যুক্তিও বানিয়ে নেন। কৃতকার্যের বৈধতা নিরূপণের জন্য অনেক কিছুই বলা যেতে পারে, নিজেদের

মানসিক সন্তুষ্টির জন্যও সেটা প্রয়োজন, কিন্তু এই মর্মান্তিক 'সমধান'-এর মূল কারণটা রাজনৈতিক; বাঙালিরা নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসতে চেয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাঞ্জাবীদের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বার্থ সরকারি নীতি-নির্ধারণে প্রাধান্য স্থাপন করেছে— ক্ষমতা হারানোর ব্যাপারটা তাদের কিছুতেই সহ্য হবে না। আর সামরিক বাহিনী এতে ইন্দুন যুগিয়েছে। কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে এই বলে সাফাই গেয়েছে যে, সামরিক বাহিনী হত্যাকাণ্ড শুরুর পূর্বে অবাঙালিদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার পাস্টা জবাব হিসেবে এখনকার পদক্ষেপগুলো নেয়া হচ্ছে। কিন্তু ঘটনাবলী এমনটা বলে না যে চলমান এই গণহত্যা তৎক্ষণিক ও বিশ্বজ্ঞল প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসেছে। এটা ছিল পূর্বপৰিকল্পিত।

ভদ্র ও আত্মবিশ্বাসী অ্যাডমিরাল আহসানের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার গর্তন্তরপদ এবং পশ্চিমন্য সাহেবজাদা খানের কাছ থেকে সামরিক ক্ষমতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান গ্রহণ করার পরই 'অনুসন্ধান'-এর পরিকল্পনা শুরু হয়— এটা পরিষ্কার। এটা মার্চের শুরুর দিককার কথা, বাঙালিদের বিরাট প্রত্যাশা এসেছিল—সভা স্থগিত হবার পর যখন শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ-আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান উভাল হয়ে উঠেছে। বলা হয়ে থাকে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের দমন-পীড়নের পক্ষের লোক হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিমালাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলছিল ঢাকাস্থ পাঞ্জাবী ইস্টার্ন কমান্ড। [এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাখ্যা যে খানরা এর সঙ্গে জড়িত নয়; খান পাকিস্তানীদের নামের একটি পদবী।]

যখন ২৫ মার্চের রাতে পাকসেনারা ঢাকার পথে নামে, পরের দিন সকালে শহর এমনিতেই জনশূন্য ছিল, তাদের সঙ্গে ছিল যাদের শেষ করে দিতে হবে তাদের নামের তালিকা। এতে ছিল হিন্দু আর প্রচুর সংখ্যক মুসলমানের নাম— ছাত্র, আওয়ামী লীগ সমর্থক, অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং মুজিবের সহায়তাকারী। মানুষকে বর্তমানে জানানো হচ্ছে যে সৈন্যদের আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের আবাসিক ভবন জগন্নাথ হল, রমনা রেসকোর্স মন্দিরের কাছাকাছি অবস্থিত দুটি হিন্দু কলোনি এবং তৃতীয়ত পুরনো ঢাকার বুকের ওপর শাখারিপটিতে। কিন্তু মার্চের ২৬ ও ২৭ তারিখের দিবারাত্বিব্যাপী কারফিউয়ের সময়ে ঢাকা ও নিকটস্থ নারায়ণগঞ্জ শিল্প এলাকার হিন্দুদের কেন হত্যা করা হলো তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। কারফিউর সময়ে রাস্তায় চলাচলকারী মুসলিমদেরও কোনো চিহ্ন পাওয়া

যায়নি। এই লোকগুলোকে খতম করা হয়েছে পরিকল্পিত অভিযানের মাধ্যমে; হিন্দু দমনের বানোয়াট অভিযোগের ফল এলো আরো বিস্তৃতভাবে, অন্যরকমভাবে।

### একটি পেসিলের খোঁচা, একটি লোকের 'নিকাশ'

১৫ই এপ্রিল ঢাকায় ঘোরার সময় ইকবাল হলের ছাদে আমি চারটি ছাত্রের গলিত মাথা পড়ে থাকতে দেখেছি। তত্ত্বাবধায়ক জানান যে, তাদের হত্যা করা হয়েছে ২৫শে মার্চের রাতে। দুটো সিডি এবং চারটি ঘরে প্রচুর রক্তপাতের চিহ্ন আমি দেখেছি। ইকবাল হলের পেছনে একটি বিশাল আবাসিক ভবন সেনাবাহিনীর বিশেষ মনোযোগ পেয়েছিল বলে মনে হল। বিশাল দেয়ালগুলো গুলিতে ঝাঁঝরা এবং সিডিতে বাজে গঙ্গের রেশ রয়ে গেছে, যদিও এখানে প্রচুর ডিডিটির গুঁড়ো ছড়ানো হয়েছে। প্রতিবেশীরা জানান ২৩ জন নারী ও শিশুর মৃতদেহ মাত্র ঘন্টাখানেক আগে সারিয়ে নেয়া হয়েছে গাড়িতে করে। ২৫ তারিখ থেকেই ছাদের ওপর লাশগুলো পচছিল। অনেক প্রশ্নের পর জানা গেল হতভাগ্যরা ছিল কাছের হিন্দু-বাড়ির। এই ভবনে তারা আশ্রয় নিয়েছিল।

এই গণহত্যা সাধন করা হয়েছে নিতান্ত নির্বিকারভাবে। ১৯শে এপ্রিল সকালে কুমিল্লার সামরিক আইন প্রশাসক মেজর আগার অফিসে বসে থাকার সময়ে আমি দেখেছি এ-সমস্ত নির্দেশ কী নির্মতার সঙ্গে দেয়া হয়। এক বিহারী সাব-ইন্সপেক্টর বন্দিদের একটি তালিকা নিয়ে এল। ওটার দিকে তাকিয়ে নির্বিকারভাবে চারটি নামের পাশে পেসিলের খোঁচা দিয়ে আগা বললেন, "সন্ধ্যার সময় এই চারজনকে নিকাশের জন্যে নিয়ে এসো।" তালিকার দিকে তাকিয়ে আবার তিনি পেসিলের দাগ বসালেন, "এই চোরটাকেও নিয়ে এসো ওদের সঙ্গে।"

মৃত্যুর ঐ আদেশ দেয়া হলো নারকেলের দুধ খেতে খেতে। আমাকে জানানো হল যে বন্দিদের দুজন হিন্দু, তৃতীয়জন 'ছাত্র' এবং চতুর্থজন এক আওয়ামী লীগ নেতা। 'চোরটি,' জানা গেলো, নিজ বাড়ীতে তার বন্ধুকে থাকতে দিয়েছিল। পরে সন্ধ্যার দিকে দেখলাম একটি দড়ি দিয়ে হাত-পায়ে শিথিলভাবে বেঁধে সর্কিট হাউজগামী রাস্তা দিয়ে ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারফিউর কিছু পরে সন্ধ্যা ছয়টার সময় পাখিদের একটি দল কাছে কোথাও কিচিরিমিচির করছিল, হঠাৎ গুলির তীব্র শব্দে তাদের খেলায় ছেদ পড়ল।

বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আজমতকে নিয়ে প্রায়ই মেসে দুটো ব্যাপার আলোচনা করা হতো। একটি হলো ৯ম ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল শওকত রাজার এডিসি হিসেবে

ওর চাকরি। অপরটি নিয়ে ওর সহকর্মীরা ওকে পেয়ে বসতো। জানা গেল আজমত দলের একমাত্র অফিসার যে কোনো 'খুন' করেনি। মেজর বশির তাকে নির্মভাবে খোঁচাতো। "এই যে আজমত," এক রাতে বশির তাকে বললেন, "কাল আমরা তোমাকে মানুষ করতে যাচ্ছি। কাল দেখব তুমি তাদের কেমন ধাওয়া দিতে পারো। ব্যাপারটা খুবই সোজা।" এই অসামর্থ্যের জন্যে বশির তার সঙ্গে লেগেই থাকতেন। এসএসও-র চাকরি ছাড়াও বশির হেডকোয়ার্টারে 'শিক্ষা কর্মকর্তা' ছিলেন। তাকেই একমাত্র পাঞ্জাবী অফিসার দেখেছি, যে অন্যগুলো বাংলা বলতে পারতো।

শুনলাম বশিরের কাছে এক দাঢ়িয়ালা একদিন সকালে তার ভাইয়ের খোঁজ নিতে এসেছিল। তার ভাই ছিল কুমিল্লার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা। কিছুদিন আগে পাকসেনারা তাকে বন্দি করেছিলো। বশির তাকে জানালেন, "দৌড় গ্যায়া, পালিয়ে গেছে।" বুড়ো লোকটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না কীভাবে ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আমিও না। এ-ঘটনা বলে লম্বা হাসি দিয়ে মেজর বশির আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন। পরে জেনেছি ওদের নিজস্ব ভাষায় 'দৌড় গ্যায়া' মানে হলো, "পালানোর সময় গুলি করে খুন।"

আমি জানতে পারিনি ক্যাপ্টেন আজমত কাউকে খুন করতে পেরেছিলেন কি না। চট্টগ্রামের সন্তুর মাইল উত্তরে ফেনীর কাছে কুমিল্লা সড়কে বাঙালি-বিদ্রোহীরা পরিখা খনন করেছিল, সে-এলাকার সব ব্রিজ ও কালভার্ট ধ্বংস করে ৯ম ডিভিশনের চলাচলকে সীমিত করে রেখেছিল। ঢাকায় ইস্টার্ন কমান্ড থেকে একের পর এক বাজে খবর পেয়ে জেনারেল রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিদ্রোহীদের পালিয়ে যাওয়া রাদ করার জন্যে জরুরি হয়ে দাঢ়ায় দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত-অঞ্চল বন্ধ করে দেয়া। অথচ চট্টগ্রাম সমূদ্র বন্দরে এসে পৌঁছানো অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে বর্তমানে একমাত্র পথ হিসেবে উন্মুক্ত রাখাও দরকার হয়ে পড়ে। তাই জেনারেল রাজা সহজেই উভেজিত হয়ে যান। সেখানে তিনি উড়ে যেতেন প্রায় প্রত্যেক দিনই। ফেনীর ভেঙে পড়া ব্রিজ নিয়ে বকবক করতেন দীর্ঘসময় ধরে। ক্যাপ্টেন আজমত সবসময়ের মতো তখনো জেনারেলের ছায়া। আমি তাকে আর দেখতে পাইনি। পরবর্তী তিনি সঙ্গাহর জন্যে খোঁচা থেকে আজমত মোটামুটি রক্ষা পেয়েছিলেন। ফেনী ও সংলগ্ন অঞ্চল ৮ই মে ৯ম ডিভিশন আয়ত্তে আনতে পারলো। বাঙালি বিদ্রোহীরা বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এতেদিন সেখানে অবরোধ দিয়ে রেখেছিলো। শেষমেষ তারা সীমান্ত টপকে প্রতিবেশী দেশ ভারতে চলে যায়।

৯ম ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের জি-১ লেফটেন্যান্ট কর্নেল আসলাম বেগ ভারি অস্ত্রসহ বাঞ্ছালি বিদ্রোহীদের পালিয়ে যাওয়ার খবরে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি বললেন, “তারতীয়রা তাদের ওখানে একদমই থাকতে দেবে না। ব্যাপারটা তাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক হবে। সীমান্ত-অঞ্চলে তারা যত হামলা করবে আমরা তত ভোগাস্তির শিকার হব।” পাক-ভারত যুদ্ধের সময় চীন থেকে অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল বেগ ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় আর্টিলারি অফিসার। তিনি ছিলেন একজন গর্বিত পরিবারের সদস্য। তিনি ফুলও পছন্দ করতেন। আমাকে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, কুমিল্লায় এর আগের পোস্টিং-এর সময় চীন থেকে আনিয়ে হেড কোয়ার্টারের উপ্টেন্ডিকের পুরুরে তিনি টকটকে লাল রঙের বিশাল জলপদ্ম রোপণ করেছিলেন। মেজর বশির তাকে খুব শুন্দি করতেন। বশির আমাকে জানালেন, একবার এক বিদ্রোহী কর্মকর্তাকে ধরা হলো। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল, তাকে নিয়ে কী করা যায়। অন্যরা যখন নির্দেশ পাবার জন্য টেলিফোনে খোঁজখবর করছেন তিনি সব সমাধান করে ফেললেন, দোড় গ্যায়া। শুধু ওর পাটুকুই গর্তের বাইরে বের হয়ে ছিল।

পরিব্যাপ্ত শ্যামল সৌন্দর্যের মধ্যে কী পাশবিকতা চলছে, তা কল্পনা করাও অসম্ভব। এপ্রিলের শেষ দিকে আমি যখন সেখানে যাই, তখন কুমিল্লা ধ্বংসস্তুপ। পথের দু'পাশের সবুজ ধানক্ষেত দিগন্তে রঙিম আভার আকাশে গিয়ে মিশেছে। গুলমোহর, ‘অরণ্যের বহিশিখা’ ফোটার সময় এসে গেছে। গ্রামের আম আর নারকেল গাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। এমন কি রাস্তার পাশে ছাগলের দৌড়োপও প্রমাণ করছিলো প্রকৃতিক বাংলার পূর্ণতা। “পুরুষ আর স্ত্রীগুলোকে আলাদা করার একমাত্র উপায় হলো,” আমাকে ওরা বললো, “মেয়ে ছাগলগুলো গর্ভবতী।”

## হত্যা আর অগ্নিকান্ড: তাদের শাস্তির নমুনা

পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল অঞ্চল কুমিল্লার জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো প্রতি বর্গমাইলে ১,৯০০ জন। অথচ কোথাও কোনো মানুষ দেখা গেলো না। ‘বাঞ্ছালিরা কোথায়?’ কিছুদিন আগে ঢাকার রাস্তাঘাট একেবারে নির্জন দেখে সেনাদলের লোকদের আমি জিজেস করেছিলাম। ওদের তৈরী করা উভ্রে ছিলো, “সবাই গ্রামে গেছে।” অথচ গ্রামেও কোনো বাঞ্ছালি দেখা যাচ্ছিল না। ঢাকার মতো কুমিল্লাও একেবারে জনশূন্য। লাকসাম দিয়ে আসার সময় দশ মাইল পথে হাতে গোলা কয়েকজন কৃষককে দেখলাম। অবশ্য

খাকি-পোশাক-পরা পাকসেনারা গন্তীর মুখে অটোমেটিক রাইফেল হাতে রাস্তায় অবস্থান করছিল। আদেশমাফিক রাইফেল হাতছাড়া করেনি কেউ। ট্রিগার-সুখী কঠিন লোকজন সবসময় রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। যেখানে পাকসেনা, সেখানে কোনো বাঞ্ছালিকে পাওয়া যাবে না।

রেডিও এবং খবরের কাগজে সামরিক আইন ঘোষণা করা হচ্ছে মুহূর্মুহু- চোরাগোপ্তা হামলার জন্য ধরা পড়লে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। রাস্তা বা বিজ ধ্বংস বা খোঁড়ার চেষ্টা করলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের একশ গজের ভেতর সমস্ত বাড়িকে এর জন্য দায়ী করা হবে এবং সেগুলোর ধ্বংসসাধন করা হবে। কার্যক্ষেত্রে ঘোষণাগুলোর চাইতে ভয়াবহ সব পদক্ষেপে নেয়া হয়েছে। “শাস্তিমূলক ব্যবস্থা” এমন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাঞ্ছালিরা বেপরোয়া ও সহিংস

## আতঙ্কে মুহূর্মান হয়ে বাঞ্ছালিদের দুটো প্রতিক্রিয়া হয়। যারা পালাতে পারে তারা সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। পাকসেনার উপস্থিতিতে যারা পালাতে পারে না তারা বশ্য ক্রীতদাসের মতো আচরণ করে

হতে বাধ্য হয়েছে।

এর যে কী ভয়াবহ অর্থ তা দেখেছি ১৭ এপ্রিল চাঁদপুর যাওয়ার পথে হাজীগঞ্জে। বিদ্রোহীরা, যারা এখনো এ-অঞ্চলে তৎপর, গত রাতে ১৫ ফুট দীর্ঘ একটা বিজ ভেঙে ফেলেছে। মেজর রাঠোরের (জি-২ অপারেশনস) মাধ্যমে জানা গেলো, তৎক্ষণাৎ এই এলাকায় একদল সেনাদল পাঠিয়ে দেয়া হলো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। বিজের সিকি মাইলব্যাপী অঞ্চলে পেঁচিয়ে ওঠা ঘন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল তখনও। সাময়িকভাবে কাঠের তক্তা দিয়ে সারানো বিজটি সাবধানে পার হওয়ার সময় দেখলাম ডানদিকের আম্য বাড়িগুলোতেও আগুন লকলকিয়ে উঠছে।

গ্রামের পেছন দিকে কিছু জওয়ান আগুন ছড়ানোর চেষ্টা করছিল নারকেলের ছোবড়া দিয়ে। এগুলো কাজও দিচ্ছিল ভালো। কারণ সাধারণত রান্নার কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়। পথের অন্যদিকে ধানক্ষেতের ওপারের গ্রামেও আগুনের চিহ্ন দেখা গেল। বাঁশবাড়ি আর ঝুঁড়েঘরগুলো তখনও পুড়িছিল। শত শত গ্রামবাসী

পাকসেনা আসার আগের রাতেই পালিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় মেজর রাঠোর বললেন, “এই দুর্দশাকে তারা নিজেরাই ডেকে এনেছে।” আমি বললাম, সামান্য কিছু বিদ্রোহীর জন্য নিরপরাধ লোকদের ওপর এটা বড় বেশি নির্মতা হয়ে গেছে। তিনি কোনো উভ্রে দিলেন না।

কয়েকঘণ্টা পরেই চাঁদপুর থেকে ফেরার সময় আমরা আবার হাজীগঞ্জ দিয়ে আসছিলাম। “হত্যা আর অগ্নিকান্ড অভিযান”-এর বর্বরতা আমি স্বচক্ষে দেখলাম তখন। দুপুরবেলা সে-এলাকার ওপর দিয়ে বেশ কড়া বাড় বয়ে গেছে। এখন শহরের ওপর পড়েছে মসজিদের মিনারের ভৌতিক ছায়া। পেছনের খোলা জিপে ক্যাপ্টেন আজহার আর চারজন জওয়ানের ইউনিফর্ম গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে চুপসানো। বাঁক নিতেই মসজিদের বাইরে আমরা ট্রাকের একটা বহর থেমে থাকতে দেখলাম। গুনে দেখলাম জওয়ান-ভর্তি সাতটা ট্রাক। বহরটির সামনে ছিল একটা জিপ। দু’জন লোক তৃতীয় একজনের নেতৃত্বে পথের পাশে একশোরও বেশি দোকানের বন্ধ দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। দু’টো কুঠার দিয়ে এই ভাঙ্গার চেষ্টা চলছিল, মেজর রাঠোর তার টয়োটা সেখানে থামালেন।

“তোমরা এখানে কী করছ?”

তিনজনের মধ্যে লম্বা লোকটা, যে ভাঙ্গুরের তত্ত্বাবধান করছিল, আমাদের দিকে চেঁচিয়ে উঠল, “মোটু, আমরা কী করছি বলে তোমার মনে হয়?” কষ্টস্বর চিনতে পেরে, মেজর রাঠোর মিষ্টি একটা হাসি দিলেন। আমাকে জানালেন তিনি হলেন তার পুরনো দোষ্ট ইফতি- ট্রুলেন্ডথ ফন্ড্রিয়ার্স ফোর্স রাইফেলের মেজর ইফতিখার।

রাঠোর বললেন, “আমি ভেবেছিলাম কেউ লুট করছে।”

“লুট? না না।” জবাব দিল ইফতিখার, “আমরা শুধু খুন করছি আর আগুন জ্বালাচ্ছি।”

হাত নাড়িয়ে তিনি বোঝালেন যে এসব তিনি ধ্বংস করবেন।

“ক’জনকে ধরতে পেরেছ?” রাঠোর জিজেস করলেন।

ইফতিখার ঝঁ নাচিয়ে হাসলেন।

“বল।” রাঠোর আবার জিজেস করলেন। “ক’জনকে ধরেছ?”

“মাত্র বারোজন।” তিনি জবাব দিলেন, “আজলাহর রহমতে আমরা ওদের পেয়েছি। লোকদের ধাওয়া করার জন্য না পাঠালে তো ওরা পালিয়েই যেত।”

মেজর রাঠোরের উৎসাহে ইফতিখার তার ঘটনার বর্ণনা শুরু করলেন বিস্তৃতভাবে। কীভাবে হাজীগঞ্জে ব্যাপক অঙ্গৈষণের পর একটা বাড়িতে লুকিয়ে থাকা বারোজন হিন্দুকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তা রসিয়ে বললেন। তাদের সবাইকে “নিকাশ করে

দেয়া হয়েছে।” এখন মেজর ইফতিখার এখন ব্যস্ত তার দ্বিতীয় অভিযানে, অগ্নিকান্ডে।

ইতোমধ্যে একটি দোকানের দরজা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাংলায় দোকানটিতে লেখা আছে “মেডিকেল এন্ড স্টোরস”。 বাংলা লেখার নিচে সেই সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা আছে “অশোক মেডিকেল এন্ড স্টোরস”。 তার নিচে লেখা ছিল “প্রোপাইটার এ এম বোস”。 তালা মেরে অন্যান্যদের মতো জনাব বোসও হাজীগঞ্জ থেকে পালিয়েছেন। দোকানের সামনে ছিল একটা প্রদর্শন কক্ষ। ওষুধ, কফ সিরাপ, ম্যাঙ্গো ক্ষোয়াসের বোতল, ইমিটেশনের অলঙ্কার, রঙিন পোশাকের প্যাকেট ইত্যাদি অনেক কিছু ওতে সাজানো ছিল। ইফতিখার লাখি মেরে সব ভাঙতে লাগলেন। তিনি কিছু চট্টের ব্যাগ নিলেন। অন্য একটি তাক থেকে নিল কিছু প্লাস্টিকের খেলনা আর রুমালের বাস্তিল। তারপর মেঝেতে সব জড়ে করে টয়োটায় বসা এক জওয়ানের কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে এলেন। ওই জওয়ানের মাথায় বুদ্ধিসুন্দি ভালোই ছিল। সে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড় দিয়ে দোকানে চুকে একটা ছাতা বের করে আনল। ইফতিখার তাকে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন।

লুট করা, তিনি মনে করিয়ে দিলেন, নিয়মবিরণক। এরপর দ্রুত আগুন ধরিয়ে দিলেন ইফতিখার। চট্টের জুলত স্টপ তিনি ছুঁড়ে দিলেন দোকানের এক কোণে, অন্য কোণে কাপড়ের বাস্তিল। মুহূর্তেই দোকানটি দাউদাউ করে জুলে উঠল। মিনিটখানেকের মধ্যেই একটি দোকান পরে তেলের দোকানে আগুন পৌঁছলে বক্স শাটারের পেছনে আগুনের আওয়াজ শোনা গেল। এ-সময়ে ঘনায়মান অন্ধকার দেখে রাঠোর উদ্ধিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। পরদিন দেখা হতেই মেজর ইফতিখার আমাকে বললেন, “আমি মাত্র ষাটটা ঘৰ জুলিয়েছি। বৃষ্টি না এলে সবগুলোই শেষ করে করে ফেলতাম।”

মুজাফফরগঞ্জের কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে আমাদের থামানো হলো। দেখা গেল একজন মাটির দেয়ালের সঙ্গে কুকড়ে রয়েছে। এক জওয়ান সর্তক করে দিল যে সে ফৌজি হতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ সর্তক নিরীক্ষণের পর বোঝা গেলো, সে একটি যিষ্ঠি হিন্দু মেয়ে। আর খোদাই জানে কার জন্য মেয়েটি নিরে অপেক্ষা করছিল। এক জওয়ান দশ বছর ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলে কাজ করার সুবাদে কিছু বাজারী বাংলা রশ্মি করেছিলো। সে মেয়েটিকে গ্রামে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। ওখানে বসে থেকেই মেয়েটি কী যেন বিড়বিড় করল। তখন তাকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেয়া হল। তবু চলে আসার পরও সে ওখানেই বসে রইল। আমাকে জানানো

হল, “মেয়েটির যাওয়ার জায়গা নেই- না আছে পরিবার না আছে ঘর।”

হত্যা ও অগ্নিকান্ড অভিযানের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মেজর ইফতিখারও একজন। বিদ্রোহীদের খুঁজে বের করার নামে হিন্দু ও ‘দুর্গৃতিকারীদের’ (বিপ্লবীদের অফিসিয়াল পরিভাষা) অবাধে খুন করার এবং আশপাশের সবকিছু জুলিয়ে দেবার অনুমতি তারা পেয়েছে। এই টিঙ্গিটিঙে পাঞ্জাবী অফিসারটি নিজের কাজ নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। কুমিল্লার সার্কিট হাউজে ইফতিখারের সঙ্গে যাবার সময় তিনি তার সাম্প্রতিক কর্মকান্ডের ফিরিস্তি দিলেন।

“আমি এক বুড়োকে পেয়েছিলাম”, তিনি বললেন। “হারামজাদার দাঢ়ি ছিলো, আর তান করছিলো পাকা মুসলমানের মতো। এমনকি নিজের নাম বলল আদুল মাহলান। কিন্তু মেডিক্যাল ইন্সপেকশনে পাঠাতেই ওর খেল খতম হয়ে গেল।” ইফতিখার বলে যাচ্ছিলেন, “আমি তাকে তক্ষুণি সেখানে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার লোকেরা বললো- এরকম জারজের জন্যে তিনটা গুলি দরকার। তাই আমি তাকে একটা গুলি করলাম গোপনাঙ্গে, একটা পেটে। তারপর মাথায় গুলি করে তাকে খতম করে দিলাম।”

আমি যখন চলে আসি তখন তাকে নেতৃত্ব-ক্ষমতা প্রদান করে উত্তর ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়েছে। আবারো তার অভিযান হত্যা আর অগ্নিকান্ড।

আতঙ্কে মুহূর্মান হয়ে বাঙালিদের দুটো প্রতিক্রিয়া হয়। যারা পালাতে পারে তারা সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানের উপস্থিতিতে যারা পালাতে পারে না তারা বশ্য ক্রীতদাসের মতো আচরণ করে- যা তাদের কপালে দুর্ভোগ ছাড়া অন্য কিছুই বয়ে আনে না। চাঁদপুর ছিল প্রথমটির উদাহরণ।

মেঘনা নদীবন্দর সংলগ্ন এই অঞ্চল আগে ব্যবসা-কেন্দ্র হিসেবে খুবই বিখ্যাত ছিল। রাত্রিবেলা নদীর পাড়ে ভেড়ানো হাজারো মৌকা আলোয় আলোয় এক রূপকথার রাজ্য বানিয়ে ফেলে। চাঁদপুর জনমানবহীন হয়ে পড়ে ১৮ই এপ্রিল। না ছিল মানুষ, না কোনো মৌকা। বড়জোর এক শতাংশ মানুষ স্থানে ছিল। বাদবাকিরা, বিশেষ করে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ হিন্দুরা, পালিয়ে গিয়েছিল। ওরা পালিয়ে গেলেও বাড়িতে, দোকানে, ছাদে হাজার হাজার পাকিস্তানী পতাকা উঠছিল। মনে হচ্ছিল জনমানুষ ছাড়াই জাতীয় দিবস উদয়াপিত হচ্ছে। হিংস্র দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যেই ছিল এই ব্যবস্থা। এই পতাকা ছিল তাদের আত্মরক্ষার

উপায়।

কীভাবে যেন তারা জেনেছে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ালে পাকিস্তানদের হিংস্র ও নির্মম ধন্সাত্মক তৎপরতা থেকে রক্ষা পওয়া যাবে। পতাকা কীভাবে বানানো হচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়াল রাখা হয়নি, কোনো রকমে একটা চাঁদতারা থাকলেই যথেষ্ট। ওগুলোর রঙ, কাঠামো গড়ন তাই হয়েছে বিচিত্র। সবুজের জায়গায় কোনটার জমি নীল। তারা যে বাংলাদেশী পতাকার মালমশলা দিয়ে এই পতাকা বানিয়েছে এটা নিশ্চিত। সবুজের জায়গায় সর্বত্র দেখা গেছে নীল পতাকা। চাঁদপুরের মতো একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে হাজীগঞ্জ, মুজাফফরগঞ্জ, কসবা আর ব্রাক্ষণবাড়িয়ায়। কিন্তু পতাকা উড়েছে- ভৌতিক পতাকা।

## একটি ‘কুচকাওয়াজ’ ও একটি চেনা ইশারা

আরেক ক্রীতদাসসুলভ বশ্যতা দেখা গেছে লাকসামে। পরদিন সকালে যখন আমি শহরে চুকি তখন বিপ্লবীমুক্ত হয়ে গেছে। দেখতে পেলাম শুধু পাকিস্তান এবং আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার পাকিস্তানী পতাকা। স্থানকার মেজর ইন-চার্জ পুলিশ-স্টেশনে ঘাঁটি গেড়েছিলেন, মেজর রাঠোর স্থানে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমার সহকর্মী পাক-টিভির একজন ক্যামেরাম্যান একটা প্রচারণা-ফিল্মের কাজে লাকসামে এসেছেন, “স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে” নামের নিয়মিত এই সিরিজ প্রতিদিন স্বাগত- কুচকাওয়াজ আর ‘শাস্তিসভার’ খবর প্রচার করতো।

সে কীভাবে এটা করে ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, কিন্তু মেজর জানালেন জিনিসটা মোটেও সুমধুর নয়। “হারামজাদারা এর চেয়ে বেশি মাত্রায় এসে ব্যাপারটাকে দর্শনীয় করে তুলতে পারে। আমাকে বিশ মিনিট সময় দাও।” ৩৯তম বেলুচ লেফটেন্যান্ট জাবেদের ওপর ভার পড়েছিল জনতাকে একত্রিত করার। তিনি দাঢ়িওয়ালা বুড়ো একজন লোককে ডাকলেন। তাকে আনা হয়েছে বানানো সাফার্বকার দেয়ার জন্যে। লোকটি, পরে জানিয়েছিলেন তার নাম মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সাইদুল হক, বললেন তিনি একজন “খাঁটি মুসলিম লীগার; আওয়ামী লীগের লোক নন”। (১৯৪৭ সনে স্বাধীন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলো মুসলিম লীগ।) খুশি করার জন্যে তিনি আগ্রহের সঙ্গে আরো জানালেন, “বিশ মিনিটের মধ্যে আমি আপনাদের অবশ্যই অন্ত তপক্ষে ষাটজন লোক জোগাড় করে দেব।” জাবেদকে তিনি বললেন, “দু’ঘণ্টা সময় দিলে দুশো জন লোক জোগাড় করতে পারব।”

মৌলানা সাইদুল হকের সাচ্চা জবান। মেজরের দেয়া চমৎকার নারকেলের দুধে যেই চুমুক দিয়েছি, অমনি দূর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো? “পাকিস্তান জিন্দাবাদ!” “পাকিস্তান জিন্দাবাদ!” “মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ!” (জিন্দাবাদ হলো ‘চিরজীবী হোক’-এর উদ্দু শব্দ।) কিছুক্ষণ পরেই তাদের কুচকাওয়াজ করে আসতে দেখা গেল। ওদের মধ্যে বুড়ো অসুস্থ লোক আর হাঁটুসমান ছেলেপিলে মিলিয়ে পঞ্চশজন মানুষ ছিল। সবাই পাকিস্তানী পতাকা উঁচিয়ে গলা ফটিয়ে চেঁচাছিল। লেফটেন্যান্ট জান্ডে আমাকে একটি চেনা ইশারা দিলেন। মিনিটখনেকের মধ্যে কুচকাওয়াজটি একটি জনসভায় পরিণত হল, একটি মাইক জোগাড় হয়ে গেল, বক্ত্ব করতে আগ্রহীর সংখ্যা বাড়তে থাকল।

সৈনিকদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেয়ার জন্যে সামনে ঠেলে দেয়া হল মাহবুব-উর রহমানকে। “এন এফ কলেজের ইংরেজী ও আরবির অধ্যাপক এবং মুসলিম লীগের আজীবন সদস্য” হিসেবে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। পরিচয় দেয়ার পরে তিনি নিজস্ব কায়দায় বলা শুরু করলেন, “পাঞ্জাবী ও বাঙালিরা পাকিস্তানের জন্যে একত্র হয়েছে। আমাদের রয়েছে নিজস্ব প্রতিহ্য ও সংস্কৃতি। কিন্তু হিন্দু ও আওয়ামী লীগাদের কারণে আমরা সন্ত্বাসের কবলে পড়েছি এবং আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম ধ্বংসের দিকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পাঞ্জাবী সৈনিকেরা আমাদের রক্ষা করেছে। তারা বিশ্বের সেরা সৈনিকদল এবং মানবতার নায়ক। আমরা হৃদয়ের অতল গভীর থেকে তাদের শুন্দি করি ও ভালোবাসি।” এবং এভাবেই সে বেশ কিছুক্ষণ চালিয়ে গেল।

“সভা” শেষে মেজরকে জিগ্যেস করলাম ভাষণ সম্পর্কে তিনি কী ভাবছেন। “উদ্দেশ্য সফল হয়েছে” তিনি বললেন, “কিন্তু এই হারামজাদাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। তার নামও আমার তালিকায় রাখব।”

পূর্ব বাংলার যন্ত্রণা এখনও শেষ হয়নি। সবচেয়ে খারাপ সময় এখনও আসেনি। “বিশুদ্ধি অভিযান” শেষ না-হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানী ফিরে না-আসার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর এই কাজের অর্ধেক মাত্র এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ৯ম ও ১৬শ, এই দুই ডিভিশন পাক সেনাকে বাঙালি বিদ্রোহী ও হিন্দুদের খুঁজে বের করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তানের মতো দেশের জন্য এই পরিমাণ যথেষ্ট কার্যকরী। পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে ২৫০০০-এরও বেশি লোক। ২৮শে মার্চ দুই ডিভিশন সৈন্যকে ৪৮ ঘন্টার নোটিশ দেয়া হয়েছিল রওয়ানা হবার জন্য। খরিয়ান ও মুলতান থেকে করাচিতে তাদের আনা হয়েছিলো ট্রেনে করে। হালকা বেড রোল ও সামরিক

যাকসাকসহ জাতীয় এয়ারলাইন পিআইএ-র বিমানে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে ঢাকায় (তাদের অন্তর্শন্ত্র সমুদ্রপথে পাঠানো হয়েছিল)। পিআইয়ের সাতটি বোয়িং বিমান আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাতিল করে সিলোন দিয়ে দীর্ঘ ১৪ দিন ধরে তাদের পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে এসেছে। এয়ার-ফোর্সের কিছু ট্রাইপোর্ট-এয়ারক্রাফট এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

পাকিস্তানীরা তৎক্ষণাতই পূর্ব-কমান্ডের ১৪শ ডিভিশনের অন্তর্পাতি নিয়ে তৎপরতায় নেমে গেছে। কুমিল্লা থেকে নিয়ন্ত্রিত ৯ম ডিভিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল পূর্ব সীমান্ত বন্ধ করে দিতে-যাতে বিপ্লবীরা তাদের চলাকেরা ও সরঞ্জাম-সরবরাহ না-করতে পারে। যশোর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে মিলে ১৬শ ডিভিশনও প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তে একই ধরনের কাজে ন্যস্ত ছিলো। মে

## পরিকল্পনা বিফলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। গেরিলা কায়দা গ্রহণকারী এই বিপ্লবীদের সামরিক কর্মকর্তারা যত সহজে দমন করেছিলেন, বাস্তবে তা ঘটেনি

মাসের ত্তীয় সপ্তাহের ভেতরে তারা এই কাজ সম্পন্ন করে ফেলে। যেসব বিপ্লবী ভারতে পালাতে পারেনি- ইস্পাত আর আগুনের বৃত্তে তারা বন্দি হয়ে পড়ে- দুই সেনা ডিভিশন তাদের জন্যে ব্যাপক চিরন্তন-অপারেশন কর্মসূচী গ্রহণ করে। কাজেই নিঃসন্দেহে আশংকা করা যায়, সীমান্তের সহিংসতা এখন মধ্যাঞ্চলে শুরু হবে। এটি হবে আরো বেদনাদায়ক। মানুষদের পালানোর আর কোনো পথ থাকবে না।

৯ম ডিভিশনের জি-১-এর পুল্পপ্রেমিক লেফটেন্যান্ট জেনারেল বেগ ২০শে এগ্রিল ধারণা পোষণ করেছিলেন যে এই অনুসন্ধান কর্মসূচী দু’মাস অর্থাৎ জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় নেবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা বিফলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। গেরিলা কায়দা গ্রহণকারী এই বিপ্লবীদের সামরিক কর্মকর্তারা যত সহজে দমন করবেন বলে আশা করেছিলেন, বাস্তবে তা ঘটেনি। বিচ্ছিন্ন ও আপাত অসংগঠিত গেরিলারা পরিকল্পিতভাবে রাস্তা ও রেলপথের ধ্বংসাধারণ করে পাক সেনাদের কাবু করে ফেলছে। কারণ এর

ফলে তাদের যাতায়াত-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ৯ম ডিভিশনের কাজও অনাকঞ্চিতভাবে পিছিয়ে গেছে এজন্যে। এদিকে তিন মাসব্যাপী বড়বাদলের মৌসুম চলে আসায় সামরিক কার্যক্রম বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে।

বর্ষাকালের জন্যে পাক সরকার মে-র দ্বিতীয় সপ্তাহে চীনের কাছ থেকে নয়টি বৃষ্টিরোধক গানবোট নিয়ে এসেছে। বাদবাকিগুলোও আসার পথে। আশি টনী, ব্যাপক গোলাবর্ষণ-ক্ষমতাধারী এই গানবোটগুলো বিমান বাহিনী ও আর্টিলারীর সৈনিকদের এখন পর্যন্ত ব্যবহারের জন্যে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি এলে এগুলো কাজ করবে না। এই বোটগুলোরে সহায়তা করবে কয়েকশ দেশীয় পরিবহন যা সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য ইস্যু ও পরিবর্তিত করা হয়েছে। সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের খোঁজে জলপথেও বেরংতে চায়।

## পূর্ব বাংলার উপনিবেশীকরণ

বটন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সতেরোটির মধ্যে তেরোটি জেলাতেই খাদ্যের অভাব আছে-যা পূরণ করা হয় চাল ও গমের পর্যাপ্ত আমদানির মাধ্যমে। গৃহযুদ্ধের জন্যে এবছর আর তা সম্ভব হচ্ছে না। ছয়টি বড়ো ও সহস্রাধিক ছোটোখাটো বিজ বিধ্বন্ত হয়ে গেছে, অনেক রাস্তাঘাটও অতিক্রমের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রেল-যোগাযোগও একই ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, যদিও সরকার বলছে যে সবকিছু “প্রায় স্বাভাবিক”। ৭ই মে পর্যন্ত তৎপরতা চালিয়ে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম সমুদ্র-বন্দর থেকে উভর পর্যন্ত সড়ক ও রেল যোগাযোগ, বিশেষ করে ফেলীর মতো বিশিষ্ট সড়ক, জংশন ধ্বংস করে দিয়েছে। খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা যাচ্ছে না এই ধ্বংসকান্ডের জন্যে। স্বাভাবিক সময়ে চট্টগ্রাম থেকে অন্যান্য এলাকায় নৌপথে ১৫ শতাংশ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। বাকি ৮৫ ভাগ সরবরাহ করা হয় সড়ক ও রেলপথে। এমনকি নৌপথের পূর্ণ যোগাযোগ ও তৎপরতা গ্রহণ করা গেলেও চট্টগ্রাম গুদামে জমা খাদ্য মজুতের ৭০ শতাংশ খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হবে না।

অন্য দুটো কারণও এর সঙ্গে যোগ করা দরকার। প্রথমত দুর্ভিক্ষের মোকাবেলার জন্যে লোকজন খাদ্যশস্য নিজেদের কাছেই মজুত করে রেখেছে। এই অবস্থা আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য দিয়েছে। অপরটি হলো দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার ব্যাপারে পাক সরকারের অস্বীকৃতি। পূর্ব বাংলার সামরিক গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ১৮ই এপ্রিল এক বেতারভাষণে বলেন যে খাদ্যশস্যের সরবরাহের ব্যাপারে তিনি ওয়াকিবহাল আছেন। তখন থেকে সরকারি সব

কায়দা ব্যবহার করা হয়েছে খাদ্য-সংকটের তথ্য গোপন করার ব্যাপারে। এর কারণ হল, এসবের পূর্বে সাইক্লোনের কারণে সুষ্টি দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষে বিপুল বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ তৈরি হবে এবং বষ্টন-ব্যবস্থা দেখতে পরিদর্শন-দল আসবে। তা হলে হত্যাকাড়ের খবর বিশ্ববাসীর কাছে গোপন রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেজন্যে বিশুদ্ধি অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুধার কারণে লোকের মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রিমি উন্নয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব কারনির সঙ্গে কিছুদিন আগে এই সমস্যা নিয়ে কথা হয়েছিল। কর্মচারীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত অফিসে দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে নির্দয়ের মতো তিনি বলেন, ‘এই দুর্ভিক্ষ তাদের স্যাবোটাজের ফল। কাজেই, তাদের মরতে দাও। মনে হয় এতে বাংলিদের বোঝোদয় হবে।’

সামরিক সরকারের পূর্ব বাংলা-নীতি আপাতভাবে এত স্ববিরোধী ও আত্মবিনাশী ছিলো যে শাসকরা নিজেরাই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। প্রথমদিকে বলপ্রয়োগের ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করে সরকার অযোক্তিকভাবে ও বোকার মতো জল ঘোলা করে ফেলেছে। এর আপাত কিছু কারণ ছিলো। একদিকে, এটা সত্য যে সন্ত্রাসের তীব্রতা হাস হয়নি। কিন্তু দমননীতি পূর্ব বাংলার বিক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একারণে প্রতিদিন সরকারের হাজার হাজার শক্তি গড়ে উঠছে এবং পাকিস্তানকে ঠেলে দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতার পথে।

অন্যদিকে, কোনো সরকারই সচেতন হতে পারে নি যে এই নীতিমালা ব্যর্থ হতে পারে (পূর্ব বাংলাকে অনিদিষ্টভাবে আটকে রাখার জন্য যথেষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানী নেই)। দৃঢ় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতায় বিশেষত আমেরিকার কঠোর বিবেচনার কারণে, যত দ্রুত সম্ভব একটি রাজনৈতিক সমর্বোত্তম প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের ২৫শে মে-র সংবাদ-সম্মেলন জানান দেন যে তিনি বিষয়গুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এবং তিনি বলেন যে মধ্য জুনে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ব্যাপারে তিনি তার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করবেন।

এ সবকিছু এটাই নির্দেশ করছে যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার স্ববিরোধী আচরণ করছে এবং দেশের ২৪ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে তীব্র সন্ধিটের সমাধানে উল্লেপথে হাঁটা শুরু করেছে। এটি হল বিস্তৃতভাবে ফুটে ওঠা চিত্র। কিন্তু এটা কি সত্য? আমার ব্যক্তিগত মত হল এসব সত্য নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে নেতৃত্ব কী বলেন, আর পূর্বে কাজে কী করেন এই দুইটি চিত্রে আমার সরাসরি দেখার দুঃখজনক সুযোগ হয়েছে। আমি মনে করি সরকারের পূর্ব বাংলার নীতিতে সত্যিকার অর্থে কোনো স্ববিরোধ নেই। পূর্ব বাংলায় উপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়া চলেছে। এটা আমার কোনো

স্বেচ্ছাচারী মতামত নয়। বাস্তবতা নিজেই সে কথা বলছে।

পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্ত চিহ্ন বিলোপ করাই পাক সামরিক বাহিনীর প্রথম বিবেচনা ছিল এবং এখনো আছে। ২৫শে মার্চ থেকে সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে চলমান দমননীতির মাধ্যমে এবং যেকোনো উপায়ে এই সিদ্ধান্ত বজায় রেখে চলেছে। ঠান্ডা মাথায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং ঠান্ডা মাথায় সেদিকে এগুচ্ছেও। পূর্ব বাংলায় ধ্বংসালী চলার সময় কোনো অর্থপূর্ণ ও বাস্তবায়নযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। জটিল প্রশ্ন হল: হত্যাকাণ্ড কি আদৌ থামবে? ৯ম ডিসেম্বরের কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল শওকত রাজা ১৬ এপ্রিল কুমিল্লায় আমাদের প্রথম সাক্ষাতে এর উত্তর দিয়েছিলেন।

“তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো”, তিনি বললেন, “আমরা মানুষ আর অর্থ দুদিক থেকেই ব্যাপক আর ব্যয়বহুল অভিযান খামোখা গ্রহণ করিন। আমরা এটাকে একটা দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি এবং তা শেষ করতে যাচ্ছি। আধাখেচড়া করে শেষ করলে রাজনীতিবিদরা এটাকে আবার খুঁচিয়ে তুলবে। তিন চার বছর পর পরই এই সমস্যাটিকে উঠে দিতে সামরিক বাহিনী নারাজ। সেনাবাহিনীর অন্য প্রয়োজনীয় কাজ আছে। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি, তা পুরোপুরি সম্পূর্ণ করতে পারলে এরকম অভিযানের আর প্রয়োজন হবে না।” কর্মরত তিনি ডিভিশনাল কমান্ডারের মধ্যে মেজর জেনারেল শওকত রাজা অন্যতম। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন তিনি। তাকে নিশ্চয় অসংলগ্ন কথা বলার জন্য এই পদে রাখা হয়নি।

লক্ষ্যনীয় যে, পূর্ব বাংলায় আমার দশ দিনের সফরে প্রতিটি সামরিক কর্মকর্তার মুখে মেজর জেনারেল শওকত রাজার কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান জানেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে যারা সৈন্য পরিচালনা করছেন তারাই পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ। সামরিক অভিযানই সেনা কর্মকর্তাদের মতেক্ষেত্রে প্রমাণ দেয়। যেকোনো মাত্রায়ই এটা একটা প্রধান কাজ। এটা এমন একটা বিষয় যার সুইচ বৃহত্তম ফলাফল ছাড়া অফ বা অন করা যাবে না।

## সামরিক বাহিনী তাদের কাজ করে যাচ্ছে

সামরিক বাহিনী ইতোমধ্যে হত এবং আহতের বিরাট পাহাড় গড়েছে। ঢাকায় ব্যক্তিগতভাবে শুনেছি যে সাধারণ মানুষের চেয়ে অফিসারদের বেশি হত্যা করা হয়েছে এবং হতাহতের পরিমাণ ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধকে অতিরুম্ভ করে গেছে। সেনাবাহিনী অবশ্যই এসব “জীবনোৎসর্গ”কে রাজনৈতিক সমাধানের খাতিরে, যার প্রচেষ্টা অতীতে বারবার ব্যর্থ প্রমাণিত

হয়েছে, পান্তি দেবে না। তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এ অবস্থায় তা স্থগিত করলে তা আত্মবিনশ্বি হয়ে উঠবে। এর মানে এটাই দাঁড়াবে যে, বাংলালি বিপ্লবীদের সঙ্গে তাতে আরো সক্ষট তৈরি হবে। প্রচল আক্রম এখন দু'পক্ষেই তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

আলোচনা সাপেক্ষে সমর্বোত্তম এখন সম্ভব নয়। এখন সম্পূর্ণ জয় বা পরাজয়ই হল একমাত্র সমাধান। সময় এখন, বিচ্ছিন্ন অসংগঠিত আধুনিক অস্ত্রীয় বিপ্লবীদের নয়, পাকিস্তানের পক্ষে। কিন্তু অন্যান্য শর্ত যেমন বৃহৎ শক্তিদের দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতির চেহারা পুরো পাল্টে দিতে পারে। তবে বর্তমান অবস্থায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দিক থেকে লক্ষ্যজ্যর্ণের ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। তাই বর্তমান ক্ষয়ক্ষতি তাদের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ইতোমধ্যেই প্রচুর অর্থ খরচ হয়ে গেছে পূর্ব বাংলায় অভিযান চালাতে গিয়ে, এবং এই ক্রমবর্ধমান ব্যয় ভারই পাক সরকারের প্রতিভার পরীক্ষা করছে। তহবিলের ব্যাপক খরচাপাতি এটা স্পষ্ট করে যে সৈন্যদল ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিসেব-নিকেশ করে কাজে নামা সেনাবাহিনীর সকল স্তরেই প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ব্যাপারে অনুমোদন ও সমর্থন রয়েছে। ২৫,০০০ পাকিস্তানকে পূর্ব বাংলায় নিয়ে যাবার মতো সাহসী ও ব্যয়বহুল উদ্যোগ শুধু শুধু নেয়া হয়নি। ৯ম ও ১৬শ ডিসেম্বর দু'টো পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক মজুত হিসেবে রাখা হয়েছিলো। বর্তমানে তাদের নবনিযুক্ত ঘটেছে প্রচল খরচের মাধ্যমে।

চীন কারাকোরাম মহাসড়ক দিয়ে বিপুল অস্ত্রবাহীয় পাঠিয়েছে। সম্প্রতি এই অস্ত্রবন্যা হাস পেরেছে বলে মনে হচ্ছে; পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রতি প্রতিক্রিতির ব্যাপারে তাদের হয়তো দিতীয় কোনো ভাবনার উদয় হয়েছে। কিন্তু এরপরও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের তলানি থেকে এক মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের অস্ত্র ইউরোপীয় অস্ত্র বিক্রেতাদের কাছ থেকে কিনতে পাক-সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিগুণস্তুতি হয়নি। ঢাকা, রাওয়ালপিন্ডি ও করাচিতে সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে তারা সমস্যা সমাধানের উপায় দেখে পূর্ব বাংলা অভিযান দ্রুত শেষ করে ফেলার মধ্যে ও ভয়ংকর আক্রমণের মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ সরকার অন্যান্য সব খরচের ওপরে অবস্থান করছে। উন্নয়ন সত্যিকার অর্থে থেমে গেছে। একবাক্যে বলা যায়, রাজনৈতিক কোনো সমাধান সরকার যদি আন্তরিকভাবে চাইতো তা হলে পূর্ব বাংলার অপারেশন পরিত্যাগ করতো, কিন্তু সরকার তা থেকে সামরিকভাবে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়ে অনেক দূরে অবস্থান করছে। রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া এখন বসে আছেন বাঘের পিঠে। তবে তার পিঠে ওঠার আগে অনেক হিসাব-নিকাশও করেছেন।

কাজেই সামরিক সেনাদের সহজে প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। ঢাকার ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারের সরকারের পূর্ব বাংলা নীতি সম্পর্কে আমি জানলাম। এর তিনটি সূত্র আছে:

বাংলিলা নিজেদের “অবিশ্বাস্ত” হিসেবে প্রমাণিত করেছে এবং তারা অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা শাসিত হবে।

ইসলামী পদ্ধতিতে বাংলিদের পুনরায় শিক্ষা দিতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা দূর করতে “জনগণকে ইসলামিকরণ” (অফিসিয়াল পরিভাষায় এরকমই বলা হয়ে থাকে) করতে হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে শক্তিশালী ধর্মীয় বন্ধন তৈরি করতে হবে।

হত্যা ও দেশত্যাগের মাধ্যমে যখন হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন তাদের সম্পত্তি সুযোগবর্ষিত বাংলি মুসলমানদের মান জয় করতে সোনালি পুরস্কার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এটা ভবিষ্যতের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করবে।

এই নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সুপরিশ করা হয়েছে। প্রকাশ্য বিদ্রোহের অপরাধে সরকারি আদেশবলে প্রতিরক্ষাবাহী-নীতে আর কোনো বাংলির নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর যেসব সিনিয়র অফিসার জড়িত ছিলেন না “আগাম-সতর্কতা হিসেবে” তাদের গুরুত্বহীন জায়গায় বদলি করা হয়েছে। বাংলি ফাইটার-পাইলট, যাদের মধ্যে কারো কারো পাঁচ বা ততোধিক শক্তি-বিমান ধর্বসের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের গ্রাউন্ডে পাঠানো এবং বিমান-পরিচালনাবহিত্ত কাজকর্মে নিযুক্তির মাধ্যমে মর্যাদা ক্ষুঁট করা হয়েছে। এমনকি দেশের দু’অংশের মধ্যে যাত্রী-পরিবহনে পরিচালিত পিআইয়ের বিমানক্রন্দেরকেও বাংলিমুক্ত করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস হলো কেবল বাংলিদের নিয়ে আধাসামরিক বাহিনী; বিদ্রোহ সমাপ্তি না আসা পর্যন্ত তাদের বাতিল করে দেয়া হয়েছে। বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বেচ্ছাকর্মীদের নিয়ে সিভিল ডিফেন্স ফোর্স নামে নতুন বাহিনী গঠন হয়েছে। পুলিশে নিযুক্তির ব্যাপারেও বাংলির জায়গায় বিহারীদের নেয়া হচ্ছে। এগুলো তত্ত্বাবধান করছেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো ও সেনাবাহিনী কৃত্ত্ব অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ। চাঁদপুরের এগ্রিল মাসের শেষদিকে পুলিশ সুপারিনেটেডেন্ট ছিলেন একজন মিলিটারি-পুলিশ-মেজর। শত শত পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারি কর্মচারী ডাক্তার এবং রেডিও, টিভি, টেলিফোন কলাকৌশলীদের পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। এদের সবাইকেই দেয়া হয়েছে এক বা দুই ধাপ প্রযোশনের লোভ। অবশ্য এই বদলী করা হয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে। সরকারি কর্মকর্তাদের দেশের যে কোনো স্থানে ইচ্ছেমত বদলী করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাম্প্রতিককালে একটি নির্দেশনামা জারি করেছেন।

## বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অনুসন্ধান’

আমাকে বলা হয়েছে যে ভবিষ্যতে ডেপুটি কমিশনার বা পূর্ব বাংলার কমিশনারদের নেয়া হবে হয় বিহারী নয়তো পূর্ব পাকিস্তানী সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে। জানা গেছে যে, জেলা ডেপুটি কমিশনাররা আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন কুমিল্লায়, এসব ডেপুটি কমিশনারদের ধরা হয়েছে এবং গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কুমিল্লার সেই বিশেষ কর্মকর্তাটি “শেখ মুজিবের লিখিত নির্দেশ ছাড়া” পেট্রল ও খাদ্য সরবরাহ করতে অস্থীকৃতি জানানোয় পাকিস্নাদের রোষে নিপত্তি হন ২০ মার্চ।

সরকার পূর্ব বাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপরও হিস্ত হয়ে উঠেছে। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে ঘোষণা করে সেগুলোতে ‘অনুসন্ধান’ করার আদেশ দেয়া হয়। অনেক অধ্যাপক পালিয়ে গেছেন; গুলিতে মারা গেছেন কেউ কেউ। তাদের স্থানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নতুন নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলি কর্মকর্তাদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে প্রশাসনিক ও পরবর্তীয় সংবেদনশীল পদ থেকে। সবকিছু এই সময়ে চরম সীমায় এসে ঠেকেছে। তবে প্রশাসন যেমন চায়, এই উপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়া স্পষ্টত তার অর্ধেকও কাজে দেয়নি। কুমিল্লার সামরিক আইন প্রশাসক মেজর আগা আমাকে এর বহু প্রমাণ আমাকে দেখিয়েছেন। বিপ্লবীদের দ্বারা বিধ্বস্ত বিজ ও রাস্তা মেরামতে তিনি স্থানীয় বাংলি নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাছ থেকে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। কাজগুলো লাল ফিতায় বন্দি হয়ে আছে এবং বিজগুলো তেমনই পড়ে আছে। “আপনি আশা করতে পারেন না যে ওরা কাজ করবে।” তিনি আমাকে বলেন, “কারণ ওদেরই আমরা হত্যা করেছি, ধৰ্মস করেছি ওদেরই দেশ। তাদের দিক থেকে চিন্তা করলে তাই দাঁড়ায়, এবং আমরা এর দাম দিচ্ছি।”

বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন দুররানি ছিলেন কুমিল্লা-বিমানবন্দরে পাহারারত কোম্পানির দায়িত্বে। এসব সমস্যা মোকাবেলায় তার ছিল নিজস্ব কায়দা। কন্ট্রোল টাওয়ারে কর্মরত বাংলিদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ওদের বলে দিয়েছি সন্দেহজনক কিছু করছে এরকম মনে হলেও তাদের গুলি করে মারা হবে।” দুররানি তার কথা ও কাজে এক। কিছুদিন আগে রাতে বিমান-বন্দরের আশে-পাশে ঘোরাফেরা করছিল এমন এক বাংলিকে তিনি গুলি করে মেরে ফেলেছেন। “সে একজন বিপ্লবী হতে পারতো” আমাকে তিনি বললেন। দুররানি আরেকটি বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিমানবন্দরের আশেপাশের গ্রামে অভিযান চালানোর সময় তিনি নিজেই “৬০ জনেরও বেশি মানুষকে” খতম করেছিলেন।

পূর্ব বাংলার উপনিশীকরণের রাজ বাস্তবতাকে নির্লজ ছদ্ম-পোশাক

দিয়ে চেকে ফেলা হয়েছে। ইয়াহিয়া খান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান কয়েক সপ্তাহ ধরে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কার্যকলাপের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলাফল অবশ্য আদৌ সন্তোষজনক নয়। সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে ঢাকার বাংলি আইনজ মৌলভী ফরিদ আহমেদ এবং জামাতে ইসলামের গোলাম আজম ও ফজলুল কাদের চৌধুরীর মতো লোকদের যাদের প্রত্যেকে গত সাধারণ নির্বাচনে প্রচন্ড মার খেয়েছিলেন। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নূরুল আমিনের সমর্থনই ধর্তব্য। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বাইরে থেকে নির্বাচিত দু’জনের মধ্যে তিনি একজন। এছাড়াও ব্যক্ষ এই মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তার বয়স এখন সন্তুর। কিন্তু নূরুল আমিনও সতর্কভাবে তার মতামত দিচ্ছেন। তিনি আজ পর্যন্ত শুধু দুটো বিবৃতি দিয়েছেন যার বিষয়বস্তু হল “ভারতের হস্তক্ষেপ”।

এসব ‘দালাল’ বাংলিদের রোষানলে পড়েছেন। ফরিদ আহমেদ ও ফজলুল কাদের চৌধুরী বেদনার্তভাবে এসব থেকে সতর্ক হয়ে চলেছেন। ফরিদ আহমেদ তার বাড়ির দরজা-জানালা সবসময় বন্ধ করে রাখেন। দরজার ফাঁক দিয়ে যাদের শনাক্ত করতে পারেন, তারাই কেবল ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাচ্ছেন।

একটি বিশেষ অবার্যকর পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদের জন্য নির্বাচিত ৩১ জন আওয়ামী লীগ নেতার ক্ষেত্রে মৌনতা আদায় করেছে। পরিবার ছাড়া আর সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের আটকে রাখা হয়েছে আসন্ন ‘প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের’ অভিষেকের জন্য। যদিও তারা এখন নিজেদের ছাড়া আর কারও প্রতিনিধিত্ব করছেন না।

বেঁচে যাওয়া ভাগ্যবান দর্জি আদুল বারীর বয়স ২৪ বছর। পাকিস্তানের বয়স ও আদুল বারীর সমান। বলপ্রয়োগ করে সামরিক বাহিনী দেশটিকে একত্রিত রাখতে পারবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে যা করা হয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায় একটাই; তা হল, ১৯৪৭ সালে দু’টি সমান অংশের মুসলিম জাতির সমষ্টিয়ে একটি দেশ গড়ে তোলার স্থপন মানুষের ছিল, সেটা এখন মৃত। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবিয়া আর পূর্ব বাংলার বাংলিলা একই জাতির অভিযান জাতি হিসেবে নিজেদের ভাবার সন্তুবনা এখন সুন্দরপরাহত। বাংলিদের এখন একটাই বাপসা ভবিষ্যৎ আছে: উপনিবেশের অসুখী অবদমন থেকে বিজয়ী হিসেবে নিজেদের উত্তরণ।

দি সানডে টাইমস, ১৩ জুন, ১৯৭১।

[সূত্র: অনুবাদের জন্য প্রতিবেদনটি মওদুদ এলাহী সম্পাদিত ‘এসাইনমেন্ট বাংলাদেশ’ (মিলিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, ঢাকা) গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।]

# ফিরে দেখা ইতিহাস : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

## নামহীন মানব

এই উপমহাদেশের মানুষ বার বার বিদেশী শক্তি দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন শুরু হয় ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। এই দুই শতক ধরে এই অঞ্চলের মানুষ ক্রমাগত স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু ১৯৪০ এর গোড়ার দিকে এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ স্পষ্ট হয় এবং মুসলিম লীগ ভারত থেকে আলাদা হয়ে যেতে চায়। ফলশ্রুতিতে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান হয় এবং ভারত দুভাগে ভাগ হয় ধর্মের ভিত্তিতে- একটি ভারত এবং অন্যটি পাকিস্তান। পাকিস্তানের আবার ভৌগলিক সীমারেখার দিক থেকে দুটি খন্দ- পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান।

## পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭ - ১৯৭১)

পাকিস্তান মূলত এমন একটি দেশ ছিলো যার দুই খন্দের মানুষে-মানুষে শুধুমাত্র ধর্ম ছাড়া আর কোনই মিল ছিল না। হাজার মাইলের দূরত্ব ছাড়াও তাদের মধ্যে ছিল অনেক অমিল। সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ এমনকি অর্থনৈতিক অবস্থানেও ব্যাপক ব্যবধান।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত মূলত ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানিদের সেই সময় আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, যা এই অঞ্চলের মানুষ মেনে নেয়নি। ১৯৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথিবীতে প্রথম কোন জাতি ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল।

[In 2001, UNESCO declared 21 February as International mother language day]

পুরো পাকিস্তান শাসনামলে এই অঞ্চলে গণতন্ত্র বলে কিছুই ছিল না।

## ওই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

১৯৫৪ মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্টের জয় কেড়ে নেয়া হয়।  
১৯৫৬ পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা।

১৯৫৮ সামরিক শাসন জারি।

১৯৬২ ছাত্রদের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন শুরু।

১৯৬৭ গণমাধ্যমে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।

পুরো পাকিস্তান শাসনামলে এই অঞ্চলের মানুষ তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির জন্য আন্দোলন করে যায়। সংস্কৃতিকর্মীদের মাঝে দেখা দেয় গভীর অসন্তোষ। গণমাধ্যমের ওপর নিমেধুজ্ঞ জারি করা হয়। শত শত আন্দোলনকারী ছাত্র এবং রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদকর্মীও আন্দোলন শুরু করে তাদের অধিকারের জন্য।

১৯৬৬ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের রহমান ৬ দফা দাবি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত্বাসনের আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৬৮ শেখ মুজিবের রহমান, কিছু বাঙালি সাধারণ মানুষ এবং সেনাসদস্যের বিরুদ্ধে আগরতলা ঘড়্যন্ত ঘামলা হয়। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র কমিটি তাদের ১১ দফা আন্দোলন শুরু করে।

১৯৬৯ এই আন্দোলন চরম রূপ নেয়। ইউনিভার্সিটির ছাত্র আসাদ, নবকুমার স্কুলের ছাত্র মতিউর রহমান এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শামসুদ্দোহা শহীদ হন। আন্দোলনের মুখ্য জেনারেল আয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে যায়।

১৯৭০ চরম চাপের মুখ্য ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৭টি আসনে পায়, যা সমগ্র পাকিস্তানের সর্বমোট ৩০০ আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তৎকালীন সামরিক সরকার এই ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।



## মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রশাসন

প্রশাসনিক গঠনতন্ত্র হয়েছিল আঞ্চলিক প্রশাসন এবং মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দের নিয়ন্ত্রণে।

### সরকার

শেখ মুজিবের রহমান - রাষ্ট্রপতি

সৈয়দ নজরুল ইসলাম - উপরাষ্ট্রপতি এবং ভারপ্রাণ রাষ্ট্রপতি  
তাজউদ্দিন আহমেদ - প্রধানমন্ত্রী

সৈয়দ মনসুর আলী - অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী  
এএইচএম কামরুজ্জামান - স্বরাষ্ট্র, কৃষি, আণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী  
খন্দকার মোশতাক আহমেদ - পররাষ্ট্রমন্ত্রী

### মুজিব নগর সরকারের সচিববৃন্দ

রহমত কুদুস - মুখ্যসচিব

হোসেন তোফিক ইমাম - মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নুরুল কাদের খান - সংস্থাপনসচিব

খন্দকার আসাদুজ্জামান - অর্থসচিব

এম. এ. খালেক - স্বরাষ্ট্রসচিব

মাহাবুবুল আলম চাষী - পররাষ্ট্রসচিব

আবদুল সামাদ - প্রতিরক্ষাসচিব

ড. টি. হোসেন - স্বাস্থ্যসচিব

নুরান্দিন আহমেদ - কৃষিসচিব

আবদুল হাফাজ চৌধুরী - আইই ও সংসদ বিষয়ক সচিব

জয় গোবিন্দ ভৌমিক - আগ্রহসচিব

আনোয়ারুল হক খান - তথ্যসচিব

১৯৭১

১লা মার্চ পাকিস্তানের সামরিক সরকার নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন স্থগিত করে দেয়।

৭ই মার্চ শেখ মুজিবের রহমান ঐতিহাসিক এক ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং বলেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

মার্চের মাঝামাঝিতে সমরোতার নামে জেনারেল ইয়াহিয়া, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং আরও কয়েকজন ঢাকা আসে। আলোচনার নামে তারা কালক্ষেপণ করে এবং তার মধ্যে সামরিক হামলা ও গণহত্যার পরিকল্পনা করে। ২৫শে মার্চের মধ্যে রাত্রি থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বল্প সময়ে সবচেয়ে ভয়ংকর গণহত্যা। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্রাবাসসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং পুলিশ ব্যারাক। তাদের এই নৃশংস আক্রমণে ইপিআর এবং পুলিশ প্রাথমিকভাবে বাধা দেয়ার চেষ্টা চালায়।

## স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫শে মার্চ কালরাতের পর ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবের রহমান তার ঘেঁষারের পূর্বে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৭ এবং ২৮শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে নবনির্মিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে রেডিওতে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

## মুক্তিযুদ্ধ : ২৫ মার্চ - ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রাথমিক বাধা দেবার পর তৎকালীন সুসজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পেরে উঠেছিলো না এবং অপরদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যা করে যাচ্ছিল। যার ফলে মানুষ প্রাণভয়ে নিজেদের সবকিছু ছেড়ে পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে।

১০ই এপ্রিল স্বত্ত্বের সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচিত

সদস্যগণ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করেন।

১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়। এরপর থেকে শুরু হয় সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধ। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম এই সরকার দ্বারাই পরিচালিত হয়। একজন সেক্টর কমান্ডারের অধীনে একটি করে সারা দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। পরবর্তীতে তিনিটি নিয়মিত সশস্ত্র বিগেড, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠিত হয়।

## মুক্তিযুদ্ধের শক্তি

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত। ভারতীয় আকাশসীমা ব্যবহার করতে না পারায় পাকিস্তানীরা তাদের সৈন্য এবং যুদ্ধসরঞ্জাম বিমান পথে কলমো হয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসতো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে তাদের সহযোগীদের শাস্তিকমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস নামে সংগঠিত করেছিল। এই স্বাধীনতাবিরোধী শত্রুরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে গণহত্যা, ধর্ষণ এবং ধংসযজ্ঞের মত অমানবিক কার্যকলাপে সহায়তা করেছিল। এর বিপরীতে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুপ্রশিক্ষিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও যুবকদের সমষ্টের গঠিত স্বল্প প্রশিক্ষিত মুক্তিবাহীর সংগ্রাম সমগ্র প্রথিবীকে বিস্মিত করেছিল।

## পাকিস্তান সেনাবাহিনী

সদর দপ্তর : ইস্টার্ন কমান্ড

চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর : লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান (মার্চ - আগস্ট, ৭১), লেফটেন্যান্ট জেনারেল এএকে নিয়াজী (আগস্ট - ডিসেম্বর, ৭১)

সিভিলিয়ান অ্যাডভাইজার : মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী

চীফ অফ স্টাফ : বিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী  
রিজিওনাল কমান্ডার : মেজর জেনারেল নাজির হোসাইন শাহ, মেজর জেনারেল এম. এইচ. আনসারী, মেজর জেনারেল রহিম খান

সমর শক্তি

ডিভিশন : ৫, বিগেড : ১৩, আর্মড রেজিমেন্ট : ৩৯  
আর্টিলারি ইউনিট : ১

## মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক প্রশাসন

### দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল - ১

নুরুল ইসলাম চৌধুরী (প্রধান)  
সৈয়দ আব্দুস সামাদ (প্রশাসক)

### দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল - ২

জহর আহমেদ চৌধুরী (প্রধান)  
কাজী রকিব উদ্দিন (প্রশাসক)

### পূর্বাঞ্চল

কর্নেল এমএ রব (প্রধান)  
ড. কেএ হাসান (প্রশাসক)

### উত্তর-পূর্ব অঞ্চল - ১

দেওয়ান ফরিদ গাজী (প্রধান)  
এস. এইচ. চৌধুরী (প্রশাসক)

### উত্তর-পূর্ব অঞ্চল - ২

শামসুর রহমান খান (প্রধান), লুৎফর রহমান (প্রশাসক)

### উত্তরাঞ্চল

মতিউর রহমান (প্রধান)  
ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ (প্রশাসক)

### পশ্চিমাঞ্চল - ১

মোহাম্মদ আবদুর রহিম (প্রধান)  
এ. কাশেম খান (প্রশাসক)

### পশ্চিমাঞ্চল - ২

আশরাফুল ইসলাম (প্রধান)  
জহিরুল ইসলাম ভুঁইয়া (প্রশাসক)

### দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল - ১

আবদুর রাউফ চৌধুরী (প্রধান), শামসুল হক (প্রশাসক)

### দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল - ২

ফনিভূষণ মজুমদার (প্রধান), বি. বি. বিশ্বাস (প্রশাসক)  
দক্ষিণাঞ্চল

আবদুর রব সেরিয়াবাত (প্রধান), এ. মোমিন (প্রশাসক)

গভর্নর : লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান (৬ই মার্চ - আগস্ট, ৭১), ড. এএম মালিক (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর '৭১) চিফ সেক্রেটারি : সাইফুল আজম, কফিল উদ্দিন মাহমুদ

## স্থানীয় সহযোগী

যুদ্ধকালীন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দখলকৃত স্থানসমূহে মুসলিম লীগ, জামায়াত ইসলামী, পিডিপি, ডেমোক্রেটিক লীগের মত মৌলবাদী দল এবং তাদের ছাত্র সংগঠনসমূহ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অমানবিক এবং পৈশাচিক কার্যকলাপে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি তারা স্বাধীনতার সপ্তকের মানুষদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যা এবং সমগ্র দেশে লুটতরাজ চালায়। তারা স্বাধীনতাকামী নর-নারীদের পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিত এবং গণহত্যায় অংশ নিত।

### শাস্তিবাহিনী

গঠনকাল	এপ্রিল, ১৯৭১
আহাবায়ক	খাজা খায়রুদ্দিন
সংগঠক	গোলাম আয়ম, একিউএম শফিকুল ইসলাম, সৈয়দ মাসুদ

### রাজাকার

গঠনকাল	মে, ১৯৭১ (খুলনা)
অধ্যাদেশ	জুন, ১৯৭১
আহাবায়ক	একেএম. ইউসুফ
পরিচালক	এএসএম জহুরুল হক

### আলবদর ও আলশামস

জামায়াত ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ দ্বারা গঠিত।  
সমগ্র পাকিস্তান প্রধান, আল বদর : মতিউর রহমান নিজামী, বর্তমান আমির, জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ।  
পূর্ব পাকিস্তান প্রধান, আল বদর : আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, বর্তমান সেক্রেটারী, জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ।

## শরণার্থী

আনুমানিক এক কোটি মানুষ পাকিস্তানী হানাদার এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যা, লুটপাট থেকে বাঁচতে এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে নিজের মাত্তুমি ত্যাগ করে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতের সরকার এবং জনগন আশ্রয়, খাদ্য এবং চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। পাশাপাশি জাতিসংঘ ও আরো কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনও সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক শিশু এবং বৃক্ষ অপুষ্টি ও রোগে মারা যায়।

### শরণার্থীদের পরিসংখ্যান:

পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪,৯৩,৪৯৪  
ত্রিপুরা : ১৪,১৬,৮৯১  
মেঘালয় : ৬,৬৭,৯৮৬  
আসাম : ৩,১২,৭১৩  
বিহার ও অন্যান্য : ৮,৬৪১  
সর্বমোট : ৯৮,৯৯,৩০৫

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বল্প সময়ে দেশত্যাগের এই সংখ্যাকে সর্বোচ্চ বলে আখ্যা দেয়।

## মুক্তিবাহিনী

মুক্তিবাহিনী ছিল সাহস এবং দৃঢ়তার প্রতীক। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুপ্রশঞ্চিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত স্বল্প প্রশিক্ষিত মুক্তিবাহিনীর বীরোচিত সংগ্রাম সমগ্র প্রথিবীকে অবাক করে দিয়েছিল। প্রধানত পাকিস্তান সেনাবাহিনীত্যাগী বাংলাদেশী সদস্যরাই মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল।

২৫শে মার্চের গণহত্যা শুরুর পর পরই সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নেতৃত্বে ই.পি.আর, পুলিশ ও সাধারণ জনতা প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে তাদেরকে পিছু হটে ভারত ও সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান নিতে হয়েছিল। ৪ঠা এপ্রিল প্রাথমিক প্রতিরোধের সাথে সম্পৃক্ষ কিছু বাঙালি



## প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি

ড. জেবা মাহমুদের জবানিতে তার পিতা রাজশাহীর সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা মামুন মাহমুদ

কিছু স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং পুলিশ কর্মকর্তা তার বাসায় গোপন মিটিং করেন। কিন্তু তা গোপন ছিল না। কারণ এ মিটিং-এ কিছু রাজাকার উপস্থিত ছিল যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে মিটিং-এর খবর পৌছে দেয়।

আমার বাবা ছিলেন কোষাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। সকালে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাটেন কোষাগারে প্রবেশ

করতে চাইলে স্থানীয় পুলিশ বাধা দিলে সে আমার বাবাকে জানায়। আমার বাবা জবাবে বলেছিলেন, ‘আমার লোকজন সঠিক কাজই করেছে। কোষাগারে প্রবেশের কোন অধিকার তোমার নেই।’ এ ক্যাপ্টেন সন্ধ্যায় আবার

আসে এবং আমার বাবাকে জানায় রংপুর থেকে বিগেড়িয়ার তার সাথে কথা বলতে চায়। আমার বাবাকে সরাসরি গ্রেঞ্জারের সাহস তাদের ছিল না। তারা তাদের সাথে বাবাকে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

আমার এখনও মনে আছে বাবা জিপে করে ডাইভার এবং গার্ডসহ ক্যান্টনমেন্টে যান। তিনি আর কোনদিন ফিরে আসেননি। যে শয়তানের থাবা থেকে বাবা দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন সেই শয়তানই আমার বাবাকে চিরতরে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়।

সেনা কর্মকর্তা সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় একত্রিত হন একটি সমন্বিত লড়াই শুরুর উদ্দেশ্যে। তারা কর্ণেল এমএজি ওসমানীকে প্রধান করে মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১১ই জুলাই মন্ত্রিপরিষদ সমর্থ দেশকে একজন করে সেন্ট্রের কমান্ডারের নেতৃত্বে ১১টি সেন্ট্রের বিভক্ত করেন।

## মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী

সর্বাধিনায়ক : কর্ণেল এমএজি ওসমান  
প্রধান স্টাফ অফিসার : লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমএ রব  
উপ-প্রধান : হ্রাপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার

## সেন্ট্রসমূহ

### সেন্ট্র: ১

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল - জুন),  
মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন - ডিসেম্বর)  
সেন্ট্রের সীমানা: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মুহূরী নদীর  
পূর্বতীরবর্তী এলাকাসমূহ।  
সদর দপ্তর: হরিপুর।

### সেন্ট্র: ২

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর খালেদ মোশারফ (এপ্রিল -  
সেপ্টেম্বর),  
মেজর এটিএম হায়দার (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)  
সেন্ট্রের সীমানা: নোয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকা শহর  
এবং ফরিদপুরের পূর্বাঞ্চল।  
সদর দপ্তর: মেঘালয়।

### সেন্ট্র: ৩

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর কেএম শফিউল্লাহ (এপ্রিল -  
সেপ্টেম্বর),  
মেজর এএনএম নুরজামান (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)  
সেন্ট্রের সীমানা: সিলেট, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকা জেলার  
উত্তরাঞ্চল এবং কিশোরগঞ্জ।  
সদর দপ্তর: মানতলা (সিলেট)।

### সেন্ট্র: ৪

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত  
সেন্ট্রের সীমানা: সিলেটের কিছু অংশ।

সদর দপ্তর: খোয়াই।

### সেন্ট্র: ৫

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর মীর শওকত আলী  
সেন্ট্রের সীমানা: সিলেটের কিছু অংশ, আজমিরীগঞ্জ, লাখাই  
এর পশ্চিমাঞ্চল।

সদর দপ্তর: শিলৎ।

### সেন্ট্র: ৬

সেন্ট্রের কমান্ডার: উইং কমান্ডার এমকে বাশার  
সেন্ট্রের সীমানা: রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও।  
সদর দপ্তর: পাটগ্রাম (রংপুর)।

### সেন্ট্র: ৭

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর নাজমুল হক (জুলাই - আগস্ট),  
মেজর কাজী নুরজামান (আগস্ট - ডিসেম্বর)  
সেন্ট্রের সীমানা: রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া।  
সদর দপ্তর: তরঙ্গপুর।

### সেন্ট্র: ৮

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল -  
আগস্ট),  
মেজর এম. এ. মনজুর (আগস্ট - ডিসেম্বর)  
সেন্ট্রের সীমানা: যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর এবং খুলনার কিছু  
অংশ।  
সদর দপ্তর: কল্যাণী।

### সেন্ট্র: ৯

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর এম. এ. জলিল  
সেন্ট্রের সীমানা: বরিশাল, পটুয়াখালী এবং খুলনার কিছু  
অংশ।  
সদর দপ্তর: হাসনাবাদ।

### সেন্ট্র: ১০

এই সেন্ট্রটি নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

### সেন্ট্র: ১১

সেন্ট্রের কমান্ডার: মেজর এম. এ. তাহের (আগস্ট - নভেম্বর),  
ক্ষেয়াজ্জন লিডার হামিদুল্লাহ (নভেম্বর - ডিসেম্বর)  
সেন্ট্রের সীমানা: টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহের কিছু অংশ।  
সদর দপ্তর: মহেন্দ্রগঞ্জ।

## প্রত্যক্ষদৰ্শীর জবানবন্দি

### সংবাদকর্মী নাদিম কাদেরের ভাষায় তার বাবা চট্টগ্রামের কর্ণেল কাদের

একদিন খুব ভোরে একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন তার  
বাহিনী নিয়ে আমাদের বাসায় এসে আমার বাবাকে বলে,  
'তুমি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে আমি  
সম্মান দেখতে পারছি না। তুমি একজন বিশ্বাসযাতক,  
তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।' তারপর থেকে  
সকল তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বাবাকে সর্বত্র খুঁজি কিন্তু

আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত  
আমার মা তার জন্য অপেক্ষা করেন। আমরা তার লাশ  
দেখিনি তাই সবসময় এই আশায় থাকি যে তিনি একদিন  
ফিরে আসবেন।

আমার বাবার একমাত্র অপরাধ ছিলো তেল এবং গ্যাসকুপ  
খননের জন্য প্রয়োজনীয় বিক্ষেপক যে গুদামে ছিল, তার  
চাবি আমার বাবার কাছে থাকতো এবং পাকিস্তানী  
সেনাবাহিনী জোরপূর্বক সেই গুদাম খুলে তারা কোন  
বিক্ষেপক পায়নি। তিনি সব বিক্ষেপক মুক্তিযোদ্ধা মেজর  
রফিকের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। এই বিক্ষেপকগুলো  
মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করতো।

### খুলনার মুক্তিযোদ্ধা সালাম খানের মুখে তার চার মাসের শিশু রেহানা

চার মাসের শিশু রেহানাও ছিল পাকিস্তানী বাহিনীর  
নৃশংসতার শিকার। তার অপরাধ ছিলো সে মুক্তিযোদ্ধা  
আবদুস সালাম খানের কন্যা। ৩০শে এপ্রিল পাকিস্তানী  
বাহিনী তার বাড়ীতে হানা দেয়। কিন্তু আবদুস সালামকে  
না পেয়ে তারা রেহানাকে বুটের তলায় পিষ্ট করে হত্যা  
করে।

প্রথমদিকে মুক্তিবাহিনী শত্রুদের সামরিক ঘাঁটি, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের উপর গেরিলা আক্রমণ চালাত। জুলাই মাস থেকে তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। ব্রিগেডগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল কমান্ডারদের নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে।

### ব্রিগেডসমূহ

জেড ফোর্স	কমান্ডার : লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান
এস ফোর্স	কমান্ডার : লে. কর্নেল কে. এম. শফিউল্লাহ
কে ফোর্স	কমান্ডার : লে. কর্নেল খালেদ মোশারফ

### বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী

ফাসের তুলন বন্দরে পাকিস্তান সাবমেরিন 'ম্যাংগ্রো'তে প্রশিক্ষণরত ৮ জন বাংলাদেশী সাবমেরিনার ৩১শে মার্চ পালিয়ে ভারতে চলে আসে। প্রাথমিকভাবে তারাই-বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল এমএজি ওসমানীর তত্ত্বাবধানে সেক্টর ১০ এর অধীনে রাখা হয়।

পলাশীর ভাগিরথী নদীর তীরে ২৭শে মে থেকে ৬ই আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ৩১৫ জন নৌ কমান্ডোর প্রথম দলটি প্রশিক্ষণ নেয়। সর্বমোট ৪৯০ জন নৌ কমান্ডো প্রশিক্ষণ নিয়েছিল।

এদের মধ্য থেকে ১৬০জন নৌ কমান্ডো আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে চৃত্তগাম, মৎস্য, চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জে 'অপারেশন জ্যাকপট' এ অংশ নেয়। এই দৃঃসাহসিক অভিযানে ২৬টি জাহাজ ধ্বংস করা হয়েছিল। অন ইন্ডিয়া রেডিওতে দুটি বিশেষ গান প্রচার করে এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের সংকেত দেয়া হতো।

### বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

নাগালদ্দের ধীমাপুর বিমান ঘাঁটিতে ১৯৭১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য। গ্রন্তি ক্যাপ্টেন একে খন্দকারকে প্রধান করে ১০ জন পাইলট, ৬৭ জন টেকনিশিয়ান, ১টি ডিসি-৩ ডাকোটা, ১টি ওটার এবং ১টি এলিমেট হেলিকপ্টার নিয়ে গঠন করা হয় এই বাহিনী। ৩৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গোদানাইল এবং চট্টগ্রামের তেল পরিশোধনাগার আক্রমণ করে।

### অন্যান্য বাহিনী

মুজিব বাহিনী - প্রধান : শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ।

ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ, সিপিবি - প্রধান : মোহাম্মদ ফরহাদ কাদেরিয়া বাহিনী - প্রধান : কাদের সিদ্দিকী হেমায়েত বাহিনী - প্রধান : হেমায়েত উদ্দিন আফসার ব্যাটেলিয়ন - প্রধান : মেজের আফসার উদ্দিন আহমেদ।

### আন্তর্জাতিক দ্রষ্টিভঙ্গি

বিংশ শতাব্দীর সপ্তাহে পুরো বিশ্বে দুই প্রারম্ভিক আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপনিরবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। এমতাবস্থায় জাতিসংঘের কতিপয় সিদ্ধান্তকেও প্রভাবাত্মিত করে। এর সাথে বাংলাদেশ সরকারও কূটনৈতিক চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

### ভারত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে ভারতের ভূমিকা অনন্বিকার্য।

১. লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর খাবার, আশ্রয় ও চিকিৎসাসেবা দিয়ে সহায়তা করে।

২. রাজনীতিবিদ, পেশাজীবি, সামাজিক সংগঠন, প্রচারমাধ্যম এবং জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন করতে সহায়তা করে। বুদ্ধিজীবি এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগত বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ক্যাম্পেইন করে।

৩. ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করে।

৪. ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ভারত। বাংলাদেশের যৌথ কমান্ড এবং ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ড একসাথে আক্রমণ শুরু করে এবং ফলশ্রূতিতে ১৬ই ডিসেম্বর যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

### সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতাত্ত্বিক দেশসমূহ

স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত ফলাফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতাত্ত্বিক দেশসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি

বড় ভাই সৈয়দপুরের ড. শামশেদ আলী সম্পর্কে আফতাব আহমেদ

সৈয়দপুরের উভরে একটি বাস্পীয় ইঞ্জিন ছিল যেখানে মৃতদেহগুলো পুড়িয়ে ফেলা হতো। গ্রেণারের পরে আমার

ভাইকে সেই ইঞ্জিনের কাছে একটি গর্তের পাশে গুলি করার জন্য নেয়া হয়। মির্জা নামক একজন বিহারীকে এই হত্যার দায়িত্ব দেয়া হয়। গুলি করার সময় আমার ভাই রাইফেলটি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। এরপর তারা আমার ভাইকে হত্যা করে বাস্পীয় ইঞ্জিনে তার মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু তার বিশাল শারীরীক আকৃতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। তখন

তারা তার দু-হাত, দু-পা কেটে ফেলে তার শরীরটি পুড়িয়ে ফেলে। আমরা দাফনের জন্য তার দেহটি পাইনি।

### প্রত্যক্ষদর্শী লেখক হুমায়ুন আহমেদের ভাষায় ফিরোজপুর

পাকিস্তানী সেনাসদস্যরা বন্দীদের খেজুর গাছে চড়তে বলে। এরপর তারা তদের গুলি করে মাটিতে ফেলে এবং আনন্দে উল্লাসিত সেনাসদস্যরা খেজুর খুঁজে খাচ্ছিল। আমি শুনতে পেলাম ভগিনী নামক একজনকে চলাত্ত জিপের সাথে বেঁধে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। প্রতিদিন নদীতে মৃতদেহ ভাসতে দেখতাম। চিল শকুন দেখতাম মৃতদেহের জন্য অপেক্ষায় বসে আছে। কিন্তু এইসব মৃতদেহের প্রতি তাদেরও আর উৎসাহ ছিল না। কোন শকুনকেই সেদিন কোন মৃতদেহের উপর বসতে দেখিনি। সেদিন দেখেছিলাম ৩০-৩৫ বৎসরের সবুজ শার্ট পরা মধ্যবয়স্ক একজন পুরুষ এবং ৭-৮ বৎসরের এক মেয়ের তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তার হাতে তখনও মেহেদির রং ছিল।

তৰা এপ্রিল ১৯৭১ : সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেণারের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি দেন।

জুন-জুলাই ১৯৭১ : স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন চেয়ে বাংলাদেশ থেকে একটি দল সোভিয়েত ইউনিয়ন, গোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং জার্মানি সফর করে।

৯ই আগস্ট ১৯৭১ : ভারত-সোভিয়েত শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার সার বিষয় ছিল, এদের যেকোন একটি দেশের উপর হামলা হলে অপর দেশ এগিয়ে আসবে। এই চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন দেয়। সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য পোলান্ড বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়।

#### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সেসময় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন রিচার্ড নিক্সন এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন হেনরী কিসিঙ্গার।

#### সরকার :

১. নিক্সন প্রশাসন কখনোই পাকিস্তানীদের গণহত্যা এবং পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি।

২. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোয়, যা যৌথবাহিনী খুব গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং জয়ের পথে একধাপ এগিয়ে যায়।

#### প্রচারমাধ্যম এবং ব্যক্তিত্ব :

কিছু নেতৃস্থানীয় সিনেটর, কংগ্রেস সদস্য, বুদ্ধিজীবি, কৃটনেতৃক এবং শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র পাকিস্তানী বর্ষরতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

১. ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আর্চার কে. ব্লাড তার আরও ২০ কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ সরকারের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে চিঠি দেয়।

২. এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৫ জন সিনেটর পাকিস্তানের এই অপকর্মের বিপক্ষে এবং পাকিস্তানের ওপর সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

৩. সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ভারতে শরণার্থী শিবির সফর করেন এবং পাকিস্তানি গণহত্যার নিন্দা জানান।

৪. ভয়েস অফ আমেরিকা এবং কিছু সংবাদপত্র নিয়মিত পাকিস্তানের মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার ব্যাপারে এবং মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযানের কথা প্রচার করে। যা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

#### ইউরোপ

১. ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অত্যাচারের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়।

২. ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের জনসভায় লর্ড ব্রুকওয়ে এবং পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর, মাইকেল বার্নস এবং জন স্টেনহাইস বক্তব্য রাখেন।

৩. ফাসের বিখ্যাত দার্শনিক আন্দো মার্লো তার বার্ধক্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

৪. জার্মানির এশিয়ান স্টাডিও অধ্যাপক ওয়াইডম্যান পূর্ব পাকিস্তানের ধৰংসলীলা বন্দের পক্ষে বিবৃতি দেন।

৫. ইউরোপের বেশিরভাগ প্রচারমাধ্যম গণহত্যার প্রকৃত ছবি এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার করে।

#### চীন

১. চীন সরকার পাকিস্তান স্বেরশাসকদের নেয়া পদক্ষেপ সমর্থন করে।

২. চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রে মূলত পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত সহায়তা করে।

৩. ১৯৭১ সালের ১লা নভেম্বর ইয়াহিয়া খান রেডিওতে এক ভাষণে বলেন, চীন পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত সহায়তা অব্যাহত রাখবে এবং যদি ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে তবে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেবে।

#### জাপান

১. কিছু জাপানি রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সংবাদপত্র পাকিস্তানের চরম অমানবিক আচরণের বিরোধিতা করে।

২. পার্লামেন্ট সদস্য কে. নিশ্চয়ুরা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত বলে মন্তব্য করেন।

## প্রত্যক্ষদশীর জবানবন্দি

জগন্নাথ হল - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যক্ষদশী কালি রঞ্জন শীলের মুখে ২৫শে মার্চের কালরাত্রি

তারা আমাদেরকে মৃতদেহগুলো তুলে গাছের নিচে জড়ে করতে নির্দেশ দিল। এরপর আমাদেরকে ছোট ছোট গুপ্তে ভাগ করা হয় এবং আমাদের গুপকে শিক্ষকদের আবাসিক

এলাকায় নিয়ে যায় যেখানে ডঃ গুহ্যাকুরুতা বাস করতেন। সেখানে সিঁড়ির নিচে আমরা বেশকিছু মৃতদেহ দেখতে পাই। আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না ঠিক কতগুলো মৃতদেহ আমরা সেখান থেকে সরিয়ে ছিলাম।

তবে আমি এটা মনে করতে পারছি যে শেষ মৃতদেহটা ছিল এ রাতের প্রহরী সুনীলের। তার শরীর তখনও গরম ছিল। এটা হতে পারে তাকে মেরেছিল বেশিক্ষণ হয়নি

অথবা উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে। আমি যখন তার মৃতদেহ মাঠের মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি কাছের বস্তিতে মহিলাদের কানার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। সেই মহিলারা মাঠে আসতে চাচ্ছিল এবং পাকিস্তানী সেনাসদস্যরা তাদের গুলি করার ভয় দেখিয়ে বাঁধা দিচ্ছিল। আমি দেখতে পাই আমাদের গুপ থেকে আলাদাকৃত বাড়ুদারের গুপকে এলোপাথাড়ি গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি চোখের সামনে দর্শনের অধ্যাপক

ডঃ গোড় গোবিন্দ দেবের অর্ধ-উল্লেগ মৃতদেহ দেখতে পাই, যাতে নির্মল অত্যাচারের চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

আমাকে যে ছেলেটি সাহায্য করছিল সে বললো, তারা ডঃ দেবকেও হত্যা করেছে। তাহলে আমরা আর মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি কেন? আমি ক্লান্ত শরীরে সুনীল এবং ডঃ দেবের মৃতদেহের মাঝে শুয়ে পড়ি।

## প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভূমিকা

পাকিস্তান শাসনামলে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে খুব কম সংখ্যক বাঙালি উচ্চশিক্ষা, চাকরি অথবা ব্যবসার জন্য বিদেশ যেতে পারতো ।

তারপরও এই স্বল্প সংখ্যক বাঙালি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলেছিল । তারা পুরো বিশ্বকে জানাতে চেয়েছিল কিভাবে পাকিস্তানীরা বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে । পাশাপাশি তারা বাঙালি শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে ।

### যুক্তরাজ্য

১. যুক্তরাজ্যের প্রধান শহরগুলোতে বড় বড় র্যালি ও সভার আয়োজন করা হয় । লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে ৪ঠা এপ্রিল ও ১লা আগস্ট এবং হাইড পার্কে ১৯শে জুন বড় আকারে সম্মেলন করা হয় । র্যালি থেকে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেয়া হয় ।

২. সভায় বাংলাদেশীদের পাশাপাশী লর্ড ব্রুকওয়ে, পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর, জর্জ স্টেন, মাইকেল বার্নস ও বাংলাদেশীদের প্রতি সহমর্�্মিতা প্রকাশ করে ভাষণ দেন ।

৩. ২৪শে এপ্রিল পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় যার দায়িত্ব দেয়া হয় (পরবর্তীতে বিচারপতি) আবু সাঈদ চৌধুরীকে । এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইন করা ।

৪. ব্রিটেনে পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত কিছু বাঙালি কূটনৈতিকের চাকরি ছেড়ে এই ক্যাম্পেইনে যোগ দেন ।

### ভারত

১. রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্যাম্পেইনে যোগ দেন ।

২. কলকাতা এবং নয়া দিল্লীতে অবস্থিত পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিরা পাকিস্তানের বিরোধিতা করে এবং ভারত ক্যাম্পেইনে যোগ দেন ।

৩. শিল্পীরা শরণার্থী শিবির এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে তাদের সাহস যোগান ।

৪. চিকিৎসকরা শরণার্থী শিবির এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে সাহায্য করে ।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

১. ১৯৭১ সালের ২৯শে মার্চ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালিরা ওয়াশিংটনের ক্যাপিটেল হিলে সম্মেলন করে । তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিন্সন এবং জাতিসংঘের সচিব ইউ. থান্টের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন ।

২. যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ২২জন বাঙালি পদত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে ক্যাম্পেইনে যোগ দেন । তাদের কার্যক্রম ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বুদ্ধিজীবি, চিন্তাবিদ এবং সিনেটরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা । ফলশুতিতে ৪৫ জন সিনেটর এবং কংগ্রেস সদস্য পাকিস্তানের বর্বরতার বিরোধিতা করে বিস্তৃত দেন ।

### জাপান

জনাব এসএ জালাল তার সহকর্মীদের নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ক্যাম্পেইন চালিয়ে যান । তারা জাপানের প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদ, গবেষক এবং বুদ্ধিজীবিদের সমর্থন পান এবং জাপানের সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশের পক্ষে খবর প্রকাশ করে ।

### গণহত্যা

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরোরা ১৯৭১ এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বিচারে গণহত্যা, অত্যাচার, ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ চালায় । আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ লোক তাদের হাতে শহীদ হয় ।

দুই থেকে চার লক্ষ নারী তাদের হাতে শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই ছিল স্বল্পতম সময়ে নৃশংসতম গণহত্যা । বাংলাদেশের কোনো গ্রাম এবং শহর তাদের এই ধৰ্বসংলীলা থেকে রেহাই পায়নি ।

## প্রত্যক্ষদশীর জবানবন্দি

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অরূপ দের মুখে তার বাবা মধুসুখন দে

২৫শে মার্চের মধ্যরাত থেকেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম সেনাবাহিনী জগন্নাথ হল ঘিরে রেখেছিল । চারদিকে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল । খুব ভোরে আমরা শুনতে পাই কয়েকজন আমাদের দরজা নক করছে । তারা ঢুকেই আমার বাবাকে গুলি করার জন্য দাঁড়াতে বলে । তখন আমার মা তার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁধা দিলে তারা আমার মায়ের হাত কেটে ফেলে । আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং এই এই নৃশংসতা দেখে দরজা বন্ধ করে দেই । তারা লাথি দিয়ে দরজা খুলে ফেলে ।

আমি দেখতে পাই মা তখনও বাবার শরীরের উপর পড়ে আছেন আর সেনাসদস্যরা তখনও গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল । কিছুক্ষণ পরে বাবা দরজার দিকে এগোতে চান কিন্তু তিনি তার ডান হাত এবং পা নাড়াতে পারছিলেন না । বাবার পিঠে বিদ্ধ গুলি দেখে আমি তা বের করি । তখনও বাবার প্রাণ ছিলো ।

আমার মা, ভাই এবং তার স্ত্রীর মতদেহ ১০-১২ দিন ধরে আমাদের ঘরেই পাঁচছিলো । পরে প্রতিবেশীরা পৌরসভার লোক ডেকে তা পরিষ্কার করায় । অবশ্য এটা আমি পরে শুনেছি ।

### ঢাকার শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর মুখে তার স্বামী ডা. আলীম চৌধুরী

তুরা ডিসেম্বর যখন ঢাকায় প্রচল আক্রমণ হয় তখন আমরা হাসপাতালে আশ্রয় নেবার পরিকল্পনা করছিলাম । কিন্তু মাওলানা আব্দুল মান্নান যাকে আমরা আমাদের নিচের তলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম সে বারবার আমাদেরকে থাকার জন্য আশ্বস্ত করছিল এবং আলীম তাকে বিশ্বাস করেছিল । ১৪ই ডিসেম্বর

রাতে কারা যেন দরজায় নক করে । আমি যখন আলীমকে জিজ্ঞেস করলাম তখন সে আমাকে খুলতে বলে নিজে মাওলানা মান্নানের দরজার দিকে দৌড়ে যায় । সে মান্নানের দরজা নক করতে থাকে কিন্তু সে দরজা না খুলে বরং বলে তাদের সাথে চলে যেতে, সে পরে সাহায্য করবে । সে মান্নানের মিথ্যা কথায় আশ্বস্ত হয়ে তাদের সাথে যায় । আমি তখনও আলীমকে ফিরিয়ে আনার জন্য মাওলানা মান্নানকে অনুরোধ করছিলাম ।

কিন্তু সে আমার দিকে ফিরেও দেখলো না । আলীমকে নিয়ে যাওয়া গাড়ীর আওয়াজ পাই । আমি কানায় ভেঙ্গে পড়ি । তখন সে আমাকে অভয় দিয়ে বলে তার ছাত্রারা আলীমকে চোখের চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেছে । অবশ্যে ১৪ই ডিসেম্বর আমি তাকে খুঁজে পাই । তার মৃতদেহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের সাথে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে পড়ে থাকে । ডা. রাবি, আলীম, লাদু ভাই এবং আরও অনেকের মৃতদেহ ছিল একসাথে ।

## মুক্তিযুদ্ধ এবং নারী

৭১ এ সর্বত্রই নারীরা পাকিস্তানী বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়। রাজাকার, আলবদর, আল শামস এবং শান্তি কমিটির সদস্যরা নারীদের ধরে নিয়ে পাকিস্তানী পশ্চদের হাতে তুলে দিত।

অনেকভাবে মুক্তিযুদ্ধে নারীরা অবদান রাখে-

১. ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত গণতন্ত্রের পক্ষে পাকিস্তানের সকল আন্দোলনেই নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল।
২. মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে এবং সময়ে সময়ে তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখে নারীরা যে সাহায্য করেছিল তা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনেকাংশে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায় করে।
৩. নারীরা সরাসরিও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে বিশেষ গোবরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৪. মহিলা চিকিৎসকরা শরণার্থী শিবিরে এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে।
৫. মহিলা শিল্পীরা রেডিওতে, শরণার্থী শিবিরে এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে তাদের উৎসাহ দেয়।
৬. কিছু বিদেশী নারী বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন দেশে ক্যাম্পেইন করে।

## মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিকমীরা

গণতন্ত্র ও স্বাধিকার আন্দোলনের সাথে সাথে বাংলার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছিলো পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিকমীরা।

১. ১৯৬৭ সালে যখন পাকিস্তান সরকার গণমাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত বন্ধ ঘোষণা করে তখন সংস্কৃতিকমীরা সংগঠিতভাবে এর বিরোধিতা করে।
২. ২৫শে মার্চের গণহত্যার পরে অনেক কবি, সাহিত্যিক তাদের লেখনীর মাধ্যমে এর বিরোধিতা করেন এবং নয় মাস ধরে তা চালিয়ে যান।
৩. শিল্পীরা শরণার্থী শিবির, মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস যোগাতেন।

৪. অংকন শিল্পীরা পোস্টার এবং ব্যানার তৈরি করেন।
৫. চিত্রনির্মাতাগণ স্বাধীনতার উপর চলচ্চিত্র তৈরি করেন।
৬. মঞ্চশিল্পীরা বিভিন্ন নাটক লিখে তা পরিবেশন করতেন।

## বিদেশী সংস্কৃতিকর্মী

১. পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পী এবং সাহিত্যিকর্মী বাংলাদেশীদের পক্ষে জনমত গঠন এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য সহায়ক কমিটি গঠন করেন।
২. ভারতের প্রথম সারির শিল্পীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন।
৩. আমেরিকার ম্যাডিসন ক্ষয়ারে জর্জ হ্যারিসন, পদ্মিত রবিশংকর, আকবর আলী খান এবং অন্যান্যরা মিলে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট আয়োজন করে। সেই কনসার্ট তারা বাংলাদেশের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায় এবং শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে।
৪. আমেরিকার বিখ্যাত কবি অ্যালান গিল্বার্গ শরণার্থী শিবিরে বাংলার সাধারণ মানুষের কর্ম অবস্থা দেখে তার বিখ্যাত "September on Jessore Road" কবিতা লিখেন।

## বাংলাদেশের অভ্যন্তর্যামী প্রচার করেন

সর্বস্তরের জনসাধারণ সমর্থিত বাংলার সাহসী সন্তানদের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস পর্যন্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয় ডিসেম্বর ১৯৭১, পাকিস্তান ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ করে। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড মিলে যৌথবাহিনী গঠিত হয়। যৌথবাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করে।

অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নিকট পাকিস্তানী লে. জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। ঐ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান গুপ্ত ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন। এভাবেই বিশ্ব মানচিত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তর্যামী প্রচার করতে সহায়তা করে।

সূত্র : মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, ঢাকা।

## মুক্তিযুদ্ধে প্রচারমাধ্যম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্ব প্রচারমাধ্যম বেশ তাংপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পূর্ব পাকিস্তানের বেশিরভাগ সংবাদপত্র স্বাধীনতার চেতনায় উন্নৰ্দেশ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মিত্র ছিল। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বিশ্ব জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্থানীয় সংবাদকর্মীরা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এবং বাক স্বাধীনতার পক্ষে তাদের সাহসী ভূমিকা রেখে আসছিলেন।

ফলশ্রুতিতে অসংখ্য সংবাদকর্মী নির্যাতন ও কারাভোগ করেন এবং কিছু কিছু সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পরাজয় নিশ্চিত জেনে রাজাকার এবং আলবদর বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানী বাহিনী প্রচুর সংখ্যক প্রসিদ্ধ সংবাদকর্মীদের হত্যা করে।

২৫শে মার্চের গণহত্যা শুরুর পর থেকে বেশকিছু বিদেশী সাংবাদিক তাদের জীবনের বুঁকি নিয়ে গণহত্যা এবং ধর্মসংঘর্ষের সংবাদ প্রচার করেন।

স্বাধীনতার দীর্ঘ নয় মাস ধরে ভারত, যুক্তরাজ্যে ও ইউরোপের আরো কিছু দেশ, জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহ পাকিস্তানীদের অমানবিক নশস্তা এবং মুক্তিবাহিনীর সাহসী সংগ্রামের ওপর নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রচার করতে থাকে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিশ্বজনমত গঠনের জন্য বিবেক জাগৰিত করে। যা বিজয় ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।

১৯৭১ এ গণমাধ্যমের এই ভূমিকা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিপক্ষে গণমাধ্যমের অবস্থানের একটি উজ্জ্বল দ্রষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

# কেইস স্টাডি : জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ

## এক্সিমো

বিংশ শতাব্দীর গণহত্যাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১ এর ধ্বংসলীলার মাধ্যমে সংঘটিত গণহত্যা শতাব্দীর সবচেয়ে নিবিড় গণহত্যাগুলো যেমন সোভিয়েট যুদ্ধবন্দি হত্যা (১৯৪১-৪২), ইত্তি হলোকাস্ট (১৯৩৩-৪৫) বা রুয়ান্ডার গণহত্যার (১৯৪৪) মতো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই চার গণহত্যা এই শতাব্দীর সবচেয়ে ন্যূন্য ঘটনাগুলোর অন্যতম। ততকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী শক্তিকে ধ্বংসের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে।

### ১. পিছনের কথা

জাতি, ধর্ম অনুসারে দেশবিভাগের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধি ও অন্যান্যদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বৃত্তিশ ও তৎকালীন উপমহাদেশের রাজনীতিবিদের কারণে ধরে ভিত্তি দুইটা দেশ গঠন করা হলে সংখ্যালঘুরা আদি নিবাস ছেড়ে অন্য প্রান্তে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয় আর সেই সাথে শুরু হলো ধর্মগত দাঙ্গা। পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তানীদের উপরে জোর জুলুম চালানোর কারণে ধীরে ধীরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। ভাষা নিয়ে ১৯৫২ সালে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন। এরপর ১৯৭০ সালের আগস্টের বন্যায় তাগের অপ্রতুলতা ও নানাভাবে প্রতিনিয়ত বখন বাঙালিদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাবের জাগরণ ঘটায়। ফলশুতিতে ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। সেই সময়ের অন্যতম দাবী ছিল স্বায়ত্ত্বাসন ও মিলিটারি শাসনের অবসান। এই আন্দোলন আন্তে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ফলশুতিতে ১৯৭১ সালের ২২ এ ফেব্রুয়ারি পাকি জাত্তি আওয়ামী লীগের নেতা ও সর্বোচ্চকর্তৃত উপরে একটি ক্র্যাকডাউনের পরিকল্পনা করে।

সামরিক সরকারের প্রধান ইয়াহিয়া খান ফেব্রুয়ারী '৭১ এ একটি কনফারেন্সে ঘোষণা দেয় - “আমরা ওদের মধ্যে ৩০ লক্ষ শেষ করে দেব আর বাকীরা আমাদের কাছে জীবন ভিক্ষা চাইবে”।

(রবার্ট পাইন, ম্যাসাকার, পৃষ্ঠা ৫০)।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এই উক্তি থেকে সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, পাকিস্তানী শাসকচক্র তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের দমনের জন্যে একটা গণহত্যার পরিকল্পনা করেছিলো।

অবশ্যে ২৫ এ মার্চ শুরু হয় সেই ইতিহাসের নির্মম ঘটনার। পাকি মিলিটারি আক্রমণ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ইগ্রিজার ও অন্যান্য এলাকা। মানুষকে পাখির মত গুলি করে মারা শুরু হলো। এক রাতেই ৭০০০ জনের মত হত্যাগ্য বাঙালি মারা যায়। সেইটা ছিলো শুধুমাত্র শুরু।

“এক সঙ্গের মধ্যে ঢাকায় অর্ধেক অধিবাসী পালিয়ে যায় এবং কমপক্ষে ৩০,০০০ এর মত নিরন্ত্র মানুষ নিহত হয়। চট্টগ্রাম ও তার অর্ধেক জনসংখ্যা হারায়। সেই সময়ে (এপ্রিলের উপাত্ত অনুযায়ী) ৩০ মিলিয়নের মত মানুষ হত্যাকারে মত দিশেহারা হয়ে দেশের ভিতরেই স্থানান্তর হয়ে মিলিটারিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছিলো।” (রবার্ট পাইন, ম্যাসাকার, পৃ. ৪৮)।

অবশ্যে ১০ মিলিয়ন বাঙালি ভারতে পালিয়ে শরণার্থী হয়। উল্লেখ্য, তখন সেই ভূত্যন্দের সর্বমোট জনসংখ্যা ছিলো ৭৫ মিলিয়ন।

অবশ্যে এপ্রিলের ১০ তারিখে আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ধীরে ধীরে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হতে থাকে এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই শুরু করে। প্রাথমিকভাবে দেশের ভূপ্রকৃতি ও জনগণের সহায়তায় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হলেও পরে জনসমর্থনের কারণে একটা গণযুদ্ধে পরিণত হয়।

### ২. বাঙালী পুরুষদের বিরুদ্ধে “জেন্ডারসাইড”

জেন্ডারসাইড বলতে বুঝায় নির্দিষ্ট লিঙ্গের মানুষের গণহত্যা। ১৯৭১ সালের গণহত্যাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

#### ২.ক. পুরুষ মানুষের প্রতি আক্রমণ

এই গণহত্যার নির্দিষ্ট কিছু টার্গেট ছিলো। এছন্তি

মাসকারেনহাসের মতে ‘গণহত্যার লক্ষ্য নিয়ে কোন দ্বিদৰ্শন ছিলো না।’ (অ্যাস্থনি মাসকারেনহাস, দা রেইপ অফ বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭)

তার মতে, গণহত্যার লক্ষ্য ছিলো যথাক্রমে-

১. সেনাবাহিনীতে চাকরিত বাঙালী জওয়ান, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ

২. হিন্দু - আর জে রুমেল কুমিলাতে নিজ কানে শোনেন যে মিলিটারিও বলছিলো, “আমরা শুধু ছেলেদের হত্যা করার জন্য এসেছি, মহিলা ও শিশুরা নিরাপদ, আমরা কি কাপুরূষ যে তাদের হত্যা করবো” (ডেথ বাই গৰ্ভন্যেন্ট, পৃষ্ঠা ৩২৩)। তাঁর মতে মিলিটারিও নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করাকে নায়কেচিত কাজ বলে মনে করছিল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই পুরো পরিবার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল।

৩. আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও সমর্থক।

৪. ছাত্র - কিশোর ও তরুণ বয়সীদের প্রতিও পাকি মিলিটারিও নির্মম আক্রোশ দেখা গিয়েছিলো। তারা অক্ষয়সী কাউকে দেখলেই মুক্তিবাহিনী বলে মনে করত এবং নির্বিচারে তাদের হত্যা করে। আর জে রুমেলের বর্ণনায় অসংখ্য কিশোর ও তরুণদের মৃত্যদেহ দেখা গিয়েছিল মাঠে, নদীতে ভাসমান অবস্থায় বা আর্মি ক্যাম্পের আশেপাশে।

৫. বাঙালী বুদ্ধিজীবি - শিক্ষক ও অধ্যাপকদের মধ্যে সেনাবাহিনীর দ্রষ্টিতে যাদের “সংগ্রামী” মনে হয়েছে, তাদেরকেই হত্যা করা হয়েছে (অ্যাস্থনি মাসকারেনহাস, দা রেইপ অফ বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭)

অ্যাস্থনি মাসকারেনহাসের লেখার সারমর্ম এই যে, হত্যাকাণ্ডের সাথে লৈঙ্গিক ও সামাজিক শ্রেণীর (বুদ্ধিজীবি, অধ্যাপক, শিক্ষক, নেতা/কর্মী, এবং মুক্তিসংগ্রামী প্রায় সবাই পুরুষ ছিলো)। অনেক ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের পরিবারের সদস্যদেরও হত্যা করা হয় শুধুমাত্র পারিবারিক বা রক্তের সম্পর্কের কারণে।

এই সব বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক একটা জেন্ডারসাইড সংগঠিত হয়েছে।

ড. রওনক জাহানের মতে - “মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাব্য যোদ্ধা হিসাবে যুবকদের প্রেক্ষাতার ও নির্যাতন চালায় আর্মি - পরে অধিকাংশকে হত্যা করা হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে শহর ও উপশহরগুলো যুবকশূন্য হয়ে যায়। তাদের অনেকে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয় অথবা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়।”

“সক্ষম যুবকদের মধ্যে যাদের খাতনা করা হয়নি তাদের জন্যে মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়।” (জেনোসাইড অব বাংলাদেশ, আর জে রোমেল, পৃষ্ঠা ২৯৮)

রোমেল আরো বলছেন, ‘পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দ্রষ্টিতে প্রতিরোধ যুদ্ধে যেতে সক্ষম কিশোর যুবকদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালায় - সেই অভিযানে ধৃত যুবকদের আর কখনও জীবিত অবস্থায় দেখা যায়নি। তাদের মৃতদেহগুলো ভাসতে দেখা গেছে নদীতে, সেনা ক্যাম্পের কাছে। এই অভিযানে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলো সকল যুবক আর তাদের পরিবারবর্গ। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৫ থেকে ২৫ বছরের সকল যুবক গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে বেড়িয়েছে - যাদের অনেকে ভারতে চলে গিয়েছিলো। যারা বাড়ি ছাড়তে চাইছিলো না - তাদের মা বা বোনেরা তাদের জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে - যাতে তাদের জীবন রক্ষা পায়।’ (দেখ বাই গভর্নমেন্ট)

রোমেলের বর্ণনা মতে (পৃষ্ঠা ৩২৩) এই গাহিম করা গণহত্যার উৎসবটি অনেকটা নাজীদের “পুরুষ নির্ধন” কর্মসূচির সাথে তুলনীয় - ‘এটা ছিলো প্রদেশব্যাপী একটা গণহত্যা, যেখানে হিন্দুদের আলাদা করে হত্যা করা হয়েছে - সেই প্রক্রিয়ায় সেনাসদস্যরা ধৃত ব্যক্তিদের খাতনার বিষয়টা নিশ্চিত হতো - যা মুসলমানদের জন্যে বাধ্যতামূলক - যদি খাতনা করা থাকতো - তাহলে হয়তো তাৎক্ষণিক মৃত্যু এড়ানো যেত।’

রবার্ট পাইন ঢাকা শহরের আশেপাশে গণহত্যার স্থানগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেইগুলোকে পরিকল্পিত গণহত্যা - বিশেষ করে লৈসিক” গণহত্যার একটা ক্লাসিক উদাহরণ হিসাবে দেখেন - যা লিঙ্গভীতিক ও নিরন্তর মানুষের উপর সংগঠিত হয়ে ছিলো বলা হয়।

“ঢাকা ও তার আশেপাশে নির্জন প্রান্তগুলোতে মিলিটারি জাতা গণহত্যার এক্সপেরিমেন্ট চালায় (বিশেষ করে পুরুষদের উপরে) যাতে করে সাংবাদিকদের চোখ এড়িয়ে যায় এই ঘটনাগুলো। বুড়িগঙ্গার তীরে হরিহারা পাড়াতে এইরকম তিনটা প্রমাণ রবার্ট পাইন আবিষ্কার করেন একটি বন্দীশালা (নদী তীরবর্তী গোড়াটন), মৃত্যুদণ্ড দেবার জায়গা (নদীর তীরে) ও তাদের লাশ

ধামাচাপা দেবার উপায় (নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে)। ছয় থেকে আট জন বন্দীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাতের আধাৰে মেরে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে রাতের পর রাত। পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানীর গোড়াউনটি ছিল নদীর ধারে - সেখানে প্রতিরাতে দলে মানুষ ধরে আনা হতো - আট দশজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর অল্প পানিতে নামিয়ে গুলি করা হতো। ভোরে কোন নৌকার মাঝিকে দিয়ে ভাসমান লাশগুলোর দড়ি কেটে আলাদা করে দিয়ে নদীর মাঝে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো - যাতে স্থানের টানে লাশগুলো আলাদা আলাদাভাবে ভেসে যায় (রবার্ট পাইন, ম্যাসাকার, পৃষ্ঠা ৫৫)।

উপরের বর্ণনা থেকে এটা বলা যায় যে, এই হত্যাকাণ্ডগুলো আর্মেনিয়া ও নানজিং (১৯৩৭) গণহত্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

## ২ খ. নির্বিচারে নারী হত্যা ও নির্যাতন

লক্ষ্য করা গেছে যে, আর্মেনিয়া ও নানজিং এর মতো বাংলাদেশেও নারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিলো। বাঙালী নারীদের উপর তৌন নির্যাতন, ধর্ষণ আর হত্যা শুরু করা হয় যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই। যুদ্ধের পুরো সময়ে জাহাঙ্গীর জুড়ে বাঙালি নারী নির্যাতন ও মৃত্যুর সম্মুখীন ছিলো -যা ছিল সুপরিকল্পিত ও ভয়াবহ।

সুজান ব্রাউনমিলার তার এগেইস্ট আওয়ার উইল বইতে (Against Our Will: Men, Women and Rape, Susan Brownmiller) এই নির্যাতনকে নানজিংয়ে জাপানিদের দ্বারা ধর্ষণ ও রাশিয়াতে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানিদের দ্বারা ধর্ষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ৮০ শতাংশ ধর্ষিত ছিলো মুসলমান নারী (পৃষ্ঠা ৮১)।

‘২,০০,০০০ বা ৩,০০,০০ বা ৪,০০,০০০ (তিনটি ভিন্ন পরিসংখ্যান) বাঙালী নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮০% নারী ছিলেন মুসলমান, যা তখনকার ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যানুপাতিক ছিল। সেই ক্ষেত্রে হিন্দু বা খন্দান নারীরাও রক্ষা পায়নি। একটা ছোট জনবহুল দেশের নারীদের উপর এই ভয়াবহ যৌন অত্যাচার হয়েছে।’ (ব্রাউনমিলার, পৃষ্ঠা ৮১)

এই বিষয়ে Aubrey Menen নামক এক রিপোর্টার করেকটি উদাহরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে সদ্যবিবাহিতা এক তরুণীকে নির্যাতনের ঘটনা এইরকম-

“দুইজন পাকিস্তানী সৈন্য বাসরঘরে চুকে পড়লো। অন্যজন বাইরে বন্দুক নিয়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকলো। বাইরের মানুষরা ভিতরে সৈন্যদের ধর্মকের সুর আর স্বামীটির প্রতিবাদ শুনতে

পাচ্ছিলো। সেই চিকিৎসার একসময় থেমে গেল

- শুধু শোনা গেল তরুণীর কাতর আর্তনাদ। কয়েক মিনিট পর একটা সৈন্য অবিন্যস্ত সামরিক পোশাকে বেরিয়ে এলো বাইরের থেকে আরেকটা সৈন্য ভিতরে গেল। এভাবে চলতে থাকলো - যতক্ষণ না ছয়টা সৈন্য দ্রুত সেই বাড়ি ত্যাগ করলো। তারপর বাবা ভিতরে গিয়ে দেখতে পেল তার মেয়ে দড়ির বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর তার স্বামী মেঝেতে করে ফেলা নিজের বমির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।” (Brownmiller, Against Our Will, p. 82)

“বাঙালি নারীদেরকে নির্যাতন কোন সৌন্দর্য বা এই রকমের কোন কিছুতে বাধাধরা ছিলো না। তারা আট সন্তানের মা বা ৭৫ বছরের দাদীয়াকেও ছাড়ে নাই। তারা শুধু ঘটনাস্থলে নির্যাতন করেই চলে যায় নাই, তারা হাজারো নারীদের তাদের ক্যাম্পে তুলে নিয়ে যায়। কেউ কেউ আট বারের মত নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এক রাতে (ব্রাউনমিলার, পৃষ্ঠা ৮৩)।

দুঃখজনক হলেও এই নির্যাতিত নারীদের অসমান যুদ্ধের পরেও চলেছিল। শেখ মুজিব কর্তৃক তাদেরকে জাতির ধীরঙ্গনা দ্বোষণা দেয়া হলেও বাস্তবে তা হালে তেমন পানি পায় নাই। নির্যাতিত অনেক নারী তাদের হারানো সুখ ফিরে পায়নি। (ব্রাউনমিলার, পৃষ্ঠা ৮৪)

## ৩. যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা - কতজন মারা গেছে

এইটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা সাত ডিজিটের মধ্যে পড়বে। এই গণহত্যা রুহান্ডা (৮০০,০০০) আর ইন্দোনেশিয়া (১ থেকে ১.৫ মিলিয়ন) ছাড়িয়ে গেছে।

আর. জে রোমেলের মতে -

“সেই ২৬৭ দিনের যুদ্ধে নিহত হওয়ার সংখ্যাটা ভয়াবহ। আঠারোটি জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলায় তদন্ত কমিটির আংশিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় - পাকিস্তানী আর্মিরা-

ঢাকায় ১,০০,০০০

খুলনায় ১,৫০,০০০

যশোরে ৭৫,০০০

কুমিল্লায় ৯৫,০০০

চট্টগ্রামে ১,০০,০০০

মানুষ হত্যা করেছে। এই আংশিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে,

১৮টি জেলায় (তখন বাংলাদেশ ১৮টি জেলায় বিভক্ত ছিল) মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২,৪৭,০০০ মানুষ। উল্লেখ্য যে, এই পরিসংখ্যানটি হলো অসমাপ্ত পরিসংখ্যান। যেহেতু সেই পরিসংখ্যানটি সম্পূর্ণ হয়নি - তাই আজও সেই যুদ্ধে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা বলা কঠিন। অনেকের মতে, প্রাক্লিত সর্বোট সংখ্যাটি হবে ৩০,০০,০০০। (আর জে রোমেল, ডেথ বাই গর্ভর্মেন্ট)।

পাকিস্তানী আর্মি আর তাদের সহযোগী বাহিনী (রাজাকার/আলবদর) কর্তৃক নিহত হয়ে প্রতি ২৫ জনের একজন বাঙালী, হিন্দু আর ভিন্নমতের মানুষ। সেই বিবেচনায় এই হত্যাকাণ্ড সোভিয়েত আর চৈনিক কমিউনিস্ট সরকার আর জাপানের বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যানুপাতের চাইতে অনেক বেশী। (Rummel, Death By Government, p. 331) এডাম জোল এক হিসেবে দেখিয়েছেন মৃতদের ৮০% হচ্ছে পুরুষ (৩ মিলিয়ন শহীদ ও ৪ লাখ নারী নির্ধারিত হয়েছে ধরে)। সেই হিসেবে এটি গত অর্ধ সহযোগের অন্যতম সেরা গণহত্যাই শুধু নয়, জেন্ডারসাইডও বটে।

## ৪. বাংলাদেশে ১৯৭১ এর গণহত্যার পরিকল্পনা কাদের?

“মাসের পর মাস ধরে চলা এই হত্যাকাণ্ড চলে। এই হত্যালীলা কোন একদল উভেজিত যুবকের রাগের মাথায় ঘটানো কোন ঘটনা নয় - বরং একদল সুপ্রশিক্ষিত আর পেশাদার আর্মি অফিসারের পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন। মুসলমান সৈন্যদের পাঠানো হয়েছে তাদের স্বর্ধমের মানুষকে হত্যা করতে আর তারা যাত্রিকভাবে সুচারুরূপে সেই আদেশ পালন করেছে। যাত্রিকভাবে এই হত্যাকাণ্ড চালাতে চালাতে তারা নিরস্ত্র মানুষ হত্যার নেশায় পড়ে গিয়েছিলো (সিগারেটের নেশার মতো) ... যা রান্নিয়া দখলের পরে হিটলারের বাহিনীর মধ্যে দেখা গেছে। (Payne, Massacre, p. 29)

রবার্ট পাইনের মতে বাংলাদেশের গণহত্যা বর্তমান সময়ের গণহত্যাগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড - একদল সামরিক কর্তার সুচিস্তিত পরিকল্পনার ফসল। যারা এই পরিকল্পনার প্রয়েতো ছিলো, তারা হলো-

- ১) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান,
- ২) জেনারেল টিক্কা খান,

- ৩) চিফ অফ স্টাফ জেনারেল পীরজাদা,
- ৪) নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল উমর খান ও
- ৫) ইন্টেলিজেন্স চিফ আকবর খান।

(যাসাকার, পৃষ্ঠা ১০২)।

এই গণহত্যা ও জেন্ডার ভিত্তিক আক্রমণ নিচু র্যাংকের মিলিটারিদের মধ্যেও ছিলো - যারা স্বপ্নগোদিত হয়ে এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে। যার মধ্যে বাঙালী জাতির প্রতি ঘৃণাও (রেসিজম) একটা কারণ। অধিকাংশ পাকিস্তানী সৈন্য মনে করতো - ‘বাঙালীরা বানর আর মুরগির সাথে তুলনীয়।’ ইস্টার্ন কমান্ডার জেনারেল নিয়াজি মনে করতো - “বাঙালীরা নিচু জায়গায় থাকা নিচু জাতের মানুষ।” তার অধিস্তনরাও একই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। সাংবাদিক ড্যান কগিন (Dan Coggin) জানান, “এক পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন তাঁকে বলে যে আমরা যাকে খুশি হত্যা করতে পারি, কোন জবাবদিহিত করতে হবে না!” (রামেল, ডেথ বাই গর্ভর্মেন্ট, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

### ৪.১ গণহত্যার সমাপ্তি

এই হত্যালীলা চলার সময় প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে এককোটি বাঙালী প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নেয়। কুটনৈতিক আর পরোক্ষ সহায়তার পর ভারত ৩২ ডিসেম্বর সরাসরি যুদ্ধে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে ১৬ই ডিসেম্বর নঠৰ হাজার সৈন্যসহ পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করে আর বাংলাদেশে পানিস্ত নীদের গণহত্যার সমাপ্তি ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতো দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তী ঘটনাবলীর সাথে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ঘটনা তুলনীয়। আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানীদের নিরাপত্তা দেয় ভারত। (Genocide in Bangladesh, p. 298; emphasis added)

আন্তর্জাতিক কুটনৈতিক মারপ্যাঁচে পাকিস্তানী জেনারেলরা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়নি। তারপরও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের বিষয়টি নিয়ে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান সেই অপরাধীদের রক্ষার সকল ব্যবস্থা নিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড আর বিচার না হওয়ার সুদূরপ্রসারী ফল হিসাবে বাংলাদেশেও পরবর্তীতে সামরিক কুঝ হয়েছে - কোন কোনটা

ছিল ভয়াবহ (Death By Government, p. 334)

### ৫. শেষ কথা

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সহযোগী হিসাবে কাজ করা আধা সামরিক বাহিনী (যেমন রাজাকার-আলবদর) সমানভাবে যুদ্ধাপরাধী। তাদের নেতোরা এখন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ভিন্নভাবে হাজির হয়ে জনতার মধ্যে মিশে যেতে চাচ্ছে। পাকিস্তানী জেনারেলদের বিচার করা বা তাদের আদালতে হাজির করা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্যে কঠিন। এই কাজটা করার জন্যে পাকিস্তানের বিবেকবান মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের বুরুতে হবে - কেন তারা একদল গণহত্যাকারীর দায়িত্ব নেবে। তার কিছু আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। গত বছর পাকিস্তানের নারী অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বে আসমা জাহাঙ্গীর সিবিসির সাথে এক সাক্ষাত্কারে সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশে গণহত্যার জন্যে দায়ী জেনারেলদের বিচারে দাবি করেছেন। পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের মানুষরা একদিন এই দিবিকে গণদাবিতে রূপান্তরিত করে যুদ্ধাপরাধী জেনারেলদের বিচারে মাধ্যমে জাতি হিসাবে তাদেরকে গণহত্যার দায় থেকে মুক্ত করবে। এই আশাই করি।

আর এই দিকে দেশের ভিতরে ধর্মের আর রাজনীতির আড়ালে লুকিয়ে থাকা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আবারো জোরালো হচ্ছে। এই কথা সত্য যে, ৩৭ বছরের রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ, প্রতিবিপুরীদের কর্মকাণ্ড আর পেটেডলারের প্রভাবে যুদ্ধাপরাধীদের অবস্থান আপাতদৃষ্টিতে বেশ সুরক্ষিত মনে হচ্ছে। কিন্তু সরকারের যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অবস্থান থেকে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের পরই আসলে বোৰা যাবে - তাদের আশ্রয়স্থলটি আসলে কি তাসের ঘর না লখিন্দরের লোহার বাসর।

### মূল রচনা : জেন্ডারসাইড ওয়াচ

[জেন্ডারসাইড ওয়াচ সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হত্যালীলার বিষয়ে গবেষণা করে। তাদের মতে নিরস্ত্র মানুষের উপর সংঘটিত হত্যাকাণ্ড বা গণহত্যা বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে বড় একটা হৃষকি।]

# বাংলির শোগানমালা : ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১

## রাখা

১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের শোগানগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আন্দোলনের সাথে কিভাবে শোগানের বিবর্তন ঘটেছে। একসময়ের শুধু অধিকার আদায়ের নিরীহ শোগানগুলো কিভাবে তীব্র, জঙ্গি, জ্বালাময়ী হয়ে উঠেছে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচারে তিতিবিরক্ত, ক্ষুদ্র বাঙালির কষ্টে। কিভাবে স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি বদলে গেছে স্বাধীনতার দাবিতে, কিভাবে জন্য হয়েছে বাংলাদেশ শব্দটির। আমাদের সবচেয়ে গৌরবময় আগুণবারা দিনের জীবন্ত দলিল এই গায়ে কাঁটা দেয়া শোগানগুলো। সেই শোগানগুলোকে একসাথে করার প্রয়াস।

## ১৯৫৩

- বীর বাংলি অন্ত ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো
- তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যুমনা
- জাগো জাগো বাংলি জাগো
- দুনিয়ার মজবুত এক হও
- ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো বাংলাদেশ মুক্ত করো
- জয় বাংলা
- ছাত্র-শিক্ষক-জনতা গড়ে তোল একতা
- জেগেছে রে জেগেছে বাংলি জেগেছে
- শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দিবো না
- রক্তের বন্যায় মুছে যাবে অন্যায়
- পাকিস্তানের দালালেরা হৃশিয়ার সাবধান

## ১৯৫৩

- শহীদ স্মৃতি অমর হউক।

## ১৯৫৬

- মৃত্যুমুখী মানুষকে বাঁচাও

## ১৯৬২

- শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার কর
- পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা চলবে না
- ২০ টাকা মণ দরে চাউল চাই
- স্বায়ত্ত্বাসন দিতে হবে

- রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, নিরাপত্তা আইন বাতিল কর।
- জাতীয় গণতান্ত্রিক ফন্ট জিন্দাবাদ
- ভাসনীর দাবী দেশের দাবী
- ভাসনীর দাবী মানতে হবে।
- গণধিকৃত এবড়ো আইন বাতিল কর
- রাজনৈতিক দল আইন বাতিল কর
- নিরাপত্তা আইন বাতিল কর।
- এককেন্দ্রিক নয় ফেডারেল পদ্ধতির
- গণতন্ত্র মানতে হবে।

## ১৯৬৪

- মোদের গরব মোদের আশা, আ'মরি বাংলা ভাষা।
- আ-এ আদা র-এ রসুন/ এ নাম জপে বুলবুল।

## ১৯৬৬

- সোনার দেশ আজ শুশান কেন!!
- গণসংগ্রামেই বাজে গণমুক্তি
- অর্থপাচার বন্ধ কর
- ৬ দফাই গণমুক্তির মহাসনদ
- ৬ দফা আমাদের বাঁচার দাবী
- ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্ত্বাসন দিতে হবে
- পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসন দিতে হবে
- সহজলভ্য শিক্ষা চাই

## ১৯৬৭

- ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি চাই
- সকল রাজনৈতিক মামলা দণ্ডাদেশ বাতিল কর
- ১১ দফার বাস্তবায়ন চাই
- নারী শিক্ষার প্রসার চাই
- সংবাদপত্রের কঠরোধ চলবে না
- কমিউনিস্ট পার্টির উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার কর

## ১৯৬৮

- গণতন্ত্র কায়েম কর।

## একাত্তরের বজ্রকঠ

- জয় বাংলা
- অধীনতা আর নয় চাই স্বাধীনতা।
- জয় বাংলা
- স্বাধীন তা
- তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা।
- পিভি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা।
- ভুট্টোর পেটে লাধি মার বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
- এক দফা এক দাবী বাংলার স্বাধীনতা।
- বীর বাঙালী অন্ত ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
- ইয়াহিয়ার দুই গালে জুতা মারো তালে তালে।
- অনেক রক্ত দিয়েছি এবার শোধ নেব।
- বাংলার সার্বিক মুক্তির জন্য জনগণ রক্ত দিতে প্রস্তুত
- ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো, বাংলাকে মুক্ত করো।
- ভুট্টো দ্য কিলার অভ ডেমোক্রেসি।
- ভুট্টো দ্য পলিটিক্যাল বাস্টার্ড।
- নো পাকিস্তান, উই ওয়াল্ট বাংলাদেশ।
- মা-বোনেরা অন্ত ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
- আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
- স্বাধীন বাংলা কায়েম কর সংগ্রামী জনতা এক হও।
- স্টপ অ্যাট্রোসিটি ইন বাংলাদেশ।
- স্টপ কিলিং ইন বাংলাদেশ।
- মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করুন, এরা আমাদেরই সন্তান।
- বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা।
- এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে।
- বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্সটান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালী।

১৯৬৯

- জেলের তালা ভাংবো শেখ মুজিবকে আনবো/ তোমার নেতা, আমার নেতা/ শেখ মুজিব, শেখ মুজিব ।
- ১১ দফার বাস্তবায়ন চাই ।
- মিছিলে যোদ্দন আমার ভায়ের বুকে বিশেছিল গুলি
- ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি চাই ।
- সকল রাজনৈতিক মামলা দণ্ডাদেশ বাতিল কর ।
- শহীদ স্মৃতি অমর হউক ।
- ১১ দফার বাস্তবায়ন চাই ।
- শহীদের ডাক বাঙালী জাগো ।
- জানি রঙ্গের পেছনে ডাকবে সুখের বাণ
- কার ছেলে কার ভাই? তোমার আমার সকলের ।
- আমরা সালামের ভাই আমরা বরকতের ভাই
- শহীদ মতিউরের রক্ত বৃথা যেতে দেব না ।
- ১১ দফা সংগ্রাম চলবে ।
- ছাত্র জনতার মুক্তির সংগ্রাম চলবেই ।
- শহীদ মতিউরের স্মৃতি অমর হউক ।
- ১১ দফা মানতেই হবে ।
- শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না

১৯৭০

- রক্ত দিলেন গুরু সংগ্রাম হইল শুরু
- আইয়ুব শাহির গদিতে/ আগুন জালো একসাথে ।
- আইয়ুব মোনেম দুই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই ।
- জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো ।
- ৬ দফা তিনিক স্বায়ত্ত্বাসন চাই ।
- জাগো জাগো বাঙালী জাগো ।
- তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ
- বাইশ বছরে ওদের শোষণে মরেছি/ এসো কৃষক,
- শ্রমিক, ছাত্র, জনতা/ দাঁড়াই এক সাথে ।

১৯৭০

- বাঁচার দাবী ও নির্বাচনের দাবী বানচালের চক্রান্ত রথিয়া দাঁড়ান ।
- চক্রান্ত প্রতিহত কর শাস্তি কায়েম কর ।
- গণরায় বানচাল করা চলবে না ।
- গণহত্যা বন্ধ কর ।
- গণঅধিকার কায়েম কর বাংলাদেশ স্বাধীন কর ।
- কাঁদো দেশবাসী কাঁদো ।
- শ্রমিক কৃষক ছাত্র জনতা এক হও ।

## ১৮ ডিসেম্বর '৭১ : একটি ছবির গল্প

### অমি রহমান পিয়াল

সময় ১৮ ডিসেম্বর, বিকেল সাড়ে চারটা । কাদের সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে শেখ জামাল সহ রওনা দিয়েছেন এখনকার জাতীয় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে । বিজয়ের পর সেনিনই প্রথম সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল সমাবেশ । তাদের গাড়ি যখন পল্টনে মোড় নিয়েছে এমন সময় বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা দুটো ডাটসান গাড়ির ভেতর থেকে কিশোরী কঠে আর্টিচকার শোনেন তারা । সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দুটো ঘিরে ফেলে মুক্তিবাহিনীর অন্য সদস্যরা । দুজন যুবক দৌড়ে পালায়, ধরা পড়ে চার জন । ভীত সন্ত্র কিশোরী দু'জনের কাছে যা জানা গেল, তারা অবঙ্গলী । এই ছয়জন তাদের বাসায় লুটপট চালিয়ে, নগদ ৫০ হাজার টাকা ও দুর্বোনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের বৃক্ষ মোটর মেকানিক পিতাকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাড়ির পেছনের বনেটে । ঠিকই দেখা যায় সত্য বলছে মেয়েরা । এরপর দুক্তিকারী ৪ জনকে জনসমূহে পরিণত হওয়া স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে সদ্য স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে নিয়ে বক্তব্য রাখেন কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান । এবং মধ্যে তোলা হয় মেয়ে দুটোকে । তাদের বক্তব্য শোনার পর, জনতার কাছে রায় চাওয়া হয়- তারা সমস্বরে দাবি জানান ম্ত্যুদণ্ডের । পরে চারজনকে একটি করে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে শাস্তি কার্যকর করে মুক্তিবাহিনী । ছবিতে বেয়নেট হাতে চার্জে যাচ্ছেন স্বয়ং বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী । ছবিটি সরাসরি ধারণ করে বেশকিছু বিদেশি মিডিয়ার প্রতিনিধিরা ও যথারীতি তুমুল সমালোচনার বাড় তোলে । এবং দেশের বাইরে থাকা স্বাধীনতা বিরোধিয়া একে ব্যবহার করে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় ।

তথ্যসূত্র : স্বাধীনতা '৭১ (কাদের সিদ্দিকী)



U.S. DEPARTMENT of STATE

U.S.-Japan Economic Relations

Proliferation Activities

Issues & Press

Travel & Business

Country

Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs

Bureau of Public Affairs

Office of the Historian

Foreign Relations of the United States

John Ford Administration

Volume XI

Foreign Relations, 1969-1971

South Asia Crisis - 1971

স্বাধীনতা পূর্বাপর গুরুত্বপূর্ণ  
ঘটনার দলিলসমূহ

মিরাজুর রহমান

Office of the Historian  
Bureau of Public Affairs

Press Release

Summary

Guide to Archival Materials and Sources

For sale by the U.S. Government Print Office  
Internet: <http://bookstore.gpo.gov>  
Phone: (202) 512-1800  
Fax: (202) 512-2250  
Superintendent of Documents, Mail: 5  
Washington, DC 20402-9328  
ISBN 0-16-072401-5



CHARGE THAT, IF APPROPRIATE OCCASION PRESENTED ITSELF BEFORE YAHYA'S DEPARTURE HE MIGHT NOTE TO YAHYA OUR HOPES FOR POLITICAL SOLUTION PROBLEMS FACING PAKISTAN.

২৫শে মার্চের গণহত্যা নিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের টেলিগ্রাম-১

1. HERE IN DACCA WE ARE MUTE AND HORRIFIED WITNESSES TO A REIGN OF TERROR BY THE PAK MILITARY. EVIDENCE CONTINUES TO MOUNT THAT THE MLA AUTHORITIES HAVE A LIST OF AWAMI LEAGUE SUPPORTERS WHOM THEY ARE SYSTEMATICALLY ELIMINATING BY SEEKING THEM OUT IN THEIR HOMES AND SHOOTING THEM DOWN.

2. AMONG THOSE MARKED FOR EXTINCTION IN ADDITION TO A.L. HIERARCHY, ARE STUDENT LEADERS AND UNIVERSITY FACULTY. IN THIS SECOND CATEGORY WE HAVE REPORTS THAT FAZLUR RAHMAN, HEAD OF APPLIED PHYSICS DEPARTMENT, PROFESSOR DEV, HEAD OF PHILOSOPHY DEPARTMENT AND A HINDU, M. ABEDIN, HEAD OF DEPARTMENT OF HISTORY, HAVE BEEN KILLED. RAZZAK OF POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT IS RUMORED DEAD. ALSO ON LIST ARE BULK OF MNA'S ELECT AND NUMBER OF MPA'S.

3. MOREOVER, WITH SUPPORT OF PAK MILITARY, NON-BENGALI MUSLIMS ARE SYSTEMATICALLY ATTACKING POOR PEOPLE'S QUARTERS AND MURDERING BENGALIS AND HINDUS. STREETS OF DACCA ARE AFLOOD WITH HINDUS AND OTHERS SEEKING TO GET OUT OF DACCA.

MANY BENGALIS HAVE SOUGHT REFUGE IN HOMES OF AMERICANS, MOST OF WHOM ARE EXTENDING SHELTER.

মার্চের গণহত্যা নিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের টেলিগ্রাম-২

4. ITEM: AMERICAN PRIESTS (PROTECT) IN OLD DACCA REPORT ARMY ACTED WITH NO PROVOCATION ON PART OF BENGALS EXCEPT BARRICADE ERECTION. ARMY EXCLUSIVELY RESPONSIBLE FOR ALL FIRES. TECHNIQUE WAS TO SET HOUSES AFIRE AND THEN GUN DOWN PEOPLE AS THEY LEFT THEIR HOMES. UNWILLING ESTIMATE NUMBER OF CASUALTIES BUT ADVISED THAT MUST BE VERY HIGH. BELIEVE HINDUS PARTICULAR FOCUS OF CAMPAIGN, ALTHOUGH AREAS INCLUDING NON-HINDUS ALSO BURNED OUT. STATED ARMY LOOKING AWAMI LEAGUERS BUT REALLY MORE INDISCRIMINATE THAN SELECTIVE IN APPROACH. MOST ARMY DESTRUCTION NIGHTS OF MARCH 25 AND 26: LESSER ON MARCH 27 AND 28. ALSO REPORTED WHAT TERMED RELIABLE ACCOUNT FAMILY OF ELEVEN ALL KILLED NITE OF 25TH.

5. ITEM: MILITARY REPORTEDLY IS STANDING BY WHILE NON-BENGALIS LOOT BENGALI DWELLINGS. THEREBY ABETTING CRIMINAL TENSIONS. BENGALI-NON-BENGALI TENSIONS VERY HIGH (CONGEN OFFICERS THIS MORNING (MARCH 29) WITNESSED BUTCHERING OF ONE CIVILIAN BY ANOTHER IN AREA OF BENGALI-NON-BENGALI DISCORD, ALTHOUGH INCIDENT POSSIBLY OF OTHER ORIGIN). BENGALIS REPORTEDLY BIDING TIME TO RETALIATE.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা নিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের টেলিগ্রাম

1. AMERICAN SERVING WITH FAO IN EAST PAKISTAN VISITED CONGEN MARCH 30 TO REPORT ON TOUR OF DACCA UNIVERSITY

MARCH 27. WAS TOLD WEAPONS STUDENTS HAD AT IQBAL HALL SERVED ONLY TO INFURIATE ARMY. STUDENTS EITHER SHOT DOWN IN ROOMS OR MOWED DOWN WHEN THEY CAME OUT OF BUILDING IN GROUPS. SAW TIGHTLY PACKED PILE OF APPROXIMATELY TWENTY FIVE CORPSES. WAS TOLD THIS WAS LAST BATCH OF BODIES REMAINING, OTHERS HAVING BEEN DISPOSED OF BY ARMY. WHILE THERE, EMPTY ARMY TRUCK ARRIVED TO REMOVE BODIES. MAJOR ATROCITY RECOUNTED TO HIM TOOK PLACE AT KOKEYA GIRLS' HALL WHERE BUILDING SET ABLAZE AND GIRLS MACHINE-GUNNED AS THEY FLED BUILDING. USIS LOCAL WHO LIVES NEAR BY CONFIRMS GIRLS GUNNED DOWN. GIRLS HAD NO WEAPONS. FORTY KILLED. ATTACK AIMED AT ELIMINATING FEMALE STUDENT LEADERSHIP, SINCE ARMY APPARENTLY TOLD GIRL STUDENT ACTIVISTS RESIDED THERE. ESTIMATED 1,000 PERSONS, MOSTLY STUDENTS, BUT INCLUDING FACULTY MEMBERS RESIDENT IN DORMS, KILLED. HE CLAIMED UNIVERSITY CONTACTS WHO CONDUCTED HIM ON TOUR HAD BEEN NOTED FOR THEIR RELIABILITY FOR INFORMATION IN PAST. TOLD ALL UNIVERSITY FILES BURNED BY ARMY IN WHAT APPEARED BE PURPOSEFUL MOVE.

4. REPORTS VARY RE STATUS OF TOP STUDENT LEADERS. SOME SAY ARMY TOOK NO PRISONERS AND KILLED ALL PRESENT IN DORMS. HENCE IF STUDENT LEADERS THERE, THEY TOO KILLED. OTHER UNIVERSITY CONTACTS SAY GAME PLAN IF ARMY MOVED IN FORCE WAS FOR TOP LEADERS TO ESCAPE TO COUNTRY-SIDE TO ORGANIZE RESISTANCE. MOST APPARENTLY SUCCEEDED IN GETTING OUT OF DACCA ENVIRONS. ARMY RADIO BROADCAST MONITORED HERE SUGGESTS SOME STUDENTS ESCAPED.



# মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল পর্যবেক্ষণ

## চুক্তি অংশ

This estimate assesses the present and prospective state of the Pakistani civil war, the role of India and other powers, and the outlook for Pakistan's two components -- if the Bengali uprising should be put down, and if it should succeed.

## THE ESTIMATE

### I. THE CONFLICT IN BENGAL

1. When they launched their campaign on 25 March, the West Pakistani military leaders probably expected -- or at least hoped -- to destroy the Awami League (AL) and regain effective control of East Bengal in a matter of days, if not hours. They clearly miscalculated; most of the top AL leaders have been arrested, but lower level party leaders continue to be active throughout much of the countryside. While no precise figures are available, substantial elements of the 13,000-man East Pakistani Rifles (the provincial paramilitary force) remain in being, as do a few of the Bengali units of the Pakistani Army. Although beset by serious logistic and leadership problems, these armed cadres continue to resist the West Pakistani units in East Bengal; they are able to move fairly easily through most of the countryside.

2. Islamabad's forces are in command of the two principal cities, Dacca and Chittagong, and a few of the lesser ones. Even there, the Army's hold is maintained by severely repressive measures and rigid curfews. Most economic activity has halted; the ports are virtually closed and most transport is

disrupted. A number of bridges have been destroyed, ferry boats sunk, and rail lines (including that between Dacca and Chittagong) cut. Nonetheless, regular army forces can move through the region at will, except where inhibited by transport difficulties.

3. The prospects are poor that the 30,000-odd West Pakistani troops can substantially improve their position, much less reassert control over 75 million rebellious Bengalis. This is likely to be the case even if the expeditionary forces is augmented. For most of East Pakistan's residents, the time has come for a separate Bengali nation. Many years of economic discrimination and political repression by the west wing had made an autonomous Bangla Desh the choice of over 75 percent of Bengali voters in the December 1970 elections. The refusal of Pakistan's military leaders to honor that choice and their attempt to terrorize the Bengalis into submission have almost certainly ended any general desire in East Bengal to see the Pakistani union continue.

4. Whether the army is to face widespread non-cooperation or continued active resistance will depend in part on how much help India gives the Bengalis. All but a few miles of East Bengal's land frontiers are with India, and the movement of arms and guerrillas across these very extensive borders cannot be prevented. There is considerable evidence that some arms shipments have already taken place.\* The Indian Government's support for the Bengali's will be determined by a mix of response to domestic popular pressures -- which are quite strong -- and of an assessment of India's

own national interests. Statements of support in parliament and the press have been very strong. West Pakistan, with its military forces, has long been a principal enemy of India. A successful Bengali insurgency would serve to weaken and discredit West Pakistan. The East Wing, basically uninterested in the Kashmir dispute and never the scene of major Indo-Pakistani fighting, poses no military threat to New Delhi. To the contrary, its leaders -- particularly Mujibur Rahman of the AL -- have advocated cordial relations with India. Hence, we estimate that India will continue and increase its arms aid to the Bengalis and this will enable them to develop at a minimum the kind of insurgency capability which the army cannot entirely suppress. In so doing, India is accepting the risk that some of its arms may fall into extremist hands. In the time the Bengalis may prove more than a match for the army except where the latter is concentrated in a few strong points.

7. India of course runs the risk in supporting or intervening in a Bengali rebellion. To do so could provoke Islamabad into launching an attack on Western India. However, in the 1965 war the Indian military showed itself more than a match for the Pakistanis. The Indians are now much better equipped than in 1965, and face forces weakened by transfer of Pakistani units to East Bengal.

11. So far, with the qualified exception of China, none of the major powers have shown any support for the central government's efforts in Bengal. Moscow has put itself firmly on the record in opposition to the West Pakistani military suppression of East Pakistan; its choice was no doubt heavily influenced by the Indian attitude. It has called for a political settlement, and probably does not believe Soviet interests would be served by prolongation of the conflict. The Soviets have probably concluded that the odds favor a separatist solution or at least that Islamabad has little chance of imposing its will on East Bengal in any lasting and effective way.

13. Stories of atrocities in Dacca and elsewhere have been widely circulated in the Western world, and West Pakistani actions have been condemned by a number of private citizens and groups. No single Western country has much influence on the situation, but general Western disapproval may make the government in Islamabad less certain of the wisdom of present policies and more amenable to pressures for change.

## PROSPECTS FOR EAST BENGAL

### A. As a Part of a United Pakistan

14. In the unlikely event that the West Pakistanis did succeed in reasserting military control over the Bengalis, they would almost certainly find it impossible to develop a new political system based on anything approaching a consensus of opinion in the two wings. In the December 1970 elections, the Bengalis gave an overwhelming mandate for political and economic autonomy: opinions have since hardened.

The best the West Pakistanis could hope to achieve would be something like a restoration of conditions which existed under Ayub (and which were ended by mass public uprisings in 1968-1969). Routine and low-level administrative duties would be in the hands of Bengalis loyal to Islamabad (and such individuals do remain, though they are in a minority); ultimate authority would continue to be in the hands of West Pakistani authorities, and the army would remain the final arbiter of power. The two areas would remain one economic unit, and the central government would make some effort to cope with the formidable economic problems of East Bengal. But a substantial majority of the population would continue to be strongly disaffected, probably to the point of launching sporadic uprisings. The Pakistani Government's talk about enlisting loyalist Bengalis in any significant numbers is wishful thinking.



### B. As an Independent Nation

15. The political complexion and outlook of an independent Bangla Desh are extremely difficult to forecast. If it came into being rather soon, and if Mujib and the principal AL leaders were still alive and permitted to return, they would quickly take over. Mujib's political and economic philosophies are essentially moderate ones; he wishes to develop good relations with India and adopt a generally balanced and neutralist international posture. In domestic affairs he advocates a mild type of socialism, emphasizing an improvement in the living standards of the Bengali people and a concerted

attack on the many economic problems of the area. On the other hand, the longer the fighting goes on, the more the prospects for a takeover by an extremist and radical leadership could be enhanced. We know almost nothing about such radicals; in recent years the politics of East Bengal protest have focused almost exclusively on the issue of autonomy. Nonetheless, given the large number of Bengali extremists in India and the ease of interchange of ideas and people between the two regions, radical movements could develop extremely rapidly.

16. Whatever its government, an independent Bangla Desh would, in the short term, have some things going for it. Relatively speaking for an underdeveloped country, its balance of payments problems would not be bad, thanks to its large current exports of jute. It would almost certainly repudiate the large debts to West Pakistan and the outside world incurred in its name. Able to trade freely with India, as it has not been in the past, it could buy many goods more cheaply.

17. But Bangla Desh would face serious problems both in the short and long term. The floods and cyclone of 1970 raised import requirements to about 3 million tons of food grains for the period until June 1971.

Some, though almost certainly not all, of this has already been met by shipments of PL 480 and West Pakistani food grains. But Bengali ports have been closed since 25 March, and ships carrying food have been diverted. The internal transportation network has been disrupted. We have no information about food conditions throughout East Bengal now, but severe food shortages are almost certain and famines in certain areas not out of the question. Beyond this, the basic economic problems in that region are as severe as those faced by any country in the world, and they appear unlikely to improve much in the next several years.



## ৭ই মার্চের প্রাক্কালে পাকিস্তান সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের মিটিং এবং কিসিঙ্গারের ভূমিকা

১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিআইএ ও আমির সমন্বয়ে গঠিত সিনিয়র রিভিউ কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিংয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সম্মত্য ভাষণ, ২৫শে মার্চের এসেম্বলী আহবান, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলন ও সংঘাত সামরিক উপায়ে মোকাবেলা এবং ভারতের ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঙ্গার। সভায় এছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবন্দ, সিআইএ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্যবিবরণী পাঠ করলে তদনীন্তন মার্কিন করকারের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

Minutes of Senior Review Group Meeting

### SUMMARY OF DECISIONS

It was agreed to:

-discuss the situation with the British to see if they would take the lead in an approach to West Pakistan to discourage the use of force, if it should become necessary;

-advise our missions at Dacca and Islamabad of our thinking and instruct Dacca, if they receive an approach from Mujib on recognition of a separate East Pakistan regime, to say nothing and refer it to Washington;

-consult by telephone on Sunday, March 7 following word on Mujib's speech./2/

Mr. Kissinger: I thought we might have a brief discussion of what may be ahead and what our basic choices may be. I assume we will know something

tomorrow.

Mr. Johnson: We have a good interagency contingency paper.

Mr. Kissinger: Yes, it's a very good paper.

Mr. Johnson: We're already on page 7 of that paper so far as events go. I would like to make two points. First, this is not an East-West, or a US-Soviet, or a US-Indian confrontation. The US, USSR and India all have an interest in the continued unity of Pakistan and have nothing to gain from a break-up. Second, we have no control over the events which will determine the outcome, and very little influence. We will know better what the issues are tomorrow after Mujibur Rahman's speech. Yahya's speech today was described by our Embassy as a mixture of sugar and bile. If the issue is postponed for a few days, we don't face any immediate problem. If Mujib should come to us and tell us he plans to make a unilateral declaration of independence and ask what our attitude would be, we would then face the issue of what to say. If Yahya carries out his declaration on the use of force against East Pakistan, we would have to decide what attitude to adopt. The judgement of all of us is that with the number of troops available to Yahya (a total of 20,000, with 12,000 combat troops) and a hostile East Pakistan population of 75 million, the result would be a blood-bath with no hope of West Pakistan reestablishing control over East Pakistan. In this event, we would be interested in bringing about a cessation of hostilities, but the question of whether we or others should take the lead remains to be seen. We are talking with the British this afternoon about the situation. Mujib has unparalleled

political control, capturing 160 of the 162 seats up for grabs in the last election. And he is friendly toward the US. In West Pakistan, Bhutto is almost unparalleledly unfriendly to the US. While we have maintained a posture of hoping the country can be brought together and its unity preserved, the chances of doing so now are extremely slight. It is only a question of time and circumstances as to how they will split, and to what degree the split is complete or may be papered over in some vague confederal scheme.

Page 7 of the contingency study introduced the question of what the U.S. posture would be if the secession of East Pakistan appeared to be imminent.

In a radio address on March 6, Yahya announced that he had decided to convene the National Assembly on March 25. He concluded the speech by warning that as long as he was in charge of the armed forces he would defend the integrity of Pakistan. (Telegram 1957 from Islamabad, March 6; National Archives, RG 59, Central Files 1970-73, POL PAK) The Embassy's comments on the speech were reported in telegram 1963 from Islamabad, March 6.

I plan to send something out today to give our people in Dacca and Islamabad the flavor of our thinking in terms of the pros and cons, and to instruct Dacca, if they are approached by Mujib, to stall and refer to Washington. We can then make a decision on our reply in the light of the circumstances at the time. In general, we would like to see unity preserved. If it cannot be, we would like to see the split take place with the least possible bloodshed or disorder. If Mujib approaches us, we will have to walk a tightrope between making him think we are giving him the cold shoulder and not encouraging him to move toward a split if any hope remains for a compromise.

Mr. Van Hollen: There are three possibilities for Mujib tomorrow: a unilateral declaration of independence; something just short of that-possibly a suggestion for two separate constitutions; or acceptance of Yahya's proposal that the National Assembly meet on March 25.

Mr. Kissinger: But doesn't Mujib control the Assembly?

Mr. Van Hollen: Yes, but Yahya controls its convening.

Mr. Kissinger: Why wouldn't the convening of the National Assembly on March 25 be acceptable to East Pakistan? They control the Assembly and nothing can pass without them.

Mr. Van Hollen: They may interpret it as another stalling tactic by Yahya.

Mr. Kissinger: If they accept the proposal for an Assembly meeting, we have no foreign policy problem.

Mr. Johnson: I agree; the temperature drops.

Mr. Kissinger: What would be the motive for a declaration of independence?

Mr. Van Hollen: There has been movement in East Pakistan in that direction which was intensified by Yahya's postponement of the National Assembly meeting that was scheduled for last Wednesday./7/ Also, they have interpreted Yahya's speech yesterday as being particularly hardline, blaming Mujib for the situation and threatening the use of force.

Mr. Kissinger: I agree that force won't work.

Mr. Van Hollen: Yes, but they might try.

Mr. Helms: To coin a phrase, Yahya's attitude is that he did not become President of Pakistan to preside over the dissolution of the Pakistan state.

Mr. Kissinger: What force do they have?

Mr. Helms: 20,000 troops.

Mr. Kissinger: Would East Pakistan resist? What is their population?

Mr. Johnson: 75 million, and they would resist. Also, West Pakistan would not be allowed to overfly India.

Mr. Kissinger: It would be impossible. They would have to reinforce by ship.

Mr. Kissinger: Would East Pakistan resist? What is their population?

Mr. Johnson: 75 million, and they would resist. Also, West Pakistan would not be allowed to overfly India.

Mr. Kissinger: It would be impossible. They would have to reinforce by ship.

Mr. Johnson: They have some C-130's which could fly around India by refueling in Ceylon.

Mr. Kissinger: Ceylon wouldn't let them, would they?

Mr. Van Hollen: They do it now, but they might not if circumstances should change.

Mr. Noyes: India would put pressure on Ceylon to refuse.

Mr. Johnson: They could use their jet transports.

Mr. Noyes: They only have 11 of limited capacity.

Mr. Kissinger: They would have to have some logistics back-up.

Mr. Noyes: They have three ships which could move 8000 men in a week's time.

Mr. Van Hollen: Despite all the problems, our mission in Islamabad estimates that Yahya is prepared to use force.

Mr. Noyes: They have 15,000 troops in Dacca.

Mr. Kissinger: You mean 15,000 of their 20,000 troops are in Dacca? They might just want to hold Dacca.

Mr. Johnson: This is not a situation which would be resolved by the use of force.

Mr. Kissinger: Doesn't contingency 3/8/ get us three weeks, if not more. If the matter goes to the National Assembly we should have several months to study it.

/8/ Contingency 3 of the contingency study cited in footnote 3 above outlined a U.S. response to a situation in which Pakistan rejected a unilateral declaration of independence and attempted to put down the secession by force.

Mr. Johnson: In those circumstances we would have no immediate foreign policy problem.

Mr. Kissinger: If an autonomous situation develops-possibly two constitutions with some vague confederal links-would we be required to make some immediate decisions?

Mr. Van Hollen: It would depend on the West Pakistan reaction. It would probably buy us time. Something short of a unilateral declaration of independence might be accepted by West Pakistan. In that event, they would not use force.

Mr. Kissinger: How would two separate constitutions work? The National Assembly wouldn't meet? Or would meet and draft two separate constitutions?

Mr. Van Hollen: It wouldn't have to be done by the National Assemblies; the country could be operated by the provincial assemblies. The Provincial Assembly in East Pakistan could draft their constitution. Mujib in the East and Bhutto in the West would wield effective power.

Mr. Kissinger: Would East Pakistan conduct its own foreign policy?

Mr. Van Hollen: That's a moot point.

Mr. Kissinger: In any event, that's not our problem. If West Pakistan accepts a solution in which each part conducts its own foreign relations, we would go along. If West Pakistan doesn't accept such a solution, we will have to decide whether to go along and grant recognition to East Pakistan. There would be no need for us to take a stand on autonomy. If they declare independence, we face the recognition question. If autonomy is rejected, we face the problem of our positions on the use of force. In other words, we have to face the question on the use of force in independence and autonomy. We face the problem of recognition only if they declare independence. Is that a fair statement? What are your views on this?

Mr. Johnson: On autonomy, if West Pakistan does not accept that solution and seeks to use force, I think we would want to discourage the use of force. We would do the same in the event of a unilateral declaration of independence.

Mr. Kissinger: If I may be the devil's advocate, why should we say anything?

Mr. Johnson: If the West Pakistanis use force, there

will be a bloodbath or, at least, a situation of great turmoil in East Pakistan. If it is quickly over, there would be no problem. But if it continues, there would be problems. The Indians, and possibly others, might feel impelled to intervene if it continued. In the short run, probably not.

Mr. Kissinger: What would we do to discourage the use of force? Tell Yahya we don't favor it?

Mr. Johnson: We would first go to the British to try to get them to take the lead. We shouldn't take the lead.

Mr. Helms: Amen!

Mr. Kissinger: Intervention would almost certainly be self-defeating.

Mr. Johnson: We have no control over developments and very little influence.

Mr. Kissinger: When is Mujib's statement?

Mr. Helms: Tomorrow at 1600 GMT.

Mr. Van Hollen: Another reason for our not taking the lead is that West Pakistan is very suspicious that we are supporting a separate East Pakistan state. If we tell Yahya to call off the use of force, it will merely fuel this suspicion.

Mr. Kissinger: The President will be very reluctant to do anything that Yahya could interpret as a personal affront. When we talk about trying to discourage West Pakistan intervention, we mean try to get another country with a history of concern in the area to do it. Would they do it in both our names?

Mr. Kissinger: The President will be very reluctant to do anything that Yahya could interpret as a personal affront. When we talk about trying to discourage West Pakistan intervention, we mean try to get another country with a history of concern in the

area to do it. Would they do it in both our names?

Mr. Johnson: We're not at that point yet. We've just begun to look for someone to do it, if necessary. How it is done and the degree of our association will be decided at the time. Our objective is to discourage the use of force.

Mr. Kissinger: Will this mean that Yahya is through anyway?

Mr. Van Hollen: Not necessarily. He could still remain as President with Bhutto wielding all effective political power.

Mr. Kissinger: Yahya had counted on being in control because of the divisions in the National Assembly.

Mr. Van Hollen: Of course, the elections seriously eroded his position.

Mr. Kissinger: He had been able to play off Bhutto against East Pakistan. If East Pakistan becomes an independent state, Bhutto is in effective control in the West.

Mr. Van Hollen: Yahya will continue to represent the military establishment which is a significant political force in West Pakistan. He may retain some limited residual power.

Mr. Kissinger: In any event, we can't neglect him.

Mr. Johnson: No.

Mr. Kissinger: Let's keep that in mind.

Mr. Johnson: It would be most unwise to do anything to prejudice our relations with Yahya. To whatever degree he remains and has power, we should

do what we can to help him.

Mr. Kissinger: Would it make any difference if we suggested to West Pakistan that the use of force would be unwise? You understand I don't mind having another country taking the rap.

Mr. Johnson: When we say "discourage" or "participate in discouraging" we don't mean pound the table and tell them they can't do it. We mean discuss it with them.

Mr. Helms: We don't want to get into a family fight.

Mr. Kissinger: If we could go in mildly as a friend to say we think it's a bad idea, it wouldn't be so bad. But if the country is breaking up, they won't be likely to receive such a message calmly. If we can get the British to do it, I wish them well!

Mr. Johnson: There has been no decision on our part to do anything. This is the purpose of our talks with the British.

Mr. Kissinger: If we should make an approach, we might give them an alibi, so that Bhutto could say that the Americans, by warning them against the use of force, kept West Pakistan from restoring the unity of the country.

Mr. Johnson: That's right.

Mr. Kissinger: It is essential that we discuss this with the British.

Mr. Johnson: We can't reach a decision now on how to proceed. If we can get someone else to take the lead, okay. If not, we will have to decide whether we want to do anything. I am not proposing we do anything, but it is a course of action we may have to consider.



Mr. Kissinger: I think we all see the pros and cons clearly. Alex (Johnson) and I will talk after his talks with the British. Every department will be consulted before we make any move. We will also have a chance to take the issue before the President if necessary.

Mr. Van Hollen: The British may be very reluctant to do anything. It does have some advantages, though, because the Pakistanis are not as suspicious of the British as they are of us and the British odor in Pakistan is not bad now because of their attitude toward the recent hijacking.

Mr. Kissinger: In the highly emotional atmosphere of West Pakistan under the circumstances, I wonder whether sending the American Ambassador in to argue against moving doesn't buy us the worst of everything. Will our doing so make the slightest difference? I can't imagine that they give a damn what we think.

Mr. Helms: I agree. My visceral reaction is to keep our distance as long as we can.

Mr. Kissinger: Alex (Johnson) will talk to the British

and we will all consult tomorrow-unless, of course, Mujib's speech is conciliatory. What if they declare their independence? Will we get an immediate recognition request?

Mr. Johnson: Probably, but we don't have to rush. We can see what Mujib says in his approach to us. We shouldn't be the first to recognize. We will want to consult with the British first since they have interests in both East and West Pakistan.

Mr. Van Hollen: The Japanese do too; also, possibly the West Germans and the French.

Mr. Johnson: We will want to recognize eventually but not be the first.

Mr. Van Hollen: Of course, if the parting is amicable and we get a request for recognition, it would be okay.

Mr. Kissinger: Suppose the request for recognition comes to our Consul General in Dacca. What will he say?

Mr. Van Hollen: He will refer to Washington.

Mr. Johnson: I'll tell them so this afternoon, not that I think he would do anything else.

Mr. Kissinger: Option 3/9/ suggests we consult with the Indians in case a military situation develops. I wonder whether we should do that. I can see that, if there is a threat of Indian military intervention, we might wish to advise them that we think it unwise.

/9/ Of the contingency study.

Mr. Van Hollen: The prospect of Indian intervention is very slim in the early stages.

Mr. Kissinger: I question too great activity on our

part. We can't win anything from it, and some Pakistani leaders would be delighted to stick us with it. I wonder whether we should intervene with them or with the Indians.

Mr. Johnson: There is a case to be made for massive inaction.

Mr. Helms: Absolutely.

Mr. Kissinger: I'm just going through the options. The possibility of Chinese military intervention seems so unlikely.

Mr. Johnson: The paper dismisses it.

Mr. Kissinger: I assume the mention of international diplomatic intervention was put in for intellectual symmetry.

Mr. Van Hollen: That is far down the road. If a real blood-bath develops, comparable to the Biafra situation, we may want to review the picture. In such case, international attention could be focussed on the problem, but this is a long way ahead.

Mr. Johnson: In any event, we wouldn't threaten West Pakistan with any sanctions.

Mr. Kissinger: Or call our Ambassador home for consultation.

Mr. Johnson: Our Ambassador is in Bangkok for some medical problem.

Mr. Kissinger: Who is our Charge?

Mr. Saunders: Sid Sober. He's a good man.

Mr. Johnson: Yes. We don't need to rush the Ambassador back.

Mr. Kissinger: I was really only joking. We'll be in

touch tomorrow.

Mr. Johnson: I'll get something out to our people today giving them our thinking. When will we know about the speech tomorrow?

Mr. Noyes: About 5:00 a.m.

Mr. Saunders: There is a ten-hour time difference. We should know fairly early in the morning. Yahya's speech of yesterday was on the CBS 8:00 a.m. news today.

Mr. Johnson: Our Operations Center will be on the alert for the speech.

Mr. Kissinger: We'll check with each other as soon as we know about the speech-with a view to taking no action!

Mr. Helms: What's the situation at the Technical University (in Ankara) today?

Mr. Kissinger: What about the four Airmen? Do they still think they are in the University?

Mr. Saunders: We have no word. The Embassy doesn't think they are in the University and the Turks have widened their search-they went into 100 private homes last night looking for them. The demonstrations have stopped, though, and things are quieter today.

সভায় নিরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়-

It was agreed to:

-discuss the situation with the British to see if they would take the lead in an approach to West Pakistan to discourage the use of force, if it should become necessary;

-advise our missions at Dacca and Islamabad of our thinking and instruct Dacca, if they receive an approach from Mujib on recognition of a separate

East Pakistan regime, to say nothing and refer it to Washington;

-consult by telephone on Sunday, March 7 following word on Mujib's speech

#### সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

Chairman-Henry A. Kissinger

#### State

U. Alexis Johnson  
Christopher Van Hollen  
William Spengler  
Thomas Thornton  
Defense  
James S. Noyes  
Brig. Gen. Devol Brett

#### CIA

Richard Helms  
David H. Blee

#### JCS

Vice Adm. John Weinel  
Col. James Connell

#### NSC Staff

Col. Richard Kennedy  
Harold Saunders  
Samuel Hoskinson  
Jeanne W. Davis

#### তথ্যসূত্র

National Archives, Nixon Presidentialial Materials, NSC Files, NSC Institutional Files (H-Files), Box H-112, SRG Minutes, Originals, 1971. Secret; Nodis. No drafting information appears on the minutes. The meeting was held in the White House Situation Room. A briefer record of the meeting, prepared by Brigadier General Devol Brett of OSD, is in the Washington National Records Center, OSD Files, FRC 330 76 0197, Box 74, Pakistan 092 (Jan-Jul) 1971.



## ঐতিহাসিক কথোপকথন : রিচার্ড নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জার

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ হানাদার পাকিস্তানী রাতের আঁধারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বিচারে গণহত্যা এবং ২৬ শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থার্থমিকভাবে এই যুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং এ থেকে উত্তরণ লাভের জন্য সামরিক জাত্তা ইয়াহিয়াকে সর্বোত্তমভাবে সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণের পর মুক্তিযুদ্ধে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যাপারটিতে ভারতের সরাসরি ইন্ধন আছে বলে সন্দেহ পোষণ করে।

এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলাবার জন্য ভারতে প্রতি কড়া ঝুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এবং ব্যাপক কৃটনৈতিক তৎপরতা চালায়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সহায়তার আশ্বাস দিয়ে ইয়াহিয়াকে একটি চিঠি পাঠান। উত্তৃত পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠির সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের ২৬ শে মে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন-

Conversation Between President Nixon and his Assistant for National Security Affairs (Kissinger), Washington, May 26, 1971, 10:38-10:44 a.m.

Kissinger: Indira Gandhi has written you a letter.

Nixon: I know about...

Kissinger: Well, no. We should answer it. Let me say one other thing.

Nixon: (unclear)

Kissinger: Well you can tell her—you can use it to bring pressure on her not to take military action. Also, I talked to the Pakistan Ambassador. He said that Yahya might appreciate a letter, which would give him an excuse to answer all the things by saying, listing all the things he's doing because he can't get any publicity here.

Nixon: No.

Kissinger: And conversely, Indira Gandhi, I checked with the Indian Ambassador, they're getting so devious now

Nixon: She wants...

Kissinger: She would like to be able to say that one



রিচার্ড নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জার, ১৯৭২

result of her letter was

Nixon: Yeah.

Kissinger: that you've written to Yahya. So everybody's happy. The Pakistanis

Nixon: But we don't say anything against Yahya?

Kissinger: No, no. You just say you hope the refugees will soon be able to go back to East Pakistan. He will then reply to you that's exactly what he wants. I've got it all arranged with the

Nixon: Good. Go ahead.

Kissinger: Embassy. Then you can take credit. You can tell the Indians to pipe down

Nixon: Yeah.

Kissinger: And we'll keep Yahya happy.

Nixon: The Indians need—what they need really is a....

Kissinger: They're such bastards.

Nixon: A mass famine. But they aren't going to get that. We're going to feed them a new kind of wheat. But if they're not going to have a famine the last thing they need is another war. Let the goddamn Indians fight a war .

Kissinger: They are the most aggressive goddamn people around there.

Nixon: The Indians?

Kissinger: Yeah.

Nixon: Sure.

### তথ্যসূত্র

Foreign Relations, 1969-1976, Documents on South Asia, 1969-1972, Released by the Office of the Historian

71

## ১৯৭১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ

স্বাধীনতা যুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাসের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৯৭১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পাল্টে যেতে থাকে। যুক্তিবাহিনীর ক্রমাগত চোরাগোষ্ঠা ও গেরিলা হামলার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে সংঘটিত আকারে যুদ্ধ শুরু হয়। দিশেহারা পাকবাহিনী তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়লেও বেশ কয়েকটি স্থান থেকে পিছু হটে বাধ্য হয়। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সন্ত্রিয় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরের তারিখ থেকে ভারত যুক্তিবাহিনীর সাথে মিলে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবর্তীণ হয়।

এই সময়কালে আস্তর্জিতিক কৃটনৈতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের তথা ইয়াহিয়ার পক্ষে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়, যার কেন্দ্রীয় সময়সূচিক ছিলেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার। এই সময়ে নিক্রন প্রশাসন ভারতের উপর ব্যাপক কৃটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার জন্য। ভারত তখনকার অন্যতম প্রধান পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের সেই চাপ অগ্রহ্য করতে সক্ষম হয়। তবে ভারত কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি বিরুদ্ধাচারণ করেনি। আমি এখানে ১৯৭১ এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে দৃষ্টির আড়ালে ঘটে যাওয়া কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার লিংক দিচ্ছি, আগ্রহী পাঠককে অনুরোধ করছি মূল লিংকে যেয়ে অনেক অজানা তথ্য জানার জন্য।

১. ৫ নভেম্বর ১৯৭১ : নিক্রন, কিসিঞ্জার এবং চিফ অব ষ্টাফ অন্তর্ম্যানের মধ্যে ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকের ব্যাপারে কথোপকথন

২. ৫ নভেম্বর ১৯৭১ : মার্কিন পরাষ্টমন্ত্রীর কাছে পেশ করা গোপন রিপোর্ট : পূর্ব-পাকিস্তানের উপর ইয়াহিয়া খানের কঠোল সীমিত : সেনা বাহিনী নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং অন্যান্য....

৩. নভেম্বর ১১ : ভারত - পাকিস্তানের সম্ভাব্য যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মাণীয় বিষয়ে স্পেশাল একশন গ্রুপের জন্য তৈরী করা গোপন প্রতিবেদন

৪. নভেম্বর ১৫ : প্রেসিডেন্ট নিক্রন, হেনরী কিসিঞ্জার ও পাকিস্তানের পরাষ্টমন্ত্রী সুলতান খানের মধ্যে কথোপকথন। নিক্রন

কর্তৃক সুলতান খানকে সর্বোত্তম সহায়তা প্রদানের আশ্বাস এবং ভারতের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধ এড়াতে করণীয় নিয়ে আলোচনা।

৫। ১১ নভেম্বর ২৩ - মার্কিন পরাষ্টমন্ত্রী উইলিয়াম রজার এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জারের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে ক্রম বর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কথোপকথন। এই কথোপকথনে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

৬। ১২ নভেম্বর ১৯৭১ : হোয়াইট হাউসে নিক্রন, কিসিঞ্জার এবং পরাষ্টমন্ত্রী রজার এর মধ্যে কথোপকথন। ভারত-পাকিস্তান সম্ভাব্য যুদ্ধ মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে আলোচনা।

<http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e7/48533.htm>

৭। ১৩ নভেম্বর ১৯৭১ : ততকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে নিক্রন এবং কিসিঞ্জারের মধ্যে মিটিং। নিক্রন এই যুদ্ধে ভারতকে বিরুতকর অবস্থায় ফেলার জন্য উন্মুখ

<http://www.state.gov/documents/organization/48091.pdf>

৮। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ : ভারতকে কিভাবে চলমান সংকটের জন্য দায়ী করা যায় সে ব্যাপারে নিক্রন এবং পরাষ্টমন্ত্রী রজার এর মধ্যে আলোচনা।

<http://www.state.gov/documents/organization/48094.pdf>

৯। নিক্রন এবং মার্কিন অর্থমন্ত্রী কনলী এর মধ্যে আলোচনা। আলোচনায় তারা এই মর্মে একমত হন যে পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান সংকট উক্ষে দেয়ার ক্ষেত্রে ভারত ও সোভিয়েতে ইউনিয়নের ভূমিকা আছে এবং এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ভারতের বিরোধিতা করা।

<http://www.state.gov/documents/organization/48096.pdf>

১০। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ : নিক্রন এবং কিসিঞ্জারের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে চলমান ভারত-পাকিস্তান সংকট নিয়ে আলোচনা। নিক্রনের মতে এ সংকটে পাকিস্তানের জয়ের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

<http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e7/48650.htm>

১১। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ : ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত মে. জে. মোহাম্মদ রাজা এবং প্রেসিডেন্ট নিক্রনের মধ্যে

কথোপকথন। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের

ক্রমবর্ধমান কোনঠাসা অবস্থানের প্রক্ষিতে নিক্রন

পাকিস্তানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সামরিক সহায়তা

চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার পরামর্শ দেন। মূল ব্যাপারটি ছিল

ভারতকে কোনঠাসা করা।

<http://www.state.gov/documents/organization/48101.pdf>

১২। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ : নিক্রন, কিসিঞ্জার এবং মার্কিন এটর্নী জেনারেল জন মিচেল এর মধ্যে আলোচনা। বৈঠকে নিক্রন

ভারতের বিরুদ্ধে চীনা সামরিক অভিযান শুরু করার জন্য

কিসিঞ্জারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। এছাড়াও

অন্তিমিলমে বঙ্গেপসাগর অভিযুক্তে মার্কিন রণতরী পাঠানোর

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়

<http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e7/48537.htm>

১৩। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ : নিক্রন, কিসিঞ্জার সোভিয়েত ক্ষিমন্ত্রী মাতসকেভিচ এবং সোভিয়েত দূত ভরোনতসভ এর মধ্যে

বৈঠক। বৈঠকে নিক্রন সোভিয়েত ইউনিয়নকে হৃশিয়ার করে দেন যে, যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম পাকিস্তান আত্মগমণে

ভারতকে নির্বাচন না করে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতে

ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অত্যাসন্ন

<http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/e7/48540.htm>

১৪। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ : গোপন সিআইএ প্রতিবেদন। ভারত

যোগ দেবার পর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত

<http://www.state.gov/documents/organization/47989.pdf>

১৫। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ : গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে মার্কিন

উপলব্ধি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় সুনিশ্চিত। নিক্রন

প্রশাসনের পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষার দিকে গুরুত্বারূপ

১৬। ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ : পাকিস্তানের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো, রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রাজা এবং

কিসিঞ্জারের মধ্যে কথোপকথন। ভূট্টো কর্তৃক মার্কিন

প্রশাসনকে প্রকাশ্যে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহা গ্রহণের ব্যাপারে

রাজী করতে জোর প্রচেষ্টা

১৭। ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ : মার্কিন মধ্যস্থায় ভারত-পাকিস্তান

যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থান জানতে চেয়ে পাকিস্তানের

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে টেলিগ্রাম

তথ্যসূত্র :

Foreign Relations, 1969-1976, Documents on South Asia, 1969-1972

Released by the Office of the Historian



## পূর্ব পাকিস্তান যেখানে আকাশও কাঁদে

East Pakistan: Even the Skies Weep এই ছিল ১৯৭১ সালের ২৫শে অক্টোবর প্রকাশিত টাইম ম্যাগাজিনের একটি নিবন্ধের শিরোনাম। এখনও সেই নিবন্ধটি পড়লে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে হাত। কী নির্মম বর্ণনা একটা জাতিকে নিপীড়নের, হত্যা আর ধর্ষণের! টাইম থেকে উদ্ধৃতি-

Though Islamabad has ordered the military command to ease off on its repressive tactics, refugees are still trekking into India at the rate of about 30,000 a day, telling of villages burned, residents shot, and prominent figures carried off and never heard from again. One of the more horrible revelations concerns 563 young Bengali women, some only 18, who have been held captive inside Dacca's dingy military cantonment since the first days of the fighting. Seized from Dacca University and private homes and forced into military brothels, the girls are all three to five months pregnant. The army is reported to have enlisted Bengali gynecologists to abort girls held at military installations. But for those at the Dacca cantonment it is too late for abortion. The military has begun freeing the girls a few at a time, still carrying the babies of Pakistani soldiers.

A Million Dead. No one knows how many have died in the seven-month-old civil war. But in Karachi, a source with close connections to Yahya's military regime concedes: "The generals say the figure is at least 1,000,000." Punitive raids by the Pakistani army against villages near sites sabotaged by the Mukti Bahini, the Bengali liberation army, are an everyday occurrence.

এখন অনেককেই স্বাধীনতা যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা নিয়ে রাজনীতি করতে দেখা যায়। টাইমের অক্টোবর নিবন্ধে সংখ্যাটা বলা আছে ১ মিলিয়ন মানে ১০ লক্ষ। যুদ্ধ এর পরেও চলেছে। চলেছে

নির্মতা। তাদেরকে বলি পড়ুন আর সত্যিকারের ইতিহাসকে জানুন। যদি বাংলাদেশী হয়ে থাকেন তাহলে এটি আপনার দায়িত্ব।

একে নির্মতা বললেও খুব কম বলা হয়ে যায়—  
Always Hungry. As conditions within East Pakistan have worsened, so have those of the refugees in India. The stench from poor sanitation facilities hangs heavy in the air. Rajinder Kumar, 32, formerly a clerk in Dacca, says he is "always hungry" on his daily grain ration of 300 grams (about 1½ cups). His three children each get half that much. "They cry for more," he says, "but there isn't any more."

Malnutrition has reached desperate proportions among the children. Dr. John Seamon, a British doctor with the Save the Children Fund who has traveled extensively among the 1,000 or so scattered refugee camps estimates that 150,000 children



between the ages of one and eight have died, and that 500,000 more are suffering from serious malnutrition and related diseases.

এখানে পাবেন টাইম এর নিবন্ধটি

<http://www.time.com/time/printout/0,8816,877316,00.html>

### বাংলাদেশ : একটি জাতির জন্ম

JAI Bangla! Jai Bangla!" From the banks of the great Ganges and the broad Brahmaputra, from the emerald rice fields and mustard-colored hills of the countryside, from the countless squares of countless villages came the cry. এই ছিল মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় লাভের পর টাইম ম্যাগাজিনের ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ Bangladesh: Out of War, a Nation Is Born এর প্রথম লাইন।

টাইম এর এই ঐতিহাসিক প্রতিবেদনটিতে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের প্রেক্ষাপট, বাঙালীর আবেগ আর দেশের প্রতি ভালবাসাকে খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সাথে যুদ্ধবিধবাস্ত একটি দেশের সামনের অনিশ্চিত এবং কঠিন সময়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকা এবং পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণসমূহ। অনেক অনিচ্ছতা আর কঠিন বাস্তবতার দোলাচলেও টাইম ম্যাগাজিন এর এই কঠি লাইন নতুন জন্ম নেয়া একটি দেশের আবেগকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট...

And so at week's end the streams of refugees who walked so long and so far to get to India began making the long journey back home to pick up the threads of their lives. For some, there were happy reunions with relatives and friends, for others tears and the bitter sense of loss for those who will never return. But there were new homes to be raised, new shrines to be built, and a new nation to be formed. The land was there too, lush and green.

স্বাধীনতার এই অমূল্য আরেকটি দলিলটি পড়ার জন্য লিংক  
<http://www.time.com/time/printout/0,8816,878969,00.html>

## পূর্ব পাকিস্তান সরকারের গোপন দলিল

# নিজামী মুজাহিদ মুক্তিযুদ্ধ প্রতিহত করতে তৎপর ছিলেন

### শওকত হোসেন মাসুম

মতিউর রহমান নিজামী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে সব রকমের সাহায্য করতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দলীয় নেতাকর্মীদের বাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। আর আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করতে আলবদর বাহিনী গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন দলীয় কর্মীদের। তাদের সেই অপকীর্তির বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন প্রতিবেদনে।

পূর্ব পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই গোপন প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতা ও সাধারণ কর্মীদের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯৭১ সালে এই প্রদেশের তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে ইয়াহিয়া সরকারকে মাসে দুইবার গোপন প্রতিবেদন পাঠাতো।

প্রতিবেদনের অফিসিয়াল শিরোনাম ‘ফর্টেনাইটলি সিক্রেট রিপোর্ট অন দ্য সিচুয়েশন ইন ইস্ট পাকিস্তান’।

ওই প্রতিবেদনে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎকালীন সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী, ছাত্র সংঘ নেতা আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ, এ টি এম আজহারুল ইসলাম কিভাবে তখন পাকিস্তানকে রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের শারীতে করতে তৎপর ছিলেন এসবের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। বর্তমানে এই তিনজন যথাক্রমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর, সেক্রেটারি জেনারেল ও সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল।

ওই গোপন প্রতিবেদনে দেখা যায়, একাত্তরের ১৪ জুন ইসলামী ছাত্র সংঘের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেনাবাহিনী যেভাবে কাজ করছে তাতে আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা সম্ভব। তিনি বলেন, ইসলাম রক্ষায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে। এজন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের বাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তিনি। প্রসঙ্গত, ইসলামী ছাত্রসংঘ ছিল ওই সময়ে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন।

প্রতিবেদনের মে মাসের প্রথম তাগ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৫ মে ঢাকা নগর জামায়াতের এক সভায় গোলাম আয়ম পাকিস্তান রক্ষার্থে কি কি করণীয় সে বিষয়ে দলের নেতাদের নির্দেশ দেন এবং সব কলকারখানা চালু রেখে দেশে যে স্বাভাবিক অবস্থা

বিবাজ করছে এই পরিস্থিতি সৃষ্টির ব্যাপারেও সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা করতে বলেন। ১১ মে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী রহমত আলী ও মেজের জেনারেল (অব: ) ওমরাহ খান ঢাকায় আসেন। গোলাম আয়মসহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠক করে তারা জামায়াত কর্মীদের পাকিস্তান সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতার আহ্বান জানান। পাকিস্তানের বিভিন্ন যৌকনোভাবে রুখতে হবে এই নির্দেশ দেন তারা। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এই দলিলে দেখা যায় [নম্বর ৪৮২/১৫৮-পল./এস(আই)], ৪ আগস্ট খুলনা জেলা জামায়াতের এক সভায় আমীর গোলাম আয়ম তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আখ্য দেন বিছিন্নতাবাদী হিসেবে। তিনি বলেন, মুজিব দেশের মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। গোলাম আয়ম তার ভাষায় ‘বিছিন্নতাবাদীদের’ ধ্বংস করতে জামায়াতের নেতৃত্বে অন্যন্যদের একত্র হওয়ার আহ্বান জানান। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুস সাতার। এই সাতার বাগেরহাট-৪ আসন থেকে নির্বাচিত জামায়াত দলীয় সাবেক সাংসদ। ২৮ আগস্ট ১৯৭১ এ দেওয়া উপরিউক্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব এম এম কাজিম। প্রতিবেদনে [নম্বর ৫৪৯(১৫৯)-পল.এস(আই)] দেখা যায়, আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সম্মেলনে বক্তব্যে অধ্যাপক গোলাম আয়ম বলেন, ‘হিন্দুরা মুসলমানদের অন্যতম শক্র। তারা সব সময় পাকিস্তানকে ধ্বংসের চেষ্টা করছে।’ সম্মেলনে গোলাম আয়ম প্রতি গ্রামে শাস্তি (পিস) কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভিতিকারী আখ্য দিয়ে তাদের দমনের কার্যক্রম নেওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। তিনি বলেন, খুব শিগগির রাজাকার, মুজাহিদ ও পুলিশ মিলিতভাবে দুর্ভিতিকারীদের মোকাবিলায় সক্ষম হবে। ১৮ আগস্ট স্বরাষ্ট্র সচিব এই প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন।

অক্টোবরে দ্বিতীয় ভাগের সরকারি এই গোপন প্রতিবেদনে (১৩ নভেম্বর ১৯৭১ স্বরাষ্ট্র সচিব সারিত) বলা হয়েছে, ১৭ অক্টোবর রংপুরে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের এক সভায় আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ আল বদর বাহিনী গড়ে তুলতে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ইসলামবিরোধী শক্তিদের প্রতিহত করতে হবে। এজন্য যুবকদের সংগঠিত করে আল-বদর

বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ওপরে তিনি গুরুত্ব দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ৭ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামী আল-বদর দিবস পালন করে। দলের নেতারা দিবস পালনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আল-বদর বাহিনীতে জনগণকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয় ‘যারা পাকিস্তান চায়না তারা আমাদের শক্র। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রুখতে হবে ও শক্রদের প্রতিহত করতে হবে।’ এদিকে ১৪ নভেম্বর ঢাকা নগর জামায়াতের ২০ সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে শুরার বৈঠকে আবারো পাকিস্তান রক্ষায় জেহাদের ডাক দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় ভাগের গোপন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৬ সেপ্টেম্বর সিলেটে এক সভায় ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী আওয়ামী লীগ নেতাদের তীব্র বিমোচনগার করে বলেন, তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। হাত মিলিয়ে ভারতের সঙ্গে। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। ইসলামী ছাত্র সংঘ ও জালালাবাদ ছাত্র সমিতি যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। ইসলামী ছাত্র সংঘ ও জালালাবাদ ছাত্র সমিতি যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। এই প্রতিবেদনে স্বরাষ্ট্রসচিব এম এম কাজিম স্বাক্ষর করেন ১৫ অক্টোবর ১৯৭১।

২৫ সেপ্টেম্বর লালবাগের ১/১ আব্দুল মতিন চৌধুরী রোডে জামায়াতে উলেমা ইসলাম ও মেজামে ইসলামী দলের নির্বাহী কমিটির বৈঠক হয়। এতে ছিলেন মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, মৌলভী আশরাফ আলী, মৌলভী মোঃ ইব্রাহিম, মুফতি মোঃ ইউসুফ, মাওলানা মোঃ ইসহাক (পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় সরকার মহানী)। বৈঠকে দলটি উপ-নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে ৬ সেপ্টেম্বর ইসলামী ছাত্র সংঘ ঢাকা মাদ্রাসায়ে আলিয়ায় ‘পাকিস্তান প্রতিরক্ষা দিবস’ পালন করে। সভায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা রায় সর্বান্তক কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র সচিব স্বাক্ষরিত সেপ্টেম্বর প্রথম ভাগের এই প্রতিবেদনে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে।

এর আগে ৩ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আয়ম, পাকিস্তানের আইনশাস্ত্রালো রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগের নির্দেশ দেন দলের নেতা-কর্মীদের। একইসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভিতিকারী আখ্য দিয়ে তাদের প্রতিহত করার নির্দেশও দেন। প্রসঙ্গত, ১৭ সেপ্টেম্বর গুরুবার মালেক ৯ সদস্যের মন্ত্রপরিষদের শপথ গ্রহণ করান। এতে জামায়াতের দুইজন ছিল। এরা হলেন আববাস আলী খান ছিলেন জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির, মাওলানা ইউসুফ। আববাস আলী খান ছিলেন নায়েবে আমির। কৃতজ্ঞতা : আরিফুর রহমান দোলন

ইতিহাস খুঁড়ে দেখা

# মুজিবনগর সরকার, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল দলিল এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক

মিরাজুর রহমান

একটি জাতির জন্য তার সঁচি সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস জানাটা দরকারি। মুক্তিযুদ্ধের পর বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় থাকা সরকারগুলোর স্বেচ্ছাচারিতার কারণে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঠিক ইতিহাস নিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে স্পষ্টতই বিভ্রান্তি আছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে মিডিয়া সর্বত্রই ইতিহাসের কাটাছেড়া হয়েছে তাই এর মাঝ থেকে সঠিক ইতিহাস তুলে আনা কঠকর। মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিলপত্র এই সব বিভ্রান্তি থেকে নতুন প্রজন্মসহ সকল বাংলাদেশীকে সঠিক ইতিহাস জানানোর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইদানীং রূপে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন সে ব্যাপারে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কে ছিলেন সর্বাধিনায়ক? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নাকি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী? আসলে এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে। পাঠ্যপুস্তক থেকেও সঠিক ব্যাপার জানা সম্ভব নয়, এমনকি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব প্রাকাশনায়ও এ ব্যাপারে দুই ধরনের কথা আছে। কোথাও বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বাধিনায়ক আবার কোথাও বলা হয়েছে জেনারেল ওসমানী ছিলেন সর্বাধিনায়ক। আসুন ইতিহাস খুঁড়ে দেখি, আসল সত্য কোনটি?

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় বাংলাদেশে কার্যত কোন সরকার ছিলো না। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলেও এবং তাকে সরকার প্রধান হিসাবে ঘোষণা দেয়া হলেও বাংলাদেশ সরকারের রূপরেখা ১৯৭১ এর ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত স্পষ্ট ছিলো না। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় পরিষদের সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন এবং এই সরকার ১৭ই এপ্রিল কৃষ্ণিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার (যেটিকে পরে মুজিবনগর নামে নামকরণ করা হয়) একটি আমবাগানে শপথ গ্রহণ করেন। ১৭ই এপ্রিল শপথ নিলেও ১০ই

এপ্রিল সরকার গঠনের পর সেইদিনই তারা স্বাধানতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেন। মূল ঘোষণাপত্রটি ছিলো ইংরেজিতে এবং সেটি এই লেখার সাথে সংযুক্ত করেছি।

এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আনন্দস্বরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সেই সাথে ঘোষণাপত্রে এটি উল্লেখ করা হয় যে প্রেসিডেন্ট নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের সকল আর্মড ফোর্সেস এর সুপ্রীম কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কমান্ডারের সরল বঙ্গানুবাদ হতে পারে সর্বাধিনায়ক।

মূল ইংরেজি থেকে উদ্ধৃতি ..

“.....We the elected representatives of the people of Bangladesh as honor bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and Having held mutual consultations, and In order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice, Declare and constitute Bangladesh to be sovereign peoples' Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and

That the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic.....

এই ঘোষণাপত্রটি ছিলো চূড়ান্ত বিজয়লাভের পর বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং সংবিধান রচনার আইনি দলিল।

এখানে একটি ব্যাপার উল্লেখ্য যে তখনে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিলো না এবং তখনও মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়নি। তখন যেটি ছিলো সেটি হলো পাকিস্তানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের স্বতঃক্ষুর্ত প্রতিরোধের মাধ্যমে গড়ে উঠা মুক্তিফৌজ। এরপর ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করার পর গঠন করা হয় মুক্তিবাহিনী, যার কমান্ডার-ইন-চীফ (Commander-in-chief) হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় কর্ণেল (পরবর্তীতে জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানীকে। এখানে উল্লেখ্য যে জেনারেল ওসমানীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মা রণাঙ্গনে ত্রিপশ বাহিনীর কমান্ডার হিসাবে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিলো।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুক্তিবাহিনী গঠিত হলেও এর কোন সম্মিহিত রূপ ছিলো না এবং তখনও নিয়মিত বাহিনী হিসাবে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত ছিলো না। সংগঠিত বাহিনী হিসাবে মুক্তিবাহিনী যাত্রা শুরু করে ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই। এই দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভার মিটিংয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে আর্গানাইজড ফর্মে মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। কর্ণেল আতাউল গণি ওসমানীকে কমান্ডার-ইন-চীফ (Commander-in-chief) হিসাবে বহাল রেখে, লে. কর্ণেল আব্দুর রবকে টেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ এবং এয়ার ফোর্সের প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এ ছাড়া ১১টি সেক্টরের প্রতিটিতে আলাদা করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হয় যাদের সবাই কমান্ডার-ইন-চীফ (Commander-in-chief) কর্ণেল ওসমানীর অধীনে ছিলেন।

এই হলো প্রকৃত ইতিহাস। এখন মুজিবনগর সরকার যখন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (যেটি চূড়ান্ত বিজয় লাভের পর বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং সংবিধান রচনার আইনি দলিল) বঙ্গবন্ধুকে (রাষ্ট্রপতি হিসাবে) বাংলাদেশ সরকারের অধীনস্ত সকল আর্মড ফোর্সেস এর সুপ্রিম কমান্ডার (Supreme Commander) বা সর্বাধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করার পর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সেটি স্পষ্ট। কারণ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটিই হলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান আইনী দলিল যা ছিলো সংবিধান এবং সরকার গঠনের মূল ভিত্তি। এখানে উল্লেখ্য যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে জেলে আটক থাকার কারণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করায় মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত সর্বাধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন কেননা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির সর্বাধিনায়ক হবার ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা ছিলো।

পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ (Commander-in-chief) কর্ণেল ওসমানীকে নিয়োগ দেয়ায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মূল নেতৃত্বে তিনি থাকায় তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান সেনাপতি (যেটি কমান্ডার-ইন-চিফের বগ্নাবাদ হতে পারে) বা মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এখানে এটা বুঝাতে হবে তিনি কমান্ডার-ইন-চিফ (Commander-in-chief) হলেও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের সকল আর্মড ফোর্সেস এর সুপ্রিম কমান্ডার (Supreme Commander), এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, এর আওতাধীন ছিলেন। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা সুপ্রিম কমান্ডার (Supreme Commander) ছিলেন নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এখন একটি সহজ সত্যকে বুঝাতে হবে এর মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর বিন্দুমাত্র অবমূল্যায়ন হয় না। তার যোগ্যতা, নেতৃত্ব গুণবলীর কারণেই তাকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ (Commander-in-chief) হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এবং সেই যৌবনকালের বার্মা রণাঙ্গনের মত তিনি তার যুদ্ধকৌশল এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে সুচারূভাবে পরিচালন করেছেন এবং বিজয় ছিন্নয়ে নিয়ে এসেছেন। একটি জাতির জন্মযুদ্ধের একজন রূপকার এবং জাতীয় বীর হিসাবে আজীবন সকল বাংলাদেশী তার অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে মনে রাখবে। যারা তার অবমূল্যায়নের চেষ্টা করে তারা আসলে নিজেদেরই অবমূল্যায়ন

করে তাতে জেনারেল ওসমানীর অবদানে একটুকুও আঁচড় পড়ে না।

পুনর্শ : মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলিতেও এখনো বিভাসি আছে। সম্প্রতি বিবিসিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাওয়া সংক্রান্ত একটি সংবাদে অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল (মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রুপ ক্যাপ্টেন) এ কে খন্দকারকে মুক্তিযুদ্ধের উপ-সর্বাধিনায়ক হিসাবে লেখা হয়েছে। লিংক এখানে। যদিও আইডিয়ালি বলা উচিত ছিলো মুক্তিবাহিনীর উপ-সর্বাধিনায়ক। আসলে সরকারকেই



উদ্যোগী হয়ে এই জাতীয় বিভাসি দূর করা উচিত।

সংযুক্ত : ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গহীত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল ইংরেজি দলিল।

দলিলটির ইংরেজি টেক্সট

Whereas free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a constitution,

And

Whereas at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

And

Whereas General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March 1971, for the purpose of framing a constitution,

And

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistani authorities declared an unjust and treacherous war,

And

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of the 95 million people of Bangladesh, in due fulfillment of the legitimate right of self determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

And

Whereas in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

And

Whereas the Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

And

Whereas the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

And

We the elected representatives of the people of

Bangladesh as honor bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and Having held mutual consultations, and In order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice, Declare and constitute Bangladesh to be sovereign peoples' Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and That the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic, Shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon, Shall exercise all the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers, as he considers necessary, Shall have the power to levy taxes and expend monies, Shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and Do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government, We the elected representatives of the people of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President, We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the family of nations and under the Charter of United Nations. We further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March 1971. We further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint prof. Yusuf Ali our duly Constituted Potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

## বিবিসি বাজার : মুক্তিযুদ্ধের অজানা কাহিনী

### আমিনুল ইসলাম জুয়েল

জায়গার নাম বিবিসি বাজার। তাই বলে জায়গাটা কিন্তু লন্ডনে নয়। এমনকি সেখানে কোন বেতার কেন্দ্র কিংবা বেতার উপকেন্দ্রও নেই। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ আর সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ অডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি)-এর গৌরবময় স্মৃতি ধারণ করে ধন্য আজকের বিবিসি বাজার। ইংশ্রীন্ডি উপজেলার রূপপুর বাজারের নাম হয়েছে বিবিসি বাজার। এই বাজারের নেপথ্য নায়কের নাম আবুল কাশেম মোল্লা।



মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রূপপুর এলাকাটি বেশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এর সন্নিহিত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ এবং পাকশী পেপার মিল- দুটোই ছিল পাকবাহিনীর বিশাল বহরে সজ্জিত। ঘন গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত অপেক্ষকৃত নিরাপদ স্থান রংপুর কড়ই তলায় গ্রামের যুবক আবুল কাসেম মোল্লা এপ্রিল(১৯৭১) মাসের প্রথম দিকে একটি চায়ের দোকান দেন। দোকানে ছিল একটা খ্রিব্যান্ড রেডিও। যে সময়ে পাঁচ গ্রাম সুরে একটি রেডিও পাওয়া যেত না সেই সময়ে একটি খ্রিব্যান্ড রেডিওর মালিক হওয়া ছিল রীতিমত গর্বের বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর শোনার জন্য তিনি বিবিসি ধরতেন। লোকজন কড়ই তলায় চা খাওয়ার নাম করে যুদ্ধের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেত। তাদের

আলোচনার খোরাগ যোগাত বিবিসির খবর। ধীরেধীরে লোকসমাগম বাড়তে লাগল। বেশিরভাগ লোকই আসত যুদ্ধের খবরাখবর শোনার জন্য। কয়েক মাসের মাসের মধ্যে লোকজন রূপপুর বাজারের নাম পরিবর্তন করে রাখল বিবিসি বাজার। স্বাধীনতার পর জায়গাটির নাম স্থায়ীভাবেই বিবিসি বাজার বলে পরিচিত পায়। দেশ স্বাধীনের পর সারা জেলায় বিবিসি বাজারের কাহিনী ছড়িয়ে যায়। বিবিসি কর্তৃপক্ষের কানেও পৌছে যায় কাসেম মোল্লার বিবিসি বাজারের কাহিনী। ১৯৯২ সালে বিবিসির পথগুলি বছর পূর্তিতে তাদের একটি দল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান সফরে আসে। এই প্রতিনিধিদল বিবিসি বাজার পরিদর্শন করে। তাদের সম্মানে এলাকাবাসী প্রাণচালা সংবর্ধনার আয়োজন করে। প্রতিনিধিদলও অনুরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

স্বাধীনতার এত বছর পর বিবিসি বাজার চিলেও অনেকেই জানেন না এর গোড়ার কথা। মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোতে যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কিংবা বিবিসির অনুষ্ঠান শোনা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, রাজাকার-আলবদরের কোপানলে পড়ার সমূহ আশংকা ছিল, এই মহা আশংকার কথা জেনেও ভরা বাজারে বসে শুধু নিজেই শোনেননি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কিংবা বিবিসির অনুষ্ঠান, অন্য শতজনকেও পৌছে দিয়েছেন সেই সংবাদ। এটা কি কম সাহস কিংবা দেশপ্রেমের কথা?

মো. তারিক মাহমুদের পোস্ট থেকে লেখাটি সংগৃহীত।

[পুরোনো কোন পত্রিকার একটা ছেঁড়া পাতায় লেখাটা পড়েছিলাম, সেখানে লেখকের নাম ছিল। সবার সাথে শেয়ার করলাম।]

# ৩ মার্চ ১৯৭১ : পল্টনের জনসভায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা

১. এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালী ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির সেনাবাহিনীর জন্য হ্যাকানে প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

২. এই সভা ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর বাঙালী ভাইদের বাঁচাইয়া রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদেরকে রাওডব্যাকে রক্ত প্রদানের আহ্বান জানাইতেছে।

৩. এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে ক্রমক-শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪. এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্তা রাখিয়া তাঁহার সফল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫. এই সভা দলমত নির্বেশে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইতেছে।

জয় বাংলা

ইশতেহার নথি এক

(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে :

গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিষণত করার জন্য বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ঘড়্যবন্ধ তা থেকে বাঙালীর মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকেরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকায় ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম "বাঙালাদেশ"। স্বাধীন ও সার্বভৌম "বাঙালাদেশ" গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম "বাঙালাদেশ" গঠন করে পথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম "বাঙালাদেশ" গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকলে সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক, শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম "বাঙালাদেশ" গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধা গ্রহণ করতে হবে :

(ক) বাঙালাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর, জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম কর্মসূচি গঠন করতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদের এক্যবন্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চল কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশ্রেষ্ঠালার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুঠতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে :

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের স্বাথের তন্ত্রীবাহী পশ্চিমা অবাঙালী মিলিটারীকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রুসৈন্যকে খত্ম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে কোন শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ ও খত্ম করার জন্য সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দ্রষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি.....' গানটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(ঌ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাঙালাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(঍) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বাপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক :

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙালাদেশ গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে--

\* স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-- দীর্ঘজীবী হউক।

\* স্বাধীন কর স্বাধীন কর-- বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

\* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা-- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

\* গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়-- মুক্তিবাহিনী গঠন কর।

\* বীর বাংগালী অস্ত্র ধর-- বাংলাদেশ স্বাধীন কর

\* মুক্তি যদি পেতে চাও-- বাংগালীরা এক হও।

বাংলা ও বাংগালীর জয় হোক  
জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।।

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খন্দ

# বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ

আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি- আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়-তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে।

কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুর্মুর্মুর আর্তনাদের ইতিহাস, রক্ত দানের করণ ইতিহাস। নির্বাচিত মানুষের কান্নার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয় লাভ করেও ক্ষমতায় বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম করে রাখলো। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা দেয়া হলো এবং এর পর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হলো। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বলেলেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম।

তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াহিয়া খানের সংগে আলোচনা হলো-আমরা তাকে ১৫ ইঁ ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম। কিন্তু 'মেজরিটি' পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন সংখ্যালভ্য দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরিটি পার্টির নেতা নই, সমগ্র পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। ভুট্টো সাহেব বলেলেন, মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন ডাকতে, তিনি মার্চের ৩ তারিখে অধিবেশন ডাকলেন।

আমি বললাম, তবুও আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা মেনে নেব, এমনকি তিনি যদি একজনও হন।

জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা হলো। ভুট্টো

সাহেব বলে গেছেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়; আরো আলোচনা হবে। মণ্ডলান নুরানী ও মুফতি মাহমুদ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পার্লামেন্টারী নেতা এলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা হলো-উদ্দেশ্য ছিলো আলাপ-আলোচনা করে শাসনতন্ত্র রচনা করবো। তবে তাদের আমি জানিয়ে দিয়েছি ৬-দফা পরিবর্তনের কোন অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের সম্পদ।

কিন্তু ভুট্টো হৃষি করে দিলেন। তিনি বললেন, এখনে এসে 'ডবল জিম্বী' হতে পারবেন না। পরিষদ কসাই খানায় পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের প্রতি হৃষি করে দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্ষণাত্মক করা হবে, তাদের মাথা ভেঙ্গে দেয়া হবে। হত্যা করা হবে। আন্দোলন শুরু হবে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত। একটি দোকানও খুলতে দেয়া হবে না।

তা সত্ত্বেও পয়ত্রিশ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য এলেন। কিন্তু পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন। দোষ দেয়া হলো, বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে, বলা হলো আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই কিছু হয়নি। এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো। আমি শাস্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এলো।

কিন্তু কি পেলাম আমরা? বাংলার নিরস্ত্র জনগণের উপর অস্ত্র ব্যবহার করা হলো। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। কিন্তু আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনে দিয়েছি বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে, আজ সে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্য। আমার দুঃখী জনতার উপর চলছে গুলী।

আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখনই দেশের শাসনভাব গ্রহণ করতে চেয়েছি, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে-আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি ১০ই মার্চ তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে চেয়েছি, তাঁর সাথে টেলিফোন আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট, ঢাকায় আসুন দেখুন আমার গৱাব জনসাধারণকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে।

আমি আগেই বলে দিয়েছি কোন গোলটেবিল বৈঠক হবে না।

কিসের গোলটেবিল বৈঠক? কার গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা বোনের কোল শুন্য করেছে তাদের সাথে বসবো আমি গোলটেবিল বৈঠকে ?

তেসরা তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহবান জানালাম। বললাম, অফিস-আদালত, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেমে নিলেন।

হঠাতে আমার সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে একজনের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ আমার ও বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। দোষ করলেন ভুট্টো- কিন্তু গুলী করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে। আমরা গুলী খাই, দোষ আমাদের- আমরা বুলেট খাই, দোষ আমাদের।

ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন। কিন্তু আমার দাবী সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো পরিষদে বসবো কি বসনো না। এ দাবী মানার আগে পরিষদে বসার কোন প্রশ্নই ওঠে না, জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি। রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি, শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখে পরিষদে যোগ দিতে যাব না।

ভাইয়েরা, আমার উপর বিশ্বাস আছে? আমি প্রধানমন্ত্রী চাই না, মানুষের অধিকার চাই। প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি, ফাঁসীর কাঠে ঝুলিয়ে নিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মালা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের খণ্ড আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো; মনে আছে? আজো আমি রক্ত দিয়েই রক্তের খণ্ড শোধ করতে প্রস্তুত।

আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোন কর্মচারী অফিস যাবেন না। এ আমার নির্দেশ। গরিবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিস্ক চলবে, ট্রেন চলবে আর সব চলবে।

ট্রেন চলবে- তবে সেনাবাহিনী আনা-নেয়া করা যাবে না। করলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য আমি দায়ী থাকবো না। সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট-জজকোর্ট সহ সরকারী,

আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্ত্বাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। শুধু পূর্ব বাংলার আদান-প্রদানের ব্যাক্ষগুলো দুঃখন্টার জন্য খোলা থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে। তবে, সাংবাদিকরা বহির্বিশ্বে সংবাদ পাঠাতে পারবেন। এদেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুবো শুনে চলবেন। দরকার হলে সমস্ত চাকা বন্ধ করে দেয়া হবে।

আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে আসবেন। যদি একটিও গুলি চলে তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলবেন। যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো-পানিতে মারবো। হৃকুম দিবার জন্য আমি যদি না থাকি, আমার সহকর্মীরা যদি না থাকেন, আপনারা আদেলন চালিয়ে যাবেন।

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবে না। গুলি চালালে আর ভাল হবে না। সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না। বাস্তালী মরতে শিখেছে, তাদের কেউ দাবাতে পারবে না।

শহীদের ও আহতদের পরিবারের জন্য আওয়ামী লীগ সাহায্যে কমিটি করেছে। আমরা সাহায্যের চেষ্টা করবো। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন। সাত দিনের হরতালে যেসব শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন, কারফিউর জন্য কাজ করতে পারেননি- শিল্প মালিকরা তাদের পুরো বেতন দিয়ে দেবেন।

সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন অফিসে দেখা না যায়। এ দেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কিভাবে করতে হয় আমি জানি। কিন্তু হুঁশিয়ার, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত্রু চুকেছে, ছাপবেশে তারা আত্মকলের সৃষ্টি করতে চায়। বাস্তালী-অবাস্তালী, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোন বাস্তালী রেডিও এবং টেলিভিশনে যাবেন না।

শাস্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসাবে বাস করার সন্তান আছে, তা না হলে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রস্তুত থাকবেন, ঠান্ডা হলে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষেপ চালিয়ে যাবেন। আন্দোলন বিমিয়ে পড়লে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃংখলা বজায় রাখুন। শৃংখলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না।

আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্যায়, ইউনিয়নে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।

রংগার হমপঞ্চের পোস্ট থেকে সংগৃহীত



## বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার : জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত

### তীরন্দাজ

তিএনইডারিউ টিভি, নিউইয়র্কে ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি ভাষ্যকার ও সাংবাদিক ডেভিড ফরস্টার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার নেন। জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীতের যে অংশটি এর ভেতরে ছিল, তা অনুবাদ করা হল।

**ফরস্টার:** আপনি একটি দেশের জন্মের প্রথম সপ্তাহেই কঠগুলো জরুরি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন। জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত নিয়েও একটি সিদ্ধান্তে পৌছাতে পেরেছেন।

**মুজিব:** হ্যাঁ। পতাকাটি অনেক আগে থেকেই ব্যাবহার করা হতো। তবে ছেট একটি পরিবর্তন আনতে হয়েছে। আর আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে গানটি নিয়েছি, তা অনেক আগে থেকেই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বিবেচিত হতো। এখন তার একটি অফিসিয়াল স্বীকৃতি দরকার। পতাকায় বাংলাদেশের ম্যাপ ছিল। আর কোন দেশের পতাকাতে এমন কোন ম্যাপ নেই।

**ফরস্টার:** কেন?

**মুজিব:** প্রথিবীর কোন জায়গাতেই এমন কিছু হয়নি। আমরা দেশের মানচিত্র পতাকায় রাখতে চাই না। আমাদের সিদ্ধান্ত দেশের জনগণও মেনে নিয়েছেন। মানচিত্রটি বাদ দিতে চাই পতাকায়, উদীয়মান সূর্য পতাকায় আগের মতোই থাকবে।

**ফরস্টার:** জাতীয় সঙ্গীত কার রচনা করা?

**মুজিব:** এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত পুরোনো একটি গান।

**ফরস্টার:** এ গানটি কি বাংলাদেশে অনেক বছর ধরে গাওয়া হতো?

**মুজিব:** হ্যাঁ, অনেক বছর ধরে। আমার গত সাতাহ মার্চের সভায় এক মিলিয়ন জনতা 'জয় বাংলা' শোগানে উত্তাল। এরই মর্মে তরুণরা যখন এই গানটি গাইল, দশ লাখ মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালো গানটিকে। তখনই এই গানটিকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ভাবা হয়েছে।

# স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

## মাশুকুর রহমান ও মাহিবুর রহমান জালাল

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের শুরুতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা বেতার কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। পাকিস্তানিরা রেডিও স্টেশনটির নতুন নাম দেয় 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা'। এ কেন্দ্র থেকেই তারা সামরিক আইন জারির ঘোষণা দেয়। বাঙালিদের কঠ রোধ করতে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে বাঙালিরা ঠিকই প্রতিরোধ গড়েছিল এবং লড়াইয়ে ফিরে এসেছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ।

বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী তীব্র আক্রমণ অবজ্ঞা করে ওই দিনই সন্ধায় একটি ছোট রেডিও স্টেশন সম্প্রচার শুরু করেছিল। চট্টগ্রামের উভৰে কালুরঘাট নামক স্থান থেকে গোপন ওই রেডিও স্টেশনটি বিশ্বাসীর কাছে ঘোষণা করে: 'শেখ পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি নাগরিককে সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।' রেডিও স্টেশনটি নিজের নামকরণ করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

পরবর্তী চার দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে রেডিও স্টেশনটির প্রচারণা যুদ্ধ চলে। যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দাবি করে বাংলাদেশে সব কিছুই শাস্ত, তখন গোপন রেডিও স্টেশনটি ঘোষণা করে, মুক্তি বাহিনীরা রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে এবং পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দাবি করে, তারা বাঙালিদের ইচ্ছাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আর গোপন রেডিও স্টেশনটি ঘোষণা করে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গর্ভন জেনারেল টিক্কা খান গুণহত্যার শিকার হয়েছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দাবি করে, বাঙালিরা পরাজিত হয়েছে, অন্যদিকে গোপন রেডিও দাবি করে, বাংলাদেশের একটি প্রাদেশিক সরকার গঠন করা হয়েছে।

গণহত্যার শুরুর দিনগুলোতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিশ্বের কাছে ঘোষণা দেয়, বাঙালিরা ছাড় দেবে না, বাঙালিরা যুদ্ধ করবে এবং তাদের আত্ম্যাগ বৃথা যাবে না। বিশ্ব গোপন ওই

রেডিওর ঘোষণা শুনেছিল। মার্চের সংকটময় ওই পাঁচ দিন কালুরঘাটের ছোট রেডিও স্টেশনটি কখনো নীরব হয়নি। রেডিও স্টেশনটি বাঙালিদের মনোবলকে পুনরংকার করেছিল এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হতাশায় ডুবিয়েছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নারী ও পুরুষেরা এবং ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা রেডিও স্টেশনটিকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। পাশাপাশি বিশ্বের কাছে ঘোষণা করেছিল, সংগঠিত বাঙালি প্রতিরোধ নতুন উদ্যমে লড়াইয়ে ফিরে এসেছে। পাকিস্তানি ট্যাংক ও যুদ্ধবিমান বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কঠকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না, বিষয়টি তারা নিশ্চিত করেছিল।

### পরিবর্তিত ঐতিহাসিক দলিল

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল, তার ইতিহাস সঠিকভাবে প্রতিফলনের লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার দেশের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। গত তিন দশক ধরে আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রশি টানাটানির মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস একাধিকবার নতুন করে লেখা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের ভূমিকার প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ একাধিকবার পুনর্লিখিত হয়েছে।

ইতিহাস বই সংশোধনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নিভৰ করেছে স্বাধীনতায়নের ব্যাপারে সরকারের আনুষ্ঠানিক ইতিহাসের পুর, যা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

আনুষ্ঠানিক ইতিহাস থেকে নিচের কালুরঘাটি পাওয়া যায়:

\* ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর থেকে ২৬ মার্চ ভোরের কোনো এক সময়ের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার একটি ঘোষণাপত্র লিখেছিলেন।

\* ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাপত্রটি সম্প্রচার করা হয়। তবে খুব কম মানুষই সম্প্রচারিত ঘোষণাটি শুনতে পেয়েছিল।

\* ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ কালুরঘাট থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে একটি ঘোষণা পাঠ করেন। ওই ঘোষণা বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো শুনতে পেয়েছিল এবং বিশ্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার ব্যাপারে জানতে পারে।

উপরোক্ত কালুরঘাম অনুযায়ী, ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা পাঠের আগ পর্যন্ত বহির্বিশ্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা শুনতে পায়নি।

স্বাধীনতার ঘোষণার এই বিবরণটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে এবং প্রথাগত বিচক্ষণতায় প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এটা গত তিন দশক ধরে তৈরি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, জনপ্রিয় ইন্টারনেট বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় কালুরঘাট রেডিও ট্রাসমিটার-বিষয়ক নিবন্ধে বলা হয়েছে: '১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এম এ হানান স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণার একটি ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেছিলেন.....ধারণা করা হয়, স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা বিশ্ব গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছায়নি।'

মেজর জিয়াউর রহমানের শুরুর কথাগুলো ছিল বাংলায় 'আমি মেজর জিয়া বলছি'। এরপর তিনি সার্বভৌম-স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা পাঠ করেন, যা বার্তা সংস্থাগুলো শুনতে পেয়েছিল এবং তারা তা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচার করে।

জিয়াউর রহমানের ঘোষণা প্রথম শুনতে পায় চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা একটি জাপানি জাহাজ। তারা তাংকশিকিভাবে তা সারা বিশ্বের কাছে প্রচার করে। জিয়ার ঘোষণার সংবাদ প্রথম সম্প্রচার করে রেডিও অস্টেলিয়া এবং বিশ্ব বাংলাদেশের অভ্যন্তরের কথা বিস্তারিত জানতে পারে।

তবে বাস্তবতা আর প্রামাণিক দলিলপত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে।

## মার্চ ২৬, ১৯৭১: কালুরঘাট থেকে ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে সারা বিশ্বের ইংরেজি ভাষার শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলোতে খবর প্রকাশিত হয়। এসব দৈনিকের ওপর একটি জরিপ চালানো হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২৬ মার্চ সকালে কলকাতায় পৌঁছা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকৃত বার্তা থেকে এবং ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচারে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চে বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ইংরেজি দৈনিকগুলোতে জরিপ চালানো হয়েছিল: ভারতের দ্য স্টেটসম্যান এবং দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া; আর্জেন্টিনার বুয়েস এয়ার্স হেরোল্ড; অস্ট্রেলিয়ার দ্য এজ এবং দ্য সিডনি মর্নিং হেরোল্ড; মিয়ানমারের দ্য গার্ডিয়ান; কানাডার দ্য প্রেস অ্যাড মেইল; হংকংয়ের দ্য হংকং স্ট্যান্ডার্ড; ইন্দোনেশিয়ার দ্য জাকার্তা টাইমস; জাপানের আসাহি ইভিনিং নিউজ; নেপালের দ্য রাইজিং নেপাল; ফিলিপাইনের ম্যানিলা টাইমস; সিঙ্গাপুরের দ্য ষ্টেইটস টাইমস; দক্ষিণ অফিসার দ্য প্রিটেরিয়া নিউজ; থাইল্যান্ডের দ্য ব্যাংকক পোস্ট; যুক্তরাজ্যের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, দ্য গার্ডিয়ান, দ্য টাইমস অব লন্ডন; যুক্তরাষ্ট্রের বাণিমোর সান, দ্য বোস্টন প্লেব, শিকাগো টাইমস, ক্রিস্টিয়ান সায়েস মনিটর, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য ফিলাডেলফিয়া ইনকুরিয়ার, সানফ্রান্সিসকো ক্রেনিকেল এবং দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট।

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত দ্য স্টেটসম্যানে ২৬ মার্চ পাওয়া দুটি বার্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়:

পাকিস্তানি বাহিনী আন্দোলনকে চাপা দিতে অগ্রসর হওয়ার পর শুরুবার শেখ মুজিবুর রহমান দুটি বার্তা সম্প্রচার করেছেন। ইউএনআই এ কথা জানায়।

একটি অঙ্গত রেডিও স্টেশন থেকে বিশ্বের কাছে পাঠানো এক বার্তায় আওয়ামী লীগ নেতা (শেখ মুজিব) ঘোষণা দিয়েছেন যে 'শত্রু' আঘাত হেনেছে এবং জনগণ বীরের মতো লড়াই করছে। বার্তাটি কলকাতা থেকে শোনা হয়েছে।

রেডিও স্টেশনটি নিজেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' হিসেবে বর্ণনা করেছে। শিলং থেকে শোনা স্টেশনটির পরবর্তী সম্প্রচারে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছেন।

২৭ মার্চ কলকাতা থেকে প্রকাশিত দ্য স্টেটসম্যান-এ আগের দিনের দুটি বার্তা তুলে ধরা হয় এভাবে:

একটি অঙ্গত রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে আজ সকালে বিশ্বের কাছে পাঠানো এক বার্তায় জনাব রহমান (শেখ মুজিব) ঘোষণা দিয়েছেন যে শত্রু আঘাত হেনেছে এবং জনগণ বীরের মতো লড়াই করছে। বার্তাটি কলকাতা থেকে শোনা হয়েছে।

রেডিও স্টেশনটি নিজেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' হিসেবে বর্ণনা করেছে। শিলং থেকে শোনা স্টেশনটির পরবর্তী সম্প্রচারে তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছেন।

২৭ মার্চ মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া সকালের প্রথম সম্প্রচার থেকে পাওয়া বার্তার বিষয়বস্তু প্রকাশ করে:

আজ বিশ্বের কাছে পাঠানো এক বার্তায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ নিজেদের স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো লড়াই করছে।



একটি অঙ্গত রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রচারিত ওই বার্তা মুম্বাই থেকে শোনা গেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, রেডিও স্টেশনটি পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম অথবা চালনায় অবস্থিত।

বার্তায় জনাব রহমান বলেন: 'আজ রাত ১২টার দিকে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী হঠাত করে পিলখানা ও রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ঘাঁটিতে হামলা চালায়। হামলায় অসংখ্য (নিরন্তর) মানুষ নিহত হয়।

'ঢাকায় ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে কঠিন লড়াই চলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণ অকুতোভয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে।

'আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন এবং শত্রুর কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে তিনি আপনাদের সাহায্য করবেন। জয় বাংলা।'

২৭ মার্চ নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত দ্য স্টেটসম্যানও প্রথম বার্তার বিষয়বস্তু প্রকাশ করে:

জনাব রহমান (শেখ মুজিব) বলেছেন, '২৬ মার্চ রাত ১২টার দিকে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী হঠাত করে পিলখানায় ও রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ঘাঁটিতে হামলা চালায়। এতে অসংখ্য নিরন্তর মানুষ নিহত হয়। ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণ বীরের মতো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে। যেকোনো মূল্যে দেশের প্রতিটি কোনায় শত্রু বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন এবং শত্রুর কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে তিনি আপনাদের সাহায্য করবেন। জয় বাংলা।'

২৬ মার্চ সন্ধ্যায় কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম

জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং বেশ কিছু বার্তা সম্প্রচার করে। সম্প্রচারিত বার্তাগুলোর সবই ধারণ করা হয় এবং এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো, ওই দিন সন্ধ্যায় কালুরঘাটের একটি রিপোর্ট ভারতে ধারণ করা হয়।

এতে বলা হয়, 'শেখ পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি নাগরিককে সার্বভৌম-স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

এই ঘোষণা এবং এর আগের বার্তা ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় সারা বিশ্বে প্রচার করা হয়। এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্বের প্রায় সব সংবাদপত্রেই প্রথম পাতায় ছাপা হয়। বিশ্বের অনেক শীর্ষ সংবাদপত্র পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ এ খবর প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসেবে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস ২৭ মার্চ এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়:

শেখ মুজিবুর রহমান শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। ইসলামী জাতিটির (পাকিস্তান) দুই অংশের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা অসন্তোষ গৃহযুদ্ধে রূপ নেওয়ায় তিনি এ ঘোষণা দেন।

'দ্য ভয়েস অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলা দেশ' নামে একটি গোপন রেডিও থেকে সম্প্রচারিত বার্তায় বলা হয়েছে, 'শেখ মুজিবুর পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি নাগরিককে সার্বভৌম-স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন।'

দালিলিক প্রমাণ নিশ্চিত করে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা গিয়েছিল এবং পরের দিন সকালে এ নিয়ে বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৭২ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশ অবজারভার-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধ অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম ইংরেজিতে পাঠ করেন ওয়াপদার প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম। আর প্রথম বাংলায় পাঠ করেন আবশ কাশেম সন্দীপ। সন্ধ্যায় এম এ হানানও একটি বক্তৃতায় ঘোষণাটি পাঠ করেন।

## মার্চ ২৭, ১৯৭১: মেজর জিয়ার ঘোষণা

২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট থেকে অব্যাহতভাবে সম্প্রচার চালিয়ে যায়। ৩০ মার্চ পাকিস্তানি বিমান হামলা করে বেতার কেন্দ্রটি গুঁড়িয়ে দেয়।

২৮ মার্চ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো খবর প্রকাশ করে, 'জিয়া খান'

নামে এক মেজর ২৭ মার্চ একটি ঘোষণা পাঠ করেন। ঘোষক জিয়া খানকে 'বাংলাদেশ মুক্তি সেনার প্রধান' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন।

২৮ মার্চ নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত দ্য স্টেটসম্যান জানায়: আরেকটি ঘোষণায় রেডিওটি দাবি করেছে, বাংলাদেশের পর পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বেলুচিস্তানের স্বাধীনতাকামী জনগণ এবং পাখতুনিস্তান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে।

রেডিওতে কথা বলা ওই ব্যক্তিটি হলেন 'বাংলাদেশ মুক্তি সেনার প্রধান মেজর জিয়া'।

২৮ মার্চ মুজাই থেকে প্রকাশিত দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়: বাংলাদেশ মুক্তি সেনার প্রধান মেজর জিয়া খান আজ রাতে স্বাধীন বাংলা রেডিওতে ঘোষণা দেন, দু-তিন দিনের মধ্যেই পাকিস্তানি সামরিক প্রশাসন থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হবে।

তিনি বলেন, আত্মসমর্পণ না করলে পশ্চিম পাঞ্জাব সৈনিকেরা 'নিশ্চিহ্ন হবে'।

ওই প্রতিবেদনে মেজর জিয়াটির রহমানকে 'জিয়া খান' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

২৮ মার্চ ভারতীয় পত্রপত্রিকার এ দুটি প্রতিবেদন বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পায়। ভারতীয় পত্রপত্রিকা ছাড়াও ২৮ মার্চ প্রকাশিত সারা বিশ্বের প্রধান ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোর ওপর পরিচালিত জরিপেও ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার সম্প্রচারের ব্যাপারে কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

## মার্চ ২৮, ১৯৭১: মেজর জিয়া এবং বাংলাদেশের 'প্রাদেশিক সরকার'

২৮ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় বাংলাদেশের একটি প্রাদেশিক সরকার গঠন করা হয়েছে এবং মেজর জিয়াকে প্রাদেশিক সরকারের অস্থায়ী প্রধান ঘোষণা করা হয়েছে। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করে, প্রাদেশিক সরকারের দিকনির্দেশনা দেবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘোষণাটি ভারতে শোনা যায় এবং এবারও ভারত মেজর জিয়াটির রহমানকে শুধু মেজর জিয়া খান হিসেবে উল্লেখ করে।

নিজেকে প্রাদেশিক প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেওয়া মেজর জিয়ার একটি বক্তৃতা ২৯ মার্চ নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়:

স্বাধীন বাংলা বেতারের এক সম্প্রচারে 'মুক্তি সেনা'র কমান্ডার ইন টিফ মেজর জিয়া খান বলেছেন, 'আমি এতদ্বারা স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর প্রাদেশিক প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

প্রাদেশিক প্রধান হিসেবে আমি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছি। জয় বাংলা।'

তিনি বলেন, 'শত্রুর আকাশ ও সমুদ্রপথে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে এসেছে।' বাংলাদেশের যুদ্ধরত গণতন্ত্রমনা জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসতে তিনি বিশ্বের সব শাস্তিকামী জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

মেজর জিয়া দাবি করেন, 'মুক্তি সেনারা' কুমিল্লায় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ৩০০ জনকে হত্যা করেছে। যুদ্ধের শেষে রেজিমেন্টের অন্যরা পালিয়ে গেছে।

মেজর জিয়া খানকে অস্থায়ী প্রধান করে প্রাদেশিক সরকার গঠনের খবর ২৯ মার্চ বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পায়। উদাহরণ হিসেবে, ২৯ মার্চ অ্যালেক্সিয়ার দ্য এজ জানায়:

পূর্ব পাকিস্তানের নেতো শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থকেরা মেজর জিয়া খানের অস্থায়ী নেতৃত্বে অধীনে আজ একটি প্রাদেশিক সরকার গঠন করেছে।

একটি বিদ্রোহী রেডিও নতুন সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়। রেডিওটি মেজর জিয়াকে শেখ মুজিবের আওয়াজী লীগের মুক্তি সেনার প্রধান হিসেবে পরিচয় দেয়। তবে শেখ মুজিবকে কেন সরকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়নি, সে ব্যাপারে রেডিওটি কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি।

২৯ মার্চও বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে কোথাও মেজর জিয়াটির রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলা হয়নি।

## মার্চ ৩০, ১৯৭১: দলিলপত্র এবং সংবাদ প্রতিবেদন

১৯৮২ সালে ১৫ খন্দে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক দলিলকে বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র। পাঠ্যপুস্তক সংশোধনে বর্তমান সরকার এটি ব্যবহার করছে। এর তৃতীয় খন্দে মেজর জিয়াটির রহমানের

স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। সেটা এ রকম:

বাংলাদেশ মুক্তি সেনার প্রাদেশিক কমান্ডার ইন চিফ মেজর জিয়া এতদ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

আমি আরও ঘোষণা করছি, আমরা ইতিমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে একটি সার্বভৌম, বৈধ সরকার গঠন করেছি, যা আইন ও সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে প্রতিশুতুরবদ্ধ। নতুন গণতান্ত্রিক সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নন-অ্যালাইনমেন্ট নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সব জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে এই সরকার বাংলাদেশের সার্বভৌম বৈধ সরকার এবং বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক জাতির কাছ থেকে এ সরকারের স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার আছে।

দলিলপত্র অনুযায়ী জিয়াউর রহমান এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ। দলিলপত্রে এর সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে একই দিন নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার। তবে স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২৭ মার্চ সংখ্যায় এই বক্তৃতা ধারণ করা নেই।

দলিলপত্রে উল্লেখিত মেজর জিয়ার বক্তৃতার প্রথম রিপোর্ট ভারতীয় পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ। ভারতীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই বক্তৃতা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ৩০ মার্চ সকালে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

৩১ মার্চ নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত স্টেটসম্যান পত্রিকার ৯ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি প্রতিবেদন আছে এ রকম:

কলকাতা, মার্চ ৩০: শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে গঠিত সরকার বাংলাদেশের সার্বভৌম বৈধ সরকার এবং ‘বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশের কাছ থেকে এর স্বীকৃতি’ পাওয়ার অধিকার আছে। মুক্তি সেনার প্রাদেশিক কমান্ডার ইন চিফ মেজর জিয়া খান আজ সকালে এ ঘোষণা দেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত বার্তায় শেখের পক্ষে মেজর জিয়া খান বলেন, ‘নতুন গণতান্ত্রিক সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নন-অ্যালাইনমেন্ট নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সব জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে।

জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নন-অ্যালাইনমেন্ট নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সব জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে।

‘আমরা ইতিমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে একটি সার্বভৌম, বৈধ সরকার গঠন করেছি, যা আইন ও সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

‘বাংলাদেশের বৈধ গণতান্ত্রিক সরকারকে দ্রুত স্বীকৃতি দিতে আমরা বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী দেশের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।’ বাংলাদেশে ‘বর্বর গণহত্যা’র বিরুদ্ধে নিজ নিজ দেশে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি সব সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

‘মেজর জিয়া খান বলেন, পাকিস্তান সরকার পরম্পরাবিরোধী ব্রিতান মাধ্যমে বিশ্বের জনগণকে বিভ্রান্ত ও ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

‘তবে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা কেউ বিভ্রান্ত হবে না।

৩১ মার্চ মুঘাই থেকে প্রকাশিত টাইমস অব ইন্ডিয়া ১৫ নম্বর পৃষ্ঠার একটি খবরে বলা হয়েছে:

কলকাতা, মার্চ ৩০: শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে গঠিত সরকার বাংলাদেশের সার্বভৌম বৈধ সরকার এবং ‘বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশের কাছ থেকে এর স্বীকৃতি’ পাওয়ার অধিকার আছে। মুক্তি সেনার প্রাদেশিক কমান্ডার ইন চিফ মেজর জিয়া খান আজ সকালে এ ঘোষণা দেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত বার্তায় শেখের পক্ষে মেজর জিয়া খান বলেন, ‘নতুন গণতান্ত্রিক সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নন-অ্যালাইনমেন্ট নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সব জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে।

মেজর জিয়া সম্প্রচার শুরু করেন এ কথাগুলো দিয়ে: আমি, মেজর জিয়া, বাংলা মুক্তিবাহিনীর প্রাদেশিক কমান্ডার ইন চিফ এতদ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

‘আমি আরও ঘোষণা করছি,’ তিনি বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে একটি সার্বভৌম, বৈধ সরকার গঠন করেছি। যা আইন ও সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৩০ মার্চ মেজর জিয়ার দেওয়া বক্তৃতার ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছিল ৩১ মার্চ, যা বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার পায়নি। জরিপ অনুযায়ী ৩০ মার্চ সকালে মেজর জিয়ার দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণা ভারতের বাইরে বিশ্বের ইংরেজি ভাষার কোনো পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়নি।

## উপসংহার

৩০ মার্চ বিকেলে কালুরঘাট থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার বন্ধ হওয়ার পর মেজর জিয়া ব্রাক্ষণবাড়িয়া যান এবং ৩ এপ্রিল তিনি মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর সফিউল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ কর্নেল এম এ জি ওসমানীর অধীনে সেন্ট্র কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ শুরু করেন।

গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ইতিহাস একাধিকবার নতুন করে লেখার কারণে প্রথাগত বিচক্ষণতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭১ সালের শেষ দিকে বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে যে ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত ঘোষণার ভিত্তিতেই সারা বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে মধ্যরাতে ঢাকায় ইপিআর ও পুলিশ ব্যারাকের ওপর হামলার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকৃত বার্তা বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল। যদিও প্রাদেশিক সরকার গঠনের ব্যাপারে ২৮ মার্চ কালুরঘাট থেকে মেজর জিয়ার ঘোষণা ও বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে প্রচার পেয়েছিল। তবে স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে মেজর জিয়াকে কোনো কৃতিত্ব দেওয়া হয়নি।

## রেফারেন্সসহ ইংরেজি ভাষ্য

মাশুকুর রহমান: ফিল্যাস লেখক

মাহবুবুর রহমান জালাল: ‘বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ডকুমেন্টস’-এর কর্মী

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

রূগার সু-শান্তের পোস্ট থেকে লেখাটা সংগৃহীত

# সেই কালোরাতে ইথারে খুনীরা যা বলেছিলো....

অমি রহমান পিয়াল

২৫ মার্চ, ১৯৭১। অপারেশনে নেমেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। আনুষ্ঠানিক নাম- অপারেশন সার্চালাইট। বাস্তবে নির্বিচার হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও। স্বাধীনতাকামী বাঙালীর কষ্ট বুলেট দিয়ে চিরতরে শক্ত করার সামরিক নকশা। সে রাতের দেড়টা থেকে পরদিন সকাল ৯ টা পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওয়ারলেস ট্রান্সিশন রেকর্ড করেছিলেন আগবিক শক্তি কমিশনের ড. এম এম হোসেইন। ঢাকার খিলগাও চৌধুরীপাড়ার বি-১৭৪ নং বাড়িতে বসে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজটি করেছিলেন এই প্রকৌশলী। ইংরেজি-উর্দু মেশানে অসম্পূর্ণ এই ট্রান্সিশনের অনুবাদ একটু কঠিন ঠেকেছে। মিলিটারি জারগন জানার চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রতিটি অপারেশনে বিশেষ কোড থাকে, যা সংশ্লিষ্টাই শুধু জানে। সেগুলো ডিসাইফার করতে সমস্যা হয়েছে খুব। কিছু বিশেষ সংযোধনের অর্থ ধরতে পারিনি। আবার কিছু আন্দাজ করে নিয়েছি। যেমন ইমাম (ধারণা করছি এর অর্থ কমান্ডার। সেটা টিক্কা খান, আবার জাহানজের আরবাব থেকে শুরু করে ইউনিট কমান্ডারও হতে পারে)। আবার মেইন বার্ড বলতে বোঝানো হয়েছে শেখ মুজিবের রহমানকে। টিক্কা খানের (ক্রিপ্টে যাকে কঠোল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই অপারেশনের রেকর্ডকৃত ট্রান্সিশনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানায় অপারেশনের দায়িত্বে থাকা ইউনিটগুলোর কথাবার্তা উল্লেখযোগ্য, যদিও প্রতিটি বার্তা ধারাবাহিক এমন নয়, অনেকে কথা বলছে, অনেক সময় বেশ সময় নিয়ে বলছে। কল্পনায় দিবিয় দেখতে পাওয়া রিসিভার হাতে এসব বার্তা বিনিময়ের সময় জ্বলছে ঢাকা, মরছে বাঙালী। একইসঙ্গে শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার প্রথম প্রহর।

: ৭৭, আমার কথা বোঝা যায়? ওভার।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না (রিডেবল)। কোনো খবর আছে? ওভার। কারেকশন, ৭৭, অপেক্ষা করেন, ওনাকে... উনি নিজেই কল করবেন...

কঠোল : ৭৭, অপেক্ষা করো। পরে কথা বলছি তোমার সঙ্গে, হ্যালো ৯৯, তুমি যোগাযোগ রাখো নয়তো ২৬ এবং অন্যরা

## প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

অপারেশন সার্চ লাইট চূড়ান্তকরণ হয়েছিলো সাধারণ একটি নীল রংয়ের প্যাডে (নীলনীলা হিসেবে ঠিক আছে) সাধারণ একটি কাঠ পেশিলে! পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সিদ্ধিক সালিক তার লেখা উইটনেস টু সারেভেলে বর্ণনা দিয়েছেন এর। জেনারেল রাও ফরমান আলী খসড়া করেছিলেন মূল পরিকল্পনাগুলোর। আর এর দ্বিতীয়ভাগ লিখেছেন জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। সেনা বন্টন এবং কোন ব্রিগেড ও ইউনিট কোন অপারেশনের দায়িত্বে থাকবে তারই নির্দেশনামা।

পাঁচ প্রাত্মাজুড়ে ১৬টি অনুচ্ছেদে পরিকল্পিত এই অপারেশনের মূল লক্ষ্য ছিলো ইপিআর (ইন্স্ট পাকিস্তান রাইফেলস, বর্তমানে বিডিআর) ও পুলিশসহ বাঙালী সেনা সদস্যদের নিরস্ত্র করা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমানসহ আওয়ামী লিগ নেতা এবং গুরুত্বপূর্ণ ১৬ জন ব্যক্তির বাসায় হানা দিয়ে তাদের গ্রেপ্তার। ২০ মার্চ ফ্ল্যাগস্টাফ হাউজে জেনারেল হামিদ ও লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পড়ে শেনানো হয় এই হাতে লেখা পরিকল্পনা। দুজনই তা অনুমোদন করেন। সে অনুযায়ী রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে বিগেডিয়ার জাহানজেবের আরবাবের নেতৃত্বাধীন ৫৭ ব্রিগেড ঢাকা ও আশপাশে অপারেশন চালায়, মেজর জেনারেল খাদিম রাজা দেশের বাকি অংশে।

২৫ মার্চ রাত ঠিক সাড়ে ১১টায় রেডিও ট্রান্সমিটারগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। মূল অপারেশনের সময়সীমা ছিলো রাত একটা (ক্যালেন্ডারের পাতায় ২৬ মার্চ শুরু), তার আগেই টার্নেটের আশেপাশে ইউনিটগুলোর অবস্থান নেওয়ার কথা। তার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু স্বাধীনতাকামী বাঙালী ছাত্র-জনতা তার আগে থেকেই রাস্তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলো, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় গাছের গুড়ি ও নানা কিছু দিয়ে রোডরক তৈরি করেছিলো তারা। শোয়েন্দাসুত্রের এই খবরেই সাড়ে ১১টায় সবগুলো ইউনিটই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে।

ঢাকার এই অপারেশনে বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলো :

১৩ ফিটিয়ার ফোর্স : ঢাকা সেনানিবাস আক্রান্ত হলে সেটা সামাল দিতে রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছিলো তাদের।

৪৩ লাইট অ্যান্টি এয়ারক্রাফট রেজিমেন্ট : তেজগাঁ বিমানবন্দরের দায়িত্বে

২২ বেলুচ : পিলখানায় ইপিআরদের নিরস্ত্রিকরণ ও তাদের ওয়ারলেস এক্রচেঞ্জ দখলের দায়িত্বে।

৩২ পাঞ্জাব : রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দায়িত্বে

১৮ পাঞ্জাব : নবাবপুরসহ পুরান ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোর দায়িত্বে

১৮ পাঞ্জাব, ২২ বেলুচ ও ৩২ পাঞ্জাবের একটি করে কোম্পানির সময়ে যৌথ ইউনিট ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে পেয়েছিল

স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের একদল কমান্ডোর দায়িত্ব ছিলো শেখ মুজিবকে (কলসাইন : মেইন বার্ড) জীবিত গ্রেপ্তার করা। এক ক্ষেয়াত্ত এম-২৪ ট্যাঙ্ক তোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলো। এছাড়া সেকেন্ড ক্যাপিটাল (শেরেবাংলা নগর/সংসদভবন এলাকা) এবং মীরপুর ও মোহাম্মদপুরের বিহারী অধ্যুষিত এলাকায় দায়িত্বরত ছিলো ফিল্ড রেজিমেন্ট।

কিছু শব্দার্থ জেনে রাখলে সুবিধা হবে পাঠকদের : ৮৮, ৪১, ২৬, ৫৫ এসব হচ্ছে দায়িত্বরত ইউনিটগুলোর পরিচিতি সংকেত। কথা বলার আগে কোন ইউনিট কথা বলছে তারই পরিচয় দিতে সংখ্যাটা বলেছে তারা। একইভাবে কোনো নির্দিষ্ট ইউনিট যখন অন্য কোনো ইউনিটের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে তখন সে সেটা উল্লেখ করছে, যেমন ৮৮কে ৯৯। রাজার মানে বোঝা গেছে, লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার মানে পরিষ্কার বোঝা গেছে, উইলকো মানে উইল কম্পাই বা আদেশ পালিত হবে, ওভার মানে বাক্য শেষ, আর্ট টু ইউ মানে তোমার সঙ্গে কথা শেষ, ইমাম হচ্ছে কমান্ডিং অফিসার, মারখোর এডজুটেট/কমান্ডিং অফিসারের স্টাফ অফিসার। কঠোল হচ্ছে রেজিমেন্ট কঠোল রঞ্জ। আবারও বলছি, বার্তা বিনিময়ের মধ্যে বিরাতি ছিলো, তাই প্রতিটি লাইনকে ধারাবাহিক ধরে নেওয়া উচিত হবে না।

দুবার করে পরিস্থিতি জানাবে। তুমি স্বেফ টিউনে থাকো, এখনও নতুন কিছু ঘটনিই; রিজার্ভ লাইন দখল করা গেছে আর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এখনও লড়াই চলছে। আউট।

: ইমামের জন্য অপেক্ষা করো।

: ৭৭, ইমাম এখানে এসেছে, আর তার সঙ্গে আমার ইমাম এখন ব্যস্ত আছে, এজন্য এই মুহূর্তে আমি কিছুই বলতে পারছি না। ওভার।

: কঠোল অঞ্গতির তথ্য চাচ্ছেন, আপনি খোঁজ নিয়ে নিজেই জানান। ওভার।

: দাঁড়াও। পরে কথা বলছি, হ্যালো, ৭৭। ইমাম শুনছেন, বার্তা পাঠাও। ওভার।

: ৭৭, ৮৮র কাছ থেকে সর্বশেষ জানা গেছে যে সে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু ওখানে এত দালান যে যেসব বাড়ি থেকে ওর দিকে গুলি করা হচ্ছে ও সেগুলিকেই বেছে নিচ্ছে। ওর যা কিছু আছে সবই ব্যবহার করছে। ওভার।

: ওকে জানান যে তার বড় ভাইরা (আঁটিলারি) শিগগিরই চলে আসছে, আশা করি বড় বিস্তিংগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে। ওদিকে মনে হচ্ছে লিয়াকত আর ইকবাল (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস) চুপ মেরে গেছে। কি ঠিক বলেছি? ওভার।

: ৭৭, কাহিনী শেষ কিনা নিশ্চিত না হলেও ওরা এ দুটো নিয়ে বেশ খুশীই মনে হলো। ওভার।

কঠোল : দুর্দাত। এখন ছেলেদের বলে দাও রাস্তায় রাস্তায় কারফিউর কথাটা প্রচার করতে। এটাই সবার আগে। দ্বিতীয় যেটা, ওরা মেন বাংলাদেশের সব পতাকা নামিয়ে ফেলতে বলে। আর কোনো বাড়িতে যদি বাংলাদেশের পতাকা পাওয়া যায় তাহলে বাড়িওয়ালাকে সেজন্য শাস্তি পেতে হবে। কোনো কালো পতাকা যেন না উড়ে, আর শহরের কোনো জায়গায় যেন বাংলাদেশের পতাকা দেখা না যায়। আর যদি সেগুলো নামানো না হয়, তাহলে তার ফল হবে ভীষণ মারাত্মক। এটা সবাইকে পরিষ্কার বুঝিয়ে বলতে হবে। রজার। ওভার।

: ৭৭, রজার, ওভার।

: ৭৭, এছাড়া রোড-রুকগুলার ব্যাপারেও ঘোষণা দিতে হবে। যদি কাউকে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা বসাতে দেখা যায় তাহলে সেখানেই গুলি করে মারা হবে। এটা হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে জায়গায় দেখা যাবে, সেখানকার মানুষজনকে শাস্তি দেওয়া হবে (মানে মেরে ফেলা), আরে ডানে-বায়ের বাড়ি-ঘরেরও হবে একই দশা। রোড রুকের আশপাশ গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। এটা সবাইকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে, জনগণকেও। আর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত এবং আগামীকাল সারাদিন মাইকে

ঘোষণা করতে হবে এই নির্দেশ। ওভার।

: ৭৭, উইলকো। আউট অন ইউ। হ্যালো ৪১, ইমামের নির্দেশ পেয়েছো? ওভার।

: ৪১, ইমাম কি শুনতে পাচ্ছে? ওভার।

: ৪১, ইমামের নির্দেশ। প্রথম হচ্ছে, সব কালো পতাকা... এসব পতাকা বাড়ির মালিকদের অবশ্যই নামিয়ে ফেলতে হবে;

কাউকে এরকম পতাকা উড়াতে দেখলে শাস্তি দিতে হবে। এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে (ভুল উচ্চারণ করে প্রসিকিউটেডকে পারসিকিউটেড বলা হয়েছে) এবং বাড়ি ধ্বংস করে দিতে হবে। এটা মাইকে ঘোষণা করতে হবে। রজার সো ফার। ওভার।

: ৪১, ঠিক একইভাবে কোথাও কোনো রোড়ুক দেখা গেলে সেটাকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে ধরা হবে। কাউকে এমন করতে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলতে হবে। রোড রুকের আশেপাশের বাড়ির মালিকদের শাস্তি দিতে হবে

ধ্বংসযজ্ঞের শুরুতে ২৫ মার্চ রাতের ঢাকা শহর



এবং তাদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এই ঘোষণাটাও উহলদার সেনাদের দিয়ে দেয়াতে হবে। ওভার।

: ৪১, আউট টু ইউ। হ্যালো ৮৮, বলো। ওভার।

: ৮৮, ইমাম অপেক্ষা করছেন। বার্তা পাঠাও। ওভার।

: ৮৮, ইমামের নির্দেশ সব বাংলাদেশের পতাকা বা কালো পতাকা এবং যেসব বাড়িতে এগুলো উড়েছে এ মুহূর্তে তা নামিয়ে ফেলার জন্য মালিকদের সতর্ক করে দিতে হবে, নয়তো তাদের শাস্তি দেওয়া হবে (এ জায়গায় বজ্ঞা পারসিকিউটেডকে সংশোধন করে আবার প্রসিকিউটেড বলেছেন)। রজার সো ফার। ওভার।

: ৮৮, উইলকো। ওভার।

: ৮৮, কোথাও কোনো রোড়ুক দেখা গেলে সেটাকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে ধরা হবে। কাউকে এমন করতে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলতে হবে। রোড রুকের আশেপাশের বাড়ির মালিকদের শাস্তি দিতে হবে। এবং তাদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এই ঘোষণাটাও উহলদার সেনাদের দিয়ে দেয়াতে হবে। ওভার।

: ৮৮। উইলকো। আর কিছু? ওভার।

: ৮৮। তোমার ইমাম কি বলেছে যে কাজটা সারতে প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগবে? ওভার।

: ৮৮। হ্যাঁ। কাজটা ঠিকমতো সারতে কমপক্ষে তিন থেকে চার ঘণ্টা লাগবে। ওভার।

কঠোল : ৮৮, ইমাম এখন ইমাম ২৬ এর সঙ্গে আছেন। যদি আর কোনো ধরনের সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে জানাতে পার। আর ব্যাদারগুলো (এম-২৪ ট্যাঙ্ক) নিরাপদ অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সামনের সব বাধা ধ্বংস করতে তোমাকে সাহায্য করবে। ওভার।

: ৮৮, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার আর কিছু বলার নেই। সব ঠিকঠাক মতোই হচ্ছে।

কঠোল : ৮৮, রজার। আউট টু ইউ। হ্যালো ৪১। ম্যাসেজ। ওভার।

কঠোল : ৪১, রেলওয়ে লাইনের পশ্চিম দিকে পালানোর পথগুলো তোমার এলাকায় পড়েছে। আশা করি জায়গামতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে যাতে ক্যাম্পাসে ২৬ ও ৮৮র হাত থেকে সেদিক দিয়ে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। ওভার।

: ৪১, আমরা এলাকাটায় টহল জোরদার করেছি। প্রতি মিনিটেই আমরা চক্র দিচ্ছি আর সতর্ক থাকছি। ওভার।

কঠোল : ৪১, রজার। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি পুরো

নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে। ২৬ এর ওরা ডেইলি পিপলে আমাদের বন্ধুদেরও খুঁজে বের করেছে। খবরটায় তোমার খুশী হওয়া উচিত। আউট।

কঠোল: হ্যালো ৮৮কে ৯৯। হাইয়েস্ট কঠোল জানতে চাইছে প্রতিপক্ষ কি ধরনের গুলিবর্ষণ করেছে। ওভার।

: ৯৯কে ৮৮। অপেক্ষা করুন। আমি আমার ইমামকে ফোন করছি, ওনার সঙ্গে কথা বলুন।

: ৯৯কে ৮৮। আমার ইমাম শুনছেন। ম্যাসেজ দিন। ওভার।

: ৮৮কে ৯৯। সর্বোচ্চ কঠোল জানতে চাইছেন জগন্নাথ, ইকবাল ও লিয়াকতে (বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস) কি ধরনের প্রতিরোধের মুখে পড়েছেন। ওভার।

: ৯৯কে ৮৮। শুরুতে জগন্নাথ ও ইকবাল হল থেকে প্রচুর গুলি ছোঁড়া হয়েছে। রজার সো ফার। ওভার।

: রজার। ওভার।

: ৮৮, আমরা রোমিও রোমিও (রিকয়েলেস রাইফেল) দিয়ে হামলা করার পর আর কোনো আওয়াজ আসেনি, তবে কয়েকটাকে নিষ্ক্রিয় করেছি। রজার সো ফার, ওভার।

: ৮৮কে ৯৯। রজার। ওভার।

: ৯৯কে ৮৮। আমি এখন লিয়াকতে যাচ্ছি কারণ ওদের সেটাটা অকেজো হয়ে গেছে। ওদের অগ্রগতি জানি না। খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি। ওভার।

: ৮৮কে ৯৯। ওপাশ থেকে স্বয়ংক্রিয় অন্ত্রের গুলি কিংবা গ্রেনেড ইত্যাদি ছোঁড়া হয়েছিল কিনা জানিও। ওভার।

: ৯৯কে ৮৮। প্রচুর থি নট থির গুলি। তবে কোনো স্বয়ংক্রিয় অন্ত্র বা গ্রেনেডের আওয়াজ শুনিনি। ওভার।

: ৮৮, রজার আউট।

: ৯৯কে ২৬। মারখোর (এডজুটেন্ট) এসেছেন। বার্তা পাঠাও। ওভার।

: ২৬কে ৯৯। দয়া করে আমাদের বলো তোমরা এখন পর্যন্ত কি কি কজা করেছো। ওভার।

: ৯৯কে ২৬। ২০০০ (রাজারবাগ পুলিশ লাইন) দখল, তারপর রামনা থানা দখল, কমলাপুর থানা দখল, টিভি ও রেডিও নিয়ন্ত্রনে, (টেলিফোন) এক্সচেঞ্জ দখল। প্রথম ধাক্কাতেই সব ইয়া আলী। ওভার। (চলবে)

: কমিশনার অফিসে আমাদের এখান থেকে পুরানো পল্টন এলাকায় প্রচুর আগুন জুলতে দেখা যাচ্ছে। এটা কি হেড অফিস নাকি অন্য কোনো জায়গা? ওভার।

: ৯৯কে ২৬। ২০০০ (এরিয়া টু থাউজেন্ড/রাজারবাগ পুলিশ লাইন) আগুন জুলছে। আবার বলছি ২০০০ জুলছে। ওভার।

: ৮৮কে ৯৯। পিপলস ডেইলির (হোটেল ইন্টারকনেক্স/এখন শেরাটন উল্টোদিকে অবস্থিত পত্রিকা অফিস) কি অবস্থা?

: ৯৯কে ২৬। উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (রোসটেড)। আবার বলছি, উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় আমাদের দুজনকে সিএমএইচ (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আরও দুজন অল্প আঘাত পেয়েছে। ওভার।

: ২৬কে ৯৯, প্রতিপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির কোনো আন্দাজ? ওভার।

: ২৬, না। এই মুহূর্তে অনুমান করা কঠিন। লক্ষ্যবস্তুগুলোতে আগুন জুলছে অথবা পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। ওভার।

: ২৬কে ৯৯, পুলিশ লাইনেরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে গেছে?

ওভার।

: ৯৯কে ২৬। হ্যাঁ বলেছি, দুই হাজার, পুলিশ লাইন জুলছে। ওভার।

: ২৬কে ৯৯। দারুণ দেখিয়েছো। আউট।

: ৫৫। লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। ওভার।

: ৫৫, মারখোর শুনছে। পাঠাও। ওভার।

: ৫৫, বার্তা পাঠাও। ওভার।

: ৫৫ আপনি কল করেছিলেন। মেসেজ পাঠান। মারখোর শুনছেন (উর্দু)। ৫৫, আপনার মেসেজ পাঠান। ওভার।

: ৫৫....

: ৫৫, আবার বলেন। ওভার।

: ৫৫....

: ৮৮কে ২৬। অগ্রগতি জানাও। ওভার।

: ৫৫। রজার। এদের সঙ্গে ঠিক কোথায় যোগাযোগ হয়েছিলো?

ওভার।

: ৮৮কে ২৬। আপনার কথা ভেঙে ভেঙে আসছে আর জগন্নাথের ব্যাপারে অগ্রগতি জানান, জগন্নাথের ব্যাপারে (উর্দু)। ওভার।

: .... আপনার কাছে রিপোর্ট করবে।

: ৮৮কে ২৬। রজার। আউট।

: ৫৫। আমি আবার বলছি, আমাদের.... সামনে একটা রোড ব্লক ছিলো আর আমরা সেটা সরাচ্ছি, আর.... .... আদার এলিমেন্টস। ওভার।

: ৫৫। জলি গুড শো (দারুণ দেখিয়েছো)। তোমার এলিমেন্টগুলো (সম্ভবত সাপোর্টিং আর্টিলারির কথা বলা হয়েছে) ২৬ এ পাঠানোর কথা। তবে তারা বেশি কাজে আসবে ৮৮-র, যারা এই মুহূর্তে বেশ বামেলায় পড়েছে। আসতে থাকো। আউট।

: ৫৫। রিনেট (টাস্মিটার সেট করার নির্দেশ)। আপনার সেটের নেটিং চেক করুন। বোবা যাচ্ছে না আপনি কি বলছেন (উর্দু)। ৫৫, ৫৫, ৫৫, ৫৫... নেটিং কল। নেট নাও। নেটিং কল এন্ডস।

: ৫৫। আমার কথা শোনা যায়? ওভার।

: ৫৫, ৫৬.... ওভার।

: ৫৫, এখনো শিশের মতো শব্দ হচ্ছে। টাস্মিটার আবার নেট করো (উর্দু)। ৫৫, ৫৫, ৫৫, ৫৫। হিয়ার নেটিং কল। নেট নাও। নেটিং কল এন্ডস।

: ৫৫। আমার কথা শোনা যায়? ওভার।

: ৫৫....।

: ৫৫। রজার। মাইক একটু দূরে রেখে কথা বলুন (উর্দু)। ৫৫, আর কিছু না। আউট।

: মেসেজ। ওভার।

: ৮৮কে ২৬, ৮৮কে ২৬, মেসেজ। ওভার।

: ২৬কে ৮৮। আমরা যাচ্ছি...

: ৮৮কে ২৬। জগন্নাথের অগ্রগতি জানাও, আবার বলছি, জগন্নাথ। ওভার।

: ২৬কে ৮৮। আমার ইমাম যাচ্ছেন।

: ৮৮কে ২৬। রজার আউট।

: মারখোরকে মারখোর। ওভার।

: ১৬। অপেক্ষা করো। আউট।

: ওদিকের ক্ষয়ক্ষতি কেমন? ওভার।

: ১৬.... চারজন নিহত।

: রজার। আহতদের যথার্থ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে?

: .... ইপিআর হাসপাতাল। ওভার।

: ১৬। খুব ভালো। আউট টু ইউ। হ্যালো ২৬, হ্যালো ২৬, হ্যালো ২৬, মেসেজ। ওভার।

: ৫৫। অবস্থান জানাও। ওভার।

: ৫৫। অবস্থান জানাও। ওভার।

: ৫৫, আমি ফার্মগেটের কাছাকাছি আর এখন বিস্ফোরক ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে রোড ব্লক সরাচ্ছি। আমরা এখনও আগের জায়গাতেই আছি। ওভার।

: ৫৫। রজার। আশা করি কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে লাগার সাহস করেন। ওভার।

: ৫৫। আমরা চারদিকে চিতা (কমান্ডো দল) ছড়িয়ে দিয়েছি। এখন পর্যন্ত নেতৃত্বাচক। ওভার।

: ৫৫। রজার। (বুল)ডোজার এবং অন্যান্য উদ্বার সরঞ্জাম আছে তোমার সঙ্গে? ওভার।

: ৫৫। হ্যা, ডোজার এখন সামনে জায়গামতো যাচ্ছে সরাতে...  
 .... শক্তি দিয়ে। আর এরাও আমাদের বেশ সাহায্য করছে।  
 ওভার।

কঠোল: ৫৫। বেশ দারকণ। আসতে থাকো। আমরা এখন এই  
 মূল ভবনের এলাকায়। তুমি চেষ্টা করে দেখো রাস্তাগুলোর  
 অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়িয়ে যেতে। আউট।

: .... ওভার।

: ৭৭কে..., ৭৭কে ১৬, মেসেজ। ওভার।

: ১৬, মারখোরকে দিন। ওভার।

: ১৬, মারখোরকে দিন। ওভার।

: ১৬ ...

: ১৬, আগে যেভাবে বলা হয়েছিলো, তোমার আসল দলের  
 (অরিজিনাল ফোর্স) ইমাম প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করবে এবং  
 আনুষঙ্গিক কি কি করতে হবে সেগুলো বের করে সে অনুযায়ী  
 সাজাবে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তোমাদের ওখানের ইমাম  
 না আসা পর্যন্ত যেমন ছিলে সেভাবেই থাকতে বলা হচ্ছে।

: ১৬, উইলকো। আউট।

: ... ইমামের জন্য। ওভার।

: ... অপেক্ষা করো। ওভার।

: ইমাম শুনছেন। মেসেজ পাঠাও। ওভার।

: ৪১, তোমার এলাকায় ফিজিকাল ট্রেনিং ইনসিটিউট  
 (মোহাম্মদপুর, এখানেই পরে আল-বদর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত  
 হয়) এবং পুলিশ স্টেশনগুলোর অবস্থা জানাও। ওভার।

: ৪১। ফিজিকাল ট্রেনিং ইনসিটিউট ভালোভাবে তল্লাশী করা  
 হয়নি, তবে আমরা সেখানে সশস্ত্র সেনা মোতায়েন করেছি। এই  
 এলাকায় কোনো পুলিশ স্টেশন নেই। ওভার।

: ৪১। ধন্যবাদ। আউট।

: ৪১। আমাদের এখানে অনেকগুলো লোক আছে যারা বেশ  
 কিছু রোড ব্লক দিয়েছিলো, এদের ধরা হয়েছে এবং সেগুলো  
 পরিষ্কার করতে কাজে লাগানো হয়েছে। ওদের কি আপনার  
 কাছে নিয়ে যেতে হবে, নাকি খতম করে দেবো (বন্দী হিসেবে  
 পাঠিয়ে দেবো না মেরে ফেলবো)? ওভার।

: ৪১, শ্রমের দারুণ ব্যবহার করেছো দেখছি। আপাতত এদের  
 ব্যবহার করতে থাকো আর যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের কাছ থেকে  
 নির্দেশ না পাচ্ছি ততক্ষণ আটকে রাখো। তারপর পরিস্থিতি বুঝে  
 হয় তোমরা তাদের খালাস করবে নয়তো আমাদেরকে পাঠাবে।  
 ওভার।

: ৪১। রজার। আউট।

: ৪৮। মেসেজ। ওভার।

: ৮৮, মেসেজ পাঠাও। ওভার।

: ৮৮, রোমিও সিয়েরা ইউনিফর্মের (রিডেরাইন ইউনিট/নদীর  
 কুল পাহারা দেয়া পদাতিক ইউনিট) সঙ্গে আপনার এক  
 এলিমেন্ট (সেনা কর্মকর্তা) আছে তার মাধ্যমে জিজেন করুন  
 তো রোমিও সিয়েরা ইউনিফোর্ম পানিতে টহল দিচ্ছে কি না  
 (উর্দু)। ওভার।

: ৮৮। রজার। ওভার।

: ৮৮, আউট।

: ... স্বেফ মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি যে রোমিও সিয়েরা  
 ইউনিফর্মের সঙ্গে থাকা আপনার এলিমেন্টের উচিত হবে  
 তাদেরকে নৌকায় করে টহল দিতে বলা (ক্যারি আউট প্যাটলিং  
 ইন দ্য রিভার বোটস)। ইমামের সঙ্গে আলোচনা অনুযায়ী  
 নদীতে টহল শুরু করুন। ওভার।

: ৮৮, আমরা এর মধ্যেই তা শুরু করে দিয়েছি, আবার বলছি,  
 আমরা ইতিমধ্যে তা শুরু করে দিয়েছি। ওভার।

: ৮৮... আমি তার কাছে পুরাটা দিচ্ছি।

: ৮৮, খুব ভালো। চালিয়ে যাও। আউট।

: হ্যালো ২৬। ওভার।

: ২৬। পাঠাও। ওভার।

: তোমারা কি ডেহলি পিপল থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাউকে আটকাতে  
 পেরেছো? ওভার।

: ২৬ না, নেগেটিভ। তবে আমাদের সৈন্যরা অন্য কয়েকজন  
 গুরুত্বপূর্ণ লোকের খোঁজে গেছে আর আমরা তাদের অগ্রগতি  
 জানতে অপেক্ষা করছি। ওভার।

কঠোল: ২৬। রজার। আলফা লিমার (আওয়ামী লিগ) কার্যালয়  
 কি দখল হয়েছে? ওভার।

: ২৬। না। ভোর বেলা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওভার।

: ২৬। রজার। তাহলে হয়তো সেখানকার বাসিন্দারা সব রেকর্ড  
 বা কাগজপত্র এর মধ্যেই পুড়িয়ে বা নষ্ট করে ফেলেছে।  
 তারপরও তোমরা তোমাদের পরিকল্পনামতোই এগোতে থাকো  
 আর তোমাদের অগ্রগতি খুবই চমৎকার হচ্ছে। ছোটখাটো যাই  
 ঘটুক না কেনো আমাদের জনিও। ওভার।

: হ্যালো ৯৯, ৯৯। মারখোর। ছোটাকে দিন। ওভার।

: ৯৯, অপেক্ষা করো। আউট।

: মেসেজ পাঠান, ওভার।

: আউট টু ইউ, হ্যালো ২৬, ২৬, ৭৭ থেকে মেসেজ,  
 মারখোরকে জানান যে ইমাম বলেছেন, ভোরের আলো ফোটার  
 আগেই যত লাশ আছে সব যেন সরিয়ে ফেলা হয়; বাকি  
 সবাইকে এটা বলে দাও (উর্দু)। ওভার।



## মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ

### ঝাড়ো হাওয়া

শহীদ ফারুক ইকবাল হলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম  
 শহীদ। তিনি ১৯৭১ সালের তৃতীয় মার্চ শহীদ হন।  
 ফারুক ইকবাল ছিলেন আবুজ গিফারী কলেজ ছাত্র  
 সংসদের (ছাত্রলীগ) সাধারণ সম্পাদক। এই  
 তথ্যগুলো লেখা আছে তাঁর সমাধির শ্বেতপাথরের  
 ফলকে। আর এই সমাধি ঢাকার মৌচাক মার্কেটের  
 সামনে মেইন রাস্তার মাঝে অবস্থিত। আমি ছোটবেলা  
 থেকেই মেইন রাস্তার মাঝে এখানকার দুটি কবর  
 দেখে আসছি কিন্তু তার একটি কবর যে মুক্তিযুদ্ধের  
 প্রথম শহীদেরে- এটা জানলাম কিছুদিন আগে। এটা  
 আমার জন্য দুঃখজনক বিষয়। আমি শহীদ ফারুক  
 ইকবাল সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানতে চাই।  
 উল্লেখ্য, অপর কবরটি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মোঃ  
 তসলিমের, উনি ১৭ ডিসেম্বর শাহাদাত বরণ করেন।

# গেরিলা ম্যানুয়েল (১৯৭১) : মেজর এমএ মঙ্গুর

অমি রহমান পিয়াল

## বাংলার মুক্তিযুদ্ধ (গেরিলা বাহিনীর নির্দেশাবলী)

"এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম  
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম ।" - বঙ্গবন্ধু

প্রগতীত  
সেনানায়ক  
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল  
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

## একটি সংগ্রামী ফরিয়াদ

তামেরা,  
আজ আমরা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত।  
পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক গোষ্ঠী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে  
যে মুশ্যংসভাবে নির্বিচারে বাঙালীর হত্যা করছে, আমাদের মা-  
বোনকে ধর্ষন করছে ও আমাদের বাড়িগুলি জ্বালিয়ে সম্পদ লুটে  
আমাদেরকে গৃহহারা করে চলেছে তার বিরুদ্ধে আমরা রুখে  
দাঁড়িয়েছি। আমাদের যুদ্ধ ততদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন পর্যন্ত  
পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী সম্মুলে নিপাত না হবে এবং  
বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হবে। শত্রু নিপাত করার জন্য  
শত্রুকে জানা দরকার ও তার রণকোশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা  
নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের শত্রু সুসজ্জিত ও সংখ্যাধিক। তার  
বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের সময় এখনো হয়নি। আমরা এখনো

গেরিলা রণকোশল ব্যবহার করছি। অতর্কিতে শত্রুর উপর হামলা  
করে তার সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করতে হবে। দেখতে হবে শত্রু  
যেন তার দৈনিক সরবরাহ না পায় ও কোথাও নিরাপদ অনুভব

না করে।

আমি বিশ্বাস করি যে, মুক্তিযুদ্ধের যে নির্দেশাবলী এই লিপিকায়  
দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি পালন করলে আমরা সফলকাম  
হবো।

খোদা মোদের সহায়- জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।

এমএ মঙ্গুর  
সেনানায়ক

## আমরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী

আমাদের কাম্য : বাংলাদেশের স্বাধীনতা

আমাদের শত্রু : বিবেকহীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ও বর্বর  
হানাদার সেনারা, যারা-

- শিশু, নারী, বৃন্দ নির্বিচারে বাঙালীদের হত্যা করছে
- ঘৃণ্যতম উপায়ে আমাদের মা-বোনকে হত্যা করছে
- আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে
- আমাদের সম্পদ লুটে লক্ষ লক্ষ নিরপেরাধ নরনারীকে  
দেশছাড়া করছে
- বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের মাৰো ভাঙল  
ধৰানোর চেষ্টা করছে।

আমাদের পণ্ড : খোদার উপর বিশ্বাস রেখে মরণপণ সংগ্রাম  
অক্ষুণ্ণ রাখব, যতক্ষণ না আমাদের শেষ শত্রুটিকে দেশ ছাড়া  
করব এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রীয়পে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখব।

## মুক্তিবাহিনীর নির্দেশাবলী

### গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়

#### ১. প্রথম পর্যায় : ঘাঁটি স্থাপন (১০-১৫দিন মোটামুটি সময়)

ক. ঘাঁটি ও লুকাইবার বিভিন্ন স্থান নির্বাচন

খ. অন্তর্শস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য রসদ রাখার গুণস্থান  
নির্বাচন

গ. কম্বুত গণবাহিনীর লোকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন

ঘ. স্বাধীনতাকামী স্থানীয় দলের সহিত যোগাযোগ

ঙ. স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং  
তাহাদের মন জয়

চ. শত্রু ও স্থানীয় বিরুদ্ধকারী দলগুলোর সম্পর্কে খবরাখবর  
সংগ্রহ

ছ. গোপন তথ্য সরবরাহকারী সংস্থা (intelligence network)

স্থাপন ও খবরাদি আদান প্রদানের ব্যবস্থা।

[এই কাজ সব পর্যায়ে চলবে]

২. দ্বিতীয় পর্যায় : অসামরিক জনগণের সমর্থন আদায়-

[এই কাজে কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, তৃতীয় পর্যায় অবধি চলবে]

ক. জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন  
সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে জনগণের মন জয় করতে হবে।  
সমাজকল্যাণ কাজের মধ্যে রয়েছে- আর্টের চিকিৎসা, আগকার্য  
ও চুরি ডাক্তান্ত বন্ধ।

খ. রাজাকার, মুজাহিদ ও অন্যান্য যারা বিভিন্ন কারণে শত্রুর  
সহযোগিতা করছে তাদের মধ্যে ভাঙল ধরাতে হবে ও নিজেদের  
দলে ভিড়িয়ে নিতে হবে।

গ. ধর্ষণ, লুঠন ও হত্যাকাণ্ড এইসমস্ত ঘৃণ্য অসামাজিক কাজকে  
সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে।

ঘ. গ্রামের বা অঞ্চলের আঞ্চলিক রক্ষীবাহিনী গঠন

৩. তৃতীয় পর্যায় : সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ না করা পর্যন্ত শত্রুর  
ধ্বংস সাধন করা

ক. রেলপথ, সড়ক এবং নদীপথে শত্রুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা  
এবং ক্রমাগত অতর্কিত হামলা ও অ্যামুশুশের মাধ্যমে শত্রুর ধ্বংস  
সাধন

খ. সকল বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করা ও শত্রুর  
ব্যবহারের অনুপযোগী করা

গ. বিদ্যুত সরবরাহ নষ্ট করে দেয়া

ঘ. শত্রুর সরবরাহী অফিস আদালতকে অকেজো করে দেয়া

ঙ. শত্রু দ্বারা নির্বাচিত অনুষ্ঠানকে বিফল করা

চ. সকল জ্বালানী তেলের গুদাম বিনষ্ট করা

ছ. শুভিয়ে বাধাদানকারী যে কোনো শক্তির উচ্ছেদ

জ. আঞ্চলিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন। একাজে সকল সৎ ও  
কর্তব্যপ্ররায়ণ মোড়ুল মাতব্বরদের যোগ্য স্থান দিবে এবং  
প্রয়োজনবোধে নতুন লোককে নিয়োগ করবে

ৰ. পাট রঞ্জনী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। সরকারী গুদাম ও বড়বড় ব্যবসায়ীদের (ইস্পাহানী ও আদমজী) গুদাম, যেখান থেকে পাট বিদেশে রঞ্জনী করা হয় সেগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে। দেশবাসীকে পাট না বুনে ধান বোনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

## গেরিলা যুদ্ধের রীতি ও কৌশল

১. শত্রুকে চমকে দেওয়া ও প্রতারণা করা- গেরিলার জন্য সবচেয়ে বড় অন্ত কৌশল- শত্রুকে হাতাং চমকে দেওয়া। শত্রু অধিকৃত এলাকায় স্বল্পসংখ্যক লোকবল ও অস্ত্রবল নিয়ে কাজ করতে হয়, সুতরাং শত্রুকে আচমকা আঘাত না হানলে শত্রু প্রস্তুতি নিয়ে উল্টো আঘাত হেনে অবাঞ্ছিত পরিমাণ ক্ষতিসাধন করতে পারে। অতএব এ ধরনের চমকে দেওয়ার জন্য গেরিলারা নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করবে :

ক. শত্রু যেখানে তোমার আঘাতের আশঙ্কা করে না সেখানে আঘাত করো।  
খ. একইস্থানে বারবার কাজ করবে না, এতে শত্রু সাবধান হয়ে আটঘাট বেঁধে আঘাত প্রতিহত করবে।  
গ. রাতের অন্ধকারে কাজ করবে।  
ঘ. তোমার কাজের কোনো নিয়মিত পদ্ধতি হবে না, এ প্রক্রিয়া পরিবর্তন করবে।  
ঙ. কঠিন সাবধানতা অবলম্বন করবে।

২. সাবধানতা- বেঁচে থাকা গেরিলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এমন কোনো কাজ করবে না যাতে তোমার অস্তিত্বের

আশংকা দেখা দেয়। সর্বক্ষণ জাগ্রত দৃষ্টি রাখবে যাতে শত্রু তোমাকে আচমকা আঘাত না করতে পারে।

৩. গতিশীলতা- নিয়মিত যুদ্ধে সৈনিকের যেসব যানবাহনের সুযোগ থাকে, গেরিলাদের তা থাকে না। এই জন্য গেরিলাদের তৎপরতা এমন সব স্থানে করতে হবে যেখানে নিয়মিত সৈনিকের আধুনিক যানবাহন পৌঁছানো সম্ভব নয়।

গেরিলা গতিশীলতার জন্য প্রয়োজন :  
ক. ধাঁধার জন্য  
খ. চমকে দেওয়ার জন্য

গতিশীলতার জন্য গেরিলা:  
গ. শারীরিকভাবে হালকা হবে  
ঘ. বাহ্যিক ও মানসিক দিক থেকে দৃঢ় হবে  
ঙ. চিন্তাশীল ও ভালো পরিকল্পনাবিদ হবে

৪. আক্রমণ- গেরিলা সর্বদা আক্রমণে উদ্যোগী হবে। যদি কোথাও শত্রু আক্রমণ করে তবে যথাসম্ভব সম্মুখ্যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে হবে।

৫. চেতনা- গেরিলার চেতনা ও উদ্যম সর্বোচ্চ স্তরের হওয়া চাই। তাদের মনোভাব এমন হবে যে, তারা সবাই একই পরিবারের লোক, একই আদর্শ বা কারণের জন্য যুদ্ধরত। সাথীকে বিপদে ফেলে গেরিলা কখনো পালায় না।

৬. নিয়মানুবর্তিতা- গেরিলার শৃংখলা সর্বোচ্চ স্তরের হবে। নিজের জীবন বিপন্ন করেও গেরিলা তার দলগতির নির্দেশ মানে।

## মুক্তিযুদ্ধের গান

### জয় বাংলা, বাংলার জয়

জয় বাংলা, বাংলার জয়  
হবে হবে হবে  
হবে নিশ্চয়  
কোটি প্রাণ একসাথে  
জেগেছে অন্ধরাতে  
নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময়  
জয় বাংলা, বাংলার জয় ।।।

বাংলার প্রতি ঘর  
ভরে দিতে চাই মোরা অঞ্চে, অঞ্চে  
আমাদের রক্ত উগবগ দুলছে  
মুক্তির দৃশ্টি তারংগে, তারংগে ।।।

নেই ভয়  
জয় হোক রক্তের প্রচদ পট ।।।

তবু করি না করি না করি না ভয়  
জয় বাংলা, বাংলার জয় ।।।

অশ্বের ছায়ে যেন রাখালের বাঁশরী  
হয়ে গেছে একেবারে স্তুর  
চারিদিকে শুনি আজ নিদারণ হাহাকার  
আর ঐ কানার শব্দ ।।।

শাসনের নামে চলে শোষনের সুকঠিন যন্ত্র  
বজ্জের হংকারে শৃংখল ভাঙতে সংগ্রামী জনতা  
অতন্ত্র ।।।

আর নয়

তিলে তিলে বাঙালীর এই পরাজয় ।।।

আর করি না করি না করি না ভয়  
জয় বাংলা, বাংলার জয় ।।।

ভুখা আর বেকারের মিছিলটা যেন ওই  
দিন দিন শুধু বেড়ে যাচ্ছে  
রোদে পুড়ে জলে ভিজে  
অসহায় হয়ে আজ ফুটপাথে তারা ঠাই  
পাচ্ছে ।।।

বারবার ঘৃঘৃ এসে  
খেয়ে যেতে দেব নাকো আর ধান  
বাংলার দুশমন- তোষামোদী চাঁকুকার  
সাবধান সাবধান সাবধান ।।।

এই দিন  
সৃষ্টির উল্লাসে হবে রঞ্জন ।।।

আর মানি না মানি না কোনো সংশয়  
জয় বাংলা, বাংলার জয়

জয় বাংলা, বাংলার জয়  
হবে হবে হবে  
হবে নিশ্চয়  
কোটি প্রাণ একসাথে  
জেগেছে অন্ধরাতে  
নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময়  
জয় বাংলা, বাংলার জয় ।।।

# বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা

অমি রহমান পিয়াল

১৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টা। শান্তিবাগে আমার বাসায় শুয়েছিলাম। হঠাত বাইরে ভারী পায়ের শব্দ পেলাম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন বাইফেলধারী লোক আসছে। রাস্তার দরজায় এসে তারা জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল। কর্কশ স্বরে তারা বলছিল- ‘ঘরে কে আছো, দরজা খোলো।’

তারপর নানা কথাবার্তার পর তারা আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। বাসার পাশের একটি মেসের একটি ছেলেকেও তারা ধরে নিয়ে এল। আমাদের তারা মালিবাগ মোড়ে দাঁড় করানো একটি বাসে নিয়ে তুলল। বাসে তুলেই তারা আমার গায়ের জামা খুলে ফেলল এবং একটি কাপড় দিয়ে চোখ শক্ত করে কষে বেঁধে ফেলল। এছাড়া হাত দুটো নিয়েও পেছন দিকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর বাস ছেড়ে দিলো। পথে আরো কয়েক জায়গায় তারা বাসটি থামালো। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমরা কোথায় যাচ্ছি। অনুমানে মনে হলো মোহাম্মদপুর, সেকেন্ড ক্যাপিটাল (শেরে বাংলা নগর) কিংবা ক্যান্টনম্যান্টের দিকে যাচ্ছে।

এমনিভাবে ঘট্টথানেক চলার পর বাস এক জায়গায় থামল। তারপর আমাদের হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ততক্ষণে কথাবার্তায় আমি টের পেয়েছি আমি বদর বাহিনীর হাতে পড়েছি। খানিকক্ষণ পর আমাকে ও আরো একজনকে উপরতলায় নিয়ে গেল। দরজা খুলে একটি রামের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। হ্রস্ব খেয়ে পড়লাম মেঝের উপর। ঠিক পাকা মেঝের উপর নয়, কিছু লোকের উপর। অনেকে কষ্টে সোজা হয়ে বসলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কক্ষের আর সব লোকেরও আমার মতো হাত-চোখ বাঁধা কিনা। শুধু বুঝতে পারছিলাম ঘরে আমার মতো আরো লোক আছে। এদিকে কষে বাঁধার জন্য আমার চোখ ও কানে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে শুরু করেছি। মাথায় শুধু একটাই চিন্তা- কি করে এই বর্বর পশ্চদের হাত থেকে বাঁচতে পারি। আমি কি সত্যি বাঁচতে পারব?

মোহাম্মদপুর ফিজিকাল টেনিং সেন্টার ছিলো আল-বদরদের হেডকোয়ার্টার। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বুদ্ধিজীবিদের ধরে এখানেই আনা হতো। অমানুষিক অত্যাচার চলত তাদের ওপর। আর তারপর রায়ের বাজর ও মীরপুরের শিয়ালবাড়িসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে গুলি করে মারা হতো। স্বাধীনতার পর মিলেছে তাদের বিকৃত লাশ। ঢাকার গ্রিনল্যান্ড মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চিফ একাউন্টেন্ট মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ভাগ্যবান। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আল-বদরদের হাত থেকে পালাতে পেরেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় ছাপা হয়েছিলো ‘বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা’ শিরোনামে তার সেই কাহিনী।

বদর বাহিনীর লোকরা তো শুনেছি মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা লাইনের ছেলে। আল্লাহর আহাজারিতে যদি বদর বাহিনীর লোকদের দয়া হয়। যদি দয়াপরবশ হয়ে চোখের ও হাতের বাঁধন একটু খুলে দেয়, নিদেনপক্ষে একটু ঢিলে করে দেয়। অনেকক্ষণ কাঁদার পর কে যেন আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফিসফিস করে বলল- সাবধান। হাত খোলা দেখলে আপনাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।’ কঠি কঠি। বুলাম অল্লব্যসী কোনো ছেলে এবং সে বদর বাহিনীর কেউ নয়। আমি তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন ঢিলে করে দিলাম। বাঁধন এমনভাবে রাখলাম, যাতে- আবছা আবছা দেখা যায়। এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি, যে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল আট-নয় বছর বয়সী একটি ছেলে। তার দুহাতের চামড়া কাটা। হাত ফোলা। সারা কক্ষে শুধু রক্ত আর রক্ত। এখন সেখানে ইতস্ততভাবে ছড়িয়ে রয়েছে রক্তে রঞ্জিত জামা ও গেঞ্জি। আমার মতো প্রত্যেকের গায়েই গেঞ্জি। তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে কাটাছেড়ার দাগ। হাতের বা পায়ের আঙুল কাটা। কারো দেহে দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত। কারো হাতে হাত-পায়ের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে।

ছেলেটি আমার হাতে আবার কাপড় জড়িয়ে বাঁধনের মত করে দিল। আমি ভাবছিলাম- আমি কি করে এই জল্লাদদের হাত

থেকে বাঁচব। কক্ষিতে শুধু একটি কাঁচের জানালা, তবে মনে হলো বেশ মজবুত। এল-টাইপের ত্রিতল অথবা চারতলা বাড়ি। বিরাট এলাকা দেয়াল দিয়ে যেরা। বাড়িটি সম্ভবত মোহাম্মদপুরের নিকটবর্তী এলাকার কোথাও হবে।

এমনিভাবে সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে বদর বাহিনী বা রাজাকারের দলের লোকজন আরো কিছু লোককে ধরে নিয়ে এল। সন্ধ্যার পর তিন-চারজন লোক আমাদের কক্ষে এলো জিঙ্গাসাবাদ করার জন্য। একেক করে সবাইকে তারা জিঙ্গাসাবাদ করা শুরু করল। শুনলাম, কেউ বলছে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কেউ বলল আমি ডাক্তার, আমি সাংবাদিক, আমি চিফ একাউন্টেন্ট, আমি কম্বাইন মিলিটারি হাসপাতালের সার্জনের ছেলে। লোকগুলোর একজন বলে উঠল, শালা, তুমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে এলিন মন্ত্র পড়িয়েছো, আজ আমি তোমাকে পড়াব। তুমি তো গভর্নেন্ট অফিসার, সরকারের টাকা খেয়েছ আর গান্দারি করেছ। এবার টের পাবে।

জিঙ্গাসাবাদের পর শুরু হলো প্রহার। এমনি ধূমধাম মার দেয়া শুরু হলো যে নিঃশ্বাস ফেলারও জো নেই। সবাই চিন্কার করে

কাঁদছে। কেউ জোরে জোরে দোয়া দরঢ় পড়ছে, আঁলাহর কাছে ফরিয়দ জানাচ্ছে। কিন্তু পশুগুলোর সেদিকে ভুক্ষেপও নেই। মারধোর করে প্রায় আধগঠ্টা পরে লোকগুলো চলে গেলো। মার খেয়ে অনেকেই অচেতন হয়ে পড়েছে। রাত তখন অনুমান দশটা। এক অধ্যাপক সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে বললেন, ভাই, আপনার হাত কি খোলা? আমার বাঁধনটা একটু ঢিলে করে দেন। লুঙ্গিটা হাঁটু থেকে নিচে নামিয়ে দেন। খানিকপরে কোনোক্ষে দেয়াল ঘেঁষে বসে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন।

রাত দশটা থেকে অনুমান একটা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার বদর বাহিনীর জল্লাদর আমাদের খানিক পরপর দেখে গেল। রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় আমাদের উপরতলা থেকে কয়েকজন মহিলার আর্টনাদ ভেসে এল। সেই আর্টনাদের বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। মারের চোটে প্রায় সবাই অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি জ্ঞান হারাইনি। আমি আঁলাহকে তেকে যাচ্ছি। শেষবারের মতো আঁলাহর কাছে আমার যদি কোনো গুণাহ হয়ে থাকে, তার জন্য পানাহ চাইছি।

রাত প্রায় একটার সময় পাশের ঘরে রাইফেলের গুলি লোড করার শব্দ এবং লোকজনের ফিস ফিস করে আলাপের শব্দ শুনতে পেলাম। সারা শরীরে আমার ভয়ের হিমস্তোত চকিতে ভরে উঠল। খানিকপর একটা লোক এসে আবার আমাদের দেখে গেলো। তারো খানিকপর কয়েকজন লোক আমাদের ঘরে চুক্ল। তারাই আমাদের ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

এরপর বদর বাহিনীর একেকটি পশু আমাদের দুজন দুজন করে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনল। তিনটি বাসে তারা আমাদের সবাইকে নিয়ে তুলল। তাদের হাবভাব, ফিসফিস করে কথাবার্তা শুনে মনে হলো- আর রক্ষা নাই। বাস ছেড়ে দিল, বাসের সব কটি জানালা উঠানো। বুঝতে পারলাম, আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাস এসে থামল কতগুলো ঘরের পাশে। ঘরের দরজা বেশ বড় বড় এবং কোনাকুনি লাঠি দিয়ে আটকানো। কিন্তু তারা আমাদের ঘরে না ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে চলল। কোশলে চোখের বাঁধন আলগা রাখার সুযোগ হলো বলে দেখতে পেলাম সামনে বিরাট এক বটগাছ, তার সম্মুখে একটি বিরাট বিল, মাঝে মাঝে কোথাও পুরুরের মত রয়েছে। বটগাছের আরো কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম ১৩০

থেকে ১৪০ জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এর মাঝে এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে আমি আমার পরনের লুঙ্গি হাঁটুর উপর উঠিয়ে রেখেছি। ঢোখ বাঁধা অবস্থায়ও আমি যে দেখতে পাচ্ছি তা বদর বাহিনীর লোকেরা বুঝতে পারেনি। বদর বাহিনীর লোকজনের হাবভাবে স্থির নিশ্চিত হলাম, আমাদের হত্যা করার জন্যই এখানে নিয়ে এসেছে। আমি এখন আমার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত করে ভাবছি- কি করে বাঁচা যায়।

দেখতে পেলাম- বদর বাহিনীর পশুরা আমার সামনের লোকদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আমাদের মতো বন্দি একজন চিকির করে বলে উঠলেন- আপনারা বাঙালী হয়ে আমাদের মারছেন! কোনো পাঞ্জাবি যদি মারত তাহলেও না হয় বুঝতে পারতাম, কেন আমাদের হত্যা করতে যাচ্ছেন? আমরা কি অন্যায় করেছি? ভদ্রলোকের গায়ে রাইফেলের এক ঘা দিয়ে বদর বাহিনীর এক জল্লাদ গর্জে উঠল- চুপ কর শালা। কে যেন একজন বলে উঠল- আমাকে ছেড়ে দিন, দশ হাজার টাকা দেব। কোন এক মহিলা চিকির দিয়ে বলে উঠলেন- আপনারা আমার বাপ, ভাই। আমাকে মারবেন না। চারিদিকে মাতম, আহাজারি, তা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। সামনের লোকদের দলে দলে ভাগ করে তারা ফাকা মাঠে নিয়ে যাওয়া শুরু করল। আমার সারা শরীর যেন ভয়ে জমে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমি বাঁচার আশায় পালাবার সম্ভাব্য সব উপায় ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। মনে হচ্ছে- কোন উপায় আর নেই।

আবার মনে হচ্ছে, বাচার কি কোনো উপায় নেই! জল্লাদদের একজন আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার পেছনের লোকের গেঁঠির সঙ্গে সে আমার গেঁঠি ভালো করে বেধে দিল। হঠাৎ সে সময় পেছনের লোকটি বলে উঠল- আজিজ ভাই তুমি! তুমি আমাকে মারতে নিয়ে এসেছো! তুমি থাকতে আমাকে মেরে ফেলবে! আফসোস। রাইফেলধারী লোকটি কোন কথা না বলে চলে গেল।

এদিকে বেয়নেট দিয়ে জল্লাদের দল তাদের হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছে। ছুড়ে গুলি। চারিদিকে আর্টিচিকার, মাঝে মাঝে জল্লাদদের কেউ চিঢ়কার করে বলে উঠছে- শালাদের খতম করে ফেল। সব ব্যাটারের খতম করে ফেল। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে আর্টিচিকারের সঙ্গে পৈশাচিক হাসি। এমন নারকীয় তান্ত্বলীলার মধ্যে আমি জীবনপণ করে আমার হাতের বাঁধন খুলে ফেললাম। আমার সামনের প্রায় তিরিশজনকে ততক্ষণে

সামনের মাঠে খতম করে ফেলেছে বদর বাহি-নীর পশুরা। এক হাতে আমি আমার গেঁঠির গিঁট খুললাম। বাঁহাতের দড়ির বাঁধন খুলে দড়িটা হাতের নিচে চাপা দিয়ে রাখলাম। হাত আবার পেছনে দিয়ে রাখলাম। বদর বাহিনীর এক দস্যু আমার সামনের কয়েকজন লোক নিয়ে তখন ব্যস্ত। কে যেন বলে উঠলেন- আঁলাহর কাছে তোরা দায়ী থাকবি। লাইলাহা ইঁলাজাহ মুহাম্মাদুর রাসুলাজ্জাহ। মাগো...।

আমি আমার চোখের বাঁধনের কাপড়টি সরিয়ে ফেলে খুব জোরে দৌড় দিলাম। প্রায় হাত কুড়ি যাওয়ার পর ‘এই এই’ বলে হাঁকড়াক শুনতে পেলাম। আমার তখন কোনো দিকে খেয়াল নেই। শুনতে পেলাম গুড়ুম গুড়ুম করে দুটো আওয়াজ। অঙ্ককারে প্রায় ৪০ গজ যাওয়ার পর সামনে পড়ল কাদা। কর্দমাক্ত জায়গাটি পার হওয়ার সময় আবার দুটি গুলির আওয়াজ শুনলাম। কিন্তু অঙ্ককারে তাদের লক্ষ্যপ্রস্ত হলো। আমি কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রায় ৩ ফুট গভীর পানি। সমস্ত শক্তি নিয়ে গুরুত্ব পান তেলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর শুকনো জায়গা পেলাম। উঠে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। দূর থেকে আমার দিকে উঠের এক বালক আলো ভেসে এলো। আবার দুটি গুলির শব্দ। সাথে সাথে আমি কাত হয়ে পড়ে গেলাম। গড়তে গড়তে পড়ে গেলাম। প্রাণপণে সাতার কেটে এগিয়ে চললাম।

এরপর শুকনো বিল আর নদী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। গায়ে শক্তি নেই, কিন্তু তখন আমি দিকপ্রান্ত। নিরাপত্তার জন্য নদীর পারে না উঠে উজানে এগিয়ে চললাম। রাতের তখন বেশি দেরি নেই। খানিক পর উঠে পড়লাম নদী থেকে। বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলাম নদীর তীরে এক বৃপ্তিতে। সকালে রোদ ওঠার পর চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না কোথায় এসেছি। গ্রামের আভাস যেদিকে পেলাম সেদিক পানে এগিয়ে চললাম। খানিকপর শুনলাম কারা যেন আমাকে ডাকছে। প্রথমে তয় পেলেও পরে বুঝলাম এরা গ্রামবাসী। তাদের সব বললাম। বটগাছের বিবরণ দিতে তারা বলল- ওটা রায়ের বাজার ঘাটের বটগাছ। সেখান থেকে পরে আমি আটির বাজারে মুক্তিফোজের কমান্ডারের সাথে দেখা করি। তিনি আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দুর্দিন পর ফিরে এলাম স্বাধীন বাংলার রাজধানীতে। তখনো বুঝিনি, এখনো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সত্যি কিভাবে আঁলাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন।

# যাদের রক্তে মুক্ত এ দেশ

ডা. মোহাম্মদ শফিকুর রহমান

## ভূমিকা

### বাবার পাঞ্জুলিপি ও কিছু প্রাথমিক ধারণা...

সাধারণ নিয়মেই উত্তরসূরীরা তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে জ্ঞানী ভাবেন। কারণও আছে, সময় তাদের জ্ঞানকে সম্মদ্ধ করে। তো আমাদের গুঠিতে ব্যাপারটা আরো জটিল। জেনেটিকালি আমি, আমার বাবা, দাদা ও তস্য বাবা সকলেই বংশের বড় ছেলে এবং একই সঙ্গে বাবা যা বলবেন তার উল্টো পথে যাত্রা।

দাদুর বাবা চেয়েছিলেন ছেলেকে নিজের কাঠ, সুপারি-পান ব্যবসায় লাগাতে, উনি স্কুলে ভর্তি হলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিক্ষক হিসেবেই তার কর্তব্য পালন করেছিলেন। আমার বাবাকে নিয়ে তার সাধ ছিল, ছেলেকে তালেবে এলেম বানাবেন। বাবা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পিতৃভূক্ত থেকে বাড়ি থেকে পালানেন। শেষ পর্যন্ত হলেন ডাক্তার। ওনার সাধ আমিও তার মতো হই। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। বুয়েটে টিকিনি, কিন্তু ছেট মামা ফ্লোরিডায় সব ব্যবস্থা পাকা করার পরও আমাকে জোর করে রেখে দেওয়া হলো তার সাধ মেটাতে। হলো ঘোড়ার ডিম। আমিও নিহিলিজম কার্যকর করলাম পেশা বদলিয়ে।

যাহোক, একটা ব্যাপারে আমার বাবার ওপর তুমুল শ্রদ্ধা, সেটা মুক্তিযুদ্ধের জন্য। উনি বন্দুক হাতে নেননি, কিন্তু যেভাবে সম্ভব, তার সাধ্যের মধ্যে তাদের সাহায্য করেছেন- এমনকি একবার প্রাণ বিপন্ন হওয়ার পরও। ৮৮ সালে বাবা পাঞ্জুলিপিতে হাত দেন। কোথায় চেম্বার কোথায় প্র্যাকটিস, ঘরে চুলা জুলে কি জুলে না। বাবা কোথেকে একটা টাইপারাইটার এনে খটখটাখট চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম, তুমি নতুন কী দিচ্ছ যা অন্যার দেয়নি? কারণ রেফারেন্স রেফারেন্স লাগছে তোমার কথাগুলো। বরং তুমি একজন বুদ্ধিজীবি হিসেবে যুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতার কথা লিখ। ওনার উত্তর, আমি কোনো গল্প উপন্যাস লিখছি না। এটা ইতিহাস, আর সেটা সত্যি বলেই বাজারে আরো ১০০ বইয়ের সঙ্গে এর অভিল পাবি না হয়তো। কিন্তু আমি এভাবেই লিখব।

তর্ক ওখানেই শেষ। যা হোক, দুবছর প্যারালাইসিসে ভুগে গত বছর ২৪ জুলাই মারা গেছেন বাবা। তার আগেই শেষ করে গেছেন ইংরেজি ও বাংলায় তার পাঞ্জুলিপি। উনি উর্দ্ধ-ফার্সিতেও সমান পারদর্শী ছিলেন।

যাহোক, পাঞ্জুলিপিটি কম্পিউটারে কম্পোজ করতে গিয়ে আমার জানি কেমন কেমন লাগছে। কিন্তু দলিল তো দলিলই। বিভাস্ত প্রজন্মের চোখ খুলতে একটু যদি কাজে লাগে বাবার কোনো রেফারেন্স, স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই তঃপৰি হাসি হাসবেন।

আমি রহমান পিয়াল  
মার্চ ২০০৬

## মুখ্যবন্ধ

এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাতের সঠিক সময় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বৃত্তিশ শাসনামলে এদেশের মুক্তির স্বপ্ন যারা দেখেছিলেন, বা পাক-ভারত উপমহাদেশের বাটোয়ারাউতরকালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই লেখার গভিতে আনা হয়নি। বিশেষভাবে, 'যাদের রক্তে মুক্ত এ দেশ' বলতে আমি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথাই বলতে চেয়েছি।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ আজ এক বাস্ত ব সত্য। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এতে সমালোচনার অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু এর অস্তিত্বে বিশ্বস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাস্তর। কেউ এই সত্যকে স্বীকার করুক বা না করুক তাতে বাংলাদেশের কিছুই যায় আসে না। অনেক রক্তের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার তরঙ্গনা মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, রণাঙ্গনে যে অদৃম্য শৈর্য, বীর্য, সাহস ও প্রগাঢ় আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিল তার দ্বষ্টাপ্ত পুরিবীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মেলা ভার।

দেশের ভেতর ও বাহিরের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে প্রচুর বাধাবিপন্নি অতিক্রম করে, নিরলস সংগ্রাম করতে হয়েছিল এদেশের স্বাধীনতাকামী তরঙ্গদের। সেদিনের বিরোধী শক্তিবর্গ আজও সন্ত্রিয় দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে। সেদিনের সর্বনাশ পরিকল্পনার নীলনঞ্চা বাস্তবায়নের ব্যর্থ প্রচেষ্টা আজও তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দশ কোটি বাঙালীর আত্মত্যাগ ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা সুর্যের উদয়, তা এক নিমেষে মুছে যাবার জন্য আসেনি। যারা তখন প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল, স্বাধীনতা অর্জনের সূন্দীর্ঘকাল পরেও তাকে বাস্তবসত্য বলে মেনে নিতে পারেন। এদেরকে বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতা ভালোভাবেই চেনে। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতার প্রতি কোনো হৃষির সন্তান দেখা দিলে, এ জাতি আবারও জীবনবাজি রেখে তা প্রতিরোধ করবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যারা দেশের বাইরে ছিলেন, স্বাভাবিক কারণেই তারা দেশের অভ্যন্তরে কী ঘটেছে তা পুরোপুরি জানেন না। আর যারা দেশের ভেতরে ছিলেন, তারাও পরিস্থিতির কারণে দেশের অন্যান্য অংশে কী ঘটেছে তার সবকিছু জানতে পারেননি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে সন্ত্রিয় ও সচেষ্ট ছিলাম। তাই সমকালীন অভিজ্ঞানের আলোকে কিছুটা সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যাদের রক্তে মুক্ত এ দেশ, তাদের সম্পর্কে। আমি তখন তদানিন্তন ব্রাক্ষণবাড়িয়া মহকুমার যঙ্গা ক্লিনিক ও হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার, আর ব্রাক্ষণবাড়িয়া

## কৃতজ্ঞতা

কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা হচ্ছে এক ব্যাপার। আর তা নিয়ে লেখা আরেক ব্যাপার- আবার তাও যদি হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো সর্বব্যাপক এক পটভূমি। অনেকদিন থেকেই মনের ভেতর একটা ইচ্ছাক্ষুর সুষ্ঠ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো একটা বিষয়বস্তু নিয়ে যদি লেখা যায়, পুঁজি ছিল যুদ্ধকাল এবং তার অবব্যহিত পরের বিভিন্ন পক্ষকাদি ও পত্রিকাস্তরে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহের ব্যক্তিগত ডায়েরির লিপিবদ্ধ অংশবিশেষ এবং যুদ্ধোন্তর দৈনিক পূর্বদেশ, ইত্তেফাক, সংবাদ ও দৈনিক বাংলার পেপার কাটিং। পুরো একটা সূটকেস ভর্তি হয়ে গিয়েছিল কাঁচামালে। এজন্য আমি এ প্রতিকাণ্ডলোর কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস কিংবা ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত হচ্ছে একটি বিশাল এবং ব্যাপক বিষয়। বিশেষ কর্তেক এলাকা এবং অবস্থানে থেকে যুদ্ধের টিউনিং সম্পর্কে পুরোমাত্রায় ধারণা করা সুস্পষ্ট কারণেই কঠকর ব্যাপার। তবুও মনে করি, আন্তরিকতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যদি পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়, তাহলে বিন্দুর মধ্যেও সমুদ্দর্শন করা তেমন দুরতিক্রম্য বাধা নয়। এ ধরনের অনুভূতি নিয়েই এ গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলাম।

কিন্তু যাদের রক্তে মুক্ত এ দেশ' লেখার স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবে রূপ নিত না যদি না বন্ধুবর সিদ্ধিকুর রহমান বারবার বিশেষভাবে তাগাদা দিতেন এবং উৎসাহ যোগাতেন। এমনকি তার স্ত্রী, যাকে আপা ডাকি, তিনিও আমাকে অনেক উৎসাহ যুগিয়েছেন।

অনেক বই থেকে আমাকে তথ্যনির্ভর সাহায্য নিতে হয়েছে। যেমন, ১. আমি বিজয় দেখেছি- এম আর আখতার মুকুল। ২. একান্তরের রণাঙ্গন- শামসুল হুদা চৌধুরী। ৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র- বেলাল মোহাম্মদ ৪. বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস- ফজলুল কাদের কাদেরী। ৫. স্বাধীনতা '৭১ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)- কাদের সিদ্ধিকী। ৬. বন্ধুদের ভুলি নাই- সিদ্ধিকুর রহমান। এছাড়া আরো অনেকেই আছেন, যাদের সহযোগিতা ও প্রতিপোষকতা না পেলে এর প্রকাশ আদৌ সন্তুর হতো না। তাদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে যার অক্রমণ হাতের সম্পর্ক ও মুখের হাসি আমার এই লেখনীর ধণাত্মক প্রভাব, সেই অদ্বিতীয় মানে আমার স্ত্রী খুরশীদ জাহানের প্রতিও আমি বিশেষভাবে ঝণ্টি। অনিচ্ছাক্ত ভুলক্রিতির জন্য সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, বিশেষ কিছু কারণে কিছু কিছু তথ্য সঠিকভাবে নির্ণয় (ক্রসচেকিং) হয়নি। এজন্য খুবই দুঃখিত। এ লেখা যদি কারো ভালো লাগে এবং এর মাধ্যমে একজন পাঠকের মনেও যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের মুল্যবোধ ছায়া ফেলতে সক্ষম হয়, তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করব।

### বিনীত

ডা. মোহাম্মদ শফিকুর রহমান

যক্ষা হাসপাতাল ছিল পাক বাহিনীর ৪০-ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের ঘাঁটি।

## স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি

স্বাধীনতা মানুষের জন্মাগত অধিকার। এদেশের স্বাধীকার ইতিহাস পর্যালোচনা বিশ্লেষণে এটাই সুনির্দিষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাঙালীর ভাগ্যপরিক্রমা রাজনৈতিকভাবে চিরদিন ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘুরেছে। ভাগ্য বিপর্যয় বারবার দাসত্বের আকারে তাদের ললাটলিখন হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। বাঙালীরা এই বিধিলিপিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমোঘ সত্য হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্বকাননে লর্ড

কাইভের ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে সেনাপতি মীর জাফর আলি খাঁ ও তার অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। আর এর সাথেই বাংলার ভাগ্যকাশে বাঙালীর স্বাধীনতার সূর্য চিরতরে অস্তিত্ব হয়ে যায়। পরবর্তীকালের ইতিহাস বিদেশী ইংরেজ শাসকদের অবিচার, অনাচার, নির্যাতন, কুশাসন, শোষণ ও বধনের নির্মম ইতিহাস। কিন্তু বাঙালীরা কখনোই এই উপনিরবেশিক শাসন ও শোষণ সহজে মাথা পেতে নেয়নি। তাদের স্বাধীনতার সৌভাগ্য সূর্যকে ছিনিয়ে আনার নিরলস প্রচেষ্টা, নিরবচ্ছিন্ন ও প্রগাঢ় আত্মত্যাগ দুশ্শা বছরেরও বেশি সময় কালের ইতিহাসের বুকে সাক্ষী হয়ে বিদ্যমান। যখনি সুযোগ পেয়েছে

বাংলীরা এই শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। কখনোবা এই অসতোষ বিক্ষেপের রূপ নিয়েছে। লর্ড ডালহোস চলে যাবার পর লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ সালে এদেশের গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। আর তখনই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এ উপমহাদেশের সর্বত্র পুঁজিভূত ক্ষেত্র প্রতিবাদী রূপ পায়। ১৮৫৭ সালে জনতার এই অসতোষ সিপাহী বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জনতার এটাই এদেশের ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম। বিস্তারিত আলোচনা এই বইয়ের কলেবর বহুলাখ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যা অনাহৃত ও অনভিপ্রেত। সংক্ষেপে বললে এরপর বাংলার সুযোগ্য সত্ত্বন তিতুমীর ও শরীয়তুল্লাহ প্রযুক্তির প্রতিরোধ সংগ্রাম, চট্টগ্রামের অগ্নিপুরুষ মাস্টারদা সূর্যসেন, কল্পনা দত্ত ও বাঘা যতিন প্রযুক্তির সশস্ত্র প্রতিবাদ। পাশাপাশি চলে মুসলিম লিগ ও ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার দ্বি-জাতি ভিত্তিক পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে বিশিষ্টি করে পাকিস্তান ও ইন্দুস্তান নামে দুটো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য দেয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম এর দুটো অংশ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব হয় প্রায় দেড় হাজার মাইলের মতো। স্বাধীন হয়েও পূর্ব পাকিস্তান ধীরে ধীরে পশ্চিমাংশের কলোনী হয়ে উঠল, এখানকার বাংলালীরা আগের মতোই রয়ে গেল। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না।

স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই আগাম এল বাংলালীর ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় পাকিস্তানের জনক ও গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই মাসের ২৪ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ সাহেব একই উক্তি করেন। বাংলালীরা বুবো নিল পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেনি। বরং নতুন ভাবে শুরু হলো। এইদিন এদেশের ছাত্র সমাজ প্রতিবাদের ঝড় তোলে।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ৰ্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু হলো। দিনাজপুর ও রাজশাহীতে ছাত্র বিক্ষেপ দেখা দিল। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খানের সংবিধান সম্পর্কিত রিপোর্টের বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ মুখ্য হয়ে উঠল। ছাত্র-জনতা নবউদ্যমে আগিয়ে পড়ল স্বাধীনতা সংগ্রামে। শুরু হলো ভাষা আন্দোলন। এল অমর ২১ ফেব্রুয়ারি। ছাত্রজনতার মিছিল আর শোগানে মুখ্য হয়ে

হয়ে উঠল রাজপথ। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনের হৃকুমে পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালাল। ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হলো শহীদ সালাম-জব্বার-রফিক-বরকত প্রমুখ ছাত্র জনতার বুকের রক্তে। প্রথমবার ইতিহাসে মাত্তভাষার জন্য এই প্রথম রক্তদান। তাদের এই আজ্ঞাহতি বাংলালীর স্বাধীকার আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেল। দেশব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হলো। ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচন হলো। এল ৯২-ক ধারা, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রাচিত হলো। সেইসঙ্গে শুরু হলো স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করলেন। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমানের কুখ্যাত শিক্ষাকমিশন রিপোর্টকে ঘিরে শিক্ষানীতি বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলো। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র।

## মার্চের উত্তাল দিনগুলো

৪ মার্চ প্রদেশব্যাপী সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। এইদিন করাচিতে এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান বললেন, 'রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশের সংহতি রক্ষা করা অপরিহার্য।' কোয়েটোর ন্যাপ নেতা খান ওয়ালী খান বললেন, 'জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবিত অধিবেশন অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা অগণতাত্ত্বিক ও অবাঙ্গিত। লাহোরে জনাব মালিক সোলাম জিলালী ঘোষণা করলেন, 'এখন আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, যখন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে সংখ্যাগুরু দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'

৫ মার্চ সমস্ত প্রদেশব্যাপী শেখ মুজিবের আহ্বানে হরতাল পালিত হলো। সাংবাদিক সংস্থা সংহতি জনিয়ে সভা ও শোভাযাত্রা করলেন। বাংলা একাডেমিতে শিল্পীদের সভা হলো। তারা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করলেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সভা করল শহীদ মিনারে, তারা আমরণ সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করলেন।

এমনিভাবে রক্তের পথ ধরে এগিয়ে চলল উত্তপ্ত মার্চ। শুরু হলো সর্বাত্মক সংগ্রাম, আর এর পথও দিনে টৌৰীতে শ্রমিক-জনতার মিছিলের ওপর গুলি চালায় বর্বর হাননাদাররা। এতে চারজন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান রফিজউদ্দিন (৩৫) ও হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আবদুল মতিন (৩০)।

প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল দুশ বাইশ (২২২)। যশোরে পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন একজন, রংপুর ও রাজশাহীতেও কারফিউ বলবত করা হলো। নারায়নগঞ্জ শহরে এক বিরাট জনসভা আয়োজিত হয়। সভা শেষে বেরুল বিশাল এক জঙ্গি লাঠি মিছিল। সেদিন ঢাকায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হলো। তারা স্বাধীনতা আদায়ের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামের শপথ নিলেন। তাদের শোগান হলো, 'লেখকের লেখনী হবে সংগ্রামের হাতিয়ার'। এছাড়া আরো অনেক সভা শোভাযাত্রা ও মশাল মিছিল হলো। এ গণজাগরণকে প্রতিরোধ করার জন্য নিষ্ঠুর ও দুর্ধর্ষ জেনারেল টিক্কা খান নতুন সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর হিসেবে ৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। কিন্তু ৭ মার্চ '৭১ হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সিংহহৃদয় জনাব বি, এ, সিদ্দিকী জেনারেল টিক্কা খানের গভর্নর পদে বহালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানিয়ে ইতিহাসের পাতায় বীর বাংলার দুঃসাহসিকতার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্নর মোনারেম খানের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষেপ দেখা দিল ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের রহমান শুরু করলেন তার ইতিহাসিক ছ'দফা আন্দোলন। ১৯৬৬ সালের ৮মে কয়েকজন আওয়ামী লিগ নেতাসহ শেখ মুজিবের রহমানকে বন্দী করা হয়। সে বছর ১৩মে ও ৭ জুন যথাক্রমে আওয়ামী লিগ নেতাদের মুক্তির দাবিতে ও ছ'দফার সপক্ষে প্রদেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। মিছিলের ওপর পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী বেপরোয়া গুলি চালায়। ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু লোক হতাহত হয়।

## ছ'দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

৭জুন ১৯৬৮ সালে জেল থেকে মুক্তির পর শেখ মুজিবের রহমানকে আগরতলা মামলার আসামী হিসেবে জেলগেট থেকেই পুনরায় বন্দী করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে জেলহাজতেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বর্বর পাকদস্ত্রীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্বে ড্রেস শামস-উজ্জেব জোহাকে নিষ্ঠুরভাবে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ষ্টেরোচারী আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আক্রমণ ও ক্ষেত্র এক ভয়াবহ রূপ নিল। তারা ঢাকায় মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান (পরে দৈনিক বাংলা) অফিস

পুড়িয়ে দিল। ব্যাপক সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট হলো। প্রদেশব্যাপী গণজাগরণের জোয়ার এল, উপায়ান্তর না দেখে স্বেরাচারী শাসকচক্র সান্ধ্য আইন জারি করে সেনাবাহিনী তলব করল। কারফিউ অগ্রহ করে মিছিলের পর মিছিল বেরল। প্রবল এই বিক্ষেপের মুখে সংগ্রামী জনতার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো আইয়ুব সরকার, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলো তারা। '৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ ষড়যন্ত্র মামলার সব আসামিকেই মুক্তি দেওয়া হয়। সেদিন বিকেলে রেসকোর্সে (সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে) এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন শেখ মুজিব। এরপর তিনি ও মওলানা ভাসানী আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য রাওয়ালপিডি গমন করেন। জুলফিকার আলী ভট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এখানে শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ৬ দফা পুনরায় উত্থাপন করেন। কেউই তার এই প্রস্তাব মানল না। এমনি করে আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়।

## স্বেরাচারী ইয়াহিয়ার আগমন

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতা থেকে নেমে যান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আর সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গা নেন আরেক জাতা ইয়াহিয়া খান। ক্ষমতায় এসেই সামরিক শাসন জারি করেন তিনি। জাতির প্রতি দেওয়া ভাষণে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দান করেন।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর এক প্রলয়কারী ঘূর্ণিঝড় ও সর্বনাশ সামুদ্রিক জলোচ্ছবি আঘাত হানল। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরপনায় দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। সেই সঙ্গে গ্রহীন হয় আরো ত্রিশ লাখ। এ ভয়াবহ দুর্ঘোগের খবর পেয়ে বিশ্ববাসী কল্পনাতীত ত্রাণ সরবরাহ নিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রহিল সম্পূর্ণ নিরব দর্শকের ভূমিকায়। কেউ সামান্য সমবেদনা দেখাতে দুর্গত এলাকায় একটি সৌজন্য সফর পর্যন্ত করল না। মওলানা ভাসানী তার কিছুসংখ্যক কর্মী নিয়ে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং গঠন করেন রিলিফ কমিটি। শেখ মুজিব দুর্গত এলাকায় একনাগাড়ে নয়দিন ছুটে বেড়ালেন। তিনি জনগণকে সাম্মনা ও কর্মীদের মাধ্যমে রিলিফ দেওয়ার সাধ্যমতো চেষ্টা চালালেন। ২৬ নভেম্বর ঢাকায় ফিরে তিনি তৎকালীন শাহবাগ হোটেলে প্রায় দুশো দেশি-বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজিতে

লেখা বিবৃতিতে দুর্গত এলাকায় তার সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সেখানে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতাদের পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি তাদের ঘৃণ্য অপরাধী ও উপনিবেশবাদের 'চেলাচামুণ্ডা' বলে আখ্যায়িত করেন।

## ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

৭ মার্চ '৭১ সকালে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তার বাসভবনে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সাক্ষাত করেন। এ বৈঠকে রাষ্ট্রদূত তার সরকারের সিদ্ধান্তের কথা শেখ মুজিবকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তা হলো- 'পূর্ব বাংলার স্বয়ংৰূপিত স্বাধীনতা যুক্তরাষ্ট্র কখনোই সমর্থন করবে না।' এদিকে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (লোকে লোকারণ্য) বিকেল প্রায় সাড়ে চারটায় বঙ্গবন্ধু মগ্নেশ এলেন। তার ঐতিহাসিক সেই বক্তৃতার অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরছি :



...১৯৫২ সালে আমরা রঞ্জ দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি-নি। ১৯৫৮ সালে আইটুব খাঁ মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে।..... দেখে যান কীভাবে আমার গরীবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের ওপর গুলি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সামরিক আইন মার্শাল ল উইথেড করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত পাঠাতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। আর তারপর আমরা বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারব কীন। এর পূর্বে আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারি না..... আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট কাচারি, আদালত, ফৌজদারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনিদিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে।..... এরপর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তাহলে তোমাদের প্রতি অনুরোধ রইল- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট সব কিছু আমি যদি ছুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমাদের ভাই- তোমরা ব্যারাকে থাক। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।..... এবং তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাক। রঞ্জ যখন দিয়েছি, রঞ্জ আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

(আমার যোগ : বাবা বক্তৃতার হাইলাইটগুলো তুলে ধরছেন।) এই জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা দানকালে ঢাকা দফা দাবির কথা উত্থাপন করেন- ১. সামরিক আইন প্রত্যাহার। ২. সেনাবাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন। ৩. নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ। ৪. প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। রেসকোর্স ৭ মার্চের এই ভাষণ ঢাকা বেতারে কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার হবার কথা ছিল। ঢাকা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব আশরাফউজ্জামানের নেতৃত্বে তার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সামরিক জাতার চক্রান্তে সেদিন তা সম্প্রচারিত হয়নি। ও-বি টিম টেপেরেকর্ডে ভাষণটি পুরো টেপ করে নেয়। জনাব আশরাফ রেসকোর্স ময়দান থেকে ফিরে বেতারের সব

কার্যক্রম বন্ধ করে দেন এবং সবাইকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে ৭ মার্চ '৭১ ঢাকা বেতার কেন্দ্রের তৃতীয় অধিবেশন প্রচারিত হয়নি। রেডিও পাকিস্তান ও অল-ইন্ডিয়া রেডিওর ইতিহাসে এটাই প্রথম অসহযোগের ঘটনা। রাতের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচারের শর্তে সমরোতা হয়। পরদিন ৮ মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় রেকর্ডকৃত পুরো ভাষণটি ঢাকা বেতার থেকে সম্প্রচার করা হয়। একই সঙ্গে তা সম্প্রচারিত হয় প্রদেশের অন্যান্য বেতার কেন্দ্র থেকেও। কিন্তু চট্টগ্রাম বেতার টেলিফোনের সাহায্যে এই বক্তৃতা পুরোটা লিখে নেয়। এই অসাধারণ কাজটি সম্ভব হয় বার্তা সম্পাদক সুলতান আলী, সহ-সম্পাদক নজরুল ইসলাম ও অনুষ্ঠান সংগঠক আব্দুল হালিম সরদারের অসীম সাহসিকতায়। তাদের বীরত্বে ও সন্ত্রিয় সহযোগিতায় ৭ মার্চই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের স্থানীয় সংবাদে পূর্ণ তথ্যবিবরণী প্রচারিত হয়। সংবাদ পাঠক ছিলেন বদরুল হুদা চৌধুরী।

## ৭ই মার্চ '৭১র সরকারী প্রেসন্টেট

'গত এক সপ্তাহে প্রদেশের নানা জায়গায় সংঘর্ষে নিহত হয় ১৭২ ও আহত হয় ৩৫৮ জন। চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, যশোর ও রাজশাহীতে সংঘর্ষ হয়। ৬ মার্চ '৭১ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার তেঙ্গে কয়েদিরা পলায়ন করার চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত হয়। খুলনা ও যশোরে জনতা সৈন্যবাহী টেন আক্রমণ করে। রাজশাহী, খুলনা ও যশোরে টেলিফোন ভবন আক্রান্ত হয়। চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুরে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ হয়। এসব কারণে শাস্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সামরিক বাহিনী গুলিবর্ষণ করে।' ৭ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। এই মর্মে ১০ দফা কর্মসূচী প্রকাশিত হয়। আওয়ামী জীবের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে আরো ১৪ দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করলেন।

## মজলুম জননেতা ভাসানী ও ৯ মার্চ

এইরকম উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ৯ মার্চ '৭১ ঢাকার পল্টনের জনসভায় মজলুম জননেতা মণ্ডলান আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের লক্ষ্যে প্রদেশব্যাপী সংগ্রামের আহ্বান

জানালেন। তিনি বাংলাদেশে জাতীয় সরকার গঠনের দাবী তুললেন। দণ্ডকপ্তে ঘোষণা দিলেন, 'একদিন ভারতের বুকে গণহত্যা করিয়া, জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ইতিহাস রচনা করিয়া, অত্যাচার অবিচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াও প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকার শেষ রক্ষায় সক্ষম হয় নাই। শেষ পর্যন্ত তাহাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশকে শত্রুতে পরিণত না করিয়া সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে সরিয়া যাওয়াই তাহারা মঙ্গলকর মনে করিয়াছেন।..... প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি- অনেক হইয়াছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়াল ইয়া দ্বীন, তোমার ধৰ্ম তোমার, আমার ধৰ্ম আমার'-এর নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও।.... মুজিবের নির্দেশমতে আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে মিলিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমল আন্দোলন শুরু করিব। খামাখা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না। মুজিবকে আমি ভালো করিয়া চিনি।'

৯মার্চ '৭১ খন্দকার নাজমুল আলমকে সভাপতি করে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এই সমিতি ১১ মার্চ সর্বসম্মতিতে স্থির করেন যে অবিলম্বে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের সর্বস্তরে যথাসম্ভব বাংলাভাষা চালু করা হবে। এইদিন মণ্ডলান মুফতি মাহমুদের সভাপতিত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত সংখ্যালঘু দলগুলোর প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হন। তারা শেখ মুজিবের ৪ দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানান এবং সরকার গঠন ও সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে অর্পণের প্রস্তাব করেন। তারা ইয়াহিয়া-মুজিব সরাসরি বৈঠকেরও দাবি জানান।

১৫ মার্চ '৭১ জুলফিকার আলী ভুট্টো এক সংবাদ সম্মেলনে বললেন, পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা গুরু। তাই কেন্দ্রের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লিগের কাছে আর পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির কাছেই হস্তান্তর করতে হবে।' এই দুই পাকিস্তানের প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বে ভুট্টোর উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কঠোর সামরিক নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকায় আসেন। এবং ১৮ পাঞ্জাব ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়নের কড়া প্রহরায় স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হাউজে উপস্থিত হন। আর সঙ্গে ছিলেন জেনারেল হামিদ খান, খাদেম হোসেন রাজা, মির্ঠা খান, পীরজাদা ওমর, খোদাদাদ খান প্রমুখ জেনারেলগণ।

কোনো সহযোগী ছাড়াই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমান ১৬ মার্চ '৭১ প্রথম দফা বৈঠকে মিলিত হন। পরে এ আলোচনা মূলতবী হয়ে যায়। ১৭ মার্চ দ্বিতীয় দফা বৈঠকে দুপরে পরামর্শদাতারাও যোগ দিলেন। প্রেসিডেন্ট ভবনে রাতে ইয়াহিয়া ও টিক্কা খানের সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয়। রাত ১০টায় গভর্নর টিক্কা খান জিওসি মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজাকে ফোনে বাঙালী নিধনযজ্ঞের নীল নকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। ৫ প্রাতঃ এই নীল নকশায় গণহত্যার বিস্তারিত নির্দেশ লিপিবদ্ধ ছিল।

এদিকে ইয়াহিয়া-মুজিব তৃতীয় বৈঠকে মিলিত হন। ইয়াহিয়া এই বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনার ভান করলেও আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ায় আওয়ামী লিগ চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়। শুরু হলো প্রতিরোধ আন্দোলন। ১৯ মার্চ ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব আরবাব খান পুরো এক ব্যাটেলিয়নের ৭২টি এলএমপি নিয়ে গঠিত পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক ক্ষেয়াডকে স্বয়ংক্রিয় অন্ত্রে সজ্জিত করে জয়দেবপুরে এল। উদ্দেশ্য জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেসেল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করা, সেই সঙ্গে অর্ডেন্স ফ্যাট্রি থেকে সম্পূর্ণ গোলাবারুদ নিয়ে যাওয়া।

জয়দেবপুরের জনগণ সামরিক বাহিনীর এই চক্রান্ত বুবতে পেরে জয়দেবপুর-ঢাকা রাস্তায় প্রথম ব্যারিকেড দিয়ে প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেন। এই ব্যারিকেড সরানোর সময় সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। হানাদারারা গুলি চালালে দুজন জয়দেবপুরবাসী শহীদ ও দুজন আহত হন। জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্টবেসেল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর শফিউল্লাহ এই প্রতিরোধ সংগ্রামে জনগণকে পুরো সমর্থন দিয়েছিলেন।

জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনীর গুলি বর্ষণের তীব্র নিন্দা করে শেখ মুজিব তার বিবৃতিতে বলেন, 'তারা (সামরিক জাত্তা) যদি মনে করে থাকে বুলেট দিয়ে জনগনের সংগ্রাম বন্ধ করা যাবে, তাহলে তারা আহমেদের স্বর্গে বাস করছে।' ১৯ মার্চের ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকে প্রায় ৯০ মিনিট স্থায়ী হয়, পরে সন্ধ্যায় তাদের পরামর্শদাতারা আলাদা বৈঠকে বসেন। ২০ মার্চ বসে মুজিব-ইয়াহিয়া চতুর্থ বৈঠক, যার শেষ দিকে দুপুরে পরামর্শদাতারাও নান ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় বসেন।

অন্যদিকে এ অঞ্চলের গণহত্যার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলে ফ্ল্যাগস্টাফ হাউজে। জেনারেল আব্দুল হামিদ খান এই বৈঠকে জেনারেল টিক্কা খানকে গণহত্যার নীল নকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়নের সর্বজ সংকেতে দেন।

২১ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে ইয়াহিয়া-মুজিব

বৈঠকে সমরোতার সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, সমস্যা সমাধানে ত্রি-পক্ষীয় সমরোতা হতে হবে। এই মর্মে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে আলোচনা চলে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ছিল আলোচনার নামে প্রহসন। এই দীর্ঘ আলোচনা পক্ষিমী সামরিক বাহিনীকে জাহাজ ও বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় প্রচুর অস্ত্র ও সৈন্য আনার সুযোগ করে দেয়।

২৩ মার্চ '৭১ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ধ্যান, ধারণা ও দাবীর সমন্বয় সাধন করে একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।' এইদিন বিকালে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসত্বন্বনের সামনে বিরাট এক জনসমাবেশে শেখ মুজিব বললেন, 'আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যহত থাকবে।'

২৪ মার্চ সারাদিন ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। ২৫ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো তার পরামর্শদাতাদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট আলোচনার পর সাংবাদিকদের বললেন, 'আওয়ামী লিগ যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা চাইছে তাকে প্রকৃত স্বায়ত্ত্বাসন বলা যায় না। ওদের দাবি স্বায়ত্ত্বাসনের দাবির চাহিতে বেশি, সর্বাংতোমত্ত্বের কাছাকাছি।'

শেখ মুজিব ২৪ মার্চ সকালেই বুরাতে পেরেছিলেন যে ইয়াহিয়া ও তার মধ্যকার আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তাই ওই দিন রাতেই তিনি চট্টগ্রামের সিদ্ধিকীকে (আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্ধিকী) টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন হানাদার বাহিনীর যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় এক বিকালে বঙ্গবন্ধু বললেন, প্রেসিডেন্টের ঢাকায় আগমন ও আলোচনার ফলে জনমনে এ রকম একটা ধারণা হয়েছিল যে, দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে কৃত্পক্ষের চেতনার উদ্দেশ হয়েছে। এবং রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান সম্ভব। অর্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সামরিক তৎপরতা শুরু করে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটানো হচ্ছে। সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করা হবে বলে ঘোষণা দিয়ে যখন প্রেসিডেন্ট খোদ ঢাকায় রয়েছেন, তখন দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এ ধরণের সামরিক তৎপরতার খবর খুবই উদ্বেগজনক। গত সপ্তাহে জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের পর রংপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি এলাকায় সান্দেহ আইন জারি করে বর্বর হামলা চালানো হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে চট্টগ্রামেও নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে।

বিশ্ববাসীর কাছে আমার আবেদন, যখন আমরা রাজনৈতিকভাবে

সমস্যার সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি তখন ক্ষমতাসীনরা শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের জন্য শেষ আঘাত হানছে। তাই আমি ক্ষমতাসীনদের ষড়যন্ত্রকারী মহলকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আপনাদের ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে না। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী চরম আত্ম্যাগের মাধ্যমে আপনাদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এক্যবন্ধভাবে প্রস্তুত রয়েছেন।

আমি বর্বরতা ও গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করছি। এবং এর প্রতিবাদে ২৭ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করছি।' পরে তিনি আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলার ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানালেন।

এই পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। গোপনে ঢাকা ত্যাগের আগে তিনি সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন শেখ মুজিবকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর ঘুমস্ত নিরস্ত্র বাঙালীদের নিষ্ঠুর ও নির্বিচার হত্যার জন্য সামরিক জাত্তি তার এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

## ২৫ মার্চ '৭১-এর কালোরাত

দেশবাসী এমনকি বিশ্ববাসীও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পূর্ব পাকিস্তানের বিজয়ী সংখ্যাগুরু দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে সমরোতার ব্যাপারে কিছুটা আশাবাদী ছিল।



আওয়ামী লিগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন, 'আর আলোচনা নয়, এবার সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই।' জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে এক আলোচনার পর সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করলেন, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।'

সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের কাছে বঙ্গবন্ধু খবর শুনে খুবই চিন্তিত হলেন। তিনি আওয়ামী লিগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। সবাই ইয়াহিয়া-মুজিবের বৈঠকের ব্যর্থতা সম্পর্কে জেনে গেল। খবর এল কিছুক্ষণ আগে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে সাদা পোষাকে বেরিয়ে বিমানবন্দরের দিকে গেছেন। কিছুক্ষণ পরেই একটি বোয়িং বিমান বিকট শব্দে পর্শিমাকাশে মিলিয়ে গেল।

চট্টগ্রাম থেকে এ সময় ভয়াবহ এক খবর এসে পৌছল ঢাকায়। 'সোয়াত' নামে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি অস্ত্র বোবাই জাহাজ নোঙ্গের করেছে চট্টগ্রাম বন্দরে, কিন্তু চট্টগ্রামবাসীরা ত্রি অস্ত্র চট্টলার মাটিতে কোনো অবস্থাতেই নামাতে দেবে না। তারা চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সষ্টি করেছে। ওই প্রতিরোধ ভাঙতে সেনাবাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

রাত ৮টার কিছু বেশি। বঙ্গবন্ধু অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বাইরের ঘরে আলোচনায় ব্যস্ত। কর্নেল (পরে জেনারেল) ওসমানী জরংরী সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গেও আলোচনা করলেন। ইতিমধ্যে বাড়ি ফাঁকা হতে শুরু করেছে। রাত নটার দিকে হাইকোর্ট মোড় ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান থেকে বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল। জনগণ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। সবার মুখে একটা কথা ছড়িয়ে পড়ল- সেনাবাহিনী বেরিয়ে পড়েছে।

বর্বর হানাদার বাহিনী নৃশংস পাশবিকতায় বাঙালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ২৫ মার্চের এই রাতে। শুরু হলো বাংলার বুকে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও জয়ন্ত্রম অধ্যায়। সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজিত ৯৬টি টাকবোবাই সৈন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরে চুকল। তাদের সঙ্গে ছিল অটোমেটিক রাইফেল, মৰ্টার ফিল্ডগান, মেশিনগান, লাইট মেশিনগান, বাজুকা ইত্যাদি সব মারণাস্ত্র। সঙ্গে ট্যাঙ্কবহর।

তখনও বারোটা বাজেনি, হঠাত রাতের নিষ্ঠুরতা তেজে গর্জে উঠল অসংখ্য মেশিনগান। আগনের লেলিহান শিখায় লাল হয়ে উঠল সারা আকাশ। টেসার ও ম্যাগনেশিয়াম ফায়ারে আলোকিত হয়ে উঠল রাতের অন্ধকার। হানাদার নরপশুরা ট্যাঙ্ক ও স্বার্যঞ্চিত্র অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো। এমনকি মেয়েদের রোকেয়া

হলও নিষ্ঠার পেল না । আগুন জুলল পিলখানায়, আগুন জুলল ঢাকার বস্তিতে, হাহাকার উঠল ঘরে ঘরে । হাজার হাজার নারী-শিশুর মর্মভেদী আর্তনাদে ঢাকার আকাশ বাতাস ভরে উঠল । রাস্তায় রাস্তায় জমে উঠল লাশের স্তুপ ।

কিন্তু এর মধ্যেও জনগণ থামল না । তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পাট্টা প্রতিরোধে । হানাদার বাহিনীকে ঠেকাতে রাস্তায় রাস্তায় গড়ে উঠল ব্যারিকেড । হানাদারদের প্রতিরোধ করা হলো রাজারবাগে, পিলখানায় । ফলে জুলে উঠল রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক । ২৬ মার্চ ভোরে পর্যন্ত জুলল সে আগুন । বাঙালীর গর্ব বীর পুলিশ বাহিনী আত্মসমর্পণ না করে সাধারণ হি নট হি রাইফেল নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করে গেল । শহীদ হলেন বাংলা মায়ের ১১৮০ জন বীর সন্তান । ২৬ মার্চ সকালের দিকে গুলি ঝুরিয়ে যাওয়ায় উর্ধ্বরতন কর্মকর্তা, এসআই, এসএসআই, হাবিলদার, সুবেদার, নায়েক ও সিপাহীসহ প্রায় দেড়শ বীর যোদ্ধা বন্দী হলেন হানাদারদের হাতে ।

মারণাল্প্রে সজ্জিত ৩০ লরি সৈন্য ও আমেরিকান এস-২৪ ট্যাক্ষ বহর কামান উচিয়ে ঢুকে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে । ব্রিটিশ কাউপিল লাইব্রেরিকে ঘাঁটি বানিয়ে সৈন্যরা ইকবাল হলকে লক্ষ্য করে মর্টারের গোলা ছোড়া শুরু করল । ইকবাল হলে ২০০ জন ছাত্র শাহাদৎ বরণ করেন । গ্রেনেড চার্জ করে সৈন্যরা জগন্নাথ হলে ঢুকে পড়ল । হলে ছাত্র ছিল ১০৩ জন । ৬ জন ছাত্রকে কবর খুঁড়তে বাধ্য করা হলো, বাকিদের গুলি করে হত্যা করা হলো নিষ্ঠুরভাবে । ওই ৬ জন ছাত্রই সঙ্গীদের কবর দিচ্ছিলেন । পরে তাদেরকেও গুলি করে হানাদাররা । একজন ছাত্র ওই পাশবিক হত্যাকান্দের সাক্ষী হয়ে আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন- কালীরঞ্জন । তার গলার পাশ দিয়ে মেশিনগানের গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল । ওদিকে ম্যাগনেশিয়াম ফায়ারের আলোয় সৈন্যরা রোকেয়া হলের ভেতর ছুটেছুটি করে মেয়েদের ধরছিল । ৫০ জন ছাত্রী ছাদ থেকে লাফিয়ে তাদের ইঞ্জত ও আরু বাঁচালেন ।

বর্বর হানাদাররা এক ২৫ মার্চের রাতেই লক্ষ্যবিক বাঙালীকে হত্যা করে । বন্দী হওয়ার আগে শেখ মুজিব একে একে সমস্ত আওয়ামী লিগ নেতাকে গোপন স্থানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন । তিনি চট্টগ্রামের আওয়ামী লিগ নেতা জহর আহমেদ চৌধুরীসহ প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার লিখিত বাণী ওয়্যারলেস যোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করে গেলেন । এই বাণীর মুদ্রিত হ্যান্ডবিলটি ২৬ মার্চ সকালে চট্টগ্রামবাসীর হাতে আসে । হ্যান্ডবিলটি ছিল ইংরেজিতে । তার বঙ্গনুবাদ করেন ডাঃ সৈয়দ আনোয়ার আলী ও মনজুলা আনোয়ার । বঙ্গনুবাদটি ছিল-

বাঙালী ভাইবোনদের কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমার

আবেদন । রাজারবাগ পুলিশক্যাম্প ও পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পে রাত বারোটায় পাকিস্তানী সৈন্যরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে । হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে আমরা লড়ে যাচ্ছি । আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন, এবং তা প্রথমীর যে কোনো স্থান থেকেই হোক । এমতাবস্থায় আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করছি । তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা কর । আল্লাহ তোমাদের সহায় হউন ।'

শেখ মুজিবের রহমান  
২৫ মার্চ, ১৯৭১ ।

একে একে সবাই বিদায় নিলেন শেখ মুজিবের ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়ি থেকে । কিন্তু তিনি কোথাও গেলেন না । রাত ১১টায় নীল নক্কার বাস্তবায়নে কমান্ডিং অফিসার এবং কোম্পানি কমান্ডার মেজর বেলাল এক প্লাটুন কমান্ডো নিয়ে শেখ মুজিবকে বন্দী করতে রওনা দিল । তারা মিরপুর রাস্তার সমস্ত ব্যারিকেড রকেটের সাহায্যে উড়িয়ে দিল । রাত দেড়টায় তারা বিদ্যুৎগতিতে শেখ মুজিবের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল । ৫০ জন কমান্ডো বাড়ির চার ফুট উচু পাটিলের ওপর উঠে বাড়ি লক্ষ্য করে স্টেনগানের এক পশলা গুলিবর্ষণ করল । এরপর বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে নিজেদের উপন্থিতি ঘোষণা করল ও শেখ মুজিবকে বেরিয়ে আসতে বলল । দোতলায় উঠে কমান্ডোরা শেখের বেডরুমের দরজা ও জানালার দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল । উনি বেরিয়ে এসে সৈন্যদের গুলি থামাতে বললেন । সৈন্যরা খোলা বেয়নেট হাতে ওনাকে চার্জ করার জন্য চারদিক থেকে এগিয়ে এল । ওনার কাছেই দাঁড়ানো এক অফিসার বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে হৃকুম দিল, 'ওকে হত্যা করো না ।' এরপর টেনেছিচড়ে নিয়ে চলল তারা বঙ্গবন্ধুকে । পেছন থেকে কিল, ঘূষি, লাথি থেকে শুরু করে চলল বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি । অফিসার তার হাত ধরে রাখা সন্ত্রেণ সৈন্যরা তাকে নিচে নামানোর জন্য টানতে লাগল । উনি চিৎকার করে বললেন, 'আমাকে টানাটানি করো না । দাঁড়াও আমি আমার পাইপ ও তামাক নিয়ে আসি । না হলে আমার স্ত্রীকে ওসব নিয়ে আসতে দাও । পাইপ আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে ।'

এরপর উনি ঘরে এলেন । তার স্ত্রী তখন দুই ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ছেট রাসেল ঘুমাচ্ছেন বিছানায় । বেগম মুজিব তখন তাকে পাইপ আর একটা ছেট সুটকেস গুছিয়ে দিলেন । সৈন্যদের ঘেরে বন্দী হয়ে মুজিব রওয়ানা দিলেন । দেখলেন আশে পাশে আগুন জুলছে । ওখান থেকে তাকে সামরিক জিপে করে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়- রাতে রাখা হলো আদমজী

ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে । পরদিন ফ্ল্যাগস্টাফ হাউসে তাকে স্থানান্তর করা হয় । তিনিদিন পরে বিমানযোগে করাচি নিয়ে যাওয়া হয় তাকে ।

২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, '....আপনারা জানেন যে আওয়ামী লিগ সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জাতীয় পরিষদের বৈঠকের আগেই মতা হস্তান্তরে দাবি জানিয়েছিল । আমাদের মধ্যে আলোচনা চলাকালে মুজিব এ মর্মে প্রস্তব করেছিল যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের ব্যাপারটা আমি একটা ঘোষণা দিয়ে নিয়মিত করতে পারি । এই ঘোষণায় সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে ।..... এরপর আমি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করি । প্রত্যেকে একবাকে স্বীকার করেন যে এধরণের প্রস্তাবিত ঘোষণা আইনসম্মত হবে না ।... মুজিব যে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিল তা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ।.... তার একগুরুমি, একরোখা মনোভাব ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় অনীহা শুধু একটা কথাই প্রমাণ করে যে এই ভদ্রলোক ও তার দল হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু এবং এরা দেশের অন্য অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিছিন্ন করে দিতে চায় । মুজিব দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার উপর আগাত হেনেছে । এ অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে ।

কিছু সংখ্যক দেশদ্বোধী ও ক্ষমতালোভী ব্যক্তি দেশকে ধ্বন্দ্ব করুক ও ১২ কেটি মানুষের ভাবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলুক তা আমরা বরদাশত করতে পারি না ।.... দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য আমি দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । আর রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লিগকে সম্পর্গভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো । সংবাদপত্রে ওপর পূর্ণ সেসরশিপ আরোপ করা হলো ।'

এই বিবৃতি থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল ইয়াহিয়া খান মুজিবের সঙ্গে আলোচনার নামে প্রহসনই করেছে । তার উদ্দেশ্য ছিল সময়সংক্ষেপণ এবং এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আন্ত ও সৈন্য এদেশে আনা । ঢাকায় ইয়াহিয়ার নানা উক্সফনির মুখেও শেখ মুজিবের শাস্তি ও শৃঙ্খলা সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন । কিন্তু ইয়াহিয়া খান মাথায় জল্লাদ টিক্কা খানকে গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে যান যাওয়ার সময় । ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় মুজিব বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের দুই অংশকে একত্র রাখার জন্য আমি আগ্রাণ চেষ্টা করেছি । কিন্তু ইয়াহিয়া খান সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক অ্যাকশনকে বেছে নিলেন এবং এখানেই পাকিস্তানের সমাপ্তি হলো ।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমি মনে করি আমাকে হয়ত হত্যা করা হবে । কিন্তু আমার কবরের ওপর দিয়েই সৃষ্টি হবে একটা স্বাধীন বাংলাদেশের ।'

## স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় চট্টগ্রাম বেতারের ১০ জন নিবেদিতপাণ কর্মী, স্থানীয় নেতৃত্ব ও জনগণ, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহায়তায়। স্বাধীন বাংলা বেতারের ১০ জন সার্বক্ষণিক সংগঠক ছিলেন জনাব বেলাল মোহাম্মদ (চট্টগ্রাম বেতারের নিজস্ব শিল্পী), আবুল কাশেম সন্দীপ (ফটিকছড়ি কলেজের ভাইস প্রিসিপাল), আবদুল্লাহ আল ফারক (অনুষ্ঠান প্রযোজক), সৈয়দ আবদুস শাকের (বেতার প্রকৌশলী), আমিনুর রহমান (টেকনিকাল অ্যাসিস্টেন্ট), রাশেদুল হোসেন (টেকনিকাল অ্যাসিস্টেন্ট), মোস্তফা আনোয়ার (অনুষ্ঠান প্রযোজক), শরফুজ্জামান (টেকনিকাল অপারেটর), আমিনুর রহমান এবং কাজী হাবিবুর্দিন।

বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ। প্রথম অধিবেশন সংগঠনের অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন আবুল কাশেম সন্দীপ, ডাঃ মনজুলা আনোয়ার, ডাঃ সৈয়দ আনোয়ার আলী, ইঞ্জিনিয়ার আশিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ চন্দ্র দাস, কাজী হোসেন আরা। শেষোক্ত পাঁচজন ঐতিহাসিক প্রথম সান্ধ্য অধিবেশন শেষে আর ফিরে আসেননি।

এই বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক ১০ জন সংগঠককে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ মোহাম্মদ শফি, বেগম মুশতারি শফী, মীর্জা নাসিরুদ্দিন (আঞ্চলিক প্রকৌশলী), জনাব সুলতান আলী (বার্তা সম্পাদক), জনাব আব্দুস সোবহান (বেতার প্রকৌশলী), জনাব দেলোয়ার হোসেন (বেতার প্রকৌশলী), জনাব মাহমুদ হোসেন, জনাব আব্দুস শুকুর, জনাব সেকান্দার হায়াত খান, জনাব মোসলেম খান প্রমুখ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে চট্টগ্রাম বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক মরহুম আবুল কাহারের পরোক্ষ সমর্থন ও শুভেচ্ছা না থাকলে এ বিপ্লবী স্বাধীন বেতার কেন্দ্র আদৌ প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। এই স্বাধীন বেতার কেন্দ্র বাঙালী জাতির জন্য কী ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। শুধু এটুকু বলব, এটা ছিল দিকহারা বাঙালী আবাল্বন্দবগিতার ধ্বনিতারা, আশার আলো, পথের দিশারী, ছিল জীবনের অস্তিত্ব, ছিল ক্রন্দ ক্রন্দন।

## ঢাকায় গণহত্যা

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী অধ্যাপকদের বাসস্থান ঘেরাও

করে। তারা ডঃ জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতার ফ্ল্যাটে ঢুকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। একই সময় ওপরের ফ্ল্যাট থেকে ডঃ মনিরুজ্জামান, তার ছেলে, তার ভাগ্নী ও একজন প্রতিবেশী যুবককে ধরে আনেখ সিডির নিচে নিয়ে পরপর আটটি গুলি করে। জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতা গুলি খেয়েও বেচে ছিলেন! তিনি জ্ঞান হারাননি। পরে ধরাধরি করে তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৭ মার্চ সকাল পর্যন্ত তার রাজক্ষণ হচ্ছিল। তাকে তখন নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, কিন্তু সেখানে কোনো ডাক্তার ছিলেন না। বিনা চিকিৎসায় ৩০ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ২৬ মার্চ পাকবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টারের ১২ নম্বর ফ্ল্যাটের ডঃ মোকতাদির ও কয়েকজন ছাত্রকে গুলি করে মারে। পরে ১১ নং ফাটের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেককে হত্যা করে।

### ইকবাল হল

আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সজ্জিত হানাদার বাহিনী রাত দেড়টায় ইকবাল হল ঘিরে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। কামান, মর্টার, রকেট, গ্রেনেড, আগুন বোমা, চাইনিজ আটোমেটিক রাইফেল, মেশিনগান



কিছুই বাদ যায়নি। ইকবাল হলের তরঙ্গরাও প্রতিরোধ দিয়ে যাচ্ছে বীর বিক্রমে। দাউ দাউ করে

জুলছে এসেম্বলি হল (পুরাতন), পাঠাগার ও পাশের বস্তি

। প্রতিরোধের মুখে সহজে হলে প্রবেশ করতে না পেরে ট্যাঙ্ক আনে হানাদাররা। শুরু হয় গোলাবর্ধণ। হলের দক্ষিণ পশ্চিমে রেল সড়কের বস্তিবাসীরা ভয়ে হলের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দলে দলে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে এল। মুহূর্তের মধ্যে তারা সবাই হানাদারদের বুলেটের আঘাতে মুখ খুবড়ে পড়ল। ভোর হলে এলাকায় গোলাগুলি থামল, কিন্তু কারফিউ থাকল সারাদিন। ইকবাল হলের চারদিকে তখন লাশের স্তুপ।

### জগন্মাথ হল

২৫ মার্চ রাত সাড়ে বারোটায় হানাদাররা আক্রমণ করে জগন্মাথ হল। মেশিন গান, মর্টার শেলিং ও ট্যাঙ্কের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে তারা হলে ঢুকে প্রতিটি রুম তন্ত্রজ্ঞ করে তল্লাশি শুরু করে। আক্রমণের আগে হলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ অঙ্ককারের মধ্যে হানাদাররা ছাত্রদের ধরে এনে কাউকে বেদম পেটালো, কাউকে সরাসরি গুলি করল। ২৬ মার্চের সকালে গুলির শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল মানুষের কান্না আর্তনাদ।

হলের ২৯ নং রুমের বাসিন্দা হরিহর ও সুনীল দাস। ওই দিন সুনীলের এক অতিথি এসেছিলেন। হানাদাররা রুমে ঢুকে তিনজনকে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে, এরপর রুমে একটা গ্রেনেড ছুড়ে বেরিয়ে যায়— মুহূর্তে সব শেষ। সুনীল ও তার অতিথি মারা গেলেও হরিহর আহত অবস্থায় এই নৃশংসতার সাক্ষী হয়ে অলোকিকভাবে বেঁচে যান। শেষ রাতে হরিহর হোস্টেলের রেইনপাইপ বেয়ে নিচে নেমে হামাঞ্জি দিয়ে নিকটস্থ পুকুর পাড়ে গিয়ে পানির কাছাকাছি লাঘা ঘাসের মধ্যে আশ্রয় নেন। ২৬ মার্চ সারা দিনরাত এভাবেই পড়ে থাকেন তিনি। তার পা দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। ২৭ মার্চ সকালে কারফিউ তুলে নেয়া হলে এক সহদয় দোকানদার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান তাকে।

হানাদারদের ভয়ে সুরেশ দাস, রবিন ও সত্যদাসসহ প্রায় ২৫ জন ছাত্র হলের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হানাদার পশ্চর তাদের সবাইকে গুলি করে। সুরেশ বেঁটে হওয়ায় তার বুকে গুলি লাগেনি, লাগে ডান কাঁধে। তার ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্ত ঝরে যাচ্ছে, চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ২৪ জন সঙ্গীর লাশ। ছাদের ওপর পানির ট্যাঙ্ক, তাতে ঢুকে পড়লেন সুরেশ। ২৬ মার্চ গোটা দিনরাত সেখানেই ছিলেন। ২৭ মার্চ ভয়ে ভয়ে নামলেন। রাত্তায় পরিমল গুহ তাকে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে দিয়ে আসেন।

২৬ মার্চ সকাল ১১টায় হানাদাররা ৫ জনকে ধরে নিয়ে এল। তাদের দিয়ে হলের বিভিন্ন কক্ষ, ছাদ, বারান্দা ও সিডি থেকে বিক্ষিপ্ত লাশগুলো সংগ্রহ করে টাকে তুলল। এরপর মাঠের মাঝখানে বিশাল এক গর্ত খোড়ানো হল ওই ৫ জনকে দিয়ে লাশ চাপা দেওয়ার জন্য, পরে গর্তের পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হলো তাদেরকেও। গুলির সঙ্গে সবাই লুটিয়ে পড়ে গর্তে। হানাদাররা টাকে চেপে চলে গেল। হঠাৎ এই লাশের স্তুপ থেকে একজন উঠে দৌড়ে পালালেন। ভাগ্যবানটির নাম কালীরঞ্জন শীল- গুলি তার গলা ভেদ করে চলে যায়।

হানাদাররা ২৬ মার্চ ভোরে হাউজ টিউটের অধ্যাপক অনুচ্ছেপায়ন ভট্টাচার্য, ছাত্র বিধান রায় ও অন্য একজনকে এনে বেদম প্রহারের পর গুলি করে হত্যা করে। জগন্নাথ হলের শহীদ মিনার গোলার আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল। শহীদ মিনারের পেছনে ১০০ ফুট বধ্যভূমির গর্তের মাটি ভেদ করে হাতের পাঞ্জা ও পায়ের আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে।

হলের কোয়ার্টারে থাকতেন জি,কে নাথ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর এবং পরেশ বল। তাদের কোয়ার্টারের দরজা জানালা সব খোলা। জনমানব শূন্য দোতলা থেকে পচা দুর্ঘন্ত ভেসে আসছে। সিঁড়ির ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চাপ চাপ রক্ত জমাট বাধা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য হলগুলোতেও লক্ষ লক্ষ গুলির আওয়াজ আর কামানের কানফটা গর্জন শোনা গেল সেই কালরাতে। রাত ১২টার দিকে জনপথ ও বন্দি এলাকায় আগুন আর আগুন, সঙ্গে বন্দির মতো গুলি। খণ্টানদের গির্জার সামনে সামরিক ঘান ও ট্যাক্সের ঘড়ডড় আওয়াজ। হাজারো কঠের আর্টনান্দ। সদরঘাট টার্মিনালে গুলির শব্দ। রাত ২টায় কারফিউ দেয়া হলো। ইংলিশ রোড ও ফেন্স রোডের দুপাশের কোটি কোটি টাকার কাঠের কারখানা ও মেশিনপত্র দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেল। দুপাশের বাণিজ্য এলাকারও অসংখ্য দোকানপাট ও বাণিজ্যকেন্দ্রের কোনো চিহ্ন রইল না। ঢাকা শহর ততক্ষণে নিষ্কুল এক প্রেতপুরী। এর মধ্যে ঢাকার অবাঙালী ও বিহারিয়া মালিটোলা, বাবুবাজার, শাখারি পত্তি, তাঁতিবাজার, সুতার নগর, গোপাল নগর প্রভৃতি এলাকায় হানাদারদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চালাল লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড।

## বেতারে স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চের কালোরাত্রির তিক্ততা ও হতাশাকে বয়ে নিয়ে এল ২৬ মার্চ '৭১-এর সকাল। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে এক তেজোদীপ্তি কর্তৃপক্ষ শোনা গেল। এই বলিষ্ঠ কঠের অধিকারী চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লিঙ্গের সভাপতি জনাব আব্দুল হান্নান।

তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বরাত দিয়ে এ বাণী প্রচার করেন মাত্র ৫ মিনিটের জন্য। এরপরই নিষ্কুল হয়ে গিয়েছিল চট্টগ্রাম বেতার। মনে হলো ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী অস্ত্রের মুখে বাঙালীর প্রতিবাদী কঠকে স্কুল করে দিল। এমনি এক অসহানীয় পরিস্থিতির মাঝে হঠাৎ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কোন এক জাদুর ছেঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠল। এক বলিষ্ঠ তেজোদীপ্তি কঠ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল, 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। নাসরুম মিনাজ্জাহে ওয়া ফাতেফুন কারিম।' ঘোষক ছিলেন চট্টগ্রাম ফটিকচুড়ি কলেজের ভাইস প্রিসিপাল জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিত্র কোরআন পাঠ করলেন চট্টগ্রাম বেতারের কবি ও গীতিকার জনাব আবদুস সালাম। পরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা ইংরেজ হ্যাভিলের বঙ্গনুবাদ পাঠ করলেন জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্থাপন করা হয়। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া এই বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণ দেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশবাসীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। ২৮ মার্চ বেতার কেন্দ্র থেকে তার ওই ভাষণ ক্যাপ্টেন শমসের মুবিন চৌধুরী সারাদিন পাঠ করেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জনাব শামসুল হক চৌধুরীর 'মুক্তিযুদ্ধে মুজিব নগর' বাইটিতে মেজর জিয়ার স্বর্কর্ত্তে টেপ থেকে উদ্ভৃত ইংরেজি ভাষণটির প্রতিলিপি ও তার বঙ্গনুবাদ দেওয়া আছে। ঘোষণাটি নিচে তুলে দেওয়া হলো :

the goverment of the sovereign state of Bangladesh, on behalf of our great leader, the supreme commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh and the goverment headed by Sheikh Mujibur Rahman, the sole leader of the elected representatives of the seventy five million people of Bangladesh is the only legitimate government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh, which is legally and constitutionally formed and is worthy of being recognized by all the goverments of the world. I therefore, appeal on behalf of our great leader Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the democratic countries of the world, specially the big powers and the neighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awful genocide that has been carried on by the army of occupations from Pakistan. The guiding principle of the new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and enmity to now. May Allah help us. Joy Bangla.

(তবে আমি নিজের কানে যে টেপটি শুনেছি তাতে ছিল, *i major zia, do here by declare the independence of Bangladesh on behalf of our great national leader, Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman, joy bangla.* - পিয়াল)

**বঙ্গনুবাদ :** আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এবং ঘোষণা করছি যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে সরকার গঠিত হয়েছে। এতদ্বারা আরো ঘোষণা করা হচ্ছে যে শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একমাত্র নেতা এবং তার নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগনের একমাত্র বৈধ সরকার, যা আইনসম্মত ও নিয়মতাত্ত্বিকভাবে গঠিত হয়েছে এবং যা পৃথিবীর সব সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত পাবার যোগ্য।

কাজেই আমি আমার মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পৃথিবীর সব গণতাত্ত্বিক রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে বাংলাদেশের বৈধ সরকারের স্বীকৃতিদান ও পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ভয়াবহ গণহত্যাকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের বৈধভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা একটি নির্মল তামাশা এবং সত্যের বরখেলাপ মাত্র, যার দ্বারা কারোই বিভাস হওয়া উচিত নয়। নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হবে প্রথম নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয় শান্তি এবং তৃতীয় কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়। আজ্ঞাহ আমাদের সহায় হউন, জয় বাংলা। (চলবে) ৩০ মার্চ '৭১ পাকিস্তান বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করে চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পাশে ক্ষতিসাধন করে। এই কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত প্রচারিত অনুষ্ঠানের টেপ থেকে ধারণকৃত অংশ বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র।

গ্রহের ৫ম খন্দে ছাপা হয়েছে। যেখানে মেজের জিয়ার অপর একটি ভাষণের ইংরেজি ও বাংলা প্রতিলিপি রয়েছে। নিচে তা উন্নত করা হলো :

I, Major Zia of Bengal Liberation Army. This is Major Zia , the leader of Bengal Liberation Army speaking on the support of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

## নারী নির্যাতনের কাহিনী

চাকার বুকে যতগুলো নারী নির্যাতন কেন্দ্র ছিল, রাজারবাগ পুলিশ লাইন তারই অন্যতম। ২৫ মার্চের কালোরাতে হানাদাররা যখন পুলিশলাইন আক্রমণ করে তখন এসএফ ক্যান্টিনে রাবেয়া খাতুন নামের একজন মহিলা সুইপার উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজারবাগ নারী নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষী। তার বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো :

‘হামলার দিন আমি রাজারবাগ ব্যারাক বাড়ু দিয়ে সেখানেই ছিলাম। কামানের গোলা, বোমা আর ট্যাক্সের অবিরাম কানফাটা গর্জনে আমি ভয়ে ক্যান্টিনে কাত হয়ে পড়ে থেকে থরথরিয়ে কাপছিলাম। ২৬ মার্চ সকালে ওদের কামানের গোলার মুখে টিকিতে পারেনি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা বীর পুলিশরা। সকালে ওরা এসএফ ব্যারাকের চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ব্যারাকে প্রবেশ করে বাঙালী পুলিশদের নাকে মুখে, সারাদেহে বেয়নেট ও ব্যাটন চার্জ করতে করতে, বুটের লাখি মারতে মারতে বের করে নিয়ে আসছিল। ক্যান্টিনের কামরা থেকে বন্দুকের নলের মুখে আমাকেও বের করে আনা হয়।

আমাকে লাখি মেরে মাটিতে ফেলে করেকজন আমার ওপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিল ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল।

উপর্যুক্তির অত্যাচারে আমি যখন মৃত্যুযায় তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওদের কাছে কাতর মিনতি জানছিলাম। হাউমাউ করে কাঁদছিলাম আর বলছিলাম আমাকে মেরো না। আমি সুইপার। আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পায়খানা ও নর্দমা পরিষ্কার করার জন্য কেউ থাকবে না। এই পুলিশ লাইন রক্ত ও লাশের পচা গন্ধে মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তোমাদের পায়ে পড়ি আমাকে মেরোনা। তখন এক পাঞ্জাবী কুকুর আমার কোমরের ওপর বসে আমাকে নির্যাতন করছিল, আমাকে মেরে ফেললে পুলিশ লাইন পরিষ্কার করার কেউ থাকবে না এই উপলক্ষিতে আমাকে ছেড়ে এক পাঞ্জাবী সেনা ধমক দিয়ে বলতে থাকে- ঠিক

হ্যায়, তুমকো ছোড় দিয়া জায়েগা জেরা বাদ। তুম বাহার নেহি নিকলেগা। হার ওয়াক্ত লাইনপর হাজির রাহেগো।

পাঞ্জাবী সেনারা রাজাকার ও দালালদের সহযোগিতায় রাজধানীর স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও অভিজ্ঞ জনপদ থেকে বহু বাঙালী যুবতী মেয়ে, রূপসী মহিলা ও সুন্দরী বালিকাদের জিপ ও মিলিটারি ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমা করতে থাকে। আমি ক্যান্টিনের ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম। দেখলাম আমার সামনে দিয়ে জিপ ও ট্রাক থেকে লাইন করে বহু বালিকা, যুবতী ও মহিলাকে এসএফ ক্যান্টিনের মধ্যে দিয়ে ব্যারাকে রাখা হলো। বহু মেয়েকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের ওপর তলার ব্যারাকে রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। আর অবশিষ্ট যাদের ব্যারাকে ঠাঁই হলো না তাদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। অধিকাংশ মেয়ের হাতে বইখাতা দেখলাম। অনেক রূপসী যুবতীর দেহে অলঙ্কার দেখলাম। তাদের অধিকাংশের চোখ বেয়ে অরোরে কান্না বরাচ্ছিল।

এরপর আরম্ভ হলো বাঙালী মেয়েদের ওপর বীতৎস পাশবিক নির্যাতন। লাইন থেকে পাঞ্জাবী সেনারা উন্ন্যন্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। ব্যারাকে ঢুকেই ওরা প্রতিটি মেয়ের পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে লাখি মেরে মাটিতে ফেলে মেতে উঠল পাশবিকতায়। আমি ড্রেন পরিষ্কার করার অভিনয় করছিলাম আর দেখছিলাম ওদের বীতৎস পৈশাচিকতা। ওদের মন্ত উল্লাসের সামনে কোনো মেয়ে টু-শৰ্বটি পর্যন্ত করতে পারেনি।

দেখলাম বর্বর পাঞ্জাবি পশুরা এই নিরীহ মেয়েদের শুধু ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয়নি। সেই সঙ্গে রাক্ষসের মতো ধারালো দাঁত দিয়ে স্তন ও গালের মাংস কামড়ে রক্তাঙ্গ করে দিচ্ছে। ওদের নির্দয় কামড়ে অনেক কঢ়ি মেয়ের স্তন মাংসসহ উঠে আসছিল। মেয়েদের গাল-পেট-ঘাড়, বুক, ঠোট, পিঠ ও কোমড়ের অংশ ওদের পাশবিকতার শিকার হতে অস্থির করল, দেখলাম তৎক্ষণাং পাঞ্জাবীরা ওদের চুল টেনে এনে স্তন ছোরা মেরে টেনে ছিড়ে ফেলে দিয়ে গুণ্ঠ স্থানে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি দুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক পশ ছোট বালিকাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসাড় রক্তাঙ্গ দেহ বাইরে এনে দুজনে দুপা ধরে দুদিকে টেনে চড়চড়িয়ে ছিড়ে ফেলছিল।

আমি সব দেখছিলাম সেখানে বসে বসে আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম। পাঞ্জাবীরা মদ খেয়ে যার যে মেয়ে ইচ্ছা তার ওপরই

পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছিল। শুধু যে সাধারণ পাঞ্জাবী সেনারাই এই পাশবিকতায় যোগ দিয়েছিল তা নয়, সকল উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারাও মদ খেয়ে সারাক্ষণ এই অসহায় মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালাতো। কোনো মেয়ে এক মুহূর্তের অবসর পায়নি। এদের অবিরাম অত্যাচারে বহু কঢ়ি বালিকা সেখানেই কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। পরদিন এসব মেয়ের লাশ বাকিদের সামনে ছুরি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটে বস্তায় ভরে বাইরে ফেলে দিত।

এসব মেয়েদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্যরা আরো ভীতসন্ত্র হয়ে পড়ত। এবং স্বেচ্ছায় বর্বরদের লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করত। যেসব মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাদের পেছনে ঘুরে বেরিয়েছে, তাদেরকেও রেহাই দেয়া হয়নি। পদস্থ সামরিক অফিসাররা তাদের ওপর সম্মিলিত নির্যাতন চালিয়ে হঠাত একদিন একজনকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, গুণ্ঠ স্থানে ধারালো অস্ত্র দুকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে পড়তে টিগার টেনে দিত।

মেয়েদের পশুর মতো লাখি মারতে মারতে এবং পেটাতে পেটাতে হেডকোয়ার্টারের দোতলা, তেতলা ও চারতলায় উঠিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হত। পাঞ্জাবী সেনারা নিজেদের কাজে যাওয়ার আগে মেয়েদের লাখি মেরে আবার কামরায় দুকিয়ে তালা মেরে চলে যেত। বহু মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের ওপর তলায় বারান্দার মোটা লোহার তারে চুলের সাথে বেধে ঝুলিয়ে রাখা হতো। প্রতিদিন পাঞ্জাবীরা সেখানে যাতায়াত করত। কেউ কেউ অসহায় মেয়েদের উলঙ্গ শরীরে ব্যাটন দিয়ে পিটিয়ে আনন্দ পেত, আবার কেউ স্তনের অংশ ধারালো দাত বা অস্ত্র দিয়ে কেটে নিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। কোনো মেয়ে এসব অত্যাচারে কোনো প্রকার চিকিৎসার করার চেষ্টা করলে তার গুণ্ঠস্থানে লোহার রড দুকিয়ে তৎক্ষণাং হত্যা করা হতো।

প্রতিটি মেয়ের হাত বাধা ছিল পেছনের দিকে এবং তাদের শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবী সেনারা এসে ওই ঝুলস্ত মেয়েদের এলোপাথাড়ি বেদম প্রহার করে যেত। প্রতিদিন এরকম বিরামহীন অত্যাচারে মেয়েদের শরীরের মাংস কেটে রক্ত বারত। কারো মুখে সামনের দাঁত ছিল না, ঠোটের দুদিকের মাংস টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছিল। লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙুল, হাতের তালু ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত মেয়েদের একমুহূর্তের জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হতো না- এমনকি পায়খানা প্রস্তাবের জন্যও না। হেডকোয়ার্টারের ওপরতলায় বারান্দায় তারা হাত বাঁধা

অবস্থায় পায়খানা প্রস্তাব করত। আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে সেসব পরিষ্কার করতাম।

আমি অনেকবার দেখেছি নির্মম অত্যাচারের শিকার এসব মেয়েরা অনেকেই ঝুলন্ত অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে সেই বাধন থেকে বাঙালী শুব্দতীনের বিভঙ্গ মৃতদেহ পাঞ্জাবীদের নামাতে দেখেছি। আমাকে দিনের বেলায় সেখানে সেই বন্দী মহিলাদের পুতিগন্ধময় বর্জ্য পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতে হতো। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে ও হেডকোয়ার্টার অফিসের ওপরতলা থেকে বহু নির্যাতিতার ক্ষতিবিক্ষিত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে ছেড়ে নিয়ে যেত। এবং সেই জয়গায় রাজধানীর নানা এলাকা থেকে ধরে আনা নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে উলঙ্গ করে নতুন উদ্যমে নির্মম নির্যাতন চালাতো।

এসব উলঙ্গ নিরীহ মেয়েদের পাঞ্জাবী সেনারা সারাক্ষণ প্রহরা দিত। কোনো বাঙালীকে সেখানে চুক্তে দেয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোনো সুইপারেনও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। মেয়েদের হাজারো কাতর আহাজারিতে আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের বাঁচানের কোনো ভূমিকা পালন করতে পারি নাই। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে খুব ভোরে হেডকোয়ার্টারের ওপরতলায় সারারাত ঝুলন্ত মেয়েদের মলমূত্র পরিষ্কার করছিলাম, এ সময় এক মেয়ের করণ অর্তিতে ব্যথিত হয়ে পড়ি এবং মেথরের কাপড় পড়িয়ে তাকে মুক্ত করে পুলিশ লাইনের বাইরে নিরাপদে দিয়ে আসি। সঙ্গত কারণেই তার নাম-ঠিকানা প্রকাশ করলাম না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই মেয়েকে আর দেখিনি।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ঢাকা প্রবেশের আগ পর্যন্ত পাঞ্জাবীরা এসব মেয়েদের ওপর একই কায়দায় পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে গেছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মিত্রবাহিনী ঢাকায় বোমা ফেলার সাথে সাথে পাঞ্জাবী সেনারা এইসব মেয়েদের বেয়েনেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে। রাজারবাগ হেডকোয়ার্টার অফিসের ওপর তলায় সমস্ত কক্ষ ও বারান্দায় এসব বীরাঙ্গনার তাজা রক্ত জমাট বেঁধে ছিল।

ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী বীরবিক্রমে ঢাকায় প্রবেশ করলে রাজারবাগের ওইসব বর্বর হায়েনার দল আত্মসমর্পণ করে।

## ঢাকার মীরপুরে প্রতিরোধ

রাজারবাগের আর্মড সাবইল্পেস্ট্র জনাব আব্দুস সোবহান ২৫ মার্চ '৭১ মীরপুর ১০ নম্বরে জরুরী টহলে ছিলেন। তিনি ৩৭ জন

পুলিশের এক প্লাটুন নিয়ে মীরপুর থানায় যান। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকবাহিনীর হামলার খবর ততক্ষণে তারা পেয়ে গেছেন। মোহাম্মদপুর আসাদগেটের দিকে ভীষণ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে, জুলছে রাজধানী ঢাকা। আব্দুস সোবহানের নেতৃত্বে ৩৭ জনের দলটি মীরপুরের ইটখোলার ভেতরে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মীরপুরের ইপিআর ক্যাম্পের জোয়ানদের সঙ্গে হানাদারদের একঘটা ধরে তুল সংঘর্ষ চলে। এরপর পাকসেনারা ইপিআরদের বন্দী করে তিনটি টাকে করে নিয়ে যাচ্ছিল। এদের সঙ্গেই সংঘর্ষ শুরু হয় ৩৭ পুলিশের। পুলিশদের প্রত্যেকের কাছে ছিল ২০ রাউট করে গুলি। তা ফুরিয়ে এলে, তারা পিছু হটতে বাধ্য হন। পরে তারা কল্যাণপুরে বাঙালী এলাকায় গিয়ে পুলিশের পোশাক ছেড়ে ছাত্র-জনতার সঙ্গে মিশে যান। ২৬ মার্চ শুক্রবার কারফিউর মধ্যে অসংখ্য বিহারী বাঙালী কলোনিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে লুটপাট ও নানা অত্যাচার শুরু করে। তখন ছয়বেশী পুলিশরা তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে দুজন বিহারী ঘটনাস্থলে মারা যায়। বাকিরা পালায়।

## ঢাকার পিলখানা

'৭১-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে ২২ বেলুচকে পিলখানাতে আনা হয়। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙালী ইপিআররা প্যারেড গ্রাউন্ডের বটগাছের মাথায় প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। আর এরাই হচ্ছেন বাংলাদেশের সামরিক ও প্রতিরক্ষা বিভাগগুলোর মধ্যে প্রথম, যারা এই দুঃসাহস দেখান। বাংলার বীর সত্তান ল্যাঙ্গনায়েক বাশার এই পতাকা উত্তোলন করেন। পরে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

২৫ মার্চ রাত ১টা ৫ মিনিটে ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট পিলখানা আক্রমণ করে। পিলখানার ২৫০০ বাঙালী জওয়ান ও অফিসারদের মধ্যে ছয় শতাধিক অন্ধকারে পালিয়ে যেতে সম হন। বাকি সবাইকে আটক করে মোহাম্মদপুর বন্দীশিবিরে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে সাত শতাধিককে বেয়েনেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করা হয়। বাকিরা পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। দীর্ঘ সাড়ে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে প্রায় এক হাজার ইপিআর সদস্য দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। পিলখানায় হানাদারদের সঙ্গে বাঙালীদের এক খন্দ যুদ্ধ হয়। এতে একজন লেফেন্টেন্যান্টসহ ৬ জন পাকসেনা নিহত হয়। একজন পাঞ্জাবী ইপিআর মোহাম্মদ খানকেও হত্যা করা হয়। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন গার্ডকমান্ডুর নায়েক জহিরল হক।

## বংশাল ফাঁড়ির প্রতিরোধ

২৫ মার্চের কালোরাতে কিছু সংখ্যক পাকসেনা বংশাল ফাঁড়ি আক্রমণ করতে গিয়ে দারণ প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। অবিশ্বাস্য হলেও ফাঁড়ির ভেতর থেকে মেশিনগানের গুলি তাদের অভ্যর্থনা জানায়। দুপক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুক্ষণ গোলাগুলির পর হানাদাররা পালিয়ে যায়। এই প্রতিরোধের নায়ক ছিলেন সুপরিচিত কাদের গুড়া ও তার কজন সাগরেদ। মেশিনগানটি ছিল তারই!

## ঢাকা শহরে সশস্ত্র প্রতিরোধ

লেং আনোয়ার হোসেনসহ ১৬ জন যুবক ২৭ মার্চ ঢাকা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যান। তেজগাঁ ভাই ফ্যাস্টের কাছে ইপিআর, আনসার, পুলিশ, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকরা মিলে মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশোর ওপর। লেং আনোয়ার এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তেজগাঁ রেললাইনের অপরদিকে হানাদারদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে নিহত হয় ১২৬ জন পাকসেনা। আহত হয় অনেক। ধ্বংস হয় হানাদারদের ৩টি গাড়ি। বহু অস্ত্র দখলে আসে মুক্তি বাহিনীর।

৩০ মার্চ '৭১ লেং আনোয়ার সহ ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা মহাখালিতে রেকি করতে যান, সেখানে তারা হানাদারদের অ্যামবুশে পড়েন। ইপিআর শামসুল আলম এখানে শহীদ হন, বাকিরা খোদার অশেষ রহমতে অক্ষত দেহে ফিরে আসেন। ৩১ মার্চ রাত ৩টায় আসাদ গেটের কাছে হানাদারদের অবস্থানে আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী। এতে ৫ জন শত্রুসেনা নিহত হয়। ১ এপ্রিল ভোর ৫টায় প্রচুর অস্ত্র ও সৈন্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হামলা করে। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হন অনেক মুক্তিযোদ্ধা। লেং আনোয়ারসহ ৭ জন পাকসেনাদের হাতে বন্দী হন। ২৭ মার্চ '৭১ হানাদার বাহিনী ৬টি জিপে ঢাকা থেকে নদীবন্দর নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তারা ১০ মাইল দীর্ঘ রাস্তার দুপাশে জনগণকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। মার্টার শেল ও কামানের গোলায় জ্বালিয়ে দেয় অসংখ্য ঘরবাড়ি। শহরের উপকণ্ঠে জেটি মাসদাইরে প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় তাদের। হানাদাররা জামিল ডকইয়ার্ডের মালিক ও মাসদাইরের বাসিন্দা জসিমুল হক ও তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে। ২৯ মার্চ শহরে প্রবেশ করে তারা। টানবাজারের ছাত্রিলিং সভাপতি ১৮ বছরের তরুণ মোশাররফ হোসেন মনা ও বন্দীর হাইস্কুলের সাধারণ সম্পাদক কর্মবীর চিন্তকে ছাত্রলীগ কার্যালয়ে হত্যা করে।

## জিজিবাৰ বৰ্বৰতা

২ এপ্রিল সকালে কুখ্যাত বিগেডিয়াৰ বশীৱেৰ নিৰ্দেশে পাক জল্লাদাৰ বাহিনীৰ নৱপশ্চাৱ কেৱালীগঞ্জে ইতিহাসেৰ অন্যতম জঘন্য হামলা চালায়। তাৱা গ্রামেৰ পৰ থাম লুঞ্ছন কৰে, জালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। বৰ্বৰৱাৰ জিজিবাৰ, শুভাড্যা ও কালিন্দি ইউনিয়নে নিৰ্বিচাৱে গুলি চালায়- আক্ৰান্ত হয় প্ৰতিটি গ্রামেৰ প্ৰতিটি ঘৰ। ধৰ্মিতা হয় এলাকাৰ প্ৰতিটি মা-বোন। রক্তেৰ গঙা বইয়ে দিল ওৱা কেৱালীগঞ্জে। প্ৰতিটি ঘৰবাড়ি, বোঁপোৱাড়, নালানৰ্দমা, পুকুৱড়োৱা আৱ কাশবন থেকে পাওয়া গেল অসংখ্য লাশ। খোলা মাঠেও পড়ে ছিল হাজাৰ লাশ। শহৰ থেকে নিৰাপদ আশ্রয়েৰ আশায় পালানো বহু অপৰিচিত মানুষও ছিল এদেৱ মধ্যে। মান্দাইল ডাকেৱ সড়কেৰ সামনেৰ পুকুৱ পারে পশুৱা একসঙ্গে ৬০ জনকে গুলি কৰে মাৱে। কালিন্দিৰ এক বাড়িতে পিশাচৰাৰ পাশবিক অত্যাচাৱ কৰাৱ পৰ হত্যা কৰে ১১ জন নারীকে।

## মধুৰ্দা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ছাত্ৰছাত্ৰী সকলেৰ মধুৰ দা, মধুসুদন দে বিখ্যাত মধুৰ ক্যান্টিনেৰ মালিক। আৱ এই ক্যান্টিনই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ছাত্ৰ রাজনীতিৰ সূত্তিকাগার। এখান থেকে বেৱিয়ে অনেকেই জীবনেৰ সিঁড়ি বেয়ে প্ৰতিষ্ঠাৰ পথে, খ্যাতিৰ শৈৰ্ষে, বিভিন্ন মহকুমা ও জেলা প্ৰশাসক হয়েছেন, অনেক দেশবৱেৱণ্য নেতাও আছেন এই তালিকায়। ৫২ সালেৰ স্মৃতিচাৰণে মধুৰ্দা বলেছিলেন, 'বৱকত চা খেয়ে দ্রুত বেৱিয়ে গেল, আৱ একদিন আসাদও এমনি চা খেয়ে ক্যান্টিন থেকে বেৱিয়ে মিছিলে গিয়েছিল। আৱ ফেৱেৰনি।'

এই মধুৰ ক্যান্টিনে অনেক শহীদেৰ স্মৃতি তৰ্পণ হয়েছে। কিষ্ট সবাৱ প্ৰিয় মধুৰ্দা রয়ে গেছেন ২৫ মাৰ্চেৰ প্ৰতীক্ষায়। মধুৰ্দা সপৰিবাৱেৰ জগন্মাথ হলেৰ পাশে শিববাড়িতে থাকতেন। ২৬ মাৰ্চ সকালে আক্ৰান্ত হলো শিববাড়ি, হানাদারৱাৰ নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৱল মধুৰ্দাৰ ছেলে রণজিৎ ও পুত্ৰবধু রানীকে। এই বৰ্বৰোচিত হত্যাকাণ্ডেৰ সাক্ষী পৰিবাৱেৰ একটি মেয়ে রানু। ছেট দাদাৰাবু ও বৌদিকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল সে। হানাদারৱাৰ তাকে গুলি কৰে যাব একটি তাৱ চোয়ালে লাগে অন্যটি বুক ভেদ কৰে যায়- কিষ্ট তাৱপৱও বেঁচে যাব রানু। এৱপৰ বৰ্বৰৱাৰ মধুৰ্দাকে গুলি কৰে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে গুলিৰ আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন তাৱ অস্তঃস্থত্বাৰ্থী। গুলি খেয়েও মধুৰ্দা অনেকক্ষণ বেঁচে ছিলেন।

গুলি কৰে চলে যাওয়াৰ ঘণ্টাখানেক পৰ আবাৱ ফিৱে এসে তাকে আহতাবস্থায় তুলে নিয়ে যায়। জগন্মাথ হলেৰ মাঠে হত্যা কৱা হয় সবাৱ প্ৰিয় মধুৰ্দাকে। ঘটনাৰ ১৪ দিন পৰ পৰ্যন্ত শিববাড়িতে পড়েছিল মধুৰ্দাৰ ছেলে, ছেলেবেউ ও স্ত্ৰীৰ লাশ। এমনি কৱেই নিৰ্মূল কৱা হয় সংগ্ৰামেৰ এই জীবন্ত প্ৰতীককে।

## পাঁচদোনাৰ সংঘৰ্ষ

৪ ও ৫ এপ্রিল পাকবাহিনী নৱসিংহীৰ ওপৰ গোলাবৰ্ষণ কৰে। ১৩ এপ্রিল স্বয়ংক্ৰিয় ও অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ নিয়ে কয়েককশ পাকসেনা বাবুৱহাট থেকে যাত্রা কৱল নৱসিংহীৰ উদ্দেশে। শুভ্রসেনা বহনকাৰী ট্ৰাকেৰ কলভয় পাঁচদোনায় পৌছলে অতক্রিতভাৱে আক্ৰান্ত হয়। প্ৰথমে মৰ্টাৰ ও পৱে কয়েক বাঁক মেশিনগানেৰ গুলিৰ শিকাৰ হয় তাৱা। দু ঘণ্টাব্যাপী এই যুদ্ধে হানাদারদেৰ তিন ট্ৰাক সৈন্য হতাহত হয়। এদেৱ সংখ্যা ১০০-ৱে বেশি। তাৰে তিনটি ট্ৰাকও অকেজো হয়ে যায়। তাই হতাহতদেৱ অন্য ট্ৰাকে উঠিয়ে অকেজো গাড়িগুলো ফেলে পালিয়ে যায় হানাদারৱাৰ। যে মুক্তিযোদ্ধাদেৱ তীব্ৰ আক্ৰমণে একটি সুসজ্জিত ও সুশক্ষিত সেনাদলকে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰেৰ অধিকাৰী হওয়াৰ পৱণ পালাতে হলো তাৰে সংখ্যা ৫২ ছিল মা৤ ১৮ জন। তাৰে অস্ত্ৰেৰ মধ্যে ছিল শুধু একটি মৰ্টাৰ ও একটি মেশিনগান।

## ঢাকায় গেৱিলা তৎপৰতা

ক্যাপেটেন হায়দাৱারেৰ নেতৃত্বে আগৱতলায় একটি ক্যাম্পে কমান্ডো আক্ৰমণেৰ কলাকোশল শেখানো হচ্ছিল। ২ নং সেক্টৰ কমান্ডোৰ খালেদ মোশারুল ফ এই ক্যাম্পেৰ ১৬ জন কমান্ডোকে নিয়ে একটি সুইসাইড ক্ষেয়াড গঠন কৱেন। বাংলাদেশেৰ পৰিস্থিতি সৱেজমিনে দেখাৰ জন্য জুন মাসে বিশ্বব্যাংকেৰ একটি প্ৰতিনিধিদল ঢাকায় আসে। খবৰ পেয়ে মেজৱ খালেদ তাৱ সুইসাইড ক্ষেয়াডকে ঢাকায় পাঠান। ঢাকা আসাৰ পথে দলেৰ ৪ জন স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিৱে যান। বাকি ১২ জনেৰ প্ৰত্যেকেৰ কাছে ছিল ৪টি কৱে গ্ৰেনেড ও ২০ পাউড বিক্ষেপক। ৬ জুন তাৱা ঢাকা শহৰে প্ৰবেশ কৱেন। ৮ জুন জিনাহ এভিনিউতে গ্ৰেনেড বিক্ষেপণ ঘটান। এবং দুপুৰ ২ টাৱ দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টেৰ এক সামৰিক অফিসাৱেৰ বাসভবনে গ্ৰেনেড ছোঁড়েন। ৯ জুন সামৰিক জাস্তা বিশ্ব অৰ্থনৈতিক সাহায্যদাতাৰ সংস্থাৰ সদস্যদেৱ সম্মানে হোটেল ইন্টাৱকনে (খেল শেৱাটন) এক মৈশ ভোজেৰ আয়োজন কৱেন। প্ৰিস সদৰুদ্দিনসহ সংস্থাৰ বেশ বিচু প্ৰতিনিধি

ও বিদেশী সাংবাদিক তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৬ জন গেৱিলা নিৰ্দিষ্ট সময়ে হোটেলেৰ মূল প্ৰবেশপথে বিশ্বব্যাংকেৰ প্ৰতিনিধিদেৱ গাড়িৰ ওপৰ পৱেপৰ তিনটি গ্ৰেনেড ছোঁড়েন। পুৱো ধৰ্স হয়ে যায় তা। বিক্ষেপণেৰ বিকট শব্দে লোকজনেৰ ছেটাছুটি ও চিৎকাৰ শুৰু হয়ে যায়। এতে বিদেশী প্ৰতিনিধিদেৱ বুবাতে অসুবিধা হয়নি যে বাংলাদেশেৰ পৰিস্থিতি মোটেও স্বাভাৱিক নয়। এদিকে গেৱিলাৰা গাড়ি ঘুৱিয়ে চলে যান রমনা থানাৰ কাছে জনেকে জামাত নেতাৰ বাড়ি। সেখানে তখন পাকবাহিনীৰ দালাল শাস্তি কমিটিৰ এক সম্মেলন হচ্ছিল। হঠাৎ কৱেই গেৱিলাৰা গাড়ি নিয়েই বাড়িৰ ভেতৰ দুকে তিনটি গ্ৰেনেড ছুড়ে বেৱিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাৱা যান দৈনিক পাকিস্তান (পৱে দৈনিক বাংলা) ও মৰ্নিং নিউজ অফিসেৰ সামনে। চলন্ত গাড়ি থেকে তাৱা সংবাদপত্ৰ অফিসেৰ মধ্যে গ্ৰেনেড ছুড়ে কয়েকজন দালালকে হত্যা কৱেন। পৱে গেৱিলাৰা পুৱানো পল্টনেৰ গলিতে গাড়িটা পৱিত্ৰাগ কৱে নিৰাপদ আশ্রয়ে ফিৱে যান। প্ৰসংস্কৃত, ৯ জুন সন্ধ্যায় গুলশান এলাকাৰ এক অবাঙালীৰ কাছ থেকে গাড়িটি ছিনতাই কৱেন তাৱা।

হানাদার বাহিনীৰ একটা ক্যাম্প ছিল ফাৰ্মগেটে। এখানে একজন ক্যাপেটেনেৰ নেতৃত্বে কিছু সেপাই থাকত। চলাচলকাৰী গাড়ি ও পথিকদেৱ তাৱা অনুসন্ধান কৱত। এতে গেৱিলাদেৱ খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাই আগস্টেৰ শুৰুতে ১০ জনেৰ একটি গেৱিলা দল এই ক্যাম্প আক্ৰমণেৰ সিদ্ধান্ত মেন। আক্ৰমণে তাৱা দুটো গাড়ি ব্যবহাৰ কৱেন। ১ নং বা সামনেৰ গাড়িটি ছিল অপাৱেশনেৰ, দ্বিতীয়টি ছিল তাৰে কাভাৰ দেওয়াৰ জন্য। ফাৰ্মগেট ওভাৱিৰিজেৰ রাস্তাৰ দুপাশে তখন পাকবাহিনীৰ কড়া প্ৰহাৰ ছিল।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় গেৱিলাৰা সেখানে পৌছে দেখেন শত্ৰুসেনাদেৱ কয়েকজন দুলুৱে ওপৰ বসে গল্পে মশগুল, বাকিৱা দাঁড়িয়ে। প্ৰথমেই দুজন গেৱিলা দুটো এলএমজি দিয়ে গাড়ি দুজনকে গুলি কৱেন। এৱপৰ গাড়ি থেকে নেমে ব্ৰাশফায়াৰ শুৰু কৱেন ক্যাম্পেৰ ভেতৰ। ত্ৰুৎিৎ এই আক্ৰমণে হতভয় খানসেনাৰা ছুটোছুটি শুৰু কৱে দুলি। এৱাই মধ্যে ১ নং গাড়িৰ ডাইভাৰ এমনভাৱে গাড়ি ঘোৱালেন যেন ডিগবাজি থেকে তা সোজা হৈল! গেৱিলা দুজন গাড়িতে উঠে হানাদারদেৱ প্ৰধান ক্যাম্প লক্ষ্য কৱে কয়েকটা গ্ৰেনেড ছুড়েন। চোখেৰ ললকে অদৃশ্য হয়ে যান তাৱা অপাৱেশন শেষে, যাতে নিহত হয় ৯ জন অফিসাৱসহ ১৭ জন শত্ৰুসেনা। এই অভিযানগুলো চালাচ্ছিলেন একটি সংঘৰ্ষ গেৱিলা দল যাদেৱ ডাকা হতো মায়া (বৰ্তমান আওয়ামী লিগ নেতা

মোফাজ্জল হোসেন মায়া বীর বিক্রম) ক্র্যাকপ্লাটুন নামে। আগস্টের ওই ঘটনার পর ৫ জন গেরিলা একটি টয়োটা করোলায় আইটুর গেটের (আসাদ গেট) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মিরপুরের দিক থেকে আসা এক আর্মি কনভয়ের মুখোমুখি পড়ে যান তারা। পেট্রোল নেয়ার ভান করে টয়োটা কাছের এক পাস্পে থামালোন গেরিলারা। কনভয় এগিয়ে আসার আগেই দ্রুত একজন গেরিলা রাস্তায় কয়েকটি মাইন পেতে দেন। কনভয়ের প্রথম দুটো গাড়ি নিরাপদেই পার হলো কিন্তু তৃতীয় গাড়িটির চাকার আঘাতে চারদিক কেপে উঠল বিক্ষেপণে। ততক্ষণে টয়োটা হাইকোর্ট ও ময়মনসিংহ রোডের ক্রসিংয়ের টাফিক রাউন্ডে পৌছে গেছে। এখানে গেরিলারা বিক্ষেপণক ছুড়ে আবাঞ্জলি যাত্রীবাহী একটি ডাবলডেকার বাসকে বিধ্বন্ত করেন।

পরদিন নর্থসাউথ রোডের চাঁওয়া রেস্তোরার উল্টোদিকে রাস্তায় দাঁড় করানো দুটো আর্মি জিপের চাকার নিচে এমকে১৪ মাইন রেখে স্টকে পড়েন গেরিলারা। প্লাস্টিক মাইন আবস্টা পর প্রচঙ্গ শব্দে বিক্ষেপণ হয়। এইসঙ্গে গেরিলারা আরো কিছু অপারেশন করেন, ১. গ্যানিজ ও ভোগ ফ্যাশন বিপণী কেন্দ্র অপারেশন, ২. শিনরোড মোড়ের পেট্রোল পাম্প অপারেশন- এখানে সায়েন্স ল্যাবরেটরির রাস্তায় এমকে১৬ মাইনের আঘাতে একটি মিলিটারি জিপ শত্রুসেনা সহ উড়ে যায়, ৩. কমলাপুর স্টেশন অপারেশন, ৪. টয়েনবি সার্কুলার রোড গভর্নর হাউজের পাশে পিএনও (পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল বা দাউদ পেট্রোলিয়াম লিঃ) পেট্রোল পাম্প অপারেশন।

এইসব গেরিলা অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল হানাদার বাহিনী অধিকৃত ঢাকা নগরীতেই যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে না তা বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া। গেরিলা হাফিজের বাসায় প্রথ্যাত সুরকার (আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারি) ও শিল্পী আলতাফ মাহমুদের যাতায়াত ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার আন্তরিক সমর্থন ও গেরিলা তৎপরতায় সন্ত্রিয় সহযোগিতা ছিল তার। এক জায়গায় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জমা থাকলে, যদি শত্রুদের নজরে পড়ে যায় তাহলে পুরোটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেইজন্য তিনি সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় ভাগভাগি করে রাখার পরামর্শ দেন। নিজের বাসায়ও কিছু নিয়ে যান। গেরিলাদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও তার বাসায় রাখিত অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়ায় পাকবাহিনী তাকে বন্দী করে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যায় এবং অকথ্য নির্যাতনের পর হত্যা করে।

এদিকে গেরিলারা আরো কিছু দুঃসাহসিক অভিযান চালায় ঢাকার বুকে। যেমন, ১. উলন পাওয়ার স্টেশন অপারেশন, ২. ওয়াপদা পাওয়ার হাউজ রেইড, ৩. গুলবাগ পাওয়ার স্টেশন অপারেশন, ৪.

কাটাবন মসজিদের উভয়ে বৈদ্যুতিক স্টেশনে হামলা, ৫ এনেগ্রা রকেট লাথ্রগর দিয়ে এমপি হোস্টেলে হামলা, ৬. হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দ্বিতীয় দফা হামলা।

১১ আগস্ট গেরিলারা সন্ধ্যা ৫টা ৫ মিনিটে হোটেল ইন্টারকনে প্রচঙ্গ এক বিক্ষেপণ ঘটান। হোটেল লাউঞ্জ, শপিং আর্কেড ও আশেপাশের রূমগুলোর কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে যায়, দরজা ছিঁকে পড়ে দূরে। রংমের ভেতর, কার ও লাউঞ্জের দেওয়াল ভেঙে যায়। বেশ কজন লোক আহত হয়। বাংলাদেশে মুক্তিবাহী নীর তৎপরতা বিশ্বজুড়ে সংবাদপত্রগুলোয় কাভারেজ পায়।

ঢাকায় বেশকিছু সফল অপারেশনের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি অবরুদ্ধ নগরবাসীও উদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। ২ নং সেক্টর থেকে ৫২ জন গেরিলার একটি দল তিতাস নদীপথে ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়। আখাউড়া ব্রাক্ষণবাড়িয়া সড়কের একটি ব্রিজের নিচে গভীর রাতে তিতাসে পৌছেন তারা। সেখানে ৭ দিন ৭ রাত অতিবাহিত করে ধামরাই থানার এক গ্রামে নৌকা ভেড়ান। রেশন ফুরিয়ে যাওয়ায় গেরিলার ৪৮ ঘণ্টা স্বেচ্ছ নদীর পানি থেঝেই পেট ভরান। এরপর তারা রাতে ক্যাম্প করেন রোহা গ্রামের বাজারে। কিন্তু তাদের আসার খবর পৌছে যায় পাকবাহিনীর কাছে। রাতে আক্রমণ করে তারা গেরিলাদের। এই সংঘর্ষে ১৯ জন হানাদার নিহত হয়। নিরূপায় হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় তারা। আর গেরিলারা রোহা ছেড়ে ক্যাম্প করেন সিংগাইর থানা এলাকার কাছাকাছি একটি গ্রামে। এখানে তারা পাকহানাদারদের একটি র্যাশনিং কোরকে আক্রমণ করে সবাইকে হত্যা করেন। সফল অপারেশন শেষে শিমুলিয়ায় ক্যাম্প স্থানান্তর করেন তারা।

এই পর্যায়ে ২৩ জনের একটি দল ঢাকায় ঢোকেন। এই দলটি ছাড়াও শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে আরো একটি দল ঢাকার দক্ষিণের কিছু এলাকায় সফল গেরিলা তৎপরতা চালান। এরা বুড়িগঙ্গা ও আশেপাশের এলাকাজুড়ে বিভিন্ন সময়ে শত্রুদের ওপর হামলা চালান (এই দলেই ছিলেন আয়ম খান ও জসিম)।

প্রথম দলটি কাকারাইলের মোড়ে যে পেট্রেলপাম্পটি ছিল তা ধ্বংস করে দেয়। এরপর ডিআইটি ভবনের ছুড়ার নিচে ৫ পাউন্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিক্ষেপণ ঘটান। বিক্ষেপণকের পরিমাণ কম হওয়ায় ছুড়াটি পুরো ধ্বংস হয়নি, তবে তাতে ফাটল ধরে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সাভার রোড ও স্টেশন থেকে মানিকগঞ্জের বড়াল ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৩০ মাইল এলাকাজুড়ে অপারেশন চালান। এতে তারা ৩১৯ জন রাজাকারকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন এবং প্রাচুর অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে আসে। অক্টোবরের প্রথম দিকে সাভার রোড ও স্টেশনের সামনে তিনটি পাকিস্তানী লরিতে আক্রমণ করে ৩৭ জন পাকসেনা খতম করেন

গেরিলারা।

অক্টোবরে সামরিক সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ চালুর চেষ্টা চালায়। গেরিলারা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সাইকেলজি বিভাগে একটি এবং তিন তলা ও চার তলায় কিছু বিক্ষেপণ ঘটান। এতে বন্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় চালুর অপচেষ্টা। কিছু গেরিলা এর মধ্যে ঢাকা মুসলিম কর্মার্শিয়াল ব্যাক্সে অপারেশন করেন। গেরিলা মুনির (অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ ছিলেন সঙ্গে) একটি খেলনা পিস্টল দিয়ে সফলভাবে বেশকিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করেন। নভেম্বরের শুরুতে গেরিলারা হাইজ্যাক করা একটি গাড়ি নিয়ে বায়তুল মোকারারমে পার্ক করা পাকবাহিনীর দুটো সৈন্যবোৰাই লরির মাঝখানে রেখে তাতে বিক্ষেপণ ঘটান- মারা যায় ১৬ জন হানাদার। নভেম্বরেই মালিবাগ রেলক্রসিংয়ের কাছে রেললাইন উড়িয়ে দিতে গিয়ে ভোর চারটায় পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রচঙ্গ সংঘর্ষ হয় গেরিলাদের। এতে তাদের একটি সেকশন নিহত হয়। এই মাসেই শাহবাগের মোড়ে হামলা চালিয়ে বেশকিছু পাকসেনাকে হত্যা করেন গেরিলারা। ১৪ নভেম্বর তারা এক উল্লেখযোগ্য অপারেশন করেন। যার নাম ছিল ভায়াডুবি ব্রিজ অপারেশন। এই সফল আক্রমণে ব্রিজে পাহারারত ২০ জন হানাদার নিহত হয়। ব্রিজটি দখল করে নেন গেরিলারা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মানিকগঞ্জের ৭০০ পাকসেনার একটি দল তিনটি গাড়িতে ব্রিজ অভিযুক্ত রওনা দেয়। গভীর রাতে তারা আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের। এই যুদ্ধে প্লাটুন অধিনায়ক মানিক শহীদ হন এবং আহত হন আরো ক'জন মুক্তিযোদ্ধা। ফলে পিছু হটেন গেরিলারা। ৪ দিন পর ১৮ নভেম্বর ব্রিজটি আবারো দখল করেন তারা এবং উড়িয়ে দেন। ধামরাই এলাকা সম্পূর্ণ শক্রমুক্ত করে গেরিলারা মূল ক্যাম্প সাভারের জিরাবতে স্থানান্তর করেন। আর ১৫০ জনের একটি দল রয়ে যায় ধামরাইয়ে। সাভার মহাসড়ক গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণে ছলে আসায় উভয়বঙ্গ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে ঢাকা। সাভারে পাকবাহিনীর একটি বড় ক্যাম্প ছিল, নভেম্বরের শেষদিকে এক বটিকা আক্রমণে তা দখল করে নেন গেরিলারা। পরে সাভার থানাও ছলে আসে তাদের নিয়ন্ত্রণে। এদিকে ৩০ জুন ক্র্যাকপ্লাটুনের ৯ জন গেরিলা পাক হানাদারদের হাতে ধরা হয়ে পড়েন। এদের ৭ জনকে অকথ্য নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়। গেরিলারা ছিলেন- হাফিজ, জুয়েল (ক্রিকেটার), বাদি, আজাদ (আনিসুল হকের 'মা' যাকে নিয়ে), বাকি, রূমি (জাহানারা ইমামের ছেলে) ও আলতাফ (সম্প্রতি আলতাফ মাহমুদই, তার বাড়ির বাগান থেকেই দুই টাক্ষ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্কার করে পাকবাহিনী)। ১৬ জুলাই '৭১ রাত ৯ টায় ৬ জন গেরিলা ঢাকার বৃহত্তম রামপুরা

পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রিকশাচালকের ছাবেশে দুইজন গেরিলা কলাবাগান থেকে আসার সময় একটি সামরিক ভ্যানের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এতে ডাইভার ছাড়া বাকি সৈন্যরা নিহত হয়। বকশিবাজারে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের গেটের কাছে অবস্থানরত একটি রাজাকার ক্যাম্পে হামলা চালান গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে, যাতে মারা যায় দুই রাজাকার। নারায়ণগঞ্জ ভিট্টোরিয়া হাসপাতালে পাহারারত জ্বেল রাজাকারকেও একই কায়দায় হত্যা করেন তারা। এর মাঝে এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে বিস্ফোরণ ঘটান গেরিলারা। সেই সঙ্গে মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকায়ও। যাত্রাবাড়িতে ক্র্যাক প্লাটুনের সঙ্গে পাকবাহিনীর মুখোমুখি এক সংঘর্ষ হয় যাতে নিহত হয় অনেক শত্রুসেনা। গেরিলারা যাত্রাবাড়িতে একটি পুল উড়িয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকাকে বিছিন্ন করে দেন।

## মেজর জিয়া ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

চট্টগ্রাম ষোলশহরে ৮ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তার সঙ্গে ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। এবং আরো কিছু বাঙালী অফিসার। ২৫ মার্চ সাড়ে এগারোটার দিকে ঢাকার বুকে যখন গণহত্যা চলছে, জিয়া তখন এ ব্যাপারে অন্ধকারে। বরং রাত ১১টায় তাকে রিপোর্ট করতে বলা হয় চট্টগ্রাম বন্দরে ব্রিগেডিয়ার আনসারীর কাছে। তাকে নিয়ে যেতে নৌবাহিনীর একটা ট্রাকও ততক্ষণে হাজির, সঙ্গে নৌবাহিনীর ৮ জন এসকর্ট ও অবাঙালী ট্রাক ডাইভার। মেজর জিয়া কেন যেন সন্দিক্ষ হয়ে উঠলেন। তার সঙ্গে ছিলেন ব্যাটেলিয়ানের তিন জোয়ান।

আগ্রাবাদের কাছাকাছি আসার পর একটা ব্যারিকেডের সামনে ট্রাক থামাতে বাধ্য হলো ডাইভার। জিয়া নেমে পায়চারি করতে লাগলেন, বাকিরা ব্যারিকেড সরাতে। এমন সময় মেজর খালেকুজ্জামান সেখানে ছুটে এলেন। জানালেন পাক সেনারা ক্যান্টনমেন্টে হামলা শুরু করেছে। শহরে হতাহতের শিকার বহু নিরীহ লোক। জিয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'উই রিভোল্ট-আমরা বিদ্রোহ করছি।' তিনি খালেকুজ্জামানকে শহরে ফিরে যেতে বললেন এবং নির্দেশ দিলেন সেখানকার পাকিস্তানী অফিসারদের বন্দী করার জন্য, সেইসঙ্গে ব্যাটেলিয়ানের সবাই যেন প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। আর পাঞ্জাবি ডাইভারকে বললেন, ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারের দিকে গাড়ি ঘোরাতে। বিনা আপত্তিতে ডাইভার নির্দেশ মনে নিল। হেডকোয়ার্টারে পৌছে জিয়া ট্রাক থেকে দ্রুত নেমে নৌবাহিনীর এসকর্টদের একজনের

কাছ থেকে অতর্কিতে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পাকিস্তানী নেভাল অফিসারদের দিকে তাক করে বললেন, 'হ্যান্ডস আপ, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।' অফিসার দুজন আত্মসমর্পণ করল। বাকিরা অন্ত মাটিতে ফেলে দিল। কোয়ার্টারে তুকে সবার আগে বন্দী করলেন ব্যাটেলিয়ন কমান্ডারকে- তিনি তখন ঘুমাচ্ছিলেন। এরপর তিনি সঙ্গী দুজন সশস্ত্র গার্ড ও ডাইভার কালামকে নিয়ে ওয়্যারলেস কলোনীতে গেলেন। তার হাতে ছিল স্টেনগান। ওয়্যারলেস কলোন তে ক্যাপ্টেন হায়াত একটা প্লাটুনের কমান্ডে ছিলেন। বাসা থেকে তাকে বন্দী করা হয়, সঙ্গে সুবেদার হাশমত ও তিনজন পাক সেনাকে। এইসময় নিরাপত্তা বিহ্বল হচ্ছে দেখে ডাইভার কালাম একজন সৈন্যকে গুলি করতে বাধ্য হন। রাত সাড়ে নটায় ক্যাপ্টেন রফিক হালিশহরে পৌছলেন। সেখানে অস্ত্রাগার ছিল তিনটি, এর সবগুলোই নিয়ন্ত্রণে নেয় বাঙালীরা। এখান থেকেই সকল বাঙালী সেনাদের অন্ত দেওয়া হলো আর বন্দী করা হয় ৩০০ অবাঙালী সৈন্যকে।

জাফরকে বললেন, 'আমি আমার ইপিআর আর ট্যাঙ্ক নিয়ে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শুরু করছি। আপনি ষোলশহর গিয়ে সমস্ত বাঙালী সৈন্যদের আমার সঙ্গে যোগ দিতে বলুন।'

এরপর তিনি সঙ্গী দুজন সশস্ত্র গার্ড ও ডাইভার কালামকে নিয়ে ওয়্যারলেস কলোনীতে গেলেন। তার হাতে ছিল স্টেনগান। ওয়্যারলেস কলোন তে ক্যাপ্টেন হায়াত একটা প্লাটুনের কমান্ডে ছিলেন। বাসা থেকে তাকে বন্দী করা হয়, সঙ্গে সুবেদার হাশমত ও তিনজন পাক সেনাকে। এইসময় নিরাপত্তা বিহ্বল হচ্ছে দেখে ডাইভার কালাম একজন সৈন্যকে গুলি করতে বাধ্য হন। রাত সাড়ে নটায় ক্যাপ্টেন রফিক হালিশহরে পৌছলেন। সেখানে অস্ত্রাগার ছিল তিনটি, এর সবগুলোই নিয়ন্ত্রণে নেয় বাঙালীরা। এখান থেকেই সকল বাঙালী সেনাদের অন্ত দেওয়া হলো আর বন্দী করা হয় ৩০০ অবাঙালী সৈন্যকে।

## ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও ক্যাপ্টেন ভুইয়া

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। জেনারেল টিক্কা খান তাঁকে জরুরি কনফারেন্সের ভাওতা দিয়ে ২৪ মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সরিয়ে নিয়ে যায়। সেদিনই ব্রিগেডিয়ার আনসারী চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার হিসেবে যোগদান করে। সেন্ট্র কমান্ডেন্ট হলো কর্ণেল মিসিরি। ক্যাপ্টেন ভুইয়া ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অধীনে হোল্ডিং কোম্পানির কমান্ডার। ২৬ মার্চ রাত ১টায় ২০ নং বেলুচ রেজিমেন্টের ৬ ট্রাকবোর্বাই সৈন্য রেজিমেন্ট সেন্ট্রারের অস্ত্রাগার দখল করে সেখানে পাহারারত সমস্ত বাঙালী সৈন্যকে নির্বিচারে হত্যা করে। চারদিক কাঁপিয়ে শুরু হলো মেশিনগান, ট্যাঙ্ক আর মর্টার শেলের প্রচন্ড গর্জন। প্রতিরোধ করতে গিয়ে আত্মাহতি দিলেন অনেক বীর বাঙালী সেনা। যারা আহত হলেন, তাদের সার বেধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

রাতের এই প্রথম প্রহরে ক্যাপ্টেন ভুইয়া শেরশাহ কলোনীতে ছিলেন। রেজিমেন্ট সেন্ট্রারের একজন হাবিলিদার ক্যান্টনমেন্টে হানাদারদের সব বাঙালী সেনার গণহত্যার কথা তাকে জানালেন। তখন কাছের এক বাসা থেকে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তাকে না পেয়ে এবং যানবাহনের অভাবে ২৬ মার্চ সকল ৭টায় পায়ে হেঁটে বেঙ্গল রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারে পৌছলেন তিনি। সেখানেও কাউকে না পেয়ে দেখা করলেন চট্টগ্রাম পুলিশ সুপার, ডিআইজি ও ডিসির সঙ্গে। দুপুর ১২টায় ৭০ জন বেঙ্গল

রেজিমেন্ট সেনা নিয়ে পাহারতলী পুলিশ রিজার্ভ ক্যাম্পে পৌছলেন ভুইয়া। সেখানে চারশ পুলিশ ও এক প্লাটুন ইপিআর যোগ দিলেন তার দলে।

## কুমিরার লড়াই

২৬ মার্চ কুমিল্লা থেকে সর্বাধুনিক অন্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকহানাদার বাহিনীর ২৪ এফএফ রেজিমেন্ট চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিল। ইপিআর অ্যাডজুটেট রফিকের পরামর্শে ক্যাপ্টেন ভুইয়া তাদের গতিরোধ করতে বিকাল ৫টায় কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হন। তার সঙ্গী ছিলেন ইপিআর ও ইস্ট বেঙ্গলের মোট ১০২ জন যোদ্ধা। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ চট্টগ্রামের কুমিরায় পৌছে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় রাস্তায় ব্যারিকেড স্থিত করেই সেখানেই অবস্থান নেন তারা।

সন্ধ্যা ৭টায় শক্রবাহিনী সেখানে পৌছতেই গর্জে উঠে ক্যাপ্টেন ভুইয়ার দলের সমরান্ত। শুরু হল যুদ্ধ। প্রায় ষটা দুয়েক ধরে চলল তা। এতে হানাদারদের কমাণ্ডিং অফিসার একজন লে. কর্ণেল ও একজন লেফটেন্যান্টসহ মোট ১৫২ জন পাকসেনা নিহত হয়। আর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে শহীদ হন ১৪ জন বীরযোদ্ধা। রাত ১টায় অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে ফিরে গেলেন ক্যাপ্টেন ভুইয়া। সেখানে মেজর জিয়ার নির্দেশে ইপিআরের ৩০ জন সৈন্য নিয়ে পাক নৌ বাহিনীর কমোডর মমতাজের বাসায় আক্রমণ চালান। ২৯ ও ৩০ মার্চ পর্যন্ত কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অবস্থান করেন তিনি। ১ এপ্রিল যাত্রা করে বান্দরবান, কাঞ্চাই, বাঙামাটি ও মহালছড়ি হয়ে ৩ এপ্রিল রামগড় পৌছেন। এখানে মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে একত্রে মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাজে যোগ দেন। পরবর্তীতে ৩ নম্বর সেক্টরে চলে যান ক্যাপ্টেন ভুইয়া।

## অন্ত্রবোৰাই সোয়াত জাহাজ

চট্টগ্রাম সেক্টর কমাণ্ড্যান্ট কর্নেল সিগরি ২৪ মার্চ '৭১ ৫০ জন নির্বস্ত্র বাঙালী সৈন্যকে ২০ নং বেলুচ রেজিমেন্টের এক সশস্ত্র কোম্পানির সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠান ১৭ নং জেটিতে নোঙ্গর ফেলা সোয়াত জাহাজ থেকে অন্ত্র-গোলাবারুদ খালাস করতে। পাকসেনাদের প্রহরায় অন্ত্র খালাসের সময় সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিগেড়িয়ার আনসারি ও কর্ণেল সিগরি।

২৫ মার্চ দুপুর একটার দিকে ইস্ট বেঙ্গল ও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরো দু প্লাটুন বাঙালী সৈন্যকে তলব করে আনা হয়।

সেখানে। আর প্রহরায় যোগ দেয় ২৭ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আর একটি কোম্পানি। তারা জেটির চারপাশে দুর্ভেদ্য বেষ্টনী গড়ে তোলে। মোট ১২০ জন বাঙালী সেনাকে দিয়ে ২৬ মার্চ সকাল ১০টা পর্যন্ত মাল খালাস করানো হয়। পুরোটা সময় অভুত রাখা হয় তাদের- কোনো খাবার সরবরাহ করা হয়নি। মাল খালাসের পর তাদের ক্যান্টনমেন্ট ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বাঙালী সৈন্যদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন আজিজ, হাবিলদার আবুস সাতার, হাবিলদার আবুল খালেক, নায়েক নিজামুদ্দিন, ল্যাঙ্গনায়েক আখতারাদিন প্রমুখ। বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় দলটির কাছে অন্ত্র ছিল, কিন্তু তা জমা দিতে বাধ্য করা হয় তাদের।

২৬ মার্চ বিকাল ৪টায় সোয়াত জাহাজ থেকে বের হয়ে কালুরঘাট খানসেনারা নির্বস্ত্র এই সৈনিকদের ১৭ নং জেটির পাটাতনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। গুলি চলার ঠিক আগ মুহূর্তে সুবেদার রব খরঞ্চোত কর্ণফুলীতে ঝাপিয়ে আত্মরক্ষা করেন। বাকি সবাই শহীদ হন। যে ক'জন গুলির আঘাতে আহত হন, তাদেরকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। পরে জল্লাদারা লাশগুলো নদীতে ফেলে দেয়। নায়েক সুবেদার নুরুল ইসলাম ও নায়েক সুবেদার তৈয়ার নদীতে ফেলে দেয়া লাশের সঙ্গে জীবনের স্পন্দন নিয়ে কোনো রকমে বেঁচে ছিলেন। ওই অবস্থায় সাঁতৰে নদী পার হয়ে কাছের এক গ্রামে আশ্রয় নেন দুজন।

৮ এপ্রিল '৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটের এক মাইল উত্তরে হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর এক সংঘর্ষ হয়। এতে নেতৃত্ব দেন মেজর মীর শওকত আলী। পাকিস্তানীদের এক প্লাটুন সৈন্য কৃষিভবন দখল করে সেখানে অবস্থান করছিল। লেং শমসের মবিন চৌধুরী মেজর শওকতের নির্দেশে কিছু সৈন্য নিয়ে প্রাথমিক হামলা চালান এবং ব্যর্থ হন। ওই ঘটনায় শহীদ হন নায়েক নায়েব আলী। এই অবস্থায় মেজর শওকত, হাওলাদার হামদু মিয়া, নায়েক তাহের, ইপিআর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জনাদশেক সৈন্য নিয়ে ৯ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৮টায় কৃষিভবন আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে একজন ক্যাপ্টেন ও একজন সুবেদারসহ ২০ জন পাকসেনা নিহত হয়। বাকিরা আহতদের নিয়ে পালিয়ে যায়।

১০ এপ্রিল মেজর শওকত তার বাহিনী নিয়ে কালুরঘাটে অবস্থান করছিলেন। ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্র-জনতা মিলিয়ে তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪৫০ জন। দুটো হানাদার বিগেড় দ্বারা আক্রান্ত হন তারা। পাকবাহিনী কর্ণফুলীতে অবস্থানরত তাদের নৌজাহাজকে শঙ্খ নদী দিয়ে কালুরঘাটের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং মুক্তিবাহিনীর ওপর নেভাল গানের গোলা নিক্ষেপ

করতে থাকে। গোলাবর্ষণ চলে বিগেড আর্টিলারি থেকেও। এসময় খবর এল পটিয়ার কালাপুলের দিক থেকেও পাকবাহিনী এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। মেজর শওকত কিছু সৈন্য দিয়ে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে পাঠালেন কালাপুলের দিকে। ১১ এপ্রিল শওকত তার বাহিনীসহ অগ্রসর হলেন কালাপুলের পরিস্থিতি জানতে। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ক্যাপ্টেন ওয়ালি মারফত খবর এল প্রায় ৭০০-৮০০ সৈন্য কালুরঘাট আক্রমণ করেছে। শত্রুদের কিছু সৈন্য মহিলা সেজে (বোরকা পড়ে) এবং কিছু সিভিল পোশাকে 'জয় বাংলা' শ্বেতাগান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে বিজের দিকে। সেখানে তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন হারুন, লেং শমসের মবিন, লেং মাহফুজসহ কিছু অফিসার। তারা প্রথমে বুবো উঠতে পারেননি ব্যাপারটা। কিন্তু শত্রু যখন 'জয় বাংলা' বলতে বলতে বিজের ওপর উঠে এল তারা বুবলেন এরা হানাদার। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। শত্রুর গুলিতে ক্যাপ্টেন হারুন ও লেং শমসের মবিন আহত হলেন।

শত্রুদের আরেকটা দল কাঞ্চাই রোডে লেং মাহফুজের ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। মেজর শওকত সকাল ৯টায় কালুরঘাট ফিরে সবাইকে রিটিটের নির্দেশ দিলেন। আর লেং মাহফুজকে নির্দেশ দিলেন মদুনাঘাট এলাকায় প্রতিরক্ষা বুহ গড়ে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে, যতক্ষণ না কালুরঘাটে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনী নিরাপদে পেছনে সরে আসতে পারে। পরে তারা সবাই প্রতিয়া একত্রিত হলেন। সেখান থেকে মেজর শওকত প্রথমে বান্দরবান, সেখান থেকে কাঞ্চাই হয়ে রাঙামাটি যান। সেখানে মহালছড়িতে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন তিনি।

ওদিকে লেং মাহফুজ শত্রুর ওপর আঘাত হেনে চলেছিলেন। কিন্তু শত্রুর ব্যাপক আক্রমণের মুখে কিছুটা পিছু হটে পাশ্ববর্তী নোয়াপাড়া ও পরে পলিটেকনিকে সার্থক প্রতিরক্ষা গড়ে সাহসের সাথে মোকাবেলা করেন তাদের। পরে মেজর শওকতের নির্দেশে প্রায় ২০০ জন মুক্তিযোদ্ধার দলটি নিয়ে মহালছড়িতে হেডকোয়ার্টারে চলে আসেন। ওই দিনই ছুটিতে থাকা ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের মহালছড়ি আসেন। মেজর শওকত তার অফিসারদের নিয়ে একটা রঞ্চ বুহ তৈরি করলেন, যা নিম্নরূপ :

১. ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে ১০০ সৈন্য রাঙামাটির বুড়িঘাটে
২. ক্যাপ্টেন আফতাব কাদেরের নেতৃত্বে ১০০ সৈন্য খাগড়াছড়িতে
৩. লেং মাহফুজের নেতৃত্বে ১০০ সৈন্য রাঙামাটির বরকলে
৪. সুবেদার মুভালিবের নেতৃত্বে ১০০ সৈন্য রাঙামাটির কুতুকছড়ি এলাকায়

১৬ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধাদের এই চারটি দল তাদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিলেন। ১৫ এপ্রিল চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের (আরেক রাজাকার) আহ্বানে পাকবাহিনী রাঙামাটি পৌঁছে। পরদিনই দুর্বত্ত সাহসী ক্যাপ্টেন আফতাব তার বাহিনী নিয়ে খাগড়াছড়ি রেস্ট হাউজে অবস্থানরat এক প্লাটুন পাকবাহিনীকে আক্রমণ করেন। এতে হানাদারদের কমাত্তি অফিসারসহ ২০ জন পাকসেনা নিহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। কেনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই আফতাব ফিরে আসেন হেডকোয়ার্টারে। প্রায় ২০ জন পাক সেনার একটি দল ১৭ এপ্রিল লঞ্চযোগে রেকি করতে বেরিয়েছিল। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তার দল নিয়ে ওত পেতে ছিলেন। লঞ্চটি তাদের গুলির আওতায় আসা মাত্র অ্যামবুশ করলেন তারা। আক্রমণে লঞ্চসহ অধিকাংশ পাকসেনা নিহত হয়। পালাতে সক্ষম হয় কয়েকজন। এই সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আহত হন দুজন। ১৮ এপ্রিল '৭১ দুটো লঞ্চ ও একটি স্পিড বোট বোরাই শত্রু সেনা চেঙ্গী নদী দিয়ে যাওয়ার সময় মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন নির্দেশ ছাড়াই হঠাত গুলি ছুঁড়ে বসে। পাকসেনারা সামান্য ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে যায়, তারপর ডিফেন্স নিয়ে মাহফুজের বাহিনীর ওপর আট্টলারির আঘাত হানতে থাকে। শত্রুর প্রবল তোপের মুখে মুক্তিবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়।

ওইদিন বিকাল ৩০টায় সুবেদার মুতালিব কুতুবহুর্দিতে শত্রুদের ৬টি সৈন্যভর্তি টাক অ্যাম্বুশ করেন। এতে ৪০ জন পাকসেনা নিহত হয় ও তিনটি টাক ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯ এপ্রিল বৃত্তিঘাটে শত্রুবাহিনীর বড় একটি দল মার্টাৰ সহযোগে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের বাহিনীর ওপর প্ৰবল আক্ৰমণ চালায়। প্ৰচণ্ড তোপের মুখে মুক্তিযোৰ্ধনের টিকে থাকা প্ৰায় অসম্ভৱ হয়ে দাঢ়ায়। কিন্তু পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না। এমনি সময় ৮ম বেঙ্গলের বঙ্গশার্দুল ল্যাসনায়েক মুসি আদুৰ রউফ মেশিনগান হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, স্যার আমি কাভাৰিং ফায়ার দিচ্ছি। আপনি বাকিদের নিয়ে রিট্রিট কৰেন।' ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তাৰ বাহিনীৰ প্ৰায় ১০০ যোৰ্ধা নিয়ে নিৱাপদে পিছিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু ল্যাসনায়েক আদুৰ রউফ হটলেন না জায়গা থেকে। এক পৰ্যায়ে হানাদারদেৱ মৰ্টাৰেৰ আঘাতে শহীদ হন বাংলাৰ প্ৰথম বীৰশ্ৰেষ্ঠ। সত্যি এৱাই বাংলা মায়েৰ বীৰ সন্তান, এদেৱ রঞ্জেই মুক্ত এদেশ।

২১ এপ্রিল '৭১ পাকবাহিনীর একটি কোম্পানি বন্দুকভাঙ্গ নামক স্থানে লেং মাহফুজের দলের ওপর হামলা করে। সংঘর্ষে হালাদাররা পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্ষতি হয়নি। ২৩ এপ্রিল হালাদারদের প্রায় ২০০ সৈন্য রাঙামাটি থেকে

মহালছড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর এল। মহালছড়ি তখন মেজর শওকতের ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার। তিনি কিছু সৈন্য নিয়ে লেং মাহফুজ ও ক্যাপ্টেন কাদেরকে এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিলেন। ২৪ এপ্রিল কুতুবছড়িতে দুই দলে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হানাদাররা বেশ ক্ষয়ক্ষতি স্থীকার করে পালিয়ে যায়।

২৫ এপ্রিল খবর এল পাকবাহিনী চেঙ্গী নদী ও বানিয়ারচর বাজার হয়ে মহালচ্ছড়ি অভিমুখে এগিয়ে আসছে। ২৬ এপ্রিল মেজর শওকত অন্য অফিসারদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। তিনি লেং মাহফুজকে তার বাহিনী নিয়ে কিছুটা পিছিয়ে রিজার্ভ থাকার নির্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন জামান তার বাহিনী নিয়ে বানিয়ারচর বাজার বড় পাহাড়ের ওপর ডিফেন্স নিলেন। ক্যাপ্টেন কাদের গেলেন সড়কপথে হানাদারদের গতিরোধ করার জন্য। ২৭ এপ্রিল '৭১ ভোরবেলা হাবিলিদার তাহের, সিপাহী বাঁরী ও করপোরাল করিম ১০ জন লোক নিয়ে গেলেন রেকি করতে। তারা ভুল করে মিজোদের এলাকায় ঢুকে পড়েন। প্রসঙ্গত মিজো উপজাতিরা পাকবাহিনীর সঙ্গে আগেই হাত মিলিয়েছিল। সৌভাগ্যবশত মিজোরা তখন একটি হাতি মেরে খাওয়াতে ব্যস্ত ছিল, তাই রেকি পেট্টল পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

ওইদিন বেলা সাড়ে বারোটায় ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের অবস্থানের ওপর মিজোরা হামলা চালায়। তারা ছিল সংখ্যায় অনেক। এ সময় লেং মাহফুজ মাত্র ১০ জন সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন জামানের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। মাহফুজ ওখানে পৌঁছেই শত্রুদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন জামান গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় সঙ্গীদের নিয়ে পিছিয়ে আসেন অন্যথে। আর মাহফুজের দলের সঙ্গে আধশংস্তা গুলি বিনিময়ে নিহত হয় ১৫০ জন মিজো। কিন্তু তাতেও পিছু হটল না তারা। এগিয়ে আসতে থাকল চেউয়ের মতো। তারা ঘিরে ফেলল মাহফুজ ও তার বাহিনীকে। খবর পেয়ে উক্কারে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন কাদের ও ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান। নিরাপদে ফিরে আসে মুক্তিবাহিনী।

পাদটাকা : মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র বইতে তার শাহাদতের তারিখ লেখা আছে ৮ এপ্রিল। আর বাবা তার নাম লিখেছিলেন ল্যাসনায়েক মুস্তি আব্দুর রব। সঠিক তথ্যটা কেউ জানালে উপকৃত হব।

২৭ এপ্রিল '৭১ দুপুর ৩টায় হানাদার বাহিনীর ১৩টি কোম্পানি সহযোগে প্রায় ১১০০ (এগারোশ) মিজো মহালছড়ি হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে। পাকবাহিনী ৬টি মর্টার সহযোগে আক্রমণ শুরু

করে। মেজর শওকত ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন কাদের ও ফারুককে এলাকা ভাগ করে দিয়ে নিজে হেডকোর্টার রক্ষার দায়িত্ব নিলেন। মুক্তিবাহিনী ভারী অস্ত্রের অভাব খুব বোধ করছিল। শত্রুর মোকাবেলায় তাদের হাতে ছিল হিন্টার্টি রাইফেল ও এলএমজি। ক্যাপ্টেন কাদের তার এলাকায় যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হন। গুলি বৃষ্টির মধ্যেই শওকত, ফারুক ও সিপাহী ডাইভার আবাস ক্যাপ্টেন কাদেরের মৃতদেহ গাড়িতে করে রামগড় ফিরে এলেন। মুক্তিবাহিনী সদ্যা পর্যন্ত পাল্টা আক্রমণ অব্যাহত রেখে রাতের অন্ধকারে মহালছড়ি ত্যাগ করে। তারা ডিফেন্স নেন খাগড়াছড়িতে।

২৮ এপ্রিল ওয়ারলেন্সে মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হয় মেজর শওকতের। ওইদিন হানাদারদের একটি দল গুইমারা হয়ে রামগড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মেজর শওকত গুইমারাতে তার বাহিনী নিয়ে ডিফেন্স নিলেন। তখন তার সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৪৫০ জন। শওকত মানিকছড়ির মগরাজার সঙ্গে দেখা করলেন। রাজা মুক্তিবাহিনীদের সহযোগিতার অঙ্গীকার করলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ৯ মাস মগ উপজাতি সর্বতোভাবে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করেছে। রাজা ত্রিদিব রায়ের বিরোধিতার জন্য চাকমারা মুক্তিবাহিনীর বিপক্ষ নেয়। আর মিজোরা তো আগেই হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

২৯ এপ্রিল মেজর শওকত তার বাহিনী নিয়ে মেজর জিয়ার পরামর্শমতো রামগড় পৌছান রাত দুটোর দিকে। ৩০ এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এমজি ওসমানী রামগড় আসেন। তিনি মেজর শওকতকে আরো দুদিন রামগড় মুক্ত রাখার নির্দেশ দেন যাতে নিরাহী জনসাধারণসহ সবাই নিরাপদে ভারতে আশ্রয় নিতে পারে।

২৯ এপ্রিল মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন ওয়ালিকে করেরহাট হিয়াকুলে পাঠালেন। পাকবাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য মেজর শওকত ৩০ এপ্রিল ক্যাপ্টেন খালেকুজামান, সুবেদার মোতালেব ও লেং মাহফুজকে হিয়াকুলে ওয়ালির সঙ্গে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে হানাদারদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। পাকবাহিনীর একটি ব্রিগেড তিনদিক থেকে রামগড় আক্রমণ করে। মেজর শওকত কর্ণেল ওসমানীর নির্দেশমতো দুইদিন রামগড় মত্ত রেখেছিলেন।

২মে রামগড় মুক্তিবাহিনীর হাতছাড়া হয়। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টায় মেজর শওকত তার বাহিনী নিয়ে ভারতের সাবরংমে চলে যান।

# নির্মম ধর্মসংবলের শিকার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার : রেবা রাণী রায়

## শওকত হোসেন মাসুম

মুক্তিযুদ্ধে কত মানুষ মারা গেছে তা নিয়ে অহেতুক জটিলতা এখনও তৈরি করা হচ্ছে। নানা জরিপের কথা বলা হচ্ছে। যারা এসব নিয়ে কথা বলেন তাদের বলছি, আপনারা সেই সব পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন যাদের ঘর-বাড়ি পুড়েছে, যারা হারিয়েছেন অসংখ্য স্বজন। এক একটি পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানলেই বেঁোবা যায় কী ভয়াবহ পরিণতি দেখা দিয়েছিল তাদের জন্য।

এরকম একটি সাক্ষাৎকার এখনে আসুন আমরা পড়ি। এর সূত্র হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ও প্রেফাইল অব বেঙ্গল।

নাম	রেবা রাণী রায়
পিতা	রমেশচন্দ্র মিশ্রী (১৯৭১ সালে পাক বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে নিহত)
ঠিকানা	বেতড়া, ডাক : বেতড়া, ইউনিয়ন : নওগাম বালকার্থি, জেলা : বালকার্থি (১৯৭১ সালে বরিশাল জেলার অন্তর্গত মহকুমা)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বি. এস.সি.
১৯৭১ সালে বয়স	১৯/২০
১৯৭১ সালে পেশা	ছাত্রী
বর্তমান পেশা	চাকরি

**প্রশ্ন :** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে আপনি কি শুনেছিলেন বা কখন কিভাবে সে খবর শুনেছিলেন? তখন আপনি কি করলেন?

**উত্তর :** পাকিস্তানিরা যখন হামলা করে তখন বাগেরহাট পি.সি. কলেজে আমি অধ্যয়নরত ছিলাম। আমি কলেজের গার্লস হোস্টেলে থাকতাম। সেখানে বসেই শুনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়ে এবং সাধারণ লোকজন নাকি দলে দলে গ্রামের দিকে চলে আসছে। তাদের কারো কারো মুখেই পাকিস্তানি হামলার খবর শুনেছি। এই সব খবর তো তখন বাতাসে বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়াইতো। এই হামলার পরই আমাদের এখনে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। তখন আমি আর বাগেরহাটে থাকা

নিরাপদ মনে করি নাই এবং এটা আমার ধারণা ছিলো যে, এটা সহজে মিটিবে না; ঘটনা আরো অনেক দূরে যাবে। আমরা তখন বাগেরহাট থেকে নিজ গ্রামে চলে আসাই নিরাপদ মনে করলাম। আমরা রওয়ানা দিলাম বাগেরহাট থেকে। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাগেরহাট থেকে কখনো ভ্যানে, কখনো রিঙায়, আবার কখনো পায়ে হেঁটে আমার কয়েকজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে হুলারহাট পৌঁছলাম। আসলে পিরোজপুর হয়ে হুলারহাট পৌঁছলাম। বাস তখন চলছিলো না। এপ্রিল মাসের সাত-আট বান্য তারিখের দিকে হবে সেটা। তারপর হুলারহাট থেকে উল্লিখনপক্ষার্থীর দিকে একটা টেলারে চেপে বসলাম। সেখান থেকে পরের দিন আমার এক আত্মীয় ছিলো সোহাগদলে, সেখানে এক রাত্রি থেকে পর দিন খোন থেকে হেঁটে আমাদের গ্রামের বাড়ি বেত্তাতে পৌঁছাই।

**প্রশ্ন :** ১৯৭১ সালে আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

**উত্তর :** ১৯৭১ সালে আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম আমাদের বাড়ির কাছাকাছি হাট, বাওকার্থি হাটে। সময়টা সম্ভবত এপ্রিলের তৃতীয় কিং চতুর্থ সপ্তাহে হবে। বাওকার্থি হাট বৃহস্পতি এবং বাবিবারে বসে, সপ্তাহে দুই দিন। কোনো এক হাটবারে মিলিটারি যায় ওখানে। মিলিটারিরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাটের বেশ কিছু লোককে গুলি করে মেরে ফেলে। কাছাকাছি গ্রামেরও কিছু লোক মারা যায়। পরবর্তীতে মিলিটারি আতঙ্ক গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে ভীষণ ভাবে। ওখান থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরে আমাদের বাড়ি। আমরা পরের দিন ভোর রাতেই কিছু রান্না করা খাবার নিয়ে শাখা গ্রামের পানিখেত নামক জায়গায় আশ্রয় নিই। সে দিনই সন্ধিয়া আবার বাড়ি ফিরে আসি। সেদিন বাড়ি ফিরে শুনতে পেলাম যে, গ্রামের অনেক ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিছে এবং অনেক লোকজন মারা গেছে। পরের দিন আমরা আবার শেষ রাত্রে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে বের হয়ে যাই। এবার আমরা জগদীশপুর পেয়ারা বাগানে আশ্রয় নেই। সেখানে পাঁচ সাত দিন থাকার পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। আমাদের গ্রামেরই বেশ বড় পরিবার মহীন্দ্রলাল বাবৈ, তার বাড়ি পোড়াই দেয়। তিনি ছিলেন খুব ধনী ব্যক্তি। ওনার বাড়ি এবং আরও

অনেকের বাড়ি পোড়ায় দেয়। আবার অনেক লোককে, আমার আজকে সবার নাম মনে নাই তাদেরকে, মেরে ফেলছিলো। এরপর আমরা আর ওখানে মানে নিজ এলাকায় যাওয়া নিরাপদ মনে করলাম না। তখন আমরা শতদশকাটির আরো অনেকটা গভীর এলাকায় গিয়া টিন দিয়া নৌকার ছই-এর মতো একটা মাচা তৈরি করিছি। সেখানে থাকতে লাগলাম। এখানে শুধু আমরা না, হাজার হাজার লোক এই জায়গায় থাকতে শুরু করলো। এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধারাও ওখানে আশ্রয় নিল। আমরা এভাবেই দিন কাটিতে থাকলাম। পরবর্তীতে খবর আসলো যে, এই পেয়ারা বাগান কাটা হবে। কিন্তু আমার কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। কারণ মাইলের পর মাইল পেয়ারা বাগান কাটা কি সহজ কাজ! আর পেয়ারা বাগান মানে তো একটা খাল। এটাকে গ্রামের ভাষায় বলে কান্দি, উচু অংশটারে। নিচটারে বলে পাইকা। সেই পাইকা ভর্তি জল। তখন তো জ্যেষ্ঠ-আষাঢ় মাস আইসা গেছে। সব তো জলে ভর্তি। এমন সময় মিলিটারিরা যে আইসা গাছ কাটবে এইটা আমার ধারণায় ছিলো না। আমি বললাম যে, মিলিটারিরা কেমনভাবে এতো গাছ কাটবে পানির মধ্যে? আশংকা সন্ত্রেণে এই জায়গাটেই থাকতে লাগলাম। রান্না, খাওয়া সবকিছুই এই জায়গায়। মোটামুটি মূল্যবান জিনিসপত্র বাড়ি থেকে নিয়া এই জায়গায় আমরা জমা করছিলাম নিরাপদ ভেবে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২২ আষাঢ় একটা খবর আসলো যে পেয়ারা বাগান কালকে কাটা হবে। ভাবলাম পেয়ারা বাগান কাটা হলে আমাদের আর কোথাও যাওয়ার পথ থাকবে না।

পরের দিন সকাল দশটা কি এগারোটা বাজে, এই সময় মনে হইলো যে, হাজার হাজার লোক পেয়ারা বাগানের চারদিকটা ঘিরে ফেলছে। তখন তাদের শোগান ছিলো 'নারায়ে তকবীর আজ্ঞাহু আকবর,' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। সমস্ত পেয়ারা বাগান প্রকল্পিত হইতেছিলো তাদের সেই শোগানে। পরে লোক মুখে শুনছি যে, ত্রিশ চাহিশ হাজার লোক আসছে পেয়ারা বাগান কাটতে। এরমধ্যে আমাদের এক বোন এবং ভগীপতি আমাদের ওখানে আসে। আইসা আমার নাম ধরে ডেকে বলে যে, 'রেবা, তুই এখান থেকে পালা, চল শিগগির, পালা, আমার বাবা তখন ওখানে ছিলেন। আমি বাবারে বলি যে, বাবা আপনি যান। আমার সেই বোন এবং ভগীপতি একটা গৌকা নিয়ে আসছিলো। ওরা

নৌকায় আমারে খুব টানাটানি শুরু করলো যে, তুই শিগগির আয়। তখন আমি বড়। কাজেই আমায় নিয়ে বেশ চিন্তা। আর এদিকে আমার চিন্তা বাবারে নিয়া। আমি বললাম, বাবা তুমি যাও, তুমি যাও। এই দুই জনের ঠেলাঠেলি যখন চলছে তখন এই শব্দ ক্রমশ কাছে আসতে লাগলো। শব্দ, লোকজনের কোলাহল এতো জোরে হইতেছিলো যে মনে হইছে আমাদের মৃত্যু খুবই কাছাকাছি। মৃত্যু ভয়ে তখন কে যে কোথায় গেলাম তা বলা যুক্তি। আমি লাফ দিয়ে নৌকায় পড়ছি এইটা মনে আছে। কিন্তু কতদূর যাওয়ার পরে নৌকাটা যেন আর চলছিলো না। পেয়ারা বাগানের জল এপাশে আর ওপাশে ধাক্কা দিছিলো। ওদিকে এই যমদূতেরা মানে যারা পেয়ারা বাগান আক্রমণ করছে তারা যেন খুব কাছে আসছে মনে হইলো। তখন নৌকা থেকে আমরা সবাই লাফ দিয়ে পড়লাম। নৌকাটা কোথায় গেলো তার কোনো খবর নাই। আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে কোনদিকে যে গেলাম তাও ঠিক মনে নাই। অনেক দূরেই গেছি। কিন্তু এর মধ্যে মনে হইলো যে, আরো কাছাকাছি আইসা গেছে শত্রু। বোন-ভুন্ধাপতির খবর নাই। আমার উপস্থিত বুদ্ধিতে আমি তখন এই বাগানের ভিতরে যে খালগুলো তাতে লম্বা লম্বা কচুরিপানাতে একদম ঠাসা ছিলো, আমি খালের গা বাইয়া নিচে নামলাম। নিচে নাইমা ডুব দিয়া প্রেখান থেকে পনের বিশ হাত দূরে গিয়া কচুরিপানা একটু সরাইয়া নাক বের করিয়া ডুব দিয়া থাকলাম। ইতমধ্যে এসব লোক আইসা গেছে সমস্ত বাগানে।

আমি কিছুটা সময় থাকার পরেই টের পাইলাম যে, পেয়ারা ডালে পা দিয়া তারা খুব নাড়ছে। পা দিয়া তৌরের দিকে ধাক্কা দিছে আর বলে পাইছি, পাইছি, পাইছি-এইতো আছে, এইতো আছে। কিন্তু আমি সচেতন ছিলাম যে, যতক্ষণ তারা আমারে না জল থেকে টেনে তুলবে ততক্ষণ আমি উঠবো না। আমার মোটেই নড়ন ঢড়ন নাই। এইভাবেই আছি। কিছুক্ষণ পরে গলার ভিতরে পচা জল আর ময়লা জমে গেলো। টের পাইছিলাম যে, শামুক আমার পা চাটতে চাটতে দেহের উপরে উঠছে। জেঁকেও ধরছে। শামুকে আমার পা চাটতে চাটতে যে ময়লা তুলছিলো তাতে মনে হলো যে, পা টা আমার বুবি শেষ হয়ে যাবে। পায়ে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করছিলাম। শামুকে চাটা কেমন যন্ত্রণা সেটা অনেকেই বোধহয় জানেন না। অসহ্য যন্ত্রণা। আমার জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা। এ দিকে দফায় দফায় লোক আসছে, মাথার উপরে, কচুরির উপরে বোধকরি লেজা টেজা বা লম্বা লাঠি দিয়া পিটাইতেছিলো। এইটা একটা তাদের চালাকি ছিলো। আমি আর নড়িচড়ি নাই। প্রচন্ড হাঁচি আসা সন্ত্রেও হাঁচি দিতেছিলাম না। কারণ হাঁচি দিলেই তো ওরা টের পেয়ে যাবে আমি কোথায়। কিন্তু নাকের ভিতরে জল ছিলো। অতো পচা জল নাকের ভিতর,

গলার ভিতর সে এক করুণ দশা। এরপরে যখন বেলা পাঁচটা বাজে বোধহয়, ঘড়ি টড়ি তো ছিলো না; পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বাজে মনে হয়-তখন আর কোনো শব্দ টের পাইলাম না। আমি তখন আস্তে আস্তে কচুরির ভিতর থেকে বার হয়ে এপারে এসে কাদার মধ্যে একটু হেলান দিয়া দাঁড়াইলাম। তখন দেখি যে, দুই একটা লোক যারা মৃত্যু ভয়ে পলাইছিলো, তারা আসছে। তাদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করলাম আমরা যেখানে মাচা করেছিলাম সেই মাচার স্থান এবং লোকশন সম্বন্ধে। ওরা আমারে চিনলো কেউ কেউ। বললো, সোজা যাও। আমি খাল বিল কাদার ভিতর দিয়া সেই এলাকায় আসছি। কিন্তু আমার মনে হইতেছিলো কি একটা হারাইছি, কি একটা হারাইছি। আমাদের সেই বাসার কাছে আইসা দেখি যে, সব তচনছ, স্থানীয় লোকজনের মুখে এই রকম শুনলাম যে, এইটা মুক্তিযোদ্ধাদের বাসা এই কইয়া সব মালপত্র নিয়া গেছে। আর যা যা না নিতে পারছে, সেইগুলা ভাইঙ্গাইরা তচনছ করিয়া রাইখা গেছে। আমার সেদিকে অবশ্য ভুক্ষেপ নাই। আমি শুধু ভাবছিলাম যে, আমরা সবাই জীবিত আছি কিনা। আমার ভাই তখন ক্লাস-টু-এর ছাত্র। হয়তো ছয় সাত বছর বয়স। ওরে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, বাবা কোথায়? ও আমার কথা শুনেই কেঁদে ফেললো। বললো যে, দিদি, বাবারে ধরে নিয়ে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে নিয়ে গেছে? তখন সে বললো যে, বাবা আমার মতো কচুরির ভিতর পালাইছিলো না। একটা বাগানের ভিতর নলখেত ছিলো, সেই নলখেতের ভিতরে বাবা ছিলো। আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম বাবাকে সেখান থেকে কিভাবে ধরিয়া নিলো। ভাই বলছে, তার কয়েকজন ছাত্রেই তাকে ধরছে। আমার ভাই নাকি কথোপকথনটা শুনছে কাছ থেকেই, ওরা হয়তো খেয়াল করে নাই। বাবা নাকি বলছে যে, তোদের আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করছি; তোরা এখন আমাকে ধইরা নিবি। আমার কাছে টাকা আছে, স্বর্গ অলংকার আছে, তোরা এইগুলি নিয়া নে। তখন তারা বলে যে, শুয়োরের বাচ্চা, কুতুর বাচ্চা যখন মানুষ করছো তখন করছো, এখন আর কি। তোর টাকা পয়সা আমরা চাই না। এই বইলা তারা আমার বাবাকে একটা গামছা দিয়া পিঠে হাত নিয়া বাইন্দা তাকে নিয়া চইলা গেলো।

**প্রশ্ন :** আপনি বলছিলেন যে, ওরা আপনার বাবার ছাত্র, ওদের নামগুলো কি আপনার মনে পড়ছে?

**উত্তর :** রুক্তল আমীন কইরা এক ছাত্র। অনেক দিন আগের কথা তো আমি অনেক নাম এখন ভুলে গেছি। যাহোক, আমি তো তখন কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েছি। আমার ফ্যামিলির একমাত্র

উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন আমার বাবা। বাবা আমার জীবনের আদর্শও। মা তখন কাঁদতে কাঁদতে আমার ছেট দুই বোনকে নিয়া বাহানের ভিতরে আসে। তিনি তখন গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। আমরা বাসা করে থাকতাম। সেখানে আমি, বাবা এবং মেজবোন থাকতাম। মেজবোন তখন এস. এস. সি-র ক্যানভিডেট ছিলো। আমার ভাইটি, ক্লাস টু-এ পড়তো। আমরা পর পর তিনি বোন তারপর এই ভাই। মা বাড়িতে ছেট বোন, সেজ বোন এবং ছেট ভাইকে নিয়ে থাকতো। দূর থেকেই দেখলাম যে, মা কাঁদতে কাঁদতে আসছে এবং বলছে, মনু, তোর বাবা, মনু তোর বাবা। বাবাকে ধরে নেওয়ার খবরটা ছড়াই গেছিলো ভীষণভাবে। আমার বাবাকে এই এলাকায় সবাই চিনতো। তিনি বাওকাঠি স্কুলের ঢিচার ছিলেন। মা এসে বললেন যে, তিনি ও আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারে নাকি মিলিটারিয়া অনেক পিটাইছে, হাত ফুটিলো গেছে। দেখলাম তাঁর শরীরও ফেললা। আমার ছেট বোনের তখন বছর দেড়েক বয়স। ওরে বুট পায়ে বলের মতো শট দিছে আর্মি। সে অন্য জায়গায় গিয়া পড়ছে। আবার দিছে। মা যখন চিক্কার করছে তখন মারে ধইরা পিটাইছে। আমার ছেট বোন তখন অজ্ঞান হইয়া গেছে। অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় ওরা মনে করছে ও মারা গেছে। আমার মা-ও মনে করছে মারা গেছে। ওরা বোনকে রাইখ্যা গেছে। কিন্তু কিছু সেবায়ত্বের পরে বোনটার আবার জ্ঞান ফিরে আসে। সে অবশ্য এখন জীবিত আছে।

ঐ দিন আমাদের গ্রামের বহু লোককে মাইরা ফালায়। অনেক শিশুও মারা গেছে। সেই দিনই আমার এক মামা বীরেন্দ্রনাথ ঘরায় এবং আমার এক মেসো কার্তিকচন্দ্র বেপারি তাদেরও হত্যা করে। কার্তিকচন্দ্র বেপারি হাল চাষ করছিলো মাঠে। সেই মাঠেই তাকে গুলি করছে। আমাদের গ্রামের এবং বাগান থেকে বোধ করি ধইরা নিয়া গেছে শতাধিক লোককে। সেদিন ওদেরকে বাওকাঠিতে যে একটা ক্যাম্প করছিলো, সেখানে রাখছিলো। তুরা আষাঢ় এটা ছিলো। ৪ঠা আষাঢ়ও রাখছে। ৫ঠে আষাঢ় খুব তোরে নবগ্রাম যে একটা পাকা পুল আছে সেই জায়গায় নিয়া চাবিশ জন না ছাবিশ জনকে এক জায়গায় লাইন করাইয়া গুলি করছে। আর পথে ঘাটে কিছু তো মারছে যাদের পাইছে। পরের দিনও ঐ পেয়ারা বাগানের গাছ কাটা অব্যাহত থাকলো। পরে লোকমুখে শুনছি যে, গ্রিশ চঁলিশ জাজার লোকই নাকি এটা করছে। ঝালকাঠি থানা, নলছিটি থানা, স্বরূপকাঠি থানা এদের মধ্যে সবাই যে রাজাকার তা নয়। জোর করে নিয়া গেছে প্রত্যেকে বাড়ি থেকে। বানারীপাড়া থানার লোকজনকেও জোরপূর্বক ধরে নিয়া গেছে। প্রতি বাড়ি থেকেই যুবক বা পুরুষদের আসতে হবে। এটা করা হয়েছিলো বাধ্যতামূলক। না হইলে তাদের আবার

জীবনাশঙ্কা । তাদের জোর করিয়া নিয়া আসতো লখে লখে, টেলারে টেলারে । তাদের দিয়া ঐ পেয়ারা বাগানগুলি কাটা হইতো । ঐ জায়গার গ্রামগুলো নিশ্চিহ্ন করার কারণ ছিলো মূলত আমাদের পঁচিশ ছাবিশটা গ্রাম ছিলো হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা । হিন্দুরা এবং মুক্তিবাহিনী ঐ সব জয়গায় আশ্রয় নিছিলো । এমন কি বালকাঠি, বরিশালের অনেক ব্যবসায়ী হিন্দুও ঐখনে আশ্রয় নিছিলো । তারা ভাবছিলো যে, পেয়ারা বাগানে পাক আর্মি, রাজকারনা আসবে না । এইজন্য ঐ সব জয়গায় অনেক লোক ছিলো । হাজারে হাজারে লোক ছিলো । পরের দিনও গাছ কাটা অব্যাহত থাকলো । প্রতি দিনই এগারোটার দিক থেকে বাগানটাকে ঘিরে ফেলতো । আমরা মৃত্যু ভয়ে দৌড়াইতাম । ভিজা কাপড় । আর তো কোনো কাপড় জামা ছিলো না, খাবার ছিলো না । যখন এইভাবে আক্রমণ করতো তখন আমাদের মাইলের পর মাইল দৌড়াইতে হইতো । কিছু কিছু ধান খেতও ছিলো । তখন ক্রলিং-এর মতো করে বুকে মাটি টাইয়া মৃত্যুর ভয়েতে যাওয়া লাগতো । ভিতরে অনেকগুলি খাল ছিলো ঐ বাগান এলাকায় । স্থোত খুব । বাবারে মাইরে ফালাইছে । এখন ভাইকে তো বাঁচাইতে হবে । ওকে এক হাতে নিয়া আর এক হাত দিয়ে সাঁতরে পার হয়ে যাইতাম । তখন দেখছি যে সবাই এক মৃত্যু ভয়ে ভীত সবাই । সবাই এক সাথে দৌড়াইতাম । এক সাথে ডুবাইতাম । এইভাবে চার পাঁচ দিন চললো ।

প্রশ্ন : কত তারিখ ?

উত্তর : এটা হবে ৮ আষাঢ় সন্ধিবত । আটই আষাঢ় রাতে সমস্ত বাগান বিরান এলাকাতে পরিণত হয় । অর্থাৎ গাছপালা কাইট্যা ফালাইছে সব । এখানে ওখানে শুধু লাশ । আর লোকজন যাদের গার্জিয়ান ছিলো তারা তো সব ওখান থেকে চইলা গেলো । কেউ ইভিয়া চইলা গেলো । কিন্তু আমাদের তো গার্জিয়ান ছিলো না । আমাদের যাওয়া আর কোথাও হইলো না । আমরা রোজ এইভাবে দৌড়াইয়া পালাইয়া কচুরির ভিতরে লুকাইয়া থাকতে লাগলাম । একদিন রাত এগারোটার দিকে আমরা প্রাণপণে কয় ভাই-বোন এবং মা মিলে একটা নৌকা উদ্ধারের চেষ্টা করলাম । এইজন্য যে, নৌকা করে আমরা এখান থেকে কোথাও বের হয়ে যাইতে পারি কিনা । যদিও নৌকা চালাইবার মতো কেউ ছিলো না, তবুও বাঁচার প্রচন্ড চেষ্টা । পথে যতো গাছ কাইট্যা ফেলছে সে সব সরাইয়া সরাইয়া কোনোভাবে একটা খাল পরিষ্কার করি যাতে বাইরে বের হইতে পারি । খাল যখন পরিষ্কার করি এই সময় শুনি অনেক দূর থেকে আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে । তখন বুঝতে পারলাম যে, কোনো আত্মীয় স্বজন হয়তো আমাদের উদ্ধার করার

জন্য ওখানে আসছে । আমরা সবাই মিলে প্রাণপণে সাড়া দিলাম যে, আমরা এইখানে । যতো জোরে পারি ততো জোরে সবাই মিলে চিৎকার করার পরে উনারা আস্তে আস্তে আমাদের কাছে আসছে । দেখলাম মায়ের এক কাকাতো ভাই । আমার মামা তিনি কয়েকজন সঙ্গী নিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য আসছেন । তিনি আমাদের ঐ নৌকাটাতে তুললেন । তারপর মামা উনাদের নিয়া গাছের গুড়গুলা সরাইয়া টুরাইয়া একটা খাল পরিষ্কার করলেন । তারপর আমাদের সবাইকে নৌকায় নিয়া লোকালয়ে নিয়া রাখিয়া আসলো । আর আমারে নিয়া ঐ রাত্রেই ওখান থেকে নবগ্রাম পর্যন্ত গেলো । মাঝখানে দুইটা বড় খাল । তখন তো খাল বেশ বড় ছিলো । সেই খাল সাঁতরাইয়া আমরা নবগ্রামের এক বাড়িতে গিয়া আশ্রয় নিলাম ।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন যে, অনেক লোক পেয়ারা বাগান কেটে ফেলছিলো । এই পেয়ারা বাগান কেটে ফেলার জন্য যে লোকজন এসেছিলো ওদের নেতৃত্বে কে বা কারা ছিলো ?

উত্তর : আমরা শুনেছিলাম যে, আখতার ব্যারিস্টার, মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচনে দাঁড়াইছিলেন । তিনি হাইরা গেছেন । এই হাইরাটা তাঁকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলে । নেছারাবাদের হজুর তিনিও বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এইটা চাইছিলো না । এই দু'জনার নেতৃত্বেই পেয়ারা বাগান কাটা হয় বলে শুনছি । হাজার হাজার লোককে জোরপূর্বক, বলপূর্বক বিভিন্ন থানা থেকে ধরে নিয়ে আসা হয় ।

প্রশ্ন : আপনার কথায় আপনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন 'পাইছি', 'পাইছি' বলে । এই শব্দটি কারা করতো এবং কেন করতো, কাদের খুঁজতো ?

উত্তর : আমাদের লুকানোর বিষয়টি সবাই জেনে গেছিলো । আমি বলেছি, এটা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা । হিন্দু মেয়ে, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ সবাই জলের কচুরির ভিতরে পলাইছিলো । ওরা পাইছি, পাইছি বললে যাতে মানুষ বিভাস্ত হয় এবং খালের কচুরির ভিতর থেকে বাইর হইয়া আসে । মানুষজনকে বিভাস্ত করার জন্যই ওরা এই 'পাইছি', 'পাইছি' শব্দগুলি ব্যবহার করতো । পরে শুনছি যে, এই শব্দে অনেকে বের হইয়া আসছে । খাল ছাইড়া উঠেছে । তখন তারে ধইরা নিছে । কিন্তু আমি সচেতন ছিলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমারে চুলের শুষ্ঠি ধইরা না উঠাইবে ততক্ষণ আমি উঠবো না । এই জন্য ঐ শব্দে আমারে বিভাস্ত করতে পারে নাই । পরবর্তীতে শুনছিলাম যে, আমার নাম ধরিয়াও নাকি কোনো কোনো এলাকায়

কেউ কেউ ডাকাডাকি করছিলো । মোটামুটি আমাকে চিনতো সবাই । ঐ এলাকায় গ্রামের মধ্যে তখন লেখাপড়া করা মেয়ের সংখ্যা কম ছিলো । আমি তখন কলেজে পড়ি, বাগেরহাট পি.সি. কলেজে । আমি ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে । সুতরাং কারো কারো দৃষ্টিতে একটু খারাপই লাগতো ।

প্রশ্ন : আপনারা ঐ সময় কিভাবে জীবন ধারণ করেছিলেন ?

উত্তর : জীবন বাঁচানোর জন্য পোড়া চাল সংগ্রহ করে নিয়ে বিলের মধ্যে এক বাড়িতে রাখা হতো । সেই পোড়া চালের ভাত যে কি বিস্বাদ তা আজ মনে করতেও কষ্ট হয় । অথচ প্রাণে বাঁচতে এটাই খাইতে হইতো । সেই সঙ্গে পানিকুচু, শাপলা অর্থাৎ বিলের মধ্যে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে রাখা হতো । তখন বাইরের বাজারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিলো না । লবণের অভাব ছিলো প্রচ । লবণ ছাড়াই আমাদের সেই অর্ধেক পোড়া আর অর্ধেক ভাল চাউলের ভাত আর শাপলা সিন্দ থেকে হতো । একদিন আমার মা কোথা থেকে একটা পুটুলিতে করে ভিজানো আতপ চাল নিয়ে আসলেন । সেই চাল দুই দিন পর্যন্ত বোধহয় পানির নিচে ছিলো । ফলে, গঞ্জ ছিলো প্রচ । সেই চাল সিন্দ করেও খেয়েছি । আর দিনের বেলা পেয়ারা টেয়ারা খাইতাম । পেয়ারা ছাড়া আর কিছুই খাওয়ার ছিলো না তখন ।

প্রশ্ন : আপনার এলাকায় কোনো বাড়িস্বর পুড়ানো বা লুটপাট হয়েছিলো কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, সব বাড়ি পুড়ানো হইছে । সব বাড়ি লুটপাট হইছে । সব বাড়িরই দুই চার জন করে লোক মারা গেছে, ধইরা নিয়া গেছে অথবা গুলি করে বা বেয়েন্টে চার্জ করে মারছে । আছড়িয়েও মারা হইছে অনেকেরে ।

প্রশ্ন : আপনার এলাকায় এই যে, বাড়িস্বরগুলো লুট এবং পুড়ানো হইছে, প্রথম কি লুট হইছে না প্রথমে পুড়ানো হয়েছে ?

উত্তর : প্রথমে লুট এবং সঙ্গে সঙ্গে পুড়ানো পাশাপাশি চলছে । আগে লুট কইরা মালামাল নিয়া পরে আগুন দিয়া দিছে । আমাদের গ্রামে একটা বা দুইটা ঘর থাকতে পারে, সেই সময় আর কোনো বাড়ি অক্ষত ছিলো না । সব বাড়ি পুড়াই দিছিলো ।

প্রশ্ন : আপনাদের পেয়ারা বাগান এলাকায় কতোটি গ্রাম বা

কতোটি ঘর বাড়ি ছিলো?

উত্তর : মোট খানে ২৬টি হিন্দু গ্রাম। কিন্তু পেয়ারা বাগান এলাকায় পনের বিশটি গ্রাম হবে। এর মধ্যে প্রচুর বাড়ি। আমি সঠিক সংখ্যা বলতে পারবো না। কোনো কোনো বাড়ির ত্রিশ পাঁয়াত্রিশটি ঘর ছিলো।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন যে, আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনী ছিলো। এরা মূলত এখানে কি করতো?

উত্তর : এরা আশ্রয় নিছিলো। ওরাও বোধহয় প্রথমে এই ধারণা করছিলো যে, এতবড় বাগান, এখানে কেউ হয়তো আক্রমণ করতে পারবে না। ওরা এখানে প্রশিক্ষণ নিতো এবং মানুষকে মিটিভেট করতো। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের মন যেন খারাপ না হয়, সাহস রাখে এ জন্য তারা সাহস জোগাইতো।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে, আপনার এলাকার অনেক লোককে এই দিন হত্যা করেছিলো। এই যে লোকজন নিহত হয়েছিলো বা শহীদ হয়েছিলো-এদের লাশগুলো কি অবস্থায় ছিলো বা এদের লাশগুলো পরে কি করা হয়েছিলো?

উত্তর : এদের লাশগুলির অধিকাংশই খালে ভাসায় দেওয়া হইছে। আর কিছু নদীতে, মাঠে, জলাভূমিতে, স্কুলের পিছনে পড়ে ছিলো। দুটা স্কুল ছিলো, যেখানে ছিলো বধ্যভূমি। একটা হইছে জগদীশপুর, এখন যেটা প্রাইমারি। এই সময় ওটা আপগ্রেড ছিলো। আর শতদলকাঠি গার্লস স্কুল। এই দুটা স্কুলে মূলত বধ্যভূমি ছিলো। আর ওপাশেও ছিলো কিনা সেটা আমার আর চোখে পড়ে নাই। লাশগুলি স্কুলের পিছনে আর খালে ফেলে দিছে। স্কুলগুলির পিছনেই পড়া ছিলো বেশি লাশ।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন আপনার বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো আপনার বাবার লাশ কি পরে পেয়েছিলেন?

উত্তর : না, আমরা লাশ পাই নাই বা দেখতেও পাই নাই। কারণ তখন তো জীবন এবং সমানের ভয়ে আমরা ভীত। শুধু পালিয়ে বেড়েছি। তখন আমাদের শক্তি সাহস কোনো কিছুই ছিলো না। আমরা লাশ পাইনি। দেখি নাই। বাবা আমাকে বলেছিলেন যে, তুই নোকায় যা। আমি বলছিলাম, তুমি যাও। আমার সঙ্গে তাঁর সেই শেষ দেখা, শেষ কথা।

প্রশ্ন : আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

উত্তর : আমি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি নাই অর্থাৎ অন্ত হাতে ধরি নাই। তবে মানুষকে মিটিভেট করার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি আমি। মহিলাদের সাহস জোগাইছি। গ্রামের মহিলারা তো ভয় পাইয়া গেছিলো। তারা ভাবছে এইভাবে বোধহয় সবাইকে শেষ হইয়া যাইতে হইবে। তখন আমি তাদের সাম্মত্ব দিছি, সাহস দিছি। বলছি, এইভাবে চলতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, একদিন না একদিন দেশ স্বাধীন হবেই। এ কথা আমি মেয়েদের বলছি।

প্রশ্ন : আপনার এলাকা কখন পাকিস্তানিরা আক্রমণ করলো? কিভাবে আক্রমণ করলো?

উত্তর : সম্ভবত এপ্রিলের ত্রুটীয় কি চতুর্থ সপ্তাহে আক্রমণ করছে। প্রথম দিকে রাস্তাঘাটে মানুষ মেরে ফেলতো, গুলি করতো, লুট করতো। লুট অবশ্য স্থানীয়রাই করছে। পাক সেনারা বেশিরভাগ গুলি করছে। স্থানীয় রাজাকার, শাস্তি কমিটির লোকজন-এরাই মানুষকে লুট করার জন্য, ঘরে আগুন দেওয়ার জন্য বলতো। গরু বাঢ়ুরসহ সবকিছু লুট করে নিয়ে যাইতো তারা।

প্রশ্ন : আপনার এলাকায় কিভাবে পাক বাহিনী গিয়েছিলো?

উত্তর : তারা বোটেই গেছিলো। কারণ বালকাঠি থেকে বাওকাঠির যোগাযোগ তো খুব ভালো। তারা নিজেদের বোটে কইরা চইলা গেছে ওখানে। বাওকাঠি তো আমাদের গ্রামের কাছাকাছি।

প্রশ্ন : পাকিস্তানি বাহিনী আপনার এলাকায় আর কি করলো?

উত্তর : তারা রাজাকারের মাধ্যমে ঘর-বাড়ি লুট করছে। তারপরে লোকজন হত্যা করছে। আগুন দিয়া গ্রাম ছারখার কইরা দিছে। গাছপালা কাইটা ফালাইছে। আমাদের গ্রামে গাছপালা আর অবশিষ্ট ছিলো না। আর এই যে, পেয়ারা বাগান ছিলো, পেয়ারা বাগান তো মাইলের পর মাইল, সেই বাগান শেষ করছে।

প্রশ্ন : বিভিন্ন জায়গায় যে লাশগুলো পড়ে ছিলো, সেই লাশগুলো সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর : আমার একটা স্মৃতির কথা বলি। আমি যখন নবগ্রামে যাই তখন আমার এক আত্মীয় আমাকে তাদের দেশে নিয়ে

যাওয়ার জন্য আসছিলো। তার সঙ্গে আমরা কয় বোন মিললা তাদের বাড়িতে যাওয়ার পথে এ জগদীশপুর স্কুলের পাশ দিয়া যে রাস্তা সেখান দিয়া রওনা করছি। দেখি যে স্কুলের পিছনে অসংখ্য লাশ পড়ে আছে। চিল, শুগাল, শুকুন, কুকুর, কাক এই লাশগুলো খাইতেছিলো। আমি বিভিন্নের মতো দাঁড়াই পড়েছিলাম, মনে হইছিলো যে, বাবার লাশটা হয়তো ওখানে আছে। আমি তখন এই লাশগুলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে ছিলাম। কিন্তু লাশগুলি এমন বীভৎস যে, চেনা যায় না। আমি ঠিক চিনতে পারি নাই কাউকেই। কোনো লাশেরই সংকার হয় নাই। আর খালে তো অসংখ্য লাশ ছিলো।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারে আর কেউ শহীদ হয়েছে কি? হয়ে থাকলে তারা কিভাবে শহীদ হলো?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রথমে বলবো আমার বাবার কথা। আমার বাবাকে তো আঘাত পেয়ারা বাগান থেকে ধরে নিয়ে যায়। শুনেছি ৫ই আঘাত খুব ভোর রাত্রে তাঁকে এই বাওকাঠি খালের পাড়েই গুলি করে হত্যা করা হয়। ওনার সাথে আরো ছারিশজনকে হত্যা করা হয়। ওদের সঙ্গে আমার মামা ছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ ঘরামি। তিনি একটা ডোবা পুরুরে কচুরির মধ্যে পালানো ছিলেন। তাঁকে নাকি তারা পাইছে এবং ধরে নিয়ে গেছে। তাঁকেও একই দিনে গুলি করা হয়। আমার মেসোমশাই কার্তিকচন্দ বেপারি ওনারেও ধইরা নিয়া যাইয়া পরের দিন গুলি করছে। আর তা ছাড়া গ্রামে তো অনেক লোক মারছে। আমার স্মৃতিতে একটা ঘটনা আজও জাগরুক; সেটা এরকম: ছেলেটার নাম কার্তিক। পদবী বলতে পারবো না। ওর বাবা আমাদের গ্রামেরই। ও আমার ছাত্র ছিলো। ওরে আমি বাড়িতে পড়াইতাম। আমি '৭১ সালে আই.এসসি. পরীক্ষার পরে জগদীশপুর আপগ্রেড স্কুলে কিছুদিন বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছিলাম অনারারি। এখানে আমার ছাত্র ছিলো কার্তিক। সে তখন ক্লাস এইটে পড়তো। সে খুব উঁচু লম্বা ছিলো ক্লাস এইটের তুলনায়। ওর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিলো। কারণ ও জন্মাইবার আগেই ওর বাবাকে ডাকাতরা মাইরা ফালাইছিলো। ওর মা আমারে বেশ আদর যত্ন করতো। বিভিন্ন কারণেই ওর প্রতি আমার একটা সফট কর্মান্বয় ছিলো। ও আমার বাড়িতেও আসতো। ওরে আমি বাড়িতে অংকটিংক শিখাইছি, বিজ্ঞান পড়াইছি। যুদ্ধের পরে ওর মার অনেকটা মন্তিষ্ঠ বিকৃতি ঘটে। মহিলা আমার দাদুর নাম ধরে প্রায় বলতো যে, আমার খোকা অমুকের নাতির কাছে পড়তে গেছে, আমি যাই, আমি যাই। এই বইলা সে ছুইটা আসতো আমাদের বাড়িতে। সে প্রায়ই এরকম

করতো । কিছুতেই মানতো না, মাইন্যা নিতো না যে, তার ছেলেকে পাকিস্তানিয়া হত্যা করেছে ।

প্রশ্ন : আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয় এবং তখন মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে জনগণের মনোভাব কেমন ছিলো ?

উত্তর : জনগণের একান্ত কাছের মানুষ ছিলো মুক্তিবাহিনী । একান্ত আপনজন মুক্তিবাহিনীকে যতো প্রকারে সাহায্য করা দরকার, সেটা আমাদের এলাকার জনগণ করেছে । তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেছে । তাদের খাদ্য জোগাইছে, তাদের আশ্রয় দিয়েছে । আমাদের এলাকার মানুষ সর্বতোভাবে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং জনগণ তাদেরকেই অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীকেই আগর্কর্তা হিসাবে ভেবে নিয়েছিলো । পেয়ারা বাগানের মাঝে মাঝে একটা বাড়ি থাকতো । ঐসব বাড়িতে মূলত মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ছিলো এবং ওখানেই তারা টেনিং নিতো । দেখতাম তারা টেনিং নিচে । আমাদের এলাকার অনেক ছেলে মেয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো এবং টেনিং নিয়েছিলো । এই মুহূর্তে আমি তাদের নাম স্মরণ করতে পারছি না ।

প্রশ্ন : আপনার এলাকায় যে সব ঘটনা ঘটেছিলো, সেখানে মেয়েদের উপরে কোনো অমানবিক বা পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছিলো কি ?

উত্তর : আমি তো সে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারি নাই । তবে আমি শুনেছি । আমাদের এলাকাটা তো মোটামুটি শিক্ষিত এলাকা । সব বাড়ির মেয়েরাই লেখাপড়া শিখতো । কলেজে পড়তো । ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় পড়াশুনা করতো । পরে শুনেছি যে, কোনো কোনো বাড়ির মেয়েদের নাকি ধরে নিয়ে গেছিলো মিলিটারিয়া ।

প্রশ্ন : আপনার গ্রাম বা এলাকায় কোরা রাজাকার ছিলো, শাস্তি কর্মিতে কারা ছিন্নেতারা এখন কোথায় ?

উত্তর : বেতড়া প্রাইমারি স্কুলের তৎকালীন হেডটিচার শাস্তি কর্মিতে ছিলো । তারপর বাওকাঠি হাইস্কুলের দুই একজন চিচারও ছিলো । তাদের নাম আমি ঠিক বলতে পারবো না । বাওকাঠি স্কুলের এক চিচারের ছেলে রাজাকারের হেড ছিলো । বাওকাঠিতে রাজাকারের যে একটা ক্যাম্প করেছিলো সেই ক্যাম্পের হেড ছিলো সে ।

প্রশ্ন : আপনি যাদের কথা বললেন, এরা এখন কি অবস্থায় আছে বা কোথায় আছে ?

উত্তর : এখন দেশেই আছে । ওরা স্বাধীনতার পর একটু আত্মগোপন করেছিলো । গ্রামে ছিলো না । কিন্তু এখন তারা আবার গ্রামেই বহাল তবিয়তে আছে ।

প্রশ্ন : আপনার গ্রামে বা এলাকায় আল-বদর আল-শামস কারা ছিলো ? তারা এখন কোথায় ?

উত্তর : আমাদের গ্রাম তো হিন্দু অধূষিত । আমাদের গ্রামের কেউ এ সব বাহিনীতে ছিলো না । আমাদের পাশাপাশি কালিকান্দা, বাওকাঠি এ সব এলাকায় ছিলো । তারপর নবগ্রাম, শিমুলিয়া এসব এলাকার লোকজনও ছিলো ।

প্রশ্ন : যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে কি অবস্থা দেখলেন ? আপনার গ্রামের বা এলাকার স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, বিজ ও বাড়িয়ের অবস্থা ?

উত্তর : আমি তো আগেই বলেছি যে, আমাদের ওখানে অনেকগুলো গ্রামেই কোনো ঘর ছিলো না । অনেক গাছপালা কাটা ছিলো । শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, লতালি গাছের জঙ্গল । গরু বাচ্চুরও ছিলো না । কোনো জিনিসপত্র ছিলো না । অধিকাংশই ভারতে গিয়া আশ্রয় নিয়েছিলো । আমাদের ছাবিবিশ্টা গ্রামের কথা আমি বলবো গ্রামের প্রায় লোকই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো এবং তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে দেশে ফিরেছে । ক্যাম্পে যে হাড়িকুড়ি তাদের দিছিলো সেইটাই তাদের সম্বল ছিলো । তারা বাড়িতে আইসা ধানের খড়কুটো দিয়া অথবা গোলপাতা দিয়া কোনোভাবে ছেটকাটো ঘর তুলা একেক ঘরে পঁচিশ ত্রিশ জন মিলে ঠাসাঠাসি করে থাকতো । আমরা এই রকম দুইটা চালের নিচে প্রায় এক বছরের মতো ছিলাম । আমাদের এলাকায় লঙ্ঘরখানা খুলছিলো আমার মনে আছে । আমার সেজ বোন এবং আমি একটু লজ্জা পাইতাম খাবার আনতে । আমি তখন বড় । সেজ বোনও বড় । ছেট বোনটা তখন সিঁড়ে পড়তো । সে আর আমার ছেট ভাই যে টু-তে পড়তো ওরা একটা গামলা বা একটা হাড়ি নিয়ে লঙ্ঘরখানায় যাইতো । এক সিঁড়ের চাল না কি বলে তার একটা জাট-এর মতো বা খিঁড়ির মতো রান্না করতো । তারা এটা হাড়ি ভাইরা নিয়া আসতো । সেইটা আমরা খাইতাম । আর ছিলো ছাতু, ভুট্টার ছাতু না কি বলতো, এটা আসতে লাগলো । এটা পাইতাম । এটা মাইথ্য সকাল বিকালে খাইতাম । দুপুর বেলা লঙ্ঘরখানার সেই জাট । কিছু গম টমও পাইতাম রিলিফ হিসাবে । রামকৃষ্ণ মিশন কিছু কাপড় দিছে । কিছু কিছু টাকাও

দিছে । এই সংস্থা আমারে স্বাধীনতার পর একশ্ব টাকা দিছিলো আর সস্তবত আধা মন আতপ চাল । আর আমি ছাত্রী হিসাবে স্বাধীনতার পরে কলেজ খোলার পরে বাগেরহাটে আমারে আধা মণ চাউল, আধা মণ গম এবং রামকৃষ্ণ মিশন হতে দুটো শাড়ি দিছিলো । কিছু টাকা পয়সাও দিছিলো তারা । তারপর স্থানীয় চেয়ারম্যান উনি মুসলিম ছিলেন । নবগ্রামে বাড়ি । উনি বাবারে খুব শ্রদ্ধা করতেন । উনি আমাদের বেশ সাহায্য করেছিলেন । কিছু চাল, গম, কাপড়ের ব্যবস্থা করেছিলেন । কম্বলও রিলিফ হিসাবে দিয়েছিলো । এইভাবেই আমরা পরবর্তীতে বেঁচে ছিলাম ।

প্রশ্ন : যুদ্ধের শেষে আপনি কি করলেন ?

উত্তর : যুদ্ধের শেষে মনে করলাম যে, লেখাপড়া করতেই হবে । বাঁচতে হলে লেখাপড়াই আসল । তখন আমি বাগেরহাটে চলে যাই । আমি আগেই বোধহয় বলেছি যে, খস্টানদের একটা সংস্থা ছিলো বিনয়কাঠিতে, ওরা আমারে কিছু সাহায্য দিছিলো । সেই সাহায্য নিয়া আমি বাগেরহাটে চইল্য যাই । বাগেরহাটে আমি এবং আমার এক বান্ধবী ওরা কলকাতার সল্টলেকে ক্যাম্পে আশ্রয় নিছিলো, সেখানে ওর মা মারা যায় দুজনে তখন বাগেরগাহাট কলেজে পড়তাম । কলেজের তখন প্রিসিপাল ছিলেন শ্রদ্ধেয় আসমত আলী আখন্দ । উনি আমাদের কথা শুনে আমাদের দু'জনারে দুই স্যারের বাসায় লজিং-এর ব্যবস্থা করে দিলেন । আমার স্যার ছিলেন শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র পাল । তৎকালীন বাগেরহাট পি.সি. কলেজের অংকের টিচার । উনি পরবর্তীতে অবশ্য ভারত চইলা গেছেন । আর আমার বান্ধবীও আরেক স্যারের বাসায়, উনার নামটা আমি ভুলে গেছি, ফিলজিং থাকলো । এটা আমাদের প্রিসিপাল স্যারই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ।

প্রশ্ন : আপনার গ্রাম বা এলাকার কোন কোন জায়গাতে ব্যাপক হত্যাকা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিলো এ সব কারা করেছিলো ?

উত্তর : জগদীশপুর, রামপুর, বোহরা, শাখাগাছি, কাপড়কাঠি, শতদশকাঠি এবং বিমলিতে ব্যাপক হত্যাকা টারিয়া মেইন রাস্তায় গেছে । কিন্তু ভিতরে সাধারণত রাজাকারাই এই কাজগুলা করছে ।

সাক্ষাৎকার গ্রন্থের তারিখ : আগস্ট ১২ ও ১৪, ১৯৯৬

# নির্মম ধর্মসংবলের শিকার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাত্কার : তারাবান বেওয়া

## শওকত হোসেন মাসুম

কাজটি মুক্তিযোদ্ধা গবেষণা কেন্দ্রের। তারা বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মুক্তিযোদ্ধারের সাক্ষাত্কার নিয়েছে। তারা এর নাম দিয়ে কথ্য ইতিহাস। এসর সাক্ষাত্কার পড়লে যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করা যায়। এখানে সেরকমই এক সাক্ষাত্কার তুলে দিলাম।

নাম	তারাবান বেওয়া
স্বামী	আলতাফ চৌধুরী (১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নিহত)
ঠিকানা	গ্রাম : প্রাণকৃষ্ণপুর, চরকোনা চরা, ইউনিয়ন : পুটিমারা, ডাকঘর : পুটিমারা, থানা : নবাবগঞ্জ, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিরক্ষর
১৯৭১ সালে বয়স	৩০
১৯৭১ সালে পেশা	গৃহবধু
বর্তমান পেশা	গৃহিণী

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ঘটনা কি আপনার মনে পড়ে?

উত্তর : হ, মনে আছে, দেশে তহন যুদ্ধ লাগছিলো। খানেরা তহন আমাদের দেশের অনেক লোক মারিছিলো।

প্রশ্ন : পাকিস্তানি সৈন্যরা আপনাদের গ্রামে আক্রমণ করেছিলো কি?

উত্তর : হ, করছিলো।

প্রশ্ন : আপনাদের এই গ্রামে কখন পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করলো?

উত্তর : আক্রমণ অনেক বার করছে। একদিন ভোরে আইসে চরম আক্রমণ করছিলো। তামাম গ্রাম হেরো ঘেরাও করছিলো। তামাম গ্রাম ঘেরাও করে ওরা পুরুষ মানুষ কাউক বাঁচাবার দেয় নাই। পুরুষ মানুষ কেউ পলাইতে পারে নাই। সবাক নিয়া যায়। ওরা মাইরে ফেলাইছে।

প্রশ্ন : সেদিন আপনাদের গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা আর কি করেছিলো?

উত্তর : কাউক ডাক দিয়া নিয়া গেছে, কারু বাড়িতে আগুন

লাগায় দিচে, কাউক মাইরে ফেলছে। মাইয়া মাইনষের ইজ্জত মারছে। কোনো অবস্থায় ওদের সাথে পারা যায় না। মোরা যে পাকেই দৌড়ে যাই সেই পাকেই খান, সে পাকেই মেয়ে মাইনষেক ওরা ধরাধরি করছে। কোনো কিছু করি পারা যাই নাই। খানেদের হাতোত থিকা মোরা বাঁচাপার পারি নাই কেউ। পুরুষ মানুষ সব ধরি নিয়া যায়। মাইয়া ফালাইলো। এ সময় থামে ব্যাটা ছেলে যা আছিলো হগলকেই ওরা মাইরে ফালাইছে। খানরা গেছে পর মোরা সবাই দৌড় মাইরে যায়। দেখি সবাই মহিরা গেছে। মোরা ওইহানে গেছি পর খানরা ফির উল্টি আইছে। যখন ওরা উল্টি আইছে সখন ফির মোরা দৌড় মাইরেছি। মোর তিনটা ভাই ওই সময় মারা গেছে। যায়ে দেখি সব মরছে। তিনটা ভাই। ভাইয়ের বড় ব্যাটা, মোর বড় ব্যাটা। গাও গেরামের হগলকে এক জায়গায় নিছিলো খানরা। তারপর গুলি করছে।

প্রশ্ন : আপনারা যখন লাশ আনতে গেলেন তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা আবার ঘুরে এসে আপনাদেরকে ধাওয়া করেছিলো।

উত্তর : হ, ফির আসছিলো। আইসা ধাওয়া করছে।

প্রশ্ন : তখন আপনি কি করলেন?

উত্তর : ফির দৌড় মাইরে এদিক ওদিক গেছি। কৈ গেছি সেটা এখন কওয়ার পারমু না। ফির আইসা দেখি ওরা সব মহিরে গেছে। মোর স্বামী কইছিলো মুক পানি খিলাও। মুই পানিডাও খিলাইতে পারি নাই। তহনই ওই খানরা আইছে, মুই আবার দৌড় মারিছি। পরে আইসা দেখি স্বামী মোর মরছে।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের কয়জনকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করেছিলো?

উত্তর : দুইজনাক নিয়া গেছিলো। মোর ব্যাটা আর স্বামী।

প্রশ্ন : খানরা আর আসেনি এখানে?

উত্তর : কত অ্যালো আবার। দৌড়াদৌড়ি, কতো কেলেংকারী। ওরা আইছে, মোরা ভাতের পাতিল থুয়ে পলাইছি, ছালন (তরকারি) থুয়ে পলাইছি, খাওনও হয় নাই। ওরা খুব অত্যাচার কইরছে এই জায়গাট। খুব অত্যাচার। মোর ভাই খানগোরে দুখ দিয়া আইছে। মোর ভাই কতো কি দিছে। ফল দিয়া আইছে, কলা দিয়া আইছে, গাই দিলো, মুরগি দিলো, সব দিলো। হেরা

তারপরও সবাক মারি ফেলালো। মেয়ে ছেলের ইজ্জত মারিলো। মোর তামাম জীবনটাই মাটি করি দিছে।

প্রশ্ন : খানেদের আপনারা মুরগি, দুধ, গরু-বাচুর দিয়েছেন?

উত্তর : হয়, হয়। বাঁচার জন্য মোরা দিছি। তাও মারিছে সোনা, তাও মারিছে। মোর ভাই বাল্টি ভইরে দুধ দিয়ে আইছে ৫/৭ জন মানুষের। তাও সবাক মাইরে ফেলছে।

প্রশ্ন : পাকিস্তানি সৈন্যরা মহিলাদের উপর নির্যাতন করেছিলো কি?

উত্তর : হ, করছিলো। বেবাক মেয়েছেলেক ধরছিলো। ধরে আমাগো বাড়িত, এর ওর বাড়িত নিয়া গেছিলো। ঘরত আর আড়াল টাড়ালে নিয়া গেছিলো। ঘরত সান্ধাইয়া হেরা অত্যাচার করছিলো। ওগুলা করা শেষ হলি পর বাড়িত আগুন লাগায়ে দিছিলো। তখন সারা গাও শুইছে আগুন। খুব অত্যাচার করছিলো, খুবই অত্যাচার।

প্রশ্ন : খানেরা কোনো মেয়েকে গুলি করে মারছিলো কি?

উত্তর : হ, মারিছে দুইজনকে।

প্রশ্ন : তাদের নাম বলতে পারবেন?

উত্তর : ছয়না এক জনের নাম। আরেক জনের নাম সালু। হেরা হামার ঘরেত কানতেছিলো।

প্রশ্ন : তারপরে আপনারা কি করলেন?

উত্তর : খানরা গেছে পর আইসে কান্দেছি। মরাগুলাক গোছল করাইছে না করাইনি তা কওয়ার পারি না। মুই বেহসের মতো। মোর তিনটা ভাই। ভাইয়ের ব্যাটা, মোর বড় ব্যাটা, স্বামী, সব এক জায়গাত মাটি দিছে।

প্রশ্ন : তারপর?

উত্তর : এখানেই ছিলাম।

প্রশ্ন : এরপর কি আর আসে নাই খানরা?

উত্তর : আসে নাই মানে? আইছে। তহন দৌড়াদৌড়ি করি লুকাইছি।

সাক্ষাত্কার গ্রহণের তারিখ : নভেম্বর ০৪, ১৯৯৬

# নির্মম ধর্মসংবংশের শিকার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাত্কার : তুনদুরন বেওয়া

## শওকত হোসেন মাসুম

কাজটি মুক্তিযোদ্ধা গবেষণা কেন্দ্রের। তারা বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মুক্তিযোদ্ধারের সাক্ষাত্কার নিয়েছে। তারা এর নাম দিয়ে কথ্য ইতিহাস। এসর সাক্ষাত্কার পড়লে যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করা যায়। আসুন জানি সেই সব ইতিহাস।

নাম	তুনদুরন বেওয়া
স্বামী	তাহের উদ্দীন (১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নিহত)
ঠিকানা	গ্রাম : প্রাণকৃষ্ণপুর, ডাক : পুটিমারা, ইউনিয়ন : পুটিমারা, থানা : নবাবগঞ্জ, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা	চতুর্থ শ্রেণী
১৯৭১ সালে বয়স	৩০
১৯৭১ সালে পেশা	গৃহবধু
বর্তমান পেশা	গৃহিণী

প্রশ্ন : ১৯৭০-৭১ সালের কথা কি আপনার মনে পড়ে ? যুদ্ধের কথা ?

উত্তর : তখন একটা ভোটাভুটি হচ্ছিলো। মোরা নৌকাত ভোট দিচ্ছি। তারপর দেশের মধ্যে যুদ্ধ নাগি গেলো। খানরা মানুষ মারি ফেলালো। মেয়ে মানুষক নির্যাতন করিলো।

প্রশ্ন : আপনাদের গ্রামে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করেছিলো কি ?

উত্তর : হ, আক্রমণ করে কোথার করিছে। পরে একদিন রাইতের বেলা গ্রামটা খানরা আবার যেরাও করছিলো। কেউ জানবার পারে নাই। ভোরাতে সবাই জাগি উঠলো। জাইগা দেখে চারপাকে খানরা ঘিরি আছে। যেই পাকে মানুষ যায় সেই পাকেই থান। কোনো পাকেই খালি নাই। সব পাকেই ওরা। কেউ বারাইতে পারে নাই। এতোগুলাই আসছিলো ওরা।

প্রশ্ন : তারপরে ?

উত্তর : ভোর হইলো। তখন ওরা বাড়ি বাড়ি চুকলো।

অর্ধেকগুলা ঘেরাও দিয়া থাকলো আর বাকিগুলান বাড়ি বাড়ি চুকলো। চুকে পুরুষ মানুষক ডাকি ডাকি নিয়া গেছে। তাদের নিয়া এক জায়গায় জমা করি মারিছে। পুরুষ মানুষক সব নিয়া গেলো। মোরা বাড়িত তো শানি পাচ্ছি না। সে সময়ে মনে করেন যে, হামার কিয়ামত আইছিলো। কিয়ামতের লাকান। যা দুঃখ হচ্ছে বাবা সেগুলি বাইলি আর কি হবি। পুরুষ মানুষক ধইয়া নিয়া গেলো। মেয়ে ছেলের উপর নির্যাতন করিলো। নির্যাতন করে টুরে হ্যারা গেছে। মোরা বিলত (বিল) নাইমে আছি, কেউ সুল্লিত (দুই বাড়ির মাঝখানের অপ্রশ্নত জায়গা) সাইন্দে আছি, কেউ পানিত নাইমে আছিলাম। ওত (ওখান) থাকি ভরভরি শব্দ খালি শুনি। আমরা জানি না যে মাইরে ফেলাইছে। অতো লোক সবাক মারি ফেলাইবে কোনো দিনও ভাবি নাই। একটা লোক আইসে মোক আর কয়জনাক খবর দিলো যে, গ্রামের সব লোকেরে ওই জায়গায় খানেরা মাইরে ফেলাইছে। তার আগে লুকাইয়া একবার মুই ওই ওইহানে গেছিলাম। যায়ে দেখি যে খালি লাইন করিছে, মুক দেখি খানরা রাইফেল তুলিছে, মুই ফির আবার দৌড়াইছি।

প্রশ্ন : দৌড়ে কোথায় গেছিলেন ?

উত্তর : গাওত। এ বাড়িত থাকি ও বাড়িত যাচ্ছি, ওডি ও দেখি খান। কোনো পাকেই আর রেহাই পাই না। খানরা মোকও ধরছিলো।

প্রশ্ন : আপনাদেরকে পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন ধাওয়া করেছিলো তখন কি তারা গুলি করেছিলো ?

উত্তর : মোক গুলি করে নাই। অন্য দুইজন মেয়ে মানুষক গুলি করেছিলো। ওই দুইজনের নাম সয়না, আর ছালু। খুব অত্যাচার কইরেছে মেয়েছেলের উপরে। খুব অত্যাচার।

প্রশ্ন : কখন অত্যাচার করেছিলো ?

উত্তর : গ্রাম থাকি পুরুষ মানুষ সব ধইরে নিয়ে গেলো। একগুলা খালি পুরুষ মানুষক ধইরে নিয়ে গেলো, আরেকগুলা খালি বাড়িত সান্ধায়। এখানে ওখানে সান্ধায়। সান্ধায়া মেয়েছেলেক ধরিছে।

ধরে নিয়া হেরা মেয়েছেলের উপর খুবই অত্যাচার করিছে।

প্রশ্ন : পাকিস্তানি সৈন্যরা মেয়েদের উপর কি খুবই অত্যাচার করেছে ? আর কি করেছে ?

উত্তর : হ। হেরা খুবই অত্যাচার ট্যাচার করে চলি গেছে। তারপর মোরা আবার এখানে ওখানে লুকায়ে ছিন। লুকায়ে থাকতেই ভরভরি আওয়াজ পাইনু। অনেকক্ষণ পর এক লোক আইছে। তখন শুনলুম সবাই মারা গেছে। খবর পাইয়া মোরা সব ওহানে গেছি। মোরা কান্দাকাটি করছি। ফির তো আবার খবর আইছে, খানরা নাকি আবার আইতেছে, ফির মোরা দৌড় দিছি। হামার কিয়ামত গেছে বাবা। সেইলা দুঃখের কতা আর এহন তোরা শুইনে কি কইরবেন।

প্রশ্ন : তারপরে ?

উত্তর : তারপরে ওইদিন বাইরের আত্মীয়-স্বজন আইসে সবাক মাটি চাপা দিছে। নাই গুসুল (গোসল), নাই ওজু, নাই কাপড়। কোনো রকমে সবাক মাটি চাপা দিছে। নেপের ওয়ার, মুশুরি (মশারি), ওইলে দিয়ে মাটি চাপা দেছে। গোরস্তান নিয়া গেছে সময় খানরা উল্টে ফির আয়েছে। মাটি দিবার লোকে ফির আবার দৌড়াইছে। এই রকম করে কোনোরকমে সবাক মাটি চাপা দিছে।

প্রশ্ন : পাকিস্তানি সৈন্যরা সে দিন মোট কতজনকে হত্যা করেছে ?

উত্তর : ম্যালা, শ'য়ের উপর গেছে বোধ হয়। মোর এহন খেয়াল নাই। কেউ মোর ভাই হয়, কেউ ভাতিজা হয়, কেউ চাচা হয়, কেউ খুড়া হয়। খালি স্বামী বুইলে নয়। সবাই গ্রামের আত্মীয়। তখনকার জন্যে চিন্তা করি। সে যে কি দিন গেছে মোদের।

প্রশ্ন : খান সেনারা লোকজনকে হত্যা করে কোথায় গেলো ?

উত্তর : চলে গেল একেরে ত্রি বলাহারের দিকে।

প্রশ্ন : বলাহার থাকতো ওরা ?

উত্তর : হ । ওরা পাল শুইকে দল ধরে গেলো ।

প্রশ্ন : তারপর আপনি বাড়িতেই ছিলেন ?

উত্তর : বাড়িতেই ছিনু । ওরা ফির আয়েছে, ফির দৌড়াদৌড়ি করিছি । ফির বাড়িত আইছি । সবাই যে দিকে যায় মুইও সে দিক গেছি । মোর বাড়িত তো লোক নাই । মোর একটা ছেট বাচ্চা । সবাই যি দিকে যায় মুইও এই ছেলেক নিয়া সিটি যাই । ছেলে তো কেবল সাড়ে তিন বছর বয়েস । এই ছেলেক নিয়া আমি আর কোথায় যাবার পারি না । খান সেনারা বাড়িঘর সব পুইড়ে দিছে, ভাঙ্গি দিছে । কি করে দিছে! আহারে! আমার বাপ নাই, মাও নাই, আমার ভাই নাই, একটা ভাই, তাকও মারি ফেলালো । আমার ছেটকালে বাপ মারা গেছে, মাও নাই । মোক যে কেউ উপকার কইবে সে লোক মোর নাই ।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের কয়জনকে হত্যা করেছিলো খানেরা ?

উত্তর : সে দিন মারিছে গ্রামের সব লোকগুলাক । আমার স্বামীক মাইরছে । ভাইওক মারিছে । আর সবাই তো আতীয় স্বজন ।

প্রশ্ন : আপনার ভাইকে কখন মারছে ?

উত্তর : ভাইকেও ওই একই দিনে মারিছে ।

প্রশ্ন : আপনার ভাইয়ের নাম কি ?

উত্তর : মফিজ । একই দিনে সব মারিছে । তহন না ভায়ের তনে (জন্য) কান্দি, না স্বামীর তনে কান্দি, না ভাতিজার তনে পশ্তাই- এইরকম অবস্থা আর কি ।

প্রশ্ন : খানরা আপনার ভাতিজাকেও মারছিলো ।

উত্তর : হ, ভাতিজাও মারা গেছে ।

প্রশ্ন : আপনার ভাতিজার নাম কি ?

উত্তর : আইজুর মিয়া । ভাসুরের ব্যাটা, ভাতিজা ।

প্রশ্ন : যুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনী আসছিলো এদিকে ?

উত্তর : মুক্তি ? মুক্তি তো পরে আইছিলো ।

প্রশ্ন : আসছিলো এখানে ?

উত্তর : হ । খানরা রাস্তা দিয়ে যায় আর কয় ব্যাটারা সব মুক্তি পকেটে রাখিছে । এইলা কথা কয় । মুক্তি তো তহন ইতিয়াত গেছিলো । পরে আইছিলো । মুক্তিরা আইসে আর কি কইবে । খানরা তো সব সাফ করে দিছে । মুক্তিরা আইসে আর কি কইবে ? দুঃখ প্রকাশ কইবে কি হবি আর ? তহন আমার ছেলে ছিলো খুবই ছেট । ফির তাক কতো কষ্ট দুঃখ কইবে মানুষ করনু, কতো কষ্ট দুঃখ কইবে শিক্ষা দিনু । হে এহন বড় হইছে । চাকরি করে । ওর আয়ে মুই কোনো যতে সংসার চালাই ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : নভেম্বর ০৫, ১৯৯৬

## এ ট্রিবিউট টু কিশোর পারেখ

### হাসান বিপুল

আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য প্রাথমিক যে প্রামাণ্য দলিল আমরা হাতের কাছে পাই তা হলো মুক্তিযুদ্ধের ফটোগ্রাফ । হাজার গল্ল বলেও যে অনুভূতি আপনি আজকের কিশোরের মনে তৈরি করতে পারবেন না, একটিমাত্র ফটোগ্রাফ তার পুরো কাজটি করে দেবে অন্যায়ে । একটি শূন্য রাস্তা, এক বিধবার করুণ দৃষ্টি যে হাহাকার তৈরি করবে, আর কোনো দলিল কি তা করার ক্ষমতা রাখে?



সম্মুখ সমর নয়, বরং সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধে সম্মততা এবং এতে তাদের অংশগ্রহণ, ত্যাগ ও প্রাণ্তির বিষয়টি যে ফটোগ্রাফার ক্যামেরায় ধারণ করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন তিনি কিশোর পারেখ । তিনি বাংলাদেশি নন, ইন্ডিয়ান । কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নয়, আর্থিক কোনো লাভ নয়, ত্রেফ একটি যুদ্ধকে ইতিহাসের অংশ করে রাখার জন্যই কিশোর চলে আসেন যুদ্ধ আঠাত্ত এ দেশে ।

দুঃখজনক অথচ সত্যি হলো জীবিত থাকতে কখনোই এ ফটোগ্রাফারকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইনি, স্মরণ করিন তিনি মারা যাওয়ার পরও । তাই মনে হচ্ছে এ ফটোগ্রাফার সম্পর্কে আমার কাছে যে তথ্য আছে, তা রূপে প্রকাশ করা যেতে পারে । প্রচারবিমুখ এ ফটোগ্রাফারের বিষয়ে ইন্টারনেটে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব নয় । তাই তার সম্পর্কে তথ্য ও

ফটোগ্রাফ বিষয়ক সাহায্যের জন্য আমি যোগাযোগ করি দ্ব্যক্ত পিকচার লাইব্রেরির পরিচালক ডক্র শহিদুল আলম-এর সঙ্গে । ২০০০ সালে তিনি ছবিমেলো ১-এর অংশ হিসেবে ১৯৭১ : দি ওয়ার উই ফরগট শিরোনামে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন যাতে ছিল দেশি-বিদেশি অনেক ফটোগ্রাফারের সঙ্গে কিশোর পারেখের তোলা বেশ কিছু ছবি । ড. আলম আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেন কিশোর পারেখের ছেলে স্বপন পারেখ-এর সঙ্গে । স্বপন নিজেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ফটোগ্রাফার, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটোতে বিচারক হিসেবে ছিলেন অন্তত তিন বার, বর্তমানে কাজ করছেন ব্ল্যাক স্টার ফটো এজেন্সিতে এবং থাকেন মুম্বাই-এ ।

# ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি যেভাবে রেডিওতে প্রচার হলো...

## বিপ্লব রহমান

১৯৭১ এর মার্চ মাসের সময়টা ছিলো ভয়ঙ্কর। তারপরও সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের কথেকজন দুঃসাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক সে ভাষণ সম্প্রচার করেছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক জাতার রক্তচক্ষু উপক্ষে করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব যে ভাষণ দেন তা সম্প্রচারের জন্য দুঃসাহসী সেসব কর্মকর্তাদের কাছে জাতি চিরকৃতজ্ঞ।

অগ্নিবারা সেই ভাষণের বিষয়বস্তু পেঁচে গিয়েছিলো বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে। এ ভাষণের মধ্য দিয়েই বাঙালির নেতা পাকিস্তান সরকারের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিল করার ঘোষণা করেন। এ ভাষণের বাঙালির স্বাধিকারের আকাঞ্চকে আরও উক্ষে দিয়েছিলো। আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো জনগণের মনে।

পাকিস্তান রেডিওর শাহবাগ কেন্দ্রে প্রবেশ করাটাও কর্মকর্তাদের জন্য ছিল কঠিন এক ব্যাপার। সম্প্রচারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল সামরিক সরকার। এসব সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের দাবিতে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে রেডিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক ধর্মঘটের ঢাক দিয়েছিলেন। যে আট-দশজন বেতারকর্মী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে '৭১ এ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন, তাদের একজন আশফাকুর রহমান থান। রেডিও পাকিস্তান ছেড়ে পরবর্তীতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। বছর দুয়েক আগে আমি এই অকুতোভয় সৈনিক আশফাকুর রহমানের সন্ধান পাই আমারই আরেক সহকর্মী নজরুল ইসলামের মাধ্যমে। তিনিও একসময় বাংলাদেশ বেতারে কাজ করার সময় এই ব্যক্তিত্ব সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ধানমন্ডির বাসায় আলাপকালে এই মুক্তিযোদ্ধা বারুদবারা সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। তার কথোপকথন থেকে সে সময় আমি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম এর জন্য তৈরি করি একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

সে সময় আশফাকুর রহমান থান বলেন, 'তখন আমার বয়স মাত্র ২৮। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সংগঠক হিসেবে

সদ্য যোগ দিয়েছি। মার্চের শুরুতেই পাকিস্তানের সেনাসদস্যরা সশস্ত্র অবস্থান নেয় শাহবাগের ওই বেতার কেন্দ্রে। কোন অনুষ্ঠান যাবে আর কোনটি যাবে না, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মেজর সিদ্দিক সালেক এটি নিয়মিত তদারকি করতেন। এরই মধ্যে আমরা আন্দোলন-সংগ্রামের খবর, শোগান, গণসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, নাটক - ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচার করতাম।'

আমাদের নেতৃত্ব দিতেন রেডিওর আঞ্চলিক পরিচালক



আশফাকুর রহমান থান  
-ছবি : বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

আশফাকুজ্জামান থান। তিনিই গোপনে আমাদের জানান, আমরা সেনা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রেডিওতে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করবো। সে-কি উক্তেজনা আমাদের মধ্যে! ৬ মার্চ রাতেই রেডিওর প্রকৌশলীরা রমনা রেসকোর্স মাঠে যে মধ্য থেকে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন, সেখানে টেলিফোনের তার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বসায়।'

আশফাকুর রহমান থান বলেন, '৭ মার্চ বেলা ২টায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দেওয়ার কথা। বেলা ১২টা থেকে আমরা রেডিওতে কিছুক্ষণ পর পর ঘোষণা দিতে থাকি, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি প্রচার করা কথা। বঙ্গবন্ধু একটু দেরিতে বেলা ২টা ২০ মিনিটের দিকে মধ্যে আসেন।

এদিকে একই সময় রেডিও অফিসে মেজর সিদ্দিক সালেক টেলিফোনে মেসেজ পাঠান: নথিং অব শেখ মুজিবুর রহমান উইল গো অন দ্য এয়ার আনটিল ফারদার অর্ডার।...

এই মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিবাদ হিসেবে রেডিওর সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে অফিস ছেড়ে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে চলে যাই। ওই দিন আমরা রেডিওর অনুষ্ঠান ব্যক্তিক করি। সাভারে একটি বিকল্প শক্তিশালী ট্রান্সমিটার ছিলো। সেখান থেকে যেনো আবার অনুষ্ঠান প্রচার করা না হয়, সে জন্য সেখানে ট্রাঙ্কল করে খবর দেওয়া হয় সকল রেডিও কর্মীকে আত্মগোপন করার জন্য। ওইদিন রেডিওতে আর কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়নি।'

তিনি স্মৃতি হাতড়ে বলে চলেন, 'ওই সন্ধিয় আমরা এলিফ্যান্ট রোডের এক বাসায় গোপন বৈঠকে বসি। রাতে আমাদের নেতা আঞ্চলিক পরিচালক আশফাকুজ্জামান খবর নিয়ে আসেন, সেনাবাহিনী রাজি হয়েছে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করতে। তবে শর্ত হচ্ছে, সবাইকে কাজে ফিরে যেতে হবে। পরদিন ৮ মার্চ সকাল ৭টায় আমরা আবার কাজে যোগ দেই। রেডিওতে প্রচার করা হয় রেকর্ড করা বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ '...এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম...'

# সাতই মার্চের ভাষণ প্রচারের নেপথ্যে : এক শব্দসৈনিকের স্মৃতিচারণ

ফরিদ

৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ কিভাবে প্রচারিত হল, তার পেছনেও ছিল কিছু সংগ্রামী মানুষের অসাধারণ বীরত্ব। এমনই এক বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসের আহমেদ চৌধুরী। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই নিভৃত শব্দসৈনিক চাইছিলেন তার স্মৃতিকথা জাদুজালের পাতায় সংরক্ষিত থাকুক।

সেই অজনা ঘটনা প্রথমবারের মত অনলাইনে। প্রকৃতই তাঁর স্মৃতিচারণাটি আমার মনে হয়েছে বাংলাদেশের লিভিং হিস্ট্রির অংশ হওয়া উচিত। শুনুন তাঁর জবানিতেই—

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সবসময় ঠাট্টাছলে বলে থাকে 'দোষ্ট তোর জন্য আমার স্বাধীনতা পেয়েছি। তুই যদি সেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ রেকর্ড করে প্রচার না করতিস, তবে দেশের লোক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক শুনতেই পেতো না, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতও হতো না।' তবে আমি বলি ঠিক তা না, বাংলাদেশের স্বাধীনতা নয় মাসের মুক্তিযোদ্ধা মুক্তি সংগ্রামী মানুষের ত্যাগের জন্যই এসেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব থেকেই পট পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছিলো। এবং এক্ষেত্রে জনমত তৈরিতে তৎকালীন রেডিও শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলো।

আমি তখন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকার অনুষ্ঠান সংগঠকের পদে কর্মরত। আমার দায়িত্ব ছিল রেডিওর বাইরের সকল অনুষ্ঠান রেকর্ড করে প্রচারের ব্যবস্থা করা। আমার সঙ্গে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসাবে কাজ করতো মীর রায়হান।

ইলেকশানে জেতার পর শেখ মজিবুর রহমানের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা, কিন্তু সবাই বুবাতে পারছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা কিছুতেই সেটা হতে দেবে না। সেটা আঁচ করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং ছাত্র নেতৃত্ব। তখন থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের ভূমিকা তৈরী হতে শুরু করলো। রেডিও পিছিয়ে থাকলো না। আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা'-র নাম পরিবর্তন করে 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' রাখলাম, এবং এই নামে প্রচার শুরু করে দিলাম। সে সময় এতবড় পদক্ষেপ

নেয়া যে কত সাহসের কাজ ছিলো, এখন তা বুবাতে পারি। রেডিওর অনুষ্ঠান, বার্তা, এবং প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, এক কথায় সমগ্র রেডিওর কর্মকর্তা কর্মচারীর সহযোগিতা ছাড়া যা কিছুতেই করা সম্ভব ছিল না।

এই সাহসিকতা করার পিছনে বিশেষভাবে যাঁদের নাম করতে হয়, তারা হলেন—

জনাব আশরাফুজ্জামান খান - পরিচালক  
জনাব আহমাদুজ্জামান - সহকারী পরিচালক  
জনাব মবজুলুল হোসেন - সহকারী পরিচালক  
জনাব মফিজুল হক - সহকারী পরিচালক  
জনাব সাইফুল বারি - বার্তা পরিচালক  
জনাব জালালউদ্দীন রূমী - অনুষ্ঠান সংগঠক  
জনাব আশফাকুর রহমান - অনুষ্ঠান সংগঠক  
জনাব তাহের সুলতান - অনুষ্ঠান সংগঠক  
জনাব শামসুল আলম - অনুষ্ঠান সংগঠক  
জনাব কাজী রফিক - অনুষ্ঠান সংগঠক  
জনাব বাহরামউদ্দীন সিদ্দিকী - অনুষ্ঠান সংগঠক  
জনাব মীর রায়হান - অনুষ্ঠান প্রযোজক  
জনাব ফয়েজ আহমদ চৌধুরী - সহকারী বার্তা পরিচালক

এবার আসি ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রসঙ্গে। প্রচার করা হলো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সরাসরি ঢাকা বেতার কেন্দ্র প্রচার করবে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান থেকে। সব ব্যবস্থা নেয়া হলো। পরিচালক আশরাফুজ্জামান খান সব রেডিওর কর্মচারীদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। রেসকোর্স মাঠে মধ্যের উপরে পরিচালক আশরাফুজ্জামান, সহকারী পরিচালক আহমাদুজ্জামান এবং আমি নাসার আহমেদ চৌধুরী থাকবো। প্রকৌশল বিভাগ থেকে জনাব সামাদ সাহেবের নাম মনে পড়ে। মধ্যের নিচে জনাব শামসুল আলম, কাজী রফিক, রেডিওর ডিউটি রুমে বাহরামউদ্দীন সিদ্দিকী, সাভার প্রচার কেন্দ্রে প্রকৌশল বিভাগের কর্মচারীর সঙ্গে মীর রায়হান। সকাল থেকেই ঘন ঘন প্রচার করা হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রেসকোর্স মাঠ থেকে প্রচার করা হবে। রেসকোর্স মাঠ লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের

জায়গাও ছিল না। আমরা বেশ আগেই মধ্যে উঠে মাইক্রোফোন সেট করে ফেললাম। আমি আমার সঙ্গে নিলাম পোর্টেবল ইএমআই টেপেরেকর্ডার। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে বঙ্গবন্ধু মাঠে এলেন। সেই সময় আকাশে প্লেন দেখা গেল। সেই প্লেনে লে. জেনারেল টিক্কা খানের আসার কথা, সারা মাঠে উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। বঙ্গবন্ধু মধ্যে উঠে ভাষণ শুরু করতে যাবেন। এমন সময় রেডিওর ডিউটি রুম থেকে ইন্টারকমের মাধ্যমে বাহরাম সিদ্দিকী মধ্যে আমাদেরকে জানালো যে এই মাঠে মেজর সিদ্দিক সালেক

জানিয়েছেন, কোনমতেই শেখ মুজিবুরের ভাষণ রেকর্ড করা যাবে না, প্রচার করলে রেডিও উড়িয়ে দেয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি প্রচার বন্ধ করে দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছেন, আমি আমার সাথে ছোট টেপ রেকর্ডারে রেকর্ডিং শুরু করে দিলাম। সহকারী পরিচালক আহমাদুজ্জামান একটি ছোট চিরকূটে 'আর্মি ভাষণ প্রচার করতে দিচ্ছে না' লিখে মধ্যে উপবিষ্ট পরিচালক

আশরাফুজ্জামানের হাতে দিলেন। আশরাফুজ্জামান সাহেবে সেটা টাঙ্গাইলের এমপির (আমার এখন নাম মনে পড়ছে না) হাতে দিলেন। তখন বক্তৃতা অনেকখানি প্রচার হয়ে গেছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর হাতে চিরকূটটি পৌছে দিলেন।

আপনারা যারা বক্তৃতা শুনেছেন, তাদের মনে থাকার কথা বক্তৃতার



একান্তরের সেই সাহসী সৈনিক  
নাসের আহমেদ চৌধুরী

এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন '...এই মাত্র খবর পেলাম তারা আমার বক্তৃতা প্রচার করতে দিচ্ছে না। রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা আপনারা কাজে যাবেন না যতক্ষণ না আমার ভাষণ প্রচার করতে দেয়। অফিস আদালত সব বন্ধ করে দেয়া হলো। ...এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সারা মাঠে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। আমি দুটো টেপে সমগ্র ভাষণ রেকর্ড করে নিলাম। ভাষণ শেষে টেপ দুটো সাবধানে আমার শার্টের ভিতরে লুকিয়ে ফেললাম এবং দ্রুত মধ্য থেকে টেপেরকর্ডার, স্ট্যান্ড নিয়ে নিচে নেমে পড়লাম। তখন লোক যে যেদিকে পারছে ছুটে যাচ্ছে। নিচে আলম, কাজী রফিকের সঙ্গে দেখা হলো।

পরিচালক সাহেবকে আমি গোপনে রেকর্ড করেছি জানালাম। তিনি আমার প্রশংসা করলেন এবং মাঠে যুগ্ম সচিব সাহেবকে জানালেন এবং প্রশংসন রাখলেন এখন আমরা কী করবো। যুগ্মসচিব জহরকল হক সাহেব জানালেন, আপনারা সবাই পালিয়ে যান। কেউ নিজের বাসায় যাবেন না। রেডিও বন্ধ করে দিন, কেউ জিজ্ঞেস করলে আমার কথা বলবেন। হাতিরপুলে কাজী রফিকের বাসায় আমরা সবাই গিয়ে উঠলাম। এবং সেখান থেকে ডিউটি রুমে, সাভার টাস্মিটারে জানানো হলো সব প্রচার বন্ধ করে পালিয়ে যাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা দেশের রেডিও প্রচার বন্ধ হয়ে গেল।

রেডিও প্রচার বন্ধ হলে দেশের যে কী অবস্থা হয়, বুঝতে পারলাম। আমাদের চেয়ে বেশি বুঝতে পারলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের। পূর্ব এবং পশ্চিমের একমাত্র লিংক ছিল রেডিও। তারা অস্থির হয়ে উঠলো পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে তা জানার জন্যে। সারা রাত আমরা কাজী রফিকের বাসায় কাটালাম। ইতিমধ্যে আর্মি আমাদের পরিচালক সাহেবকে খুঁজে পেল এবং তার কাছে পুরোপুরি সারেন্ডার করলো। এই ছিল পাকিস্তান আর্মির প্রথম আত্মসর্পণ। তারা আশরাফুজ্জামানকে জানালো, 'আপনারা যা চান, যেভাবে চান পুরো ভাষণ প্রচার করুন, কিন্তু খোদার ওয়াস্তে রেডিও প্রচার চালু করুন। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার সবাই অস্থির হয়ে গেছে।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব এসে আমাদের জানালেন, 'আমাদের জয় হয়েছে। আর্মি পুরোপুরি আমাদের কাছে সারেন্ডার করেছে। আমি তাদের বলে দিয়েছি কাল সকালের আগে রেডিও চালু হবে না, এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পুরোপুরি প্রচার করতে দিতে হবে। তারা রাজি হয়েছে।' আশরাফাকুর রহমান খান পূর্ব ঘোষণা লিখে ফেললেন। প্রকৌশলী সবাইকে জানিয়ে দেয়া হলো সকালে

রেডিও খোলা হবে। সকাল থেকে ঘন ঘন ঘোষণার পরে আমার রেকর্ড করা সেই টেপ দুটো বাজানো হলো। পূর্ব পাকিস্তানের সব অঞ্চলের লোক সেই ভাষণ শুনে বুঝতে পারলো স্বাধীনতার ডাক দেয়া হয়েছে। তারা সবাই স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

এর পর বঙ্গবন্ধুর ইঞ্জিনিয়ারিং হলের ভাষণ, ২৩শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর

৩২ নং বাসায় দেয়া ভাষণ— সব রেকর্ড করে প্রচার করা হলো।

তারপর এলো সেই বিভীষিকাময় ২৫শে মার্চের রাত।

এর পূর্বে শেরাটন হোটেলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, ভূট্টো এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দরকাশকষি শুরু হয়েছে। আসলে তারা সময় নিচিল, সিভিলিয়ান ডেসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রেনে আর্মি আনার। এমনও কথা শোনা গেল ভূট্টো চাইছেন শেখ মুজিব হবেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং ভূট্টো হবেন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এমন অবাস্তব প্রস্তাবে শেখ মুজিব রাজী হলেন না। কোন মীমাংসা ছাড়াই ইয়াহিয়া ও ভূট্টো রাত ৮টা-৯টার দিকে ফিরে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে।

রাত ১২টার পর দেখতে পেলাম রাস্তা দিয়ে একের পর এক আর্মির ট্যাঙ্ক রেডিও অফিস এবং অন্যান্য জায়গায় এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু জানার আগেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। তারা যাকে যেখানে পেল গুলি করে মেরে ফেললো। সকালে জানা গেল ইন্ডেফাক অফিস, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বি ডি আর পিলখানা সব জায়গায় গোলাগুলি চলছে।

সকাল ৯টার দিকে আর্মি কমান্ড থেকে রেডিওর কর্মচারীদের রেডিওতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধুর কোন খবর পাওয়া গেল না, বেঁচে আছেন না নেই কেউ কিছু জানে না। রেডিওতে আমরা কাজ শুরু করলাম। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ঢাকা রেডিও থেকে তাহের সুলতান, আশরাফাকুর রহমান, আশরাফুল আলম, আরও অনেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেয়ার জন্য সীমান্তের ওপারে চলে গেল।

আমরা রেডিওতে থেকে সহযোগিতা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

আমার সহকর্মী জালালউদ্দিন রশমি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য রেডিও ছেড়ে দিল।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে পার্টানোর জন্য আমি এবং ফয়েজ চৌধুরী গণসঙ্গীত এবং দেশাভিবেদক গানের টেপ নিয়ে বাসে করে আর্মির চোখকে ফাঁকি দিয়ে নারায়ণগঞ্জে জালালউদ্দিনের কাছে দিয়ে আসতাম। রাস্তায় কতবার আর্মি আমাদের সার্চ করতো তার হিসাব ছিল না। যেহেতু আমি বহিপ্রচার বিভাগে কর্মরত ছিলাম, তাদেরকে বলতাম 'নারায়ণগঞ্জ আদমজী জুট মিলে কাজটাজ ঠিকমতো চলছে, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ

করছে এগুলো রেকর্ড করতে যাচ্ছি।' তারা বুঝতে পারতো না। ছেড়ে দিত।

রেডিওর পরিচালক আশরাফুজ্জামানকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সৈয়দ জিল্লার রহমান সাহেবকে আনা হলো। জিল্লার রহমান সাহেব আমাকে খুব মেহ করতেন। একদিন তার কক্ষে আমার ডাক পড়লো। সেখানে গিয়ে দেখি একজন আর্মি অফিসার বসে আছেন। জিল্লার রহমান সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি

কর্ণেল কাশেম, তোমার বিরুদ্ধে ইনার কিছু অভিযোগ আছে। তুমি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিশে দেশদ্রোহিতার কাজ করছো।'

আমি সুবোধ বালকের মতো অস্মিকার করলাম। কর্ণেল কাশেম তখন সরাসরি আমাকে প্রশ্ন শুরু করলেন। 'তুমি আওয়াজী লিগ কর। ৭ই মার্চের ভাষণ তুমি রেকর্ড করেছিলে, এবং তুমি মধ্যে শেখ মুজিবকে তার ভাষণ প্রচার করতে দিচ্ছে না লিখে জানিয়েছিলে। 'আমি বললাম, না, আমি লিখিওনি কাউকে জানাইওনি।' তখন জিল্লার রহমান আমাকে বাঁচানোর জন্যে বললেন, 'He is a pity officer, whatever he does he does with the permission of his director.' তখন কর্ণেল

কাশেম তার বিফকেস খোলার ভান করে আমাকে বললেন, 'আমার কাছে তোমার ছবি আছে, মধ্যে তুমি শেখ মুজিবকে চিরকুট দিচ্ছো।'

যেহেতু আমি দেই নাই।' তখন কর্ণেল আর বিফকেস খুললেন না। জিল্লার রহমান সাহেবের বললেন, 'সে Govt অফিসার, সে কোন পার্টি করে না, আমি তাকে খুব ভালভাবে জানি।'

জিল্লার রহমান সাহেবের কথায় কর্ণেল কিছুটো আস্তন্ত হলো। বললো 'ঠিক আছে, তুমি যা যা করেছো এবং যা যা জানো, একটা কাগজে লিখে আমার কাছে নিয়ে এসো।' আমি আসল কথা গোপন করে যিথে যা যা পারলাম লিখে দিলাম। কর্ণেল চলে গেলেন। জিল্লার রহমান সাহেবের আমার মামার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মামা জনাব আলি হাসান সিএসপি, তখন পাকিস্তানের

communication secretary ছিলেন। দু'জনে মিলে সেইদিনই আমাকে চট্টগ্রাম রেডিওতে বদলি করে দিলেন, এবং আমাকে বললেন, 'তোমার নাম আর্মির লিস্টে আছে। যে কোন মুহূর্তে তোমাকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যাবে এবং নঁখের ভিতরে সুই ফুটিয়ে কথা বের করে নেবে। তাই আজই তুমি চিটাগাং চলে যাও, আমরা এদিক সামলে নেবে।'

চট্টগ্রাম রেডিওতে গিয়ে জয়েন করলাম, কিন্তু সেখানে আমাকে কোন দায়িত্ব দেয়া হলো না। ওএসডি করে রাখা হলো। হয়তো

ঢাকা রেডিও থেকে আগাম জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাই সবাই আমাকে একটু এড়িয়ে চলছে বুঝতে পারলাম। কোন উপায় না দেখে ঢাকার বার্তা বিভাগের ফয়েজ চৌধুরীকে ফোন করলাম, 'Mother serious come sharp লিখে একটা টেলিগ্রাম পাঠ্যে দে। আমার এখানে ভাল লাগছে না, আমি ঢাকায় চলে আসি।' দুদিনের মধ্যেই টেলিগ্রাম পেয়ে গেলাম। সেটা ছিল ৭১ সালের অগস্ট মাস। বহু কষ্টে টেলিগ্রাম দেখিয়ে সাতদিনের ছুটি নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম। এসে দেখি রেডিওর গেটে জানিয়ে রাখা হয়েছে আমাকে যেন চুক্তে দেয়া না হয়। আমি রেডিওর সামনে শাহবাগ হোটেল, বর্তমান পিজি হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আলম, রফিক, ফয়েজ সবাই এসে আমার সঙ্গে দেখা করতো। তারা টেপ দিলে আমি যথারীতি নারায়ণগঞ্জে জালালের কাছে নিয়ে যেতাম। সেই যে চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলাম, আর ফিরে যাইনি। আমার স্কুল জীবনের বন্ধু সিরাজউদ্দীন ভুইঞ্চা মুক্তিযোদ্ধার সক্রিয় কর্মী ছিল। সে কখন কোথায় বোমা ফাটাতো আমার সঙ্গে আলাপ করতো। যেমন 'আজ শেরাটন হোটেলে, কাল আজিমপুর গার্লস স্কুলে বোমা ফাটাবো।' এইভাবে মুক্তিযোদ্ধারা অস্তির করে তুলেছিল সমগ্র দেশের ব্যবস্থাপনা। একটা মজার ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ছে। তখনও আমি রেডিওর ঢাকা অফিসে দায়িত্বরত। মুক্তিযোদ্ধারা বোমা মেরে ঢাকা বিমান বন্দরের রানওয়ে নষ্ট করে দিয়েছে, সব বিমান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটি বিমান রিলিফ সামগ্রী নিয়ে কোনমতে একটা রানওয়েতে নেমেছে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের তরফ থেকে জানানো হলো সমস্ত প্রচার মিডিয়া এটা সংগীরবে প্রচার করবে যে, এয়ারপোর্টে কিছুই হয়নি। সবই ঠিকমতো চলছে।

আর্মির ক্যাপ্টেন সব খবরের কাগজের সাংবাদিকদের এবং রেডিও থেকে আমাকে নিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে হাজির হলেন। আমাদেরকে দূর থেকে এয়ারপ্লেন দেখিয়ে বললেন 'আপনারা যান এবং প্রতিবেদন তৈরি করুন। সারা প্রথিবীকে জানিয়ে দিন দেশের অবস্থা ভাল, এয়ারপোর্টের অবস্থা ঠিকই আছে। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের propaganda সব মিথ্যা।' জনাব এবিএম মুসা সবার আগে, পিছে পিছে আমরা প্লেনের দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ পশ্চিম পাকিস্তান এক আর্মির সিকিউরিটি গার্ড আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, 'কিধার যাতা হ্যায়?' মুসা সাহেব বললেন, 'ও প্লেন কে পাস

যাতা হ্যায়। উসকা পাইলট কে সাথ বাতচিত কারেগা, নিউজ পেপার মে ছাপেঙ্গে।' 'নিউজ পেপার, ও কিয়া হোতা হ্যায়?' জিজ্ঞেস করলো আমাদের।

ভাবলাম ভাল লোকের পাল্লায় পড়া গেছে। মুসা সাহেব তাকে বুঝাবার জন্য বললেন, 'ও যো জংগ খাবর কা কাগজ (যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হতো), উস তারহা ইঁহাকা কাগজ মে ছাপেগা।' সে অন্য কোন কথাই বুঝলো না, শুধু জংগ কথাটা ধরে বললো, 'ইহা কোই জংগ-ওয়ং নেহি চালেগা, ভাগো।' আমি ভাবলাম আমাকে হয়তো যেতে দেবে। আমি রেডিও পাকিস্তানের কর্মচারী, হাতে টেপরেকর্ড। তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হাম রেডিও পাকিস্তান সে আয়া হ্যায়।' আমার দিকে তাকিয়ে বললো 'ও কোন সা পাকিস্তান হ্যায়? ইহা এক পাকিস্তান হ্যায়, দুসরা কোই পাকিস্তান নেহি - যাও ভাগো।' আমরা সবাই ফিরে এলাম, কিছুতেই যেতে দিল না। মুসা সাহেব বললেন, আমি এর প্রতিবাদ করবো। পরের দিন খবরের কাগজে ঠিকই বিমান অবতরণের কথা ছাপা হলো, কিন্তু প্রতিবেদন না করতে দেয়ার প্রতিবাদ সহ।

বাংলি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় ১৯৭১ এর ঢো ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। আমরা আমাদের ধানমন্ডির বাসার ছাদে উঠে আকাশে ভারতীয় মিগ আর পাকিস্তানের সেবার জেটের মধ্যে সামনাসামনি যুদ্ধ দেখতাম। মিগের গতির সঙ্গে কিছুতেই সেবার জেট পেরে উঠতো না। সেবার জেটগুলো একের পর এক গুলি খেয়ে ধোঁয়ার কুঙলী পাকিয়ে নিচে পড়ে যেত। অনেকে বাড়ির ছাদের উপর থেকেই সেবার জেটের প্রতি লক্ষ্য করে গুলি ছেঁড়া হতো।

৭ই মার্চ যেই রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই একই ময়দানে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী তাদের পাপের প্রায়চিন্ত করলো সম্প্রিলিত বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে। যে অত্যাচার অবিচার তারা করেছিল, সব কিছুর সমাপ্তি টানা হলো। জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সেই অমূল্য টেপ দুটো যুদ্ধ চলাকালীন নয় মাস স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রচার করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অনুগ্রামিত করার জন্য।

৬ মে ২০০৮

## দুই কঠবীরের গল্প

আমি রহমান পিয়াল

মার মুখে শুনেছি, 'কী বলব, শুধু মনে পড়ে মুঢ় হয়ে শুনতাম তার কথা, আত্মস্তু করতাম প্রতিটি লাইন।' এক বিশ করে রাখা কঠ! '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর আকাশবাণীর সংবাদ পরিদ্রমার টাপ্সমিশনের সময়টা রীতিমতো ঢোটস্থ ছিল মুক্তিকামী প্রতিটি বাঙালীর। '... পড়ছি বন্দোপাধ্যায়।'

কঠ শুনুন ইমিপসে

উৎসুক হয়ে শুনে যেত সবাই, তার রেশ রয়ে যেত অনেকক্ষণ। ফিসফিস আলোচনা। কাঁটাছেড়া। 'নাহ, দেবদুলাল যখন বলেছেন তখন ঠিকই বলেছেন' জাতীয় নিভরতা।

এমনই আরেকজন এম.আর.আখতার মুকুল। যুদ্ধকালে এয়ারে আসা মানেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রেডিওয়ে প্রায় কান মিশে ফেলা।

সূচনা সঙ্গীত শুনুন ইমিপসে

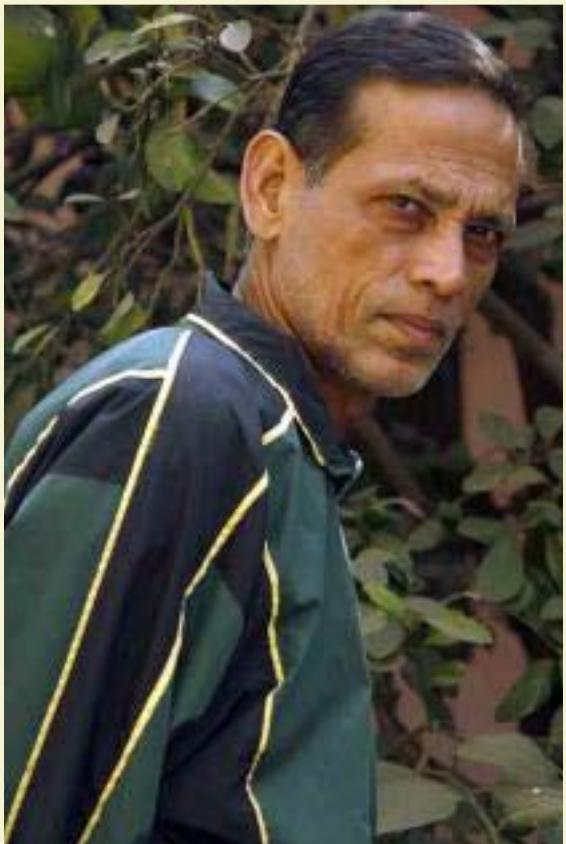
মুকুল ভাই পড়তেন দারচণ এক রম্যকথিকা। সে না শুনলে বোঝা যাবে না।

কথিকা শুনুন ইমিপসে

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে, স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে দারচণ এক উদ্দীপনা ছিল এই চরমপত্র। তার ভাষায়, 'এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি প্রতিদিন গঞ্জের ছলে দুরহ রাজনীতি ও রণনীতির ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রণাঙ্গনের খবরাখবর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করেছি।... লক্ষণীয় যে চরমপত্র অনুষ্ঠানে আমি মোটামুটিভাবে ঢাকাইয়া তথা বাঙাল ভাষা ব্যবহার করলো ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্ত সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি যথেচ্ছাবে বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছি।'

# যুদ্ধ শেষ করতে পারেননি আজম খান!

বিপ্লব রহমান



আমার নকশালাইট বড়ভাই মানব ৭০ দশকে যখন লম্বা চুল রেখে, বেলবটম প্যান্ট পরে, গিটার বাজিয়ে আজম খানের গান করতেন, তখন সেই শৈশবে পপ সম্প্রাট এই শিল্পীর গানের সঙ্গে পরিচয়। আরো পরে লংপ্রেয়ারে তার নানান হিট গান শুনেছি। তাকে আমি সামনা-সামনি প্রথম দেখি ১৯৮৬-৮৭ সালে, এইচিসিতে পড়ার সময়। বুয়েটের মাঠে কলসাট হচ্ছে—গাদাগাদি ভীড়, গাঁজার ধোঁয়া, 'গুরু, গুরু' জয়ধ্বনি, আর তুমুল হটগোলের ভেতর সেদিন শিল্পীকে ভাল করে চোখেই পড়েনি। তবু রাতে বন্ধুরা দল বেঁধে গান করতে করতে ফিরেছিলাম, হাইকোর্টের মাজারে, কতো ফকির ঘোরে, কয়জনা আসলও ফকির?...

মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলার রণাঙ্গনে তার মুক্তিযোদ্ধাদের গান গেয়ে শোনানোর কথা জানতে পারি 'একান্তরের দিনগুলি'তে। তো, আজম খান সব মিলিয়ে আমার কাছে এক বিবাট আইকন। শুধু মাত্র মুক্তিযুদ্ধকে ফোকাস করে শিল্পীর সঙ্গে কথোপকথনের জন্য আমি তার ফোন নম্বর খুঁজতে শুরু করি। এ পত্রিকা, সে পত্রিকার অফিসে খোঁজ করে কোথাও তার নম্বর পাই না। বিনোদন পাতার এক সাংবাদিক আমাকে জানালেন, তিনি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। আর তার বাসার ল্যান্ডফোনটিও অনেকদিন ধরে বিকল! তবু লোকেশন জেনে হাজির হই এক বিকালে তার উভর কমলাপুরের বাসায়। একটি দাঁড় করানো জুতোর বাক্সের মতো লম্বালম্বি পুরনো একচিলতে দোতলা ঘর। সরু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দরজা ধাক্কাতে একটি মেয়ে বের হয়ে এসে বললেন, "আকেল তো খুব অসুস্থ। আজ দেখা হবে না। আপনি কাল সকালে আসুন।" পরদিন সকালে আবার হামলা। এবার দরজা খোলা। নক করতেই সেই বিখ্যাত খনখনে গলা, "কে রে?"... আমি উঁকি দিয়ে অনেকটা ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়ি। একটা সালাম ঠুকে ভয়ে ভয়ে বলি আগমেনর হেতু।

শিল্পী তখন একটি খাটে শুয়ে পা দোলাচ্ছেন। পরনে একটি সাদা টি শার্ট আর ট্র্যাকিং প্যান্ট। ফর্সা, লম্বা আর হাইডিসার ফিগারে এই বয়সেও (৫৭) তাকে সুদর্শন লাগে। সব শুনে তিনি বলেন, "একান্তরের কথা কেউ মনে রেখেছে নাকি? আর তাছাড়া আমি

তো যুদ্ধ শুরু করেছিলাম মাত্র, শেষ করতে পারিনি। আমার যুদ্ধ ভারতীয় সেনারাই তো শেষ করে দিলো!"

শুরু হলো আনুষ্ঠানিক কথোপকথন। পুরো সময় শিল্পী শুয়েই রইলেন। মাঝে মাঝে বিছানার পাশে রাখা একটি গিটার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন। খুকখুকে কাশি দেখে বুঝি, তার শরীর বেশ খারাপ করেছে।...

"যুদ্ধে গেলেন কেনো" আমি জানতে চাই।

"১৯৬৮তে ছাত্রাবস্থায় আমরা বন্ধুবন্ধব মিলে গান করতাম। সেই সময় আমি গণসঙ্গীত শিল্পী গোষ্ঠী 'ক্রান্তি'র সঙ্গে যুক্ত হই। ঢাকায়, ঢাকার বাইরে গান করতে গেলে পুলিশ নানা রকম হয়রানি করতো।"

"১৯৬৯ সালে গণঅভ্যন্তরানের সময় দেশপ্রেম থেকে আমরা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ তৈরি করতাম। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ভয়ে বাসায় টেঁকা যেতো না। সেই সময় বন্ধু-বন্ধব দল বেঁধে সিদ্ধান্ত নিলাম, ঢাকায় থাকলে এমনিতেই মরতে হবে, তার চেয়ে যুদ্ধ করে মরাই ভাল। তখন সবাই একসঙ্গে যুদ্ধে যাই।"

"আম্মাকে বললাম, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। আম্মা বললেন, যুদ্ধে যাবি, ভাল কথা, তোর আবাবাকে বলে যা। আববা ছিলেন সরকারি চাকুরে। ভয়ে ভয়ে তাকে বললাম, যুদ্ধে যাচ্ছি। উনি বললেন, যাবি যা, তবে দেশ স্বাধীন না করে ফিরবি না! তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। একটা সালাম দিয়ে যুদ্ধে যাই। তখন আমার বয়স ২১ বছর।"

জানতে চাই, "মাসটি মনে আছে?"

"আরে নারে ভাই। যুদ্ধের সময় এতো মাস-তারিখ মনে রাখা সম্ভব নয়।... প্রথমে কুমিল্লা বর্ডার দিয়ে ত্রিপুরার আগরতলা যাই।

সেখান থেকে মেলাঘরে মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের সেক্টরে মেজর এটিএম হায়দারের কাছে দুমাস গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেই। কুমিল্লার সালদায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সম্মুখ সমরে সাফল্যের পর আমাকে ঢাকার গেরিলা যুদ্ধের দায়িত্ব দেওয়া হয়।”

“১৯৭১ সালে ঢাকার মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলা গ্রুপের সেকশন কমান্ডার হিসেবে আমি যাত্রা বাড়ি, ডেমরা, গুলশান, ক্যাটনমেন্ট এলাকাসহ বেশ কয়েকটি সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করি, এ সব যুদ্ধের নেতৃত্ব দেই।”

“মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিশেষ স্মৃতি?...”

আজম খান বলেন, “শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জাকিরের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। ঢাকার গোপীবাগে একজন আহত মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে সে পাকিস্তানী সেনাদের গুলিতে মারা যায়।... সে সময় জাকিরের মৃত্যুর খবর আমি গ্রুপের কাছে চেপে গিয়েছিলাম, নইলে তারা মনোবল হারাতে পারতো।”

অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “এই তো সেদিন ফকিরাপুলে আমার গ্রুপের একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখি, ফুটপাতে চা বিক্রি করছে! কি আর করবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যার ভেতর আছে, সে তো আর চুরি করতে পারে না!... মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো সরকারই তো মূল্যায়ন করেনি। এর পাশাপাশি অনেক বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধা সে সময় লুটপাট-ডাকাতি করেছে, বিহারীদের বাড়ি-জমি দখল করেছে, মা-বোনদের ইজতহানি করেছে। অনেকে ডাকাতি করতে গিয়ে গণপটুনিতে মারাও গিয়েছে।”

“আমি নিজেও এসব কারণে অনেক বছর নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেইনি।... বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধাদের কারণে জাতিও বহুবছর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানের চোখে দেখেনি।”

“স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কিভাবে সম্ভব?”

“অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কঠিন হয়ে গেছে” – কথা জানিয়ে শিল্পী বলেন, “এখন রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসরা সংগঠনিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী। একজন গোলাম আজমের বিচার

করলেই এদের ভিত্তি নির্মূল করা যাবে না। এদের যে বিস্তৃতি গত ৩৬ বছরে ঘটেছে, তাকে উৎখাত করা সত্যিই কঠিন। তবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একদিন না একদিন হতেই হবে।”

“স্বাধীনতার পর পরই এই বিচার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি, কারণ ভারত সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানী সেনাদের সসমানে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে এর পরের সরকারগুলো ক্ষমতার লোভে পাক সেনাদের সহযোগী যুদ্ধাপরাধীদের লালন-পালন করেছে।”

“কিন্তু তা না হয়ে ভারত যদি মুক্তিযুদ্ধে শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করতো, আমরা নিজেরাই যদি আমাদের যুদ্ধ শেষ করতে

**এই তো সেদিন ফকিরাপুলে আমার গ্রুপের একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখি, ফুটপাতে চা বিক্রি করছে! কি আর করবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যার ভেতর আছে, সে তো আর চুরি করতে পারে না!**

পারতাম, তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতো। নয় মাসে নয়, নয় বছর পরেও দেশ স্বাধীন হলে আমরা স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারতাম।”

“কিন্তু যুদ্ধাপরাধ কখনো তামাদি হয় না। তবে এদের বিচার বিলম্বিত হওয়ায় অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা এখন এখন হয়ে গেছে। তাই অনেক দেরিতে হলেও আন্তর্জাতিক আদালত বসিয়ে এর বিচার করা উচিত। এ জন্য সরকারের সদিচ্ছা ছাড়াও আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রয়োজন।”

“স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায়িত্ব সং ও দেশপ্রেমিক সরকারকেই নিতে হবে। তবে যতদিন এটি জাতীয় দাবিতে পরিণত না হবে, ততদিন কোনো সরকারই এই বিচার করবে না।”

এবার আমি পপ সমাটের গানের জগতে ফিরে আসি। সেখানেও

আমার জিজ্ঞাস্য মুক্তিযুদ্ধ, “আচ্ছা, আজম ভাই, মুক্তিযুদ্ধের পর ‘রেললাইনের ওই বস্তিতে’ বা ‘ফাস্টেশন’ -- ইত্যাদি গানে আপনার হতাশা ফুটে উঠছে কেনো? গানের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলো কেনো প্রকাশ পায়নি?”

“তখনকার প্রেক্ষাপটে এই সব গান করেছিলাম।... যে আশা নিয়ে আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম, যুদ্ধের পর আমাদের সে আশা প্রৱণ হয়নি। পাকিস্তান আমলে ঘূর্ণ-দুর্নীতি ছিল না। বাজারে সব জিনিসের একদর ছিল। আর যুদ্ধের পর ঘূর্ণ-দুর্নীতি, কালোবাজারী, লুটপাটে দেশ ছেয়ে গেল। সব জিনিমের দাম হ্রাস করে বাড়তে লাগলো। শুরু হলো ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ। আর বঙবন্ধু রক্ষিতাবাহিনী গঠন করে আরেকটি বড় ভূল করলেন। সারাদেশে শোগান উঠলো -- সোনার বাংলা শুশান কেনো?... এই পরিস্থিতিতে তখন ওই সব হতাশার গান।”

“এখন কী নতুন প্রজন্মকে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের গান, নতুন আশার গান শোনাবেন?”

হতাশা ছড়িয়ে পড়ে শিল্পীর গলায়, “এই প্রজন্মের কেউ তো মুক্তিযুদ্ধের গান শুনতে চায় না! এদের জন্য এই সব গান করে লাভ নেই। তারা তো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসই জানে না।... তবু এখন দেশ গড়ার গান করছি। দেশের দুঃসময়ে আমাদের আমি এই প্রজন্মকে অন্য এক মুক্তির গান শোনাতে চাই। কারণ এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার মুক্তি এখনো আসেনি।”...

\*

কথোপকথনের শেষ পর্যায়ে এসে হাজির হন সহকর্মী ফটো সাংবাদিক ফিরোজ আহমেদ। বাসার সঙ্গের খোলা ছাদে একটি বাতাবি লেবুর গাছ। ফিরোজ বললেন, “আইটেডোরে এখানেই ছবি ভাল হবে।” আমি বললাম, “আজম ভাই, সাদা জামাটা বদলে নেবেন না কী? রঙিন জামায় ছবি ভাল আসবে।”

তিনি শিশু সুলভ হাসি দিয়ে বললেন, “দাঁড়াও একটা সবুজ জ্যাকেট পরে আসি... বেশ খানিকটা ফিল্ড ফাইটার, ফিল্ড ফাইটার দেখাবে।”

শুরু হলো, আমাদের ফটোসেশন...

# মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

অমি রহমান পিয়াল

১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেছিলেন ওসমানী। ১৯৪০ সালের ৫ অক্টোবর দেরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি থেকে সামরিক শিক্ষা শেষ করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির 'আর্মি সার্টিস কোর' বিভাগে কমিশন লাভ করেন। দ্রুত পদোন্নতি দিয়ে ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্যাপ্টেন এবং পরের বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকিন্তি মেজর হন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান আসেন, এইদিনই তাকে লে. কর্ণেল পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৫১ থেকে ৫৫ পর্যন্ত খুলনা, যশোর, ঢাকা ও চট্টগ্রামের স্টেশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালের তখনকার ইপিআর-এর অতিরিক্ত কমান্ডায়ট (বর্তমানে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল) হিসেবে দায়িত্ব ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তাকে কর্ণেল পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কর্ণেল ওসমানী ডেপুটি ডিরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস সহ বিভিন্ন দায়িত্ব ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কর্ণেল পদমর্যাদায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে তিনি আওয়ামী লিগে যোগ দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখেন। সে বছর ডিসেম্বরে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লিগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সিলেটের ৪টি থানা (বালাগঞ্জ, ফেখুগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও বিশ্বনাথ) সমষ্টিয়ে গঠিত পাকিস্তানের বহুমত নির্বাচনী এলাকা থেকে নোকা প্রতীক নিয়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

## মুক্তিযুদ্ধের সময় ওসমানী

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তানী একটি কমান্ডো বাহিনী বনানীতে ওসমানীর বাড়িতে হামলা চালায়। কিন্তু ওসমানী সৌভাগ্যক্রমে পালাতে পারেন। এরপর ছদ্মবেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম কুমিল্লার সালদা নদীর অববাহিকায় পৌছে বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধের বাণিজী যোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমানকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে ওসমানী এক্ষিত লিস্টে আহুত হন। ১২ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করা হয়। এতে রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করা হয়। এবং

বাংলাদেশ সরকার এক ঘোষণায় ওসমানীকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে ১২ এপ্রিল থেকে মন্ত্রীর মর্যাদাসহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে। ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই মুজিবনগরে উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর গঠন করা হয়। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত দেওয়া হয়। তার পেশাগত ক্রমিক নম্বর ৮২১। একই বৈঠকে কর্ণেল আব্দুর রব সেনা প্রধান এবং গুপ্ত ক্যাপ্টেন একে খন্দকার উপ-সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পান। ওসমানীর এ.ডি.সি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় লেফটেন্যান্ট শেখ কামালকে (শেখ মুজিবের বড় ছেলে, পেশাভিত্তিক ক্রমিক নং-৮৬৫)। ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে অফিসার ক্যাডেট (১৯৪৪) দেওয়ান গাউস আলী। ২১ নভেম্বর '৭১ বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ সিদ্ধান্তে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমষ্টিয়ে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। আর এই কমান্ডের অধিনায়ক ছিলেন লে. জেনারেল জেগজিং সিং অরোরা। ওসমানী ছিলেন তার অধীনস্থ।

১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত এই কমান্ড কার্যকর ছিলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অরোরার কাছেই আত্মসমর্পণ করে। ১৫ ডিসেম্বর চাকার উপকর্তে এসে ঘাঁটি গাড়া মিত্রবাহিনীর জেনারেল মানেক শ'র কাছে পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল নিয়াজী এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃতি জানান। মানেক শ'র আত্মসমর্পণের সময় নির্ধারণ করে দেন।

## মুক্তিযুদ্ধে পর ওসমানী

স্বাধীনতার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতির প্রতি চরম ত্যাগ ও মহান সেবার স্বীকৃতি হিসেবে ওসমানীকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন, যা কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর দ্বিতীয় থেকে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের জাহাজ চলাচল, অভ্যরণী নৌ ও বিমান চলাচল মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ওসমানী। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আগের দায়িত্বসহ ডাক, তার, টেলিফোন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান তিনি। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে

একদলীয় (বাকশাল) রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার চালু হলে এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে আওয়ামী লিগ ও সংসদ সদস্য থেকে পদত্যাগ করেন। ২৯ আগস্ট ১৯৭৫ সালে দেশে সামরিক শাসন চলাকালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন এবং ৩ নভেম্বর পদত্যাগ করেন। ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনতা পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯৭৮ ও ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং হেরে যান। ১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ক্যাপ্সারে আক্রান্ত ওসমানী লড়নে মৃত্যুবরণ করেন।

**তথ্যসূত্র :** মুজিব নগর সরকারের দলিল পত্র, বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান/ এএসএম সামুদ্র আরেফীন, মুক্তিযুদ্ধ কোষ/মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, জন্মযুদ্ধ

## কিছু বিতর্ক

তথ্যপ্রমাণেই বোবা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক পদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জায়গায় প্রধান সেনাপতি ওসমানীর আসার প্রশ্নই ওঠে না। মুক্তিযুদ্ধের পর ওসমানী অবমূল্যায়িত হয়েছেন এটা ও সত্য নয়। কেনো ওসমানীকে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি এ নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়।

**মার্কিন অধিদপ্তরের প্রকাশিত দলিলপত্রে (ইম্পিসে দেখুন)**

দেখা যায় যে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে যে দাবিগুলো তুলেছিল তাতে ১ নম্বরে ছিল শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি। ৩ নম্বরে বলা হয়েছে পাকিস্তানে অবস্থানরত সব বাঙালী সৈনিকের দেশে ফিরে আসার সুযোগ এবং ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করা। আগেই বলা হয়েছে যৌথ কমান্ডের নেতৃত্ব ছিলো অরোরার হাতে। বাংলাদেশের পক্ষে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-সেনাধ্যক্ষ একে খন্দকার। এখন কেন ছিলেন না ওসমানী- এর কেনো ব্যাখ্যা নেই। তিনি থাকতে না পারার জন্য কখনও মন খারাপ করে কোনো বিরুদ্ধ দেননি, লেখেনওনি কোথাও যা দলিলাকারে পাওয়া যাবে।

# ভিনদেশী মানুষ, আমাদের বীরপ্রতীক

হাসান মোরশেদ

ড্রিউ এ এস ওডারল্যান্ড (W. A. S OUDERLAND) একজন ভিনদেশী। জন্ম নেদারল্যান্ডে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রয়েল ডাচ বাহিনীর সাহসী সার্জেন্ট। নাঃসীদের হাতে ধরা পড়ে কোশলে প্রাণে বেঁচে যাওয়া। সবশেষে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী হওয়া এবং ২০০১ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

কী আর এমন গুরুত্বপূর্ণ? বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য? হ্যাঁ। গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই! কারণ এই লোকটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন বীরপ্রতীক। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সাহসী অবদানের জন্য এই ভিনদেশী বীরপ্রতীক উপাধি পেয়েছিলেন। বাটা কোম্পানীর তৎকালীন পূর্ব পার্কিস্টানের চিফ ওডারল্যান্ড বাটার কারখানার ভেতর মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ট্রেনিং দিতেন। পশ্চিমা নাগরিকদের সুযোগ নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দিতেন যোদ্ধাদের। এক পর্যায়ে নিজেই অংশগ্রহণ করেন সরাসরি যুদ্ধে। ওডারল্যান্ড সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য আছে নিচের লিংকে-

লিংক

যুদ্ধাপরাধী ও ঘাতকেরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পায় আইনের মারপ্যাঁচে। গর্ডন গ্রিনিজ নামের এক বেতনভোগী কর্মচারীর পায়েও লুটিয়ে দেয়া হয় দেশের নাগরিকত্ব। অথচ এ দেশের জন্য যুদ্ধ করেও ওডারল্যান্ডের সে সৌভাগ্য হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ সৈনিকদের খুব চমৎকার সমাধি সৌধ আছে এই দেশে। এ দেশের জন্মযুদ্ধে প্রাণ দিল যে ১৪ হাজার ভারতীয় সৈনিক। অথচ না, তাদের সম্মানে কোনো সমাধি নেই! কোনোদিন তাদের কথা উচ্চারণ করা যাবে না। ১ মাস ভারতের সাধারণ মানুষ বাংলাদেশীদের আশ্রয় দিল, খাদ্য দিল উদ্বাস্তদের। কিন্তু না, সে কথা ভুলেও উচ্চারণ করা যাবে না! কৃতজ্ঞতার বোৰা এতই ভারী!!!



## Life sketch of W.A.S. Ouderland, Bir Pratik

Mr W A S Ouderland was born in December 1917 in Amsterdam, The Netherlands.

He started work with the Bata Show Company. He was called up to serve as a sergeant in the Dutch Royal Signals Corps on the eve of Nazi invasion in 1940.

He was taken prisoner by the Nazis, but he soon escaped from the POW camp and joined the Dutch resistance. He spoke fluent German, which helped him keep the resistance as well as the Allied forces abreast of German movements.

Following the end of the World War II, he returned to work for Bata. He was posted as the CEO of Bata operation in the then East Pakistan on the eve of our War of Liberation. Brutal repression and occupation of unarmed Bangladeshis by the

Pakistani occupation army reminded him of the similar brutalities perpetrated by the Nazis in occupied Europe. He fully appreciated the legitimacy of Bangladeshi resistance against the brute forces of occupation.

He felt the acute need to make the world aware of the extent of genocide. As he was able to move freely as a foreigner, he took photographs of the atrocities committed by Pakistanis and their agents. He then passed these photographs to the world press.

As CEO of a major multinational, he enjoyed close access to higher echelon of the occupation forces.

Indeed, he had close personal relationship with Gens Tikka Khan and Niazi. He maintained the appearance of friendship to the Pakistani top brass in order to avail sensitive information. He then passed these vital information on to the Mukti Bahini.

As the War progressed, he secretly began to train and assist local youths around the Tongi area in the art of guerilla resistance. He sent his family away from occupied Bangladesh so that he could turn his residence into a safe haven for our freedom fighters and their weapons.

He was awarded gallantry award Bir Pratik for his contribution to our War of Liberation.

Mr Ouderland remained in Bangladesh till 1978 and was transferred to Australia thereafter. He later settled in Australia and died after prolonged ailment at the age of 84 in a hospital at the Western Australian city of Perth on 18 May 2001. His love and concern for Bangladesh was undiminished until his last days.

# বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা : স্বীকৃতিহীন এক অধ্যায়

## ফরহাদ উদ্দিন স্বপন

এ বিষয়ে কোন সদেহ নেই যে, মুক্তিযুদ্ধ বাসালীর হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম আর স্বাধীনতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অর্জন। হাজার বছর না বলে সর্বকালের বললেও অতুল্য হবে না। কেবলমাত্র মীরজাফরের বংশোদ্ধূত গুটিকয়েক জারজ সন্তান (সাধারণ অর্থে যাদেরকে রাজাকার বলে জানি) ছাড়া আপামর সব বাসালী এ সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। রাজনীতিবিদ, সৈনিক, শিক্ষক, ছাত্র, ক্ষমক, দিনমজুর, ক্ষেত্রমজুর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবার প্রচেষ্টাই এই সংগ্রামকে দিয়েছিলো সফলতা। এটাকে সংগঠিত কোন নির্দিষ্ট বাহিনীর সংগ্রাম না বলে আপামর জনগণের প্রচেষ্টা বললেই সত্যিকারের সত্য কথা বলা হবে। নিঃসন্দেহেই এটা একক কোন অর্জন ছিল না।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে যখন স্বীকৃতির প্রশংস্তি আসলো, তখন দেখা গেলো যে, মুক্তিযুদ্ধের সেই বৃহৎ অংশের প্রচেষ্টা, ত্যাগ, রক্তদান সব আমাদের অলক্ষ্যে চলে গেল। বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত ৭ মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে দেশের বেসামরিক জনগোষ্ঠীর সেই যোদ্ধাদের একজনও নেই, যারা কোন পেশাদারী দায়বদ্ধতা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজের দেশমাত্কার সম্মান রক্ষার্থে যারা যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের সার্বিক সমর্থন, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ ছাড়া। আমি শুধু সেইসব অপেশাদার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি চাইছি, যারা ইতোমধ্যেই স্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছেন। এদের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খণ্ডিতই থেকে যাবে। একটি সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতেই স্বীকৃতি দেয়া উচিত সেইসব অপেশাদার বেসামরিক যোদ্ধাদের, যারা সম্পূর্ণ বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকেই নিজের মায়ের সম্মানের স্বার্থে যুদ্ধ করেছিলেন এবং জীবন দিয়েছিলেন। স্বীকৃতি দেয়া উচিত সেই সমস্ত মহৎপ্রাণ লোকদের, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, খাদ্য দিয়েছিলেন, আর্থিক সাহায্য করেছিলেন এবং শুধুমাত্র এই কারণে হানাদার বাহিনী কিংবা তাদের দোসররা তাদের বাড়ি-ঘর জালিয়ে দিয়েছিলো, উদ্বাস্তু করেছিলো। স্বীকৃতি দেয়া উচিত সেইসব শহীদ বুদ্ধিজীবীদের, ধর্মের আফিম খাইয়ে ঘুমিয়ে রাখা একটি জাতিকে জাগ্রত করার দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পূর্ণত দিতেই ভুলে যাওয়া এই সমস্ত বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে খণ্ডিত দেখতে চাই না। যদি সেটা বাস্তবেই ঘটে যায়, তবে আমাদের জন্য জাতি হিসেবে এর চেয়ে লজ্জার কী আর থাকতে পারে? নিশ্চিতভাবেই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতির কপালে এ কলঙ্ক শোভা পায় না।

অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং সে সময়ের সামরিক বাহিনী আমাদের গর্ব, আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আমাদের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। কিন্তু আমরা জানি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীতে এ অঞ্চলের জনগণের লোকজনের উপস্থিতি অবোধিতভাবেই নিষিদ্ধ ছিলো। ক্ষেত্রবিশেষে নিয়োগ দিলেও উচ্চপদে নিয়োগ দিতো না। তিনি বাহিনীর কোন সদর দপ্তরই তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো না। কাজেই বিষয়টি পরিষ্কার, তখন আমাদের সামরিক বাহিনী কোন অবস্থায়ই একটি সংগঠিত বাহিনী ছিলো না। এরকম এক অসংগঠিত সামরিক বাহিনী দিয়ে কোন অবস্থায়ই পাকিস্তানিদের মতো একটি সংগঠিত বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব ছিলো না, যদি না পেশাদারি দায়বদ্ধতা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজের দেশমাত্কার সম্মান রক্ষার্থে যারা যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের সার্বিক সমর্থন, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ ছাড়া। আমি শুধু সেইসব অপেশাদার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি চাইছি, যারা ইতোমধ্যেই স্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছেন। এদের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খণ্ডিতই থেকে যাবে। একটি সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতেই স্বীকৃতি দেয়া উচিত সেইসব অপেশাদার বেসামরিক যোদ্ধাদের, যারা সম্পূর্ণ বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকেই নিজের মায়ের সম্মানের স্বার্থে যুদ্ধ করেছিলেন এবং জীবন দিয়েছিলেন। স্বীকৃতি দেয়া উচিত সেই সমস্ত মহৎপ্রাণ লোকদের, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, খাদ্য দিয়েছিলেন, আর্থিক সাহায্য করেছিলেন এবং শুধুমাত্র এই কারণে হানাদার বাহিনী কিংবা তাদের দোসররা তাদের বাড়ি-ঘর জালিয়ে দিয়েছিলো, উদ্বাস্তু করেছিলো। স্বীকৃতি দেয়া উচিত সেইসব শহীদ বুদ্ধিজীবীদের, ধর্মের আফিম খাইয়ে ঘুমিয়ে রাখা একটি জাতিকে জাগ্রত করার দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পূর্ণত দিতেই ভুলে যাওয়া এই সমস্ত বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে খণ্ডিত দেখতে চাই না। যদি সেটা বাস্তবেই ঘটে যায়, তবে আমাদের জন্য জাতি হিসেবে এর চেয়ে লজ্জার কী আর থাকতে পারে? নিশ্চিতভাবেই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতির কপালে এ কলঙ্ক শোভা পায় না।

## মুক্তিযুদ্ধে শহীদের বাস্তব সংখ্যা : কিছু পরিসংখ্যান

### রাশেদ

মাঝেমাঝেই একটা প্রশ্ন উঠতে দেখি মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে। কেউ কেউ মানতে রাজি না ৩০ লক্ষ শহীদের ব্যাপারটা। যদিও এই বিষয়ে বেশ কিছু প্রমাণ রয়েছে।

Donald Beachler তাঁর “The politics of genocide scholarship: the case of Bangladesh” (Patterns of Prejudice, 41:5, 2007, pp467 - 492) জার্নাল পেপারে এই বিষয়ে বিশদ কিছু তথ্য তুলে ধরেন এবং তিরিশ লক্ষের ব্যাপারটা জাস্টিফাই করেন। নিচে তার কিছু চুম্বক অংশ তুলে ধরলাম।

আমেরিকান পলিটিক্যাল সাইন্টিস্টস Richard Sisson and Leo E. Rose (গণহত্যা হয়েছিল তা তারা স্বীকার করেন নি) বলেছিলেন প্রায় তিনি লক্ষের মত মানুষ মারা গিয়েছিল [১]। Kalyan Chaudhuri বলেছিলেন ১২,৪৭,০০০ এর মত মানুষ মারা গিয়েছিল যদিও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তার হাতে কমপ্লিট ডেটা ছিল না [২]। R. J. Rummel হিসেব করেছিলেন দেড় মিলিয়নের মত মানুষ মারা গিয়েছিল [৩]। কিন্তু এইসব তথ্যই ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। সাংবাদিক Sydney Schanberg হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, বিদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা আর বিদেশি পর্যবেক্ষকদের মতামত নিয়ে, পাকিস্তানি আর্মিদের হাতে নিহত হওয়া সব মানুষকে গণনা করলে ম্তের সংখ্যা ৩ মিলিয়নই হবে [৪], যা শেখ মুজিবের রহমান তাঁর ভাষণে বলেছিলেন। তিনি মিলিয়নের সপক্ষে আরেকটি বড় দলিল

# একটি নির্বিকার ন্যস্ততার গল্প

রিয়াজ শাহেদ

আক্ষণবাড়ীয়ায় আমার দাদার বাড়ি। মুক্তিযুদ্ধের সময় দাদার বয়স প্রায় সত্তর, অন্ত হাতে যুদ্ধে অংশ না নিলেও বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। একদিন বেরিয়েছেন বাজার করতে, সাথে প্রতিবেশী বন্ধু। বাজার করে ফিরে আসার সময় পড়ে গেলেন পাকবাহিনীর একটা ট্রাকের সামনে। আতংকজাগানিয়া ট্রাকটা রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে প্রায় দশ-পনেরো জন খানসেনার সাথে এলাকার চিহ্নিত আলবদর বাহিনীর কয়েকজন সদস্য বসে আছে। দাদাদেরকে দেখে তাদের কোন ভাবান্তর হলো না বলেই মনে হলো, একজন শুধু দাদার হাতে ধরা বাজারের থলেটার দিকে ইঁগিত করে কিছু একটা বললো।



দাদারা ট্রাকটা পার হয়ে বেশ কিছুদুর চলে এসেছেন, এমন সময় হঠাৎ গুলির আওয়াজ; দাদা দেখলেন তার ছেটখাটো বন্ধুটি একটা ঝাঁকি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। দাদা বুঝতে পারছেন বন্ধুটি এখনো মারা যায়নি, বাজারের ব্যাগ ফেলে দাদা তাকে ধরে উঠনোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পেছন থেকে আসা একটি কঠস্বর শুনে তাকে থেমে যেতে হলো, “ঐ অরে ধরবিনা খবরদার, দেখতাছসনা স্যারেরা প্র্যাকটিস করতাহে? একটু পরে অপারেশন আছে।” দাদা ফিরে তাকালেন; ট্রাকের ভেতর বসা এক আলবদর বলেছে কথাগুলো। এক পাকসেনা হাত দিয়ে দাদাকে ইশারা করলো সরে যেতে। তখনো পর্যন্ত দাদা বুঝে উঠতে পারেননি একটু পরে তার চোখের সামনে প্রথিবীর সবচেয়ে নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা হতে চলেছে।

দাদাকে বন্দুকের ইশারায় তার বন্ধুর কাছ থেকে সরানো হলো। এবার একজন একজন করে পাকসেনা দাদার বন্ধুটিকে লক্ষ্য করে নিশানা প্র্যাকটিস করা শুরু করলো। আলবদরগুলো হততালি মেরে তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে। তখন প্রায় দুপুরবেলা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, যতদূর দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাট পুরো ফাঁকা, তার মাঝে শুধু একটি ট্রাকের ভেতর কিছু পথভঙ্গ মানুষ আর রাস্তায় আমার দাদা, আর হঠাৎ করেই প্রথিবীর সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষে পরিগত হওয়া দাদার সেই বন্ধু, জীবিত না মৃত বোৰা যায়না। দুয়েকটা শকুনও কি ওড়ে আসন্ন ভোজের অপেক্ষায়? পুরো ব্যাপারটিকে কোন পরাবাস্তব জগতের দৃশ্য বলে মনে হয়।

অবশেষে একসময় শেষ হয় খানসেনাদের এই উৎসব। দাদার বন্ধুটিকে মানুষ হিসাবে আর চেনা যায় না, অনেক লাল রঙ দেয়া একটা গোল বলের মতো মনে হয়। দাদা ভেবে পাননা কী করে তিনি এই লাল বলটিকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। সমাধান দেয় এক আলবদর, “অক্ষণ চইলা যা, অইটারে নিবিনা, স্যারেরা আরো প্র্যাকটিস করব পরে।”

২৬ মার্চ ২০০৮

আসে এ. এম. এ. মুহিতের কাছ থেকে। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছিলেন তিনি মিলিয়নই মারা গিয়েছিল যুদ্ধের সময়ে [৫]।

আরেকটি খুব শক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় ড. মাহবুবুর রহমানের “বাংলাদেশের ইতিহাসঃ ১৯৪৭-৭১” বইয়ের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস অধ্যায় থেকে (পৃ. ৩১০)। জনসংখ্যার হিসেব করলেই এটি স্পষ্ট কতজন মারা গিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৬৯৮ লাখ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনা করলে ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে জনসংখ্যা ৮০১ লাখ হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল ৭৬৪ লাখ। যা প্রায় ৩৭ লাখ কম ছিল। তাই ৩০ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল যুদ্ধে এটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। ছবিতে দেখুন।

ড. মাহবুবুর রহমান বিষয়ক তথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতাঃ এম এম আর জালাল, অমি রহমান পিয়াল

#### রেফারেন্স

1. Sisson and Rose, War and Secession.
2. Kalyan Chaudhuri, Genocide in Bangladesh (Bombay: Orient Longman 1972)
3. R. J. Rummel, Death by Government (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers 1997)
4. Sydney H. Schanberg, “Bengalis land a vast cemetery”, New York Times, 24 January 1972, 1
5. A. M. A. Muhith, Bangladesh: Emergence of a Nation, (Dhaka: University Press 1992)

২৬ মার্চ ২০০৮

## 2 Gunmen Assassinate Ex-East Pakistan Chief

Special to The New York Times

**KARACHI, Pakistan, Oct. 14—**Abdul Monem Khan, former Governor of East Pakistan, died today in the Dacca Medical College Hospital of gunshot wounds inflicted by two men who visited his home in Dacca, the East Pakistani capital, last night. The assailants, after talking with him for some time, suddenly fired and escaped. They left a grenade in his house.

Mr. Monem Khan, 72 years old, was Governor of East Pakistan for more than six years in the nineteen-fifties during the regime of President Mohammad Ayub Khan.

According to a Pakistani news agency, Mr. Monem Khan was regarded as the unofficial adviser of Dr. A. M. Malik, civilian Governor of East Pakistan, and "therefore he might have become a target" of Bengali separatists, or "Indian agents" as they are officially described.

১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত সংবাদ, এম আর জালালের সংগ্রহ থেকে

# অপারেশন মোনায়েম খান কিলিং

## বিপ্লব রহমান

তার সঙ্গে আমার পরিচয় বছরচারেক আগে দৈনিক যুগান্তরে কাজ করার সময়। তখন বন্যায় ঢাকার নিম্নাঞ্চল ডুবতে শুরু করেছে। মোজাম্বেল হক, বীর প্রতীক (৫০) আবার ঢাকার উপকণ্ঠ ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান। তো বন্যা দুর্গত আর ও ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে তিনি তখন খুব ব্যস্ত। কালো রঙের একটি সেত তোলা টুপি পড়ে দিনরাত মোটর সাইকেল দাবড়ে বেড়াচ্ছেন।

আমি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সাহসী ভূমিকার কথা আগেই জেনেছিলাম পত্রিকা পড়ে। সে সময় তাঁর ব্যস্ততার কারণে অবশ্য এ নিয়ে কথা হয়নি। তবু পেশাগত সম্পর্কের বাইরে এক ধরনের শুদ্ধাপূর্ণ বন্ধুত্ব হয়। মানুষ হিসেবে তিনি খুব স্পষ্টবাদী, কাউকে তোয়াক্ষ করা তার ধাঁতে নেই।

সে সময় একগাদা সাংবাদিকের সামনে এক দুপুরে চরম বিরক্তির সঙ্গে তিনি বলেই ফেললেন, খোকা ভাই (মেয়র সাদেক হোসেন খোকা) আসবেন বিকালে। এর আগে ত্রাণ দিতে উনি নিষেধ করেছেন। মেয়র হিসেবে উনি ত্রাণ কাজের উদ্বেগ্ন করতে চান! আরে মিয়া, সেই সকাল থেকে বন্যার্তরা এক হাতা খিচুড়ি খাওয়ার জন্য রোদের মধ্যে বসে আছে। খিদা কি আর এই সব মেয়র-ফেয়র, আর টিভি ক্যামেরা বোরো? ত্রাণ লাগাও, ত্রাণ লাগাও। মেয়র আসলে তখন দেখা যাবে!" তার নির্দেশে তখনই খিচুড়ি বিতরণ শুরু হয়ে যায়।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা আর পুলিশ কর্মকর্তারা কী যেনো তাকে বোঝাতে চান, মাইকের শব্দে ভাল করে বোঝা যায় না। মোজাম্বেল ভাই শুধু মাথা নাড়েন। মাছি তাড়ানোর মতো বার দুয়েক হাত নাড়েন নেতা আর পুলিশ কর্তাদের উদ্দেশে।

জনপ্রিয় এই মানুষের সঙ্গে ঘন্টা তিনেক আলাপচারিতা হয় সেদিন। বিষয় -- মহান মুক্তিযুদ্ধ। প্রিয় পাঠক, আসুন তারই বয়ানে শুনি, ১৯৭১ এর সেই আগুন ঘারা দিনগুলোর কথা। শুনি, কিশোর মুক্তিযোদ্ধার সেই দুর্দশ অপারেশন মোনায়েম খান কিলিং' এর কথা।...

১৯৭১ সালে আমি শাহীনবাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স মাত্র ১৪ বছর। বাড়া, ভাটারা, ছেলমাইদ তখন পুরোপুরি গ্রাম। মাইলের পর মাইল ধানের ক্ষেত, খাল-বিল-জলায় বিস্ত

ৰ্ণ এলাকা। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও তখন খুব কাছে মনে হয়। পাকিস্তানী সেনারা প্রায়ই আমাদের গ্রামের আশেপাশের মাঠে প্রশিক্ষণ নিতো।... আমার বাপ-চাচারা সবাই কৃষক, নিরক্ষর মানুষ। আমরা স্কুলে পড়ি। পড়ার ফাঁকে তাদের কৃষিতে সাহায্য করি, গরু চরাই।

'২৫ মার্চের রাতে বাবা ধানিজমিতে সেচ দিচ্ছিলেন। আমি গিয়েছি তাঁর জন্য খাবার নিয়ে। হঠাৎ ক্যান্টনমেন্ট থেকে গুলির শব্দ। মর্টারের ফায়ার আর ফেয়ার গানের আলোয় পুরো আকাশ মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে।... বাবা বললেন, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চল।'

আমি তাকে জিজেস করি, 'আপনি ওই বয়সে যুদ্ধে গেলেন কোন চেতনা থেকে?'।

তিনি বলেন, 'তখন ওই বয়েসেই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পাক সেনাদের অত্যাচারের বেশ কিছু কথা আমরা শুনেছিলাম। গ্যারিসন সিনেমা হলে স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন আমাদের গ্রামের এক লোক। পাক সেনারা তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে তার স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে। এছাড়া আমাদের গ্রামের পাশে প্রশিক্ষণ নিতে এসে তারা সদ্য প্রসূতি আরেক গ্রহবধূকেও গণধর্ষণ করে।'

'আমরা বাসে চড়লে অবাঙালী কন্ডাটর-হেল্পারা আমাদের সিট থেকে তুলে দিয়ে বিহারীদের সেই সিটে বসতে দিতো। তাছাড়া সে সময়ের ছাত্রলাইগ নেতা, বিকমের ছাত্র আনোআর হোসেন (বীর প্রতীক) ভাই আমাদের বলতেন, পূর্ব পাকিস্তানে কাগজের কল হওয়া সত্ত্বেও এখানে কাগজের দিস্তা যথন ১৪ আনা, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কাগজের দাম ছিলো ৬ আনা। বাবার কাছে শুনেছিলাম, ১৯৬১-৬২ তে পাকিস্তান সরকার আমাদের তিন একর জমি অধিগ্রহণ করে মাত্র দেড় হাজার টাকা দাম দিয়েছিল।'

'আনোয়ার ভাই বলতেন, দেশ স্বাধীন করে বাঙালিদের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে এই সব অত্যাচার থেকে মুক্ত পাওয়া যাবে না। ২৫ মার্চের পর রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবরে শুনতাম

পাক সেনাদের বর্বরতার কাহিনী। শুনতাম মুক্তিবাহিনীর অগ্রাহ্যতার খবর। এ সবই আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত করেছে।'

মোজাম্বিল হক বলে চলেন, 'আমি অন্য তিন চাচাতো ভাই আজাহারুল ইসলাম বকুল, গিয়াস উদ্দিন ও আবু সাঈদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, এক রাতে রহিমুদ্দীন ও আনোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে কুমিল্লা বর্ডার দিয়ে ত্রিপুরা যাবো। সেখানে টেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করবো। কিন্তু পরিকল্পনা বাড়িতে আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আমি, বকুল আর সাঈদ পালাতে পারিনি। অন্য ঠিকই ত্রিপুরা চলে গিয়েছিলো।'

'এদিকে আমার মন মানে না। স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর শুনি, দেশের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। মনে হয়, সব তরঙ্গ-যুবারা যুদ্ধ করছে, আর আমরা মায়ের আঁচলের ছায়ায় আরাম-আয়াশে আছি। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। ১০-১৫ দিন বাড়িতে বসে থাকার পর আমি আর সাঈদ আবার যুক্তি করলাম, বাড়ি থেকে পালাবো, যুদ্ধে যাবো। এবার বাবা-মাকে বললাম, যদি টাকা-পয়সা দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি না দাও, তাহলে টাকা-পয়সা ছাড়াই বাড়ি থেকে পালাবো। তখন বাপ-চাচাৰা পরামর্শ করে টাকা-পয়সা দিয়ে আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত বাড়ির সম্মতিতে যুদ্ধে যান?'

'হ্যাঁ, আমি আর সাঈদ কিছু টাকা জুতোর ভেতর আলাদা করে লুকিয়ে, জামা-কাপড় গুছিয়ে এক রাতে রওনা হই। নরসিংহী পর্যন্ত বাসে, তারপর লপ্তে কমিল্লার নবীনগর। শুনেছিলাম, কুমিল্লাৰ সিএনবি রোড পার হলেই ত্রিপুরাৰ বর্ডার। পথে পথে শত শত মানুষৰে দেখা পাই, যারা পরিবার-পরিজন নিয়ে দলে দলে শারণার্থী হিসেবে ভারত যাচ্ছেন। কেউ বা আবার যাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। কুমিল্লা পৌছে আমরা একটি রিকশা ভাড়া নেই সিএনবি রোড যাবো বলে।'

'কিন্তু রিকশাওয়ালা আমাদের ঘূরপথে নিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যা করে ফেলে। তখন আমরা রিকশা ছেড়ে দিয়ে হাঁটা শুরু করি। পথ-ঘাট কিছুই চিনি না। এক লোক আমাদের এসে বলে, আপনারা আমার বাসায় চলেন, রাতটা কাটান, ভোরে আমরাই আপনাদের বর্ডার পার করে দেবো। আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক।'

'উপায় না দেখে আমরা সেই রাতে ওই লোকের বাসায় উঠি। রাতে খাবারের জন্য একটা মোরগ কিনবে বলে সেই লোক আমাদের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেয়। সারারাত বর্ডারে মৰ্টার বিনিময়ের শব্দ শুনি। গোলাগুলি বন্ধ হলে ভোরের দিকে দুজন লোক আমাদের সিএনবি রোডে নিয়ে যায়। তারা গোমতি নদী দেখিয়ে বলে, ওই পারে ইভিয়া। লোক দুজন আমাদের পকেটে হাতড়ে টাকা-পয়সা সব রেখে দেয়। জুতার ভেতরে লুকানো সামান কিছু টাকা তখন আমাদের শেষ সম্ভল।'

'লুঙ্গি পরে ছেটে গোমতি নদী হেঁটে পার হই। ত্রিপুরা সীমান্তের উঁচু পাহাড় দেখা যায়।'

আমি বলি, 'তাহলে, সীমান্ত পার হয়ে টেনিং নিলেন। আর যুদ্ধ শুরু হলো?'

'আরে নারে ভাই, অত সহজে হয় নাই। প্রথমবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি। ওপারে গিয়ে কোনাবন হয়ে কলেজটিলা টেনিং ক্যাম্পে পৌঁছাই। সেখানে ক্যাম্প চিফ ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা রশিদ ভাই। সেখানে আমাদের ১৫ দিন রাখা হয়। থাকা-খাওয়ার অবস্থা আর বলতে! খাবার বলতে শুধু ডাল আর ভাত। আর ডাল যে দুর্গন্ধ হতে পারে, তা বলার নয়। আমরা রশিদ ভাইকে অতিষ্ঠ করে মারি, ভাই, আমাদের টেনিংয়ে পাঠাবেন না?'

তিনি আমাদের পাঠালেন পাশের নির্ভয়পুর টেনিং ক্যাম্পে। সেখানে পৌঁছে দেখি, ক্যাম্পের নামই শুধু নির্ভয়পুর, আসলে নবাগতদের ভয় পাওয়ানোর মতো সব রকম ব্যবস্থাই সেখানে আছে। টেনিং নিতে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সবার 'চোখ উঠেছে'। জুর আর ডায়ারিয়ায় একেকজনের অবস্থা কাহিল। পরিষ্ঠিতি দেখে নামধার রেজিস্ট্রি করার আগেই আমার চাচাতো ভাই বেঁকে বসে। সে আমাকে বলে, চল, আমরা পালিয়ে দেশে ফিরে যাই। এখানে টেনিং নিতে গেলে আর বাঁচতে হবে না। যুদ্ধের আগেই অসুখে এখানেই আমাদের মরতে হবে!... তার কথা শুনে আমি সত্যি সত্যি ভয় পাই। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা চোরের মতো পালিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আবার গ্রামে ফিরে আসি।...'

'রোগ-শোকের ভয়ে মুক্তিযুদ্ধের টেনিং না নিয়েই ত্রিপুরা থেকে দুই ভাই পালালেন, দেশে গ্রামের বাড়িতে ফিরলেন। তারপর? আমি তাকে জিজেস করি। মোজাম্বিল হক একটু স্থির হয়ে দম নেন। তারপর স্মৃতি হাতড়ে বলতে শুরু করেন আবার।'

'তো ঢাকার গ্রামের বাড়ি ভাটারায় ফিরে সবার কাছে সত্যি কথাটাই বললাম। বাড়ির লোকজন তো মহাখুশি, যাক, ঘরের ছেলে ভালোয় ভোলোয় ঘরে ফিরেছে। ওই সব যুদ্ধের ভূত পালিয়েছে।'

'তখন রহিমুদ্দীন মুক্তিযুদ্ধের টেনিং নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। সে আমাকে বলে, ইভিয়ায় যে গেরিলা টেনিং নিয়েছি! আর হাতিয়ার আমাদের দিয়েছে! বুলি, তোদের মতো ভীতুদের আর দরকার নেই। এবার আমরাই দেশ স্বাধীন করে ফেলবো।'

'রহিমুদ্দীনের কথাটা আমার খুব মনের ভেতরে গিয়ে লাগে। ১০-১৫ দিন খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটে। একদিন তাঁকে আবার ধরি, রহিম ভাই, আমি ভুল করেছি, তুমি আমাকে টেনিংয়ে পাঠাও। আমি যুদ্ধে যাবো। সে কিছুতেই রাজি হয় না। শেষে আমাকে বলে, মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে তোমাকে সাহসিকতার পরীক্ষায় পাস করতে হবে। পাস করলে তারপর দেখা যাবে।'

'আমি রাজি হলে, জুন-জুলাই মাসে রহিমুদ্দীন এক সন্ধ্যায় আমাকে একটি হ্যান্ডগ্রেনেড দেয়। এর ব্যবহার শিখিয়ে দিয়ে বলে, এই বোমার ৩৬টি টুকরো আছে। এটি ফাটলে ৩০ গজের মধ্যে যারা আছে, তারা সবাই মারা যাবে। তোমাকে এটি বিদেশীদের মার্কেটে মারতে হবে। পারলে সাহসিকতার পরীক্ষায় পাস।'

'পরে গ্রেনেডটিকে আমি প্যান্টের পকেটে নিয়ে রহিমুদ্দীনসহ গুলশান ২ নম্বর ব্রিজের পাকিস্তানী চেকপোস্ট সহজেই পার হয়ে যাই। সেখানে পাক সৈন্যদের সহায়তা করতো যে বাঙালি, সে আমাদের গ্রামেরই এক লোক। তাছাড়া ছাত্র হিসেবে আমার পরিচয়পত্র ছিলো। আমার অসুবিধা হয় না।'

'দুজনে একটা বেবী ট্যাক্সি নিয়ে গুলশান ১ নম্বর ডিআইটি মার্কেটে যাই। সেখানে বিদেশীদের আনাগোনা। রহিমুদ্দীন 'রেকি' করে বলে, এখানে সুবিধা হবে না, প্রচুর মিলিটারির পাহারা।'

'আমরা দুজনে আরেকটি বেবী ট্যাক্সি নিয়ে মহাখালি টিবি হাসপাতাল গেটের দিকে যেতে থাকি। পথে বিদেশী প্রতাকা ওড়ানো একটি বাসা দেখি। ট্যাক্সি ঘুরিয়ে আবারো ওই পথে যাওয়ার সময় রহিমুদ্দীন আমাকে ইশারা করে। আমি চলতে

ট্যাক্সি থেকে গ্রেনেডটির পিন খুলে ওই বাড়ির ভেতর ছুঁড়ে

মারি'...

‘কিছুদুর যাওয়ার পরেই বিকট শব্দে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়। অবাঙালি বেবিচালক ব্রেক কবে আমাদের বলে, কেয়াঁ হয়া হ্যায়? রহিমুদ্দীন তাকে ধমকে বলে, বোমা ফুটায়া! সালে লোগ, চালাও বেবী!’

‘কিছুদুর গিয়ে আমরা বেবি ছেড়ে দিয়ে ঘুরপথে বাড়ায় এক আত্মায়ের বাসায় ওই রাতটি কাটাই। পরদিন পত্রিকায় দেখি, বড় বড় হেডলাইনে খবর -- দুষ্প্রতিকারীরা বিদেশী দূতাবাসে গ্রেনেড হামলা করেছে! সেটি কোন্ঠ দূতাবাস ছিল, এখন আর মনে নেই।’...

‘তারপর?’ বালক-বিস্ময়ে আমি জানতে চাই।

মোজাম্মেল ভাই বলেন, ‘আর কী! রহিমুদ্দীনের পরীক্ষায় পাস। একদিন রাতে বাড়িতে ফিরে দেখি মা কাঁঠালের পিঠা বানিয়েছেন। সেই পিঠা খেতে খেতে মাকে আমি বলি, মা, আমি কাল সকালেই টেনিং নিতে ইতিয়া যাবো। আমাকে কিছু টাকা দিতে পারো?’

‘মা বলেন, তোর বাবা তো বাড়িতে নেই। আর আমার কাছে তো টাকা-পয়সা থাকে না। দেখি, তোর চাচীর কাছে কিছু পাওয়া যায় কী না।’

‘মা টাকা ধার করতে চাচীর বাসায় গেছেন। একটু পরে চাচা এসে আমাকে ধর্মকানো শুরু করলেন, এই সব কী? দুদিন পর পর যুদ্ধ, যুদ্ধ করে বাসায় অশান্তি করা! একবার আমার ছেলেকে (চাচাতো ভাই সঙ্গে) ওই যে অসুখ-বিসুখের ভয়ে আমারা দুজন ত্রিপুরা থেকে টেনিং না নিয়েই পালালাম!) উঞ্চানি দিয়ে ইতিয়ায় নিয়ে গেলি। টেনিং না নিয়েই পালিয়ে এলি। এখন আবার টেনিং এর যাওয়ার জন্য বায়না ধরা।... এবার যেতে হলে তুই একই যা। আমার ছেলেকে সঙ্গে নিবি না।’

‘আমি বললাম, টাকা দাও, না দাও, এবার আমি যাবোই। একাই যাবো, মরতে হলে একাই মরবো। তোমার ছেলেকে এবার নেবো না।’

‘তো পরদিন ভোরে মা’র ধার করা ২৪৬ টাকা নিয়ে আমি



মোজাম্মেল হক, বীর প্রতীক

গুলশান ২ নম্বর বাস স্ট্যান্ডে যাই। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা রহিমুদ্দীন আগে থেকেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। দুজনে ইপিআরটিসির বাস ধরে ভাঙা পথে কুমিল্লা পৌছাই। আবার সেই গোমতি নদী পর হয়ে পৌছাই মেলাঘার টেনিং সেন্টারে। সেখানে ২ নম্বর সেন্টার কমান্ডার মেজর এটিএম হায়দার আমাকে দেখেই রহিমুদ্দীনকে ধমক, কী সব পোলাপাইন নিয়ে এসেছো! এই সব দিয়ে কী যুদ্ধ করা যায়? রহিমুদ্দীন আমার পক্ষে ওকালতি করে বলে, স্যার, ও ছেট হলেও খুব সাহসী। ঢাকার বিদেশী দূতাবাসে হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ করেছে!

‘শুরু হলো টেনিং? কী কী অস্ত্র চালানো শিখলেন?’

‘হ্যাঁ, মেজর হায়দারের সম্মতিতে এইবার সত্যি সত্যি গেরিলা টেনিং শুরু হলো মেলাঘারে। ২১ দিনের টেনিংয়ে আমি লাইট মেশিনগান (এলএমজি), কয়েক ধরণের রাইফেল, স্টেন গান, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, এন্টি ট্যাংক মাইন, ১৬ ইঞ্জিন মাইন, ফসফরাস বোমা, গ্রেনেড থ্রোইং, অ্যামবুশ প্রশিক্ষণ নেই।’

‘২১ দিন পর ১৫ জন নিয়ে আমাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গেরিলা গ্রুপ তৈরি হলো। এর গ্রুপ কমান্ডার হলেন এমএন লতিফ। আর সেই রহিমুদ্দীনকে করা হলো ডেপুটি কমান্ডার।’

‘একদিন মেজর ফেরদৌস, ক্যাপ্টেন আয়েন উদীন ও আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক) আমাদের একটু ভাল খাইয়ে-দাইয়ে রাতের বেলা বিদ্যা দিলেন। কিন্তু যাদের সীমান্ত রেকি করতে পাঠানো হয়েছিলো, তার ঠিকভাবে ডিউটি না করেই ক্লিয়ারেস দেয়। আমরা ১৫ জন কুমিল্লার সিএনবি রোডে উঠতেই পাক সেনাদের অ্যামবুশের মুখে পড়লাম। তিন-চারটা ব্যাংকার থেকে শুরু হলো ক্রমাগত মেশিনগানের গুলি।’

‘ওই রাতে এক পাট ক্ষেত্রে পালিয়ে পরদিন বুকে ভর দিয়ে একটু একটু করে আবার ইন্ডিয়ার মেলাঘারে পৌছাই। দেখি আমরা ১৫ জনই অক্ষত আছি। কিন্তু মেজর হায়দার এবার বেঁকে বসলেন, এদের মর্যাল ডাউন হয়ে গেছে। এদের দিয়ে আর যুদ্ধ হবে না! তিনি নির্দেশ দিলেন, আমাদের কোনো একটি গেরিলা ইউনিটে গোলাবারুদ বহনকারী হিসেবে যোগানদারের দায়িত্ব পালন করতে।’

মোজাম্মেল হক বলে চলেন, ‘এই কথায় সবার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এতো কষ্ট করে টেনিং নিলাম, আর শেষে কী না যোগানদার! আমরা কী যুদ্ধ করবো না।’

‘আমি বুদ্ধি করে প্রতিদিন রঞ্জিট করে মেজর হায়দারের অফিসের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলাম। ১৫-২০ দিন পর উনি আমাকে ডেকে বললেন, এই তোর কী হয়েছে? প্রত্যেক দিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস কোনো? আমি বলি, স্যার আমাদের যুদ্ধে পাঠান। আমরা মরতে ভয় পাই না। মেজর সাহেব বলেন, তোদের দিয়ে তো যুদ্ধ হবে না। তোদের মর্যাল বলতে আর কিছু নেই। আমি নাছোড়বান্দা, না স্যার। আমরা পারবো। আমাদের একটা অপারেশন দিয়েই দেখুন না।’

‘মেজর হায়দারের বলেন, তুই কাউকে মারতে পারবি? কোনো চিন্তা না করেই বলি, স্যার, পাকিস্তানের স্পীকার আব্দুল জব্বার খানকে মারতে পারবো। মেজর সাহেব আমাকে একটা চড় মারেন। বলেন, বেয়াদব, জানিস, এটা কতো কঠিন কাজ?’

আচ্ছা, তুই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাসিন্দা পাক গভর্নর মোনায়েম খানকে মারতে পারবি?

'এইবার আমি বলি, স্যার, এটা আমার জন্য অনেক সহজ। আমি তার বাসা চিনি। ছোটবেলায় তার বাসার ওখানে খেলতে গিয়েছি। আমার এক দূর সম্পর্কের জবাব চাচা তার বাসার গোয়ালা।' 'মেজের হায়দার হেসে হুকুম দেন, গেট টেন, উল্লুক কা পাঁঠা।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি ১০টা বুক ডন দিতে লেগে যাই। বুঝতে পারি, আমাকে মোনায়েম খান কিলিং অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে।

'এবার আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করি, স্যার, যদি অপারেশন সাকসেস হয়, আমাকে কী পুরস্কার দেবেন?'

'তুইই বল, তুই কী চাস?'

'অপারেশন শেষে আমি আপনার কোমরের রিভলবারটা চাই!'

'গেট লস্ট! উল্লুক কা পাঁঠা!'

'...ক্যাম্পে ফিরে গ্রুপকে এই খবর বলি। কেউ বিশ্বাস করে না। একটু পরে অর্ডার আসে, আমাদের ঢাকায় অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে! খুশিতে সবাই চিংকার চেঁচামেচি শুরু করে।'

'এরপরেও সীমান্তের একটি ছোটখাট যুদ্ধে আমাদের সাহসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। আমরা ১৫ জনের গ্রুপ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পৌঁছাই। সঙ্গে যার যার হাতিয়ার জামার নিচে আর ব্যাগের ভেতর লুকানো।'

'সেখান থেকে আমি ভাটারার গ্রামে ফিরি। আমার মাথায় তখন একটাই চিপ্তা -- অপারেশন মোনায়েম খান।'...

'আমি মোনায়েম খানের গোয়ালা জবাব চাচাকে খুঁজে বের করে তাকে সবাকিছু বলি। তিনি আমাকে বলেন, তুই তার রাখাল শাজাহানের সঙ্গে খাতির কর। তোর কাজ হবে। খবরদার, আমার কথা কিছু বলবি না!'

'জবাব চাচা একদিন দূর থেকে শাজাহানকে চিনিয়ে দেন। সে তখন বনানীতে মোনায়েম খানের বাসার পাশে গরু চড়াচ্ছে। আমি তার সঙ্গে এটা-সেটা গল্প জুড়ি। মোনায়েম খানের ওপর রাখালের খুব রাগ।'

'কথায় কথায় শাজাহান বলে, মোনায়েম খান একটা জানোয়ার।'

আমাকে বেতন তো দেয়ই না, উল্টো নানান নির্যাতন করে। একেকটা সিন্ধী গাই ২০-২৫ সের দুধ দেয়। এক ফোটা দুধও আমাকে খেতে দেয় না। গাই দোয়ানোর সময় মোড়া পেতে সে নিজেই বসে থাকে, যেনো দুধ চুরি না হয়। পাঁচবার বাসা থেকে পালিয়েছি। প্রত্যেকবার পুলিশ দিয়ে আমাকে ধরিয়ে এনেছে। মুক্তিরা এতো মানুষকে মারে, এই ব্যটাকে মারতে পারে না!'

'আরেকটু খাতির হওয়ার পর একদিন শাজাহানকে আমি বলি, আমার সঙ্গে মুক্তিদের যোগাযোগ আছে। আপনি যদি সহায়তা করেন, তাহলে আমি তাদের খবর দেই, আপনি মোনায়েম খানকে মারার ব্যবস্থা করুন। শাজাহান রাজি হয়। আরও দু-একদিন ঘোরানোর পর শাজাহান অস্ত্রির হয়ে পড়ে, কই, আপনার মুক্তিরা তো আসে না!'

'একদিন বিকালে আমি একটি চট্টের ব্যাগে আমার স্টেনগান, দুটি ম্যাগজিন, একটি হ্যান্ডগ্রেনেড আর একটি ফসফরাস বোমা নিয়ে শাজাহান ভাইয়ের কাছে হাজির হই। তাকে বলি, আজ সন্ধ্যায় একটু দেরিতে গরঞ্জলোকে মোনায়েম খানের বাসায় ঢেকাতে হবে।

আর আমাকে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাসার ভেতর। সেই প্রথম শাজাহান ভাই বোঝোন, এতোদিন আমার কাছে মুক্তিবাহি-নীর যে গল্প তিনি শুনেছেন, আমিই সেই মুক্তিবাহিনী! তিনি আমার প্রস্তাবে রাজি হন।'

আমি বলি, 'তো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মোনায়েম খানের বাসার ভেতর চুক্কেন? শুরু হলো অপারেশন?'

মোজাম্মেল ভাই বলেন, 'ওই দিন বাসার ভেতরে চুক্তে পারলেও সেদিনই অপারেশন করতে পারিনি। পর পর দুবার ব্যর্থ হই। ... প্রথমবার ওই সন্ধ্যায় মোনায়েম খানের বাসায় চুক্তে গেটের পাশের কলাবাগানের বোঁপে ঘাপটি মেরে বসে থাকি। একটু পরে তার রাখাল সেই শাজাহান ভাই এসে খবর দেয়, মোনায়েম খানের শরীর খারাপ। সে দোতলায় উঠে গেছে। দোতলায় যেতে গেলে তার ছেলের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে। আবার বাড়ি ভর্তি লোকজন।'

'অপারেশন ওইদিন স্থগিত রেখে আমি সেখান থেকে চলে যাই পাশের বনানী প্রিস্টন পাড়ায়। সেখানে প্রচুর ইটের পাঁজা ছিল। ইটের পাঁজায় হাতিয়ারের ব্যাগটি লুকিয়ে চলে আসি।'

'পরে আরেকদিন সন্ধ্যায় হাতিয়ারের ব্যাগ নিয়ে শাজাহান ভাইয়ের সঙ্গে আবার মোনায়েম খানের বাসায় যাই। আবার সেই

কলাবাগানে ঘাপটি মেরে বসা। কিন্তু তখন একটি উজ্জল বৈদ্যুতিক বাল্বের আলোয় চারপাশের সব কিছু পরিষ্কার। আমি অন্ধকারের আড়াল পেতে সেই বাতিটি ইট মেরে ভেঙে ফেলি। এতেই বিপন্নি দেখা দেয়।'

'একজন চাকর ভাঙ্গা বাল্ব দেখে চিংকার-চেঁচামেচি শুরু করে, বাড়িতে চোর চুক্তে! মোনায়েম খানের বাসা পাহারা দিতো যে সব বেলুচিস্তানের অবাঙ্গাল পুলিশ, তারা হুইসেল বাজিয়ে, টর্চ মেরে চোর খোঁজাখুঁজি শুরু করে। আমি বিপদ দেখে আবার পালাই।'

আমি বলি, 'ও আচ্ছা। কিন্তু এতোদিন পত্রিকায় কিন্তু এই সব বাকি-বামেলার কথা পড়িনি। আমি ভেবেছি...।'

মোজাম্মেল ভাই হাসেন, 'আরে পত্রিকাওয়ালারা এতো কথা লিখতে চায় না। ওরা হচ্ছে, সংক্ষেপে বিস্তারিত!'

'তো তারপর তো আমার মন খুব খারাপ। পর পর দুবার অপারেশনে বাধা। আর বুঝি হবে না! এদিকে শাজাহান ভাই ভাটারা এসে একদিন আমাকে ধরে, কী ভাই, যুদ্ধ হবে না? তার কথায় আবার মনোবল ফিরে পাই।'

'এবার সহযোগী হিসেবে সঙ্গে নেই আনোয়ার ভাইকে (আনোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক)। আবারো সন্ধ্যার পর মোনায়েম খানের বাসার ভেতরের সেই কলাবোঁপে দুজন লুকিয়ে বসে থাকি। একটু পরে শাজাহান ভাই এসে খবর দেয়, আজকে অপারেশন সম্ভব। মোনায়েম খান, তার মেয়ের জামাই (জাহাঙ্গীর মো. আদিল) আর শিক্ষামন্ত্রী (আমজাদ হোসেন) বাসার নিচতলার ডাইংরমে বসে গল্প-গুজব করছেন।'

'আমি জানতে চাই, কে মোনায়েম খান, চিনবো কী ভাবে? শাজাহান ভাই জানান, একটি সোফায় তিনজনই একসঙ্গে বসে আছে। মাঝের জনই মোনায়েম খান, তার মাথায় গোল টুপি রয়েছে। আমি অপারেশনের পরের পরিস্থিতি আন্দাজ করে গোয়ালা জবাব চাচা আর শাজাহান ভাইকে জামা-কাপড় নিয়ে বাসা থেকে পালাতে বলি।'

'শুনশান নিরবতার মধ্যে হাতিয়ার বাগিয়ে আমরা দুজন মূল বাড়িটির দিকে এগিয়ে যাই। আমার প্ল্যান হচ্ছে, স্টেনগানের একটি ম্যাগজিন পুরো খরচ করবো মোনায়েম খানের ওপর। বাকি দুজনকে আরেকটি ম্যাগজিন দিয়ে ব্রাশ করবো।'

...ব্যাকআপ আর্মস হিসেবে হ্যান্ডগ্রেনেড আর ফসফরাস বোমা তো আছেই।'

‘আমরা বাড়ির ড্রইংরুমের দরজায় পৌঁছে দেখি দরজাটি খোলা। দরজার দিকে মুখ করে তিনজন একটি সোফায় ঘনিষ্ঠভাবে বসে মাথা নিচু করে কোনো শলাপরামর্শ করছে। মাঝখনে গোল টুপি মাথায় মোনায়েম থান। আমি স্টেন দিয়ে ভ্রাশ করি। কিন্তু একটি মাত্র সিঙ্গেল ফায়ার বের হয়, গুলিটি মোনায়েম থানের পেটে লাগে। সে-- ও মা গো-- বলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ...বাকি দুজন ভয়ে--বাবা গো, মা গো, বাঁচাও, বাঁচাও-- চিৎকার শুরু করে।...আমার স্টেনগান দিয়ে আর ফায়ার হয় না। আমি ম্যাগজিন বদলে বাকি ম্যাগজিন দিয়ে ফায়ার করার চেষ্টা করি, তাতেও কাজ হয় না। আনোয়ার ভাই সেফটি পিন খুলে গ্রেনেডটি ছুঁড়ে মারেন। এবারো ভাগ্য খারাপ। গ্রেনেডটি ও ছিলো অকেজো, সেটি দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফেরত আসে।’

‘এদিকে তার বাড়ির বেলুচিষ্টানী পুলিশরা চিৎকার-চেঁচমেচি শুনে একের পর এক ব্ল্যাক ফায়ার করতে থাকে। আমরা দেয়াল টপকে পালাই।’

‘দৌড়ে গুলশান-বনানী লেকের কাছে পৌঁছে দেখি জববার চাচা আর শাজাহান ভাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি আনোয়ার ভাইকে ওদের সঙ্গে লেক সাঁতরে ওপারে চলে যেতে বলি। স্টেনগান নিয়ে আমার পক্ষে সাঁতার দেওয়া হয় না। ...খুঁজতে খুঁজতে আমি একটি কোষা নৌকা পেয়ে যাই। সেটা নিয়ে আমি গুলশান ২ নম্বর বিজের কাছাকাছি আসি।’

‘এদিকে গোলাগুলির শব্দে একের পর এক পাক আর্মির ট্রাক মোনায়েম থানের বাসার দিকে রওনা হয়েছে। দূরে বড় রাস্তা দিয়ে ট্রাকের চলাচল দেখি। ওই বিজিটির ওপর আর্মির চেকপোস্ট ছিলো। আমি ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েই ক্রলিং করে বিজের নিচ দিয়ে একটু করে ভাটারা পৌঁছাই।’

‘ভাটারা বাজারে তখন একটি চায়ের দোকানে সহযোগী তিনজন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। স্টেনগান কাঁধে সেই প্রথম গ্রামের মানুষ আমাকে দেখে। এর আগে তারা কানাঘুষায় শুনেছিল, আমি টেনিং নিয়েছি। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। তখন আমাকে দেখে ভয়ে সবাই দৌড়ে পালায়। আমি শীতে কাঁপতে (তখন অক্টোবর মাস) কোনরকমে আনোয়ার ভাইকে স্টেনগান দিয়ে বলি, আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে! এরপর

আমি জ্ঞান হারাই।’

‘জ্ঞান ফিরে আসে রাতে আমার বাড়িতে। দেখি, বাড়ির লোকজন ছাড়াও জববার চাচা, শাজাহান ভাই আর আনোয়ার ভাই আমাকে ঘিরে আছেন। আনোয়ার ভাই বলেন, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমরা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে যাচ্ছি। তুমি ও আমাদের সঙ্গে চলো। আমি তাদের বলি রওনা হয়ে যেতে। আমি রাতটুকু এখানেই বিশ্রাম নিয়ে পরদিন রূপগঞ্জে পৌঁছাবো।’

‘পরদিন সকালে ঘুমিয়ে আছি, আমার এক চাচা এসে বললেন, রাতে আকাম করে এসে এখনও তুই বাড়িতে! রেডিও খবরে বলছে, মোনায়েম থান মারা গেছে। এখনই তুই পালা। ...আমি রূপগঞ্জে পালিয়ে যাই। সেখানে আমাদের গ্রহণের অন্য সহযোদ্ধারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।’

\*

এবার আমি একটু অফ ট্র্যাকে যাই। জানতে চাই, ‘আচ্ছা মোজাম্বেল ভাই, স্বাধীনতার ৩৬ বছরেও তো স্বাধীনতা বিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলো না। এর কারণ কী বলে মনে হয়?’

মোজাম্বেল হক বলেন, ‘অতীতে রাজনৈতিক দলগুলো কোনো না কোনো স্বার্থের কারণে জামায়াতসহ স্বাধীনতা বিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলান-পালন করেছে। তারা ক্ষমতার লোভে ঘূণ্য এই সব চরম অপরাধীদের সঙ্গে আপোষ করেছে।’

‘আপনি কী মনে করেন, দল নিরপেক্ষ এই সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে এখন স্বাধীনতা বিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলছে, এই দায়িত্ব তাদেরই নেওয়া উচিত?’

‘অবশ্যই। সবদেশে সরকার পক্ষই স্বাধীনতা বিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায়িত্ব নেয়। এই সরকার দুর্নীতি ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে জেহাদ যোগান করে এরই মধ্যে সুনাম কুড়িয়েছেন। এখন তাদের উচিত হবে বক্ত্বাবাজীর বাইরে চরম অপরাধী হিসেবে স্বাধীনতা বিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজটা অন্তত শুরু করা। নইলে আমরা ধরে নেবো, অতীতের সরকারগুলোর মতো দলনিরপেক্ষ এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও কোনো কেনো স্বার্থ রয়েছে; তারাও আপোষকামী। এ ক্ষেত্রে অতীতের সরকারগুলোর সাথে তাদের কোনো পার্থক্য থাকবে না।’

তার কাছে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সহযোদ্ধাদের কথা জানতে চাই।

মোজাম্বেল ভাই বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বর দেশ

স্বাধীন হলো মিরপুরে বিহারীদের কাছে প্রচুর অস্ত্র ছিল। তারা তখনও অস্ত্র সমর্পণ করেনি। বিহারীদের পরাজিত করতে সে সময় একাধিক যুদ্ধ হয়। আমি নিজেও এরকম কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেই। মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল্লাহ ঢালি ও দিল মোহাম্মদ ঢালি একটি প্রাইভেট কার নিয়ে মিরপুরে ঢোকার চেষ্টার করলে দুই দিক থেকে বিহারীরা গুলি করে তাদের খুন করে। সহযোদ্ধাদের এমন কর্ণ মৃত্যুর খবরে আমি নিজেই তাদের লাশ নিয়ে আসার জন্য অপারেশন ঢালাই। দেখি, গুলিতে ঝাঁঝড়া হওয়া গাড়ির ভেতরে তাদের দুজন রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছেন। তীব্র আক্রমণের মুখে তাদের লাশ আর নিয়ে আসতে পারিনি। কিন্তু সব সময়েই তাদের কথা মনে পড়ে।’

‘আর মুক্তিযোদ্ধাদের তো কেউ ঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি। বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি, সারাদেশেই সব মুক্তিযোদ্ধারাই অবহেলিত। আর এখন সবখানেই রাজাকার, আলবদর, আল শামসের জয়জয়াকার। ...যখন পত্রিকায় পড়ি, মুক্তিযোদ্ধা রিকশা ঢালান, ভিক্ষে করেন, তখন মনে হয়, এই রকম বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি। ...একদিকে টাকার পাহাড় গড়ে উঠছে, আরেকদিনে মানুষ অভাবে, অনাহারে, অপুষ্টি আর অশিক্ষায় ধূঁকে ধূঁকে মরছে।... আমাদের দাবি, খুব সামান্য— মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারগুলোকে যেনো রাষ্ট্র ন্যূনতম সন্তান দেয়। কিন্তু গত ৩৬ বছরে কোনো সরকারই এই কাজ করেনি।’

‘মুক্তিযোদ্ধাদের দুরাবস্থা দেখে, এখন মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, তাহলে কি একান্তের আমরা ভুল করেছি? গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জমিজমা সংক্রান্ত ৫০ টি মিথ্যে মাললায় আমাকে হয়রানি করা হয়। এর মধ্যে ৮টি মাললায় আমাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে দুমাস জেল খাটকে হয়। অর্থ আমি একজন বীর প্রতীক, ইউপি চেয়ারম্যান। তাহলে সারা দেশে অন্য সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কী অবস্থা, তা তো সহজেই অনুমেয়।’

\*

মোজাম্বেল হক, বীর প্রতীকের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা শেষে আমি যখন ফিরে আসছিলাম, তখন অন্য নানান কথা সঙ্গে তার সেই শেষ কথাটিই বার বার মাথার মধ্যে ঘূরপাক খেতে থাকে, ‘তাহলে কি একান্তের আমরা ভুল করেছি?’...

# ১৯৭১ টাজেডি : মুক্তিযুদ্ধে চা শ্রমিকদের ঐতিহাসিক দলিল

## ভাস্কর চৌধুরী

১৯৭১ সাল। হেনেড ও বোমার স্টাগল। স্বাধীনতার মাস। দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের একটি লাল সবুজের পতাকা। সেই পতাকাটি উড়াতে সেদিন মুক্তির মাঠে ওরাও ছিল। বলছি বাংলাদেশের (তৎকালীন) সোয়া লাখ চা শ্রমিকের কথা। ব্রিটিশ শাসনের পালাবদল, পাকিস্তান টাজেডি ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ চা শ্রমিকের প্রাণ সময়ের স্বোত্তে উৎসর্গীত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে চা শ্রমিকদের আত্মহতির প্রায় ৩ যুগে পদার্পণ। এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও চা শ্রমিকরা রয়ে গেছে সেকালেই।

## মুক্তিযুদ্ধে চা শ্রমিকদের কিছু দলিলনামা

এই যুদ্ধে চা শ্রমিকদের অনেক বধ্যভূমি রচিত হয়; লুঠিত হয় অনেক মা-বোনের ইজজত। চা শ্রমিকরা হারিয়েছিল চা সমাজের অসংখ্য সংগ্রামী ও যৌগ্য নেতাকে।

১৯৭১ সালের ১ মে ভাড়াউড়া চা বাগানের প্রবেশমুখে একটি ছড়ার পাড়ে একসঙ্গে বারে পড়ে ৫৭ জন চা শ্রমিকের তাজা প্রাণ। সেদিন ছিল শুক্রবার। বেলা প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে পাকহানাদার বাহিনীর ১২টি এলএমজি একসঙ্গে গর্জে উঠেছিল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা চা শ্রমিকদের ওপর। সেদিন পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন বিশ্বময় হাজরা, গংগা বাড়ৈ, ভোমর চাঁদ, অম্রত হাজরা, রামচরণ গোড়, গবিনা গৌড়, কৃষ্ণচরণ হাজরা, রবিনা গৌড়, হক হাজরা, বংশী মুধা, শিব মোড়া, মোংরা তুড়িয়াসহ নাম না জানা ৫৭ জন চা শ্রমিক। এগুলোর শেষ সন্তানে সাতগাঁও (মাকরী ছড়া) চা বাগানে আপনা অলিমিকসহ আরো ৬/৭ জন চা শ্রমিক পাক হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাক হানাদার বাহিনী দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে যখন বুবাতে পেরেছিল পরাজয়ই তাদের সুনির্ণিত, তখন গোটা বাঙালি জাতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য শুরু হলো বুদ্ধিজীবী হত্যা।

সেই নিষ্পেষিত কালো থাবা থেকেও রেহাই পায়নি চা শ্রমিকরা। চা শ্রমিক সমাজের অগ্রন্থায়ক, নিপীড়িত নির্যাতিত চা শ্রমিকদের



জাগ্রত করায় যার ছিল অগ্রণী ভূমিকা, আপসকামী নেতৃত্বের বিবরণে যিনি ছিলেন বিদ্রোহী বীর, সেই পৰ্বন কুমার তাঁতিকেও পাক হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। চারদিন বন্দি রেখে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয় তার ওপর।

কালীঘাট চা বাগানের শিববাড়ী বষ্টির দাশিবাড়ী থেকে ধরে নিয়ে যায় তাকে। চা শ্রমিকদের মধ্যে পৰ্বন কুমার তাঁতি ছিলেন প্রথম গ্লাজুরেট। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাজঘাট চা বাগানে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৬২ সালে মদন মোহন কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করে বাগানে চলে আসেন তিনি। ১৯৭১ সালে ৪ ডিসেম্বর ভোরে পাকবাহিনী নির্মভাবে হত্যা করে তাকে। শ্রীমঙ্গল শহরের ওয়াপদা (তৎকালীন) বর্তমান পল্লী বিদ্যুতের কাছে একটি ছড়ার মধ্যে পৰনের লাশ ফেলে রেখে চলে যায় পাকবাহিনী। রাজঘাট চা বাগানের পঞ্চায়েত সভাপতি বসু তাঁতিকেও পাকবাহিনী ধরে নিয়ে নির্মভাবে হত্যা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে দেশের বীর বাঙালির সঙ্গে চা শ্রমিকরাও যুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করলেও স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরও চা শ্রমিকরা মুক্ত হতে পারেনি।

অত্যাচার, অবিচার, শাসন ও শোষণের যাতাকল থেকে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে জয়ী হলো সিন্দুরখান চা বাগানের সুধীর

দাশ, রাজঘাট চা বাগানের পৰ্বন খড়িয়া ও কেজুরী ছড়া চা বাগানের চন্দ কাটারের মতো বীর মুক্তিযোদ্ধা চা শ্রমিকরা জীবন যুদ্ধে আজ পরাজিত। আজ কেউই তাদের খোঁজ রাখছেন না। ছাত্র-জনতার সঙ্গে সেদিন চা শ্রমিকদের রক্তও একই মোহনায় মিলিত হয়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা। জাতি পেয়েছিল লাল সবুজের পতাকা।

শোষণের অবসান ঘটিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে চা শ্রমিকরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু আজও চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর বস্তনার ইতিহাসের অবসান হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে চা শ্রমিকদের আত্মহতির প্রায় ৩ যুগে পদার্পণ। এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও চা শ্রমিকরা রয়ে গেছে সেকালেই। আজও অত্যাচার ও শোষণের চাকায় পিষ্ট চা শ্রমিকদের জীবন। আজ মুক্তিযোদ্ধা চা শ্রমিক ও যুদ্ধাত্মক চা শ্রমিকদের জীবন্যাপন দেখলে মনে হয়, হয়তো জন্মই তাদের আজন্ম পাপ।

তবুও মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে এদেশের আপামর জনতার সঙ্গে চা শ্রমিকরা যে বীরত্বের ও প্রত্যয়ের দৃঢ় মনোবল দেখিয়েছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের সবার মাঝে।

# সেক্টর কমান্ডার মেজর জিলিলের লেখায় খুলনার আত্মসমর্পণ

অমি রহমান পিয়াল

জেনারেল দলবীর সিংহের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি অধীর আগহে অপেক্ষা করছেন। কেননা, প্রধান স্টাফ অফিসার, আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানী কমান্ডারদের নিয়ে ইতিমধ্যেই রওয়ানা হয়েছেন, এখনও এসে পৌছাননি। সময় অতি মহসুরগতিতে চলতে লাগল। এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-একটি ঘট্ট। মিত্র বাহিনীর ৯ নং ডিভিশনের স্টাফ অফিসার কর্ণেল দেশপাত্তে জেনারেল দলবীর সিংকে বললেন, ‘বিশেষজ্ঞ হায়াত খান ও তার সাথের সাতজন লে. কর্ণেল এসে পৌছে গেছেন।’

উত্তেজনার চরম মুহূর্ত। জেনারেল দলবীর সিং গন্তীর স্বরে হৃকুম দিলেন, ‘ওদের এখানে নিয়ে আসুন।’ আমরা হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের ছান্দে ছিলাম। নিচে তাকাতেই দেখলাম সাংঘাতিক অবস্থা। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ফটোগ্রাফাররা এতদিন ধরে অধীর আগহে অপেক্ষা করছিল যাদের ছবি তোলার জন্য তাদের সামনে পেয়ে সমানে ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বালিয়ে ছবি তুলছে।

যাহোক, পাকিস্তানী কমান্ডারদের নিয়ে আসা হলো। আমি চারদিকে তাকাচ্ছিলাম- ওদের ভেতর আমার চেনাশোনা কেউ আছে কিনা। হ্যা, ওদের ভেতর আমার চেনা দুজন ছিল। একজনের নাম লে. কর্ণেল ইমতিয়াজ ভয়ায়েচ। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যখন আমি ক্যাডেট ছিলাম তখন ওখানে তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। অপরজন লে. কর্ণেল শামস। তার সাথে আমার জানাশোনা ছিল। বিশেষজ্ঞ হায়াতকেও একবার কি দুবার পশ্চিম পাকিস্তানে দেখেছি। তখন তাদের মনে হতো খুব ভদ্র, বিনয়ী। কিন্তু বাংলাদেশে তারাই অভদ্র, অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। বসতে তাদের চেয়ার দেয়া হলো। জেনারেল দলবীর সিং অত্যন্ত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলেন ওদের সাথে। বিজয়ী ও বিজিতের কোনো সামঞ্জস্য রাখলেন না। চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। জেনারেল দলবীর সিংহের মার্জিত রঞ্চিবোধ ও ব্যবহার দেখে সত্যিই মুঝ হয়েছিলাম। তিনি বিশেষজ্ঞ হায়াতের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এই যে ইনি হচ্ছেন মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার, আগে আপনাদেরই একজন ছিলেন।’ আত্মসমর্পণের খুটিনাটি বিষয় শেষ হলো। বিশেষজ্ঞ হায়াত

ঢাকায় ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও খুলনায় দেরি হয়েছিল একদিন। সাতক্ষীরা ও যশোর থেকে পালিয়ে আসা পাকিস্তানীরা রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও স্থানীয় বিহারীদের সহায়তায় এখানে যুদ্ধ চালায় গোটা দিন। ১৬ ডিসেম্বর রাতেও খুলনা কেপেছে মিত্রবাহিনীর তুমুল আক্রমণে। ৯ নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর (অবঃ) জিলিলের নিজের লেখা খুলনার আত্মসমর্পণ তুলে দিলাম পাঠকদের হাতে

তার বিগেড মেজরকে ডেকে বললেন, ‘মেজর ফিরোজ, তুমি এখনই চলে যাও এবং সৈন্যদের হৃকুম শুনিয়ে দাও, যে যেখানে আছে সেখানেই অস্ত্র সংবরণ করতে। ওদের বলে দাও আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।’

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী ইতালিয়ান সৈন্যদের মতো হানাদারেরা দীর্ঘ লাইন দিয়ে চলতে লাগল। ধীরে ধীরে আমরা খুলনা শহরের ভেতর চুকলাম। সেখানে বিশেষজ্ঞ হায়াত খানের হেডকোয়ার্টারে গেলাম। চারদিক শাস্ত, নিরব। মিত্রবাহিনীর একজন বিশেষজ্ঞারের তত্ত্বাবধানে আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদল মার্চ করে এগিয়ে এলো। চেয়ারে বসে বিশেষজ্ঞ হায়াত খান দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ‘অদমহোদয়গন, পূর্ব পাকিস্তানে বসে শেষবারের মতো এক কাপ চা দিয়ে আপ্যায়ন করা ছাড়া দেওয়ার মতো আমার আর কিছুই নেই।’

‘মৃত পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ বলবেন কি?’ আমি এ কথা বলতেই বিশেষজ্ঞ হায়াত অসহায়ের মতো আমার দিকে চেয়ে রাইলেন। উপায়ন্তর না দেখে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তার ভুল সংশোধন করে নিলেন। চা খেয়ে আমরা সবাই খুলনা সার্কিট হাউজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। এই যাত্রাটা খুবই আনন্দকর। আমরা খুলনা সার্কিট হাউজের কাছাকাছি আসতেই

রাস্তার দুপাশের লোকজন গগনবিদারী শোগান দিয়ে আমাদের স্বাগত জানালো।

‘জয় বাংলা’ ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। আজ মনে হলো জয় বাংলা বাস্তব সত্য। প্রত্যেক বাড়ির চূড়ায়, দোকানে বাংলাদেশের পতাকা। প্রতিটি নারী-পুরুষ ও শিশুর হাতেই বাংলাদেশের পতাকা। হাত নেড়ে উল্লসিত জনতার অভিনন্দনের জবাব দিলাম। সবার মুখেই হাসি। শিগগিরই আমরা সার্কিট হাউজে পৌঁছালাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে এদিকে আসতে লাগল। সার্কিট হাউজের উপরে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। বুকটা ফুল উঠল। সম্মুখত পতাকার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রাইলাম। হাজার হাজার উৎসুক মানুষ সার্কিট হাউজ ঘিরে রয়েছে এবং সবাই সামনে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

যে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীরা নিরীহ বাঙালীদের উপর এতদিন অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের একনজর দেখার জন্য জনতার বাঁধভাঙা স্থোত্রের মতো ছুটে আসতে চাইল। জনতার অসন্তুষ্টি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়েগ করা হয়েছে। কিন্তু জনতার চাপ এত বেশি যে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই সামলাতে পারছে না। সার্কিট হাউজের দরজায় নামতেই এত ভিড়ের মধ্যে পিষ্ট হতে হতে জনতা আমাদের দেখার জন্য

প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগল । কেউ আনন্দে হাততালি দেয়, কেউ গলা ফাটিয়ে চিতকার করে, কেউবা পাগলের মতো ছুটে এসে ছয় খায় । কি অপূর্ব দৃশ্য ! মানবতার কি মহান বহিঃপ্রকাশ ! সব হারাবার দুর্বিষ্হ জ্বালা ভুলে গিয়ে নতুন দিনের সূর্যকে কত আপন করে নিতে চায় । মহামানবের তীর্থ সলিলে অবগাহন করে অবহেলিত জনতা আজ যে নতুন প্রাণের সন্ধান পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে । প্রতিটি জিনিস আজ ওদের নিজস্ব । ইতিমধ্যেই একটা হেলিকপ্টার জেনারেল দলবীর সিংকে নিয়ে সার্কিট হাউজের মাঠে অবতরণ করল । লম্বা, উন্নত চেহারার অধিকারী দলবীর সার্কিট হাউজ পর্যন্ত হেঠে আসলেন এবং আত্মসমর্পণ পরের খুটিনাটি বিষয় ঠিক না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন । সবুজ ঘাসের উপর লাল কাপেটি বিছানো । তার উপর একটি টেবিল ও একটি চেয়ার ।

ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সমাগত । সুশিক্ষিত আট হাজার পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের কমান্ডারদের আত্মসমর্পণ । যে দাস্তিক পাকিস্তানী সৈন্যরা হিংস্ব কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতো তারা আজ নিরীহ মেষশাবকের মতো আত্মসমর্পণ করলো । জেনারেল দলবীর সিং চেয়ারে উপবিষ্ট । বিগেডিয়ার হায়াত খান তার সাথের আটজন কর্গেল নিয়ে মার্চ করে তার সামনে এসে থামলেন । পাকিস্তানী কমান্ডাররা যখন সার্কিট হাউজ থেকে বেরিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল, তখন বাইরে অপেক্ষামান হাজার হাজার লোক আনন্দে ফেটে পড়ল । কেউ হাততালি দেয়, কেউ বা শিশ দেয় । গ্লানিকর পরাজয় ! কত বড় শাস্তিমূলক অনুষ্ঠান ! জেনারেল দলবীর সিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম আত্মসমর্পণকারী সবাই দাঁড়িয়ে আছে । অনুষ্ঠান খুবই সাদাসিধা । জেনারেল দলবীর সিং আত্মসমর্পণের দলিল পাঠ করলেন এবং পাকবাহিনীর পরাজিত কমান্ডার বিগেডিয়ার হায়াত খান মাথা নুইয়ে কম্পিত হাতে দলিলে সাক্ষ দিলেন । এরপর বিগেডিয়ার হায়াত খান ও তার সঙ্গী অফিসাররা সামরিক নিয়মে কোমরের বেল্ট খুলে মিত্র বাহিনীর কাছে অর্পণ করলেন । এ সময় সমস্ত ফটোগ্রাফার ফটো মেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন । দেখে মনে হলো যেন একটা বিয়ের পর্ব । উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের পক্ষে এ রকম গ্লানিকর আত্মসমর্পণ আমি আর কখনো দেখিনি । অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয় !

## জরিনা পাগলীর গল্প

### মাহবুব সুমন

ঘটনাটা ২ যুগ আগের । বয়স কতোইবা তখন ? হাফপ্যান্ট পড়া, সাইকেলে হাফ-প্যাডেল চালানো বয়স । টিনের চাল দেয়া ছেটে যে বাড়িটায় থাকতাম, তার ঠিক পাশেই ছিলো অর্ধসমাণ একটা বাড়ি । রাতে মাঝেমাঝেই সেখানে এক পাগলীকে দেখতাম । জটলা পাকানো বিশাল চুল । এখান-ওখান থেকে যোগাড় করা ন্যাকড়া দিয়ে বানানো বিস্তুকিমাকার পোশাক । নিজের মনেই একাকী কী সব বলতো সেটা সেই জানতো । হয়তো এখান-ওখান থেকে ছাঁড়ে দেয়া খাবারে জীবন বাঁচতো তার । মা বলেছিলো কাছে না যেতে, যেতাম না । তয় পেতাম খুব, যদি মারতে আসে !

নাহ, জরিনা পাগলী কাউকে মারেনি । একদিন সে নিজেই মারা গিয়েছিলো । অদ্বোকেরা যেভাবে নিশ্চিন্তে নিজের বিছানায় মারা যায় সেভাবে নয়, রাস্তার ধারে কুকুর বেড়াল যেভাবে মারা যায় ঠিক সেভাবে । জানাজা হয়েছে কিনা সেটাও জানি না । হয়তো কেউ সদয় হয়ে গোরস্থানে কবর দিয়েছিলো, হয়তো শুশানে পুড়িয়েই ফেলেছিলো । কে জানে ! হাজার হলেও মানুষাকৃতির এক প্রাণী যে ! জরিনার আসল নাম জানা হয়নি, জানাও হবেও না কোনোদিন । কী দরকার ?

ছোটবেলো থেকেই টিভিতে-রেডিওতে-মাঠে ময়দানে দু লাখ মা-বোনের ইঞ্জিনের বিনিয়মে অর্জিত স্বাধীনতা, ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিয়মে অর্জিত স্বাধীনতা বলে বজ্ঞাতা শুনছি । মুক্তিযুদ্ধ শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ দু লাখ মা-বোনকে বীরাঙ্গনা ঘোষণা করলেন । "বীরাঙ্গনা" শব্দটা শুনতে ভালোই লাগে, এতটুকুই । মাঝে মাঝে তো বীরাঙ্গনাদের কথা চেপে যেতেই ভালোবাসি আমরা । মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখিছি, পড়ছি, দু লাখ মা বোনের ইঞ্জিনের বিনিয়মে স্বাধীনতা বলে মাঠ গরম করছি, কিন্তু এই মা-বোনদের খবর রাখার প্রয়োজন



বোধ করছি না । এদের ভুলে যেতে হয় । কবিতা লেখা যায় এদের নিয়ে, কিন্তু সমাজে গ্রহণ করা যায় না । জরিনা ছিলেন একজন বীরাঙ্গনা । সেই দুই লাখ মা-বোনের একজন ।

এটা কোনো গল্প না । আধা সত্য মেশানো একটি কাহিনী । শহরের অনেকেই জানতেন জরিনার কথা । সবাই চেপে যেতেন, আবার অনেকে জানতেনই না ওঁর কথা । স্বাধীনতার এই মানুষগুলো এভাবেই অচেনা, উহ্য রয়ে যায় ইতিহাস থেকে । কিছুই বলার নেই ।

# একান্তরে টাইম ম্যাগাজিনের তিনটি আলোচিত প্রতিবেদন

মিরাজুর রহমান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দমাবার জন্য পাক বাহিনীর নির্বিচার রাজ্যপাত যখন বাংলার মানুষের স্বাধীনতার অদম্য আকাংখাকে দমাতে পারলো না তখন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানে সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের নামে প্রহসন শুরু করে ।

## Mujib's Secret Trial

প্রাসঙ্গিক ব্যাপারগুলোকে সামনে নিয়ে আসে টাইম ম্যাগাজিনের ২৩ আগস্ট ১৯৭১ এ Mujib's Secret Trial শীর্ষক রিপোর্টটি । বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রক্রিয়াটি যে বাংলাদেশের মানুষের প্রতিরোধকে আরো তীব্রতর করবে সেই সহজ সত্যটিকে টাইম তুলে ধরে এভাবে—

"Our people will react violently to this," a member of the Bengali liberation underground whispered to TIME Correspondent David Greenway in Dacca last week. The warning proved all too true. Sheik Mujibur ("Mujib") Rahman, 51, fiery leader of East Pakistan and the man who may hold the key to ending the bloody five-month-old civil war, had just gone on trial for his life before a secret military court in West Pakistan, more than 1,500 miles away. Late that same afternoon, a bomb exploded in the lobby of Dacca's Intercontinental Hotel.

The timing of the bombing tends to confirm that Mujib's trial will further stiffen Bengali resistance to the occupying West Pakistani army. If there are any chances of a political settlement —and they seem almost nonexistent—imposition of the death penalty could dash them.

প্রহসনের এ বিচারের পূর্বনির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারটি টাইম স্পষ্ট করে উল্লেখ করে তাদের রিপোর্টে । তবে এই পুরো প্রক্রিয়ায় ইয়াহিয়া সরকারের মরিয়া ব্যাপারটিকেই তুলে ধরে ।

There is little doubt that Mujib will be convicted of the undefined charges of "waging war against Pakistan and other offenses." When he was arrested last March 26, hours after the army crackdown, Yahya publicly branded him a traitor and hinted that he "might not live." Observed one Western diplomat last week: "You know how hot the Punjabi plains are this time of year. You might say Mujib has a snowball's chance of acquittal."

Though everything about the trial is shrouded in secrecy, it was learned last week that the proceedings are being held in a new, one-story red-brick jail in the textile city of Lyallpur, 150 miles south of Rawalpindi. Islamabad sources claim that the strict secrecy is necessary to prevent Bengali rebels from trying to rescue Mujib. More likely it is because Yahya is unwilling to give Mujib a public platform.

পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, তার বিরুদ্ধে পরিচালনা করা অন্যান্য মামলা নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে রিপোর্টটিতে । তবে রিপোর্ট যে ব্যাপারটিকে নিয়ে এবং রিপোর্টের শেষে টাইম যেভাবে conclusion টানার চেষ্টা করেছে সেটি নিয়ে বিতর্ক আছে । বঙ্গবন্ধু স্বাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা চেয়েছিলেন নাকি শুধুমাত্রই স্বায়ত্ত্বাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন, এই ব্যাপারটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে একটি আলোচনার বিষয় ছিল । তবে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা সেই আলোচনাকে অপ্রাসঙ্গিক করে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের কঠস্বরে পরিণত করে ।

Though Mujib is accused of advocating secession for East Pakistan, the fact is that he did not want a total split-up of Pakistan and never declared independence until it was done in his name after the bloodbath began. To keep his young militants in line, he spoke of "emancipation" and "freedom." "But there is no question of secession," Mujib often said. "We only want our due share. Besides, East Pakistanis are in a majority, and it is ridiculous to think that the majority would secede from the minority."

টাইম এর মূল রিপোর্টটি পাবেন এখানে  
<http://www.time.com/time/printout/0,8816,877251,00.html>

## The Most Fearful Consequence

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থী সমস্যা মোকাবেলায় ভারতের রাজনীতিবিদদের মধ্যকার চিন্তাভাবনা, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সম্ভাব্য একটি যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক সমাধান, সেই সাথে সেই সময়ে সক্রিয় নকশাল আন্দোলনের পূর্ব বাংলা (পূর্ব-পাকিস্তান) এবং পশ্চিম বাংলাকে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে গেরিলা আন্দোলনের ব্যাপারে ভারত সরকারের সর্তর্কতা এই ব্যাপারগুলি উঠে এসেছে ১৯৭১ সালের ৫ই জুলাই প্রকাশিত টাইম ম্যাগাজিনের এই রিপোর্টটিতে ।

In the long run, the Indians fear that they could be faced on their eastern border with an even more threatening force than the Pakistan army. There is

a real danger that leadership of the guerrilla movement in East Pakistan could pass from the shattered Awami League into the hands of the Naxalites, the ideological cousins of the Maoist extremists who have terrorized Calcutta and other pockets of eastern India. What the Indians fear is an attempt to reunite India's West Bengal with Pakistan's East Bengal, which have strong cultural and linguistic ties that could some day transcend the religious differences.

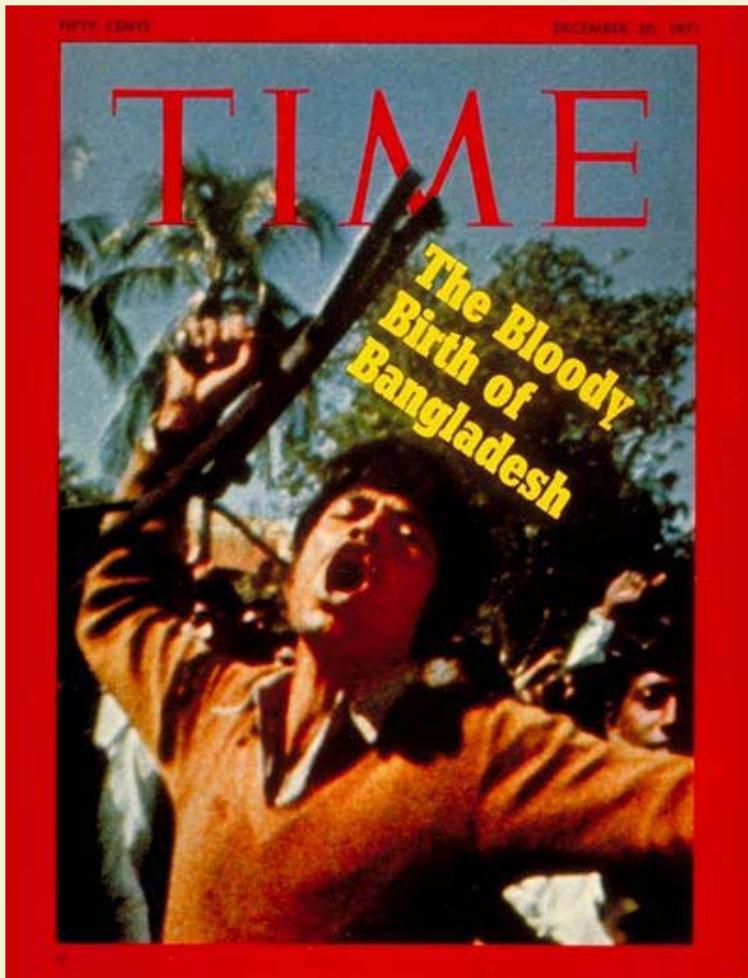
A tough young East Pakistani who calls himself a Naxalite told TIME Correspondent James Shepherd: "For the moment, the common enemy [of both the Awami League and the East Bengali Naxalites] is the Pakistan army. The arms that India gives the Awami League will find their way to the Naxalites, and eventually we will fight not only the army but also the bourgeoisie and the feudal elements." Contemptuous of democratic processes, the Naxalite said scornfully: "Now the Awami League cadres are seeing the truth of the saying that political power grows out of the barrel of a gun."

রিপোর্ট থেকে প্রতীয়মান হয় যে ভারত সরকার ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমাধানের দিকেই বেশী আগ্রহী ছিল যে ক্ষেত্রে মূল বাধা ছিলেন ইয়াহিয়া খান । তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট ছিল না ।

টাইম এর মূল রিপোর্টটি পাবেন এখানে  
<http://www.time.com/time/printout/0,8816,905304,00.html>

## Raise Your Hands and Join Me

১৯৭১ সালে ২৫ শে মার্চের ভয়াবহ গণহত্যার পর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তখন সেই সময়ের কঠিন্যের পরিণত বঙ্গবন্ধুকে



নিয়ে ৫ এপ্রিল ১৯৭১ প্রভাবশালী টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের শিরোনাম এটি । ১৯৭০ এর নির্বাচনের প্রাক্তালে বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট উচ্চারণ "If the polls bring us frustration, we will owe it to the million who have died in the cyclone to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as free people." কে তুলে ধরা এই রিপোর্টটিতে বঙ্গবন্ধুর ব্রিটিশ আমল থেকে বাঙালির অধিকার আন্দোলনের সংগ্রামে অংশগ্রহণের কথা খুব অল্প কথায় কিন্তু শক্তিশালী ভাষায় বর্ণনা

করা হয়েছে ।

Gray-haired, stocky and tall for a Bengali (6 ft.), the bespectacled Mujib always wears a loose white shirt with a black, sleeveless, vestlike jacket. A moody man, he tends to scold Bengalis like so many children. He was born in the East Bengal village of Tongipara 51 years ago to a middle-class landowner (his landlord status accounts for the title of sheik). Mujib studied liberal arts at Calcutta's Islamia College and law at Dacca University. He lives with his wife Fazil-itunessa, three sons and two daughters in a modest two-story house in Dacca's well-to-do Dhanmandi section. Except for a brief stint as an insurance salesman, he has devoted most of his time to politics. First he opposed British rule in India. After the subcontinent's partition in 1947, he denounced West Pakistan's dominance of East Pakistan with every bit as much vehemence. "Brothers," he would say to his Bengali followers, "do you know that the streets of Karachi are lined with gold? Do you want to take back that gold? Then raise your hands and join me." He was first jailed in 1948, when he demonstrated against Pakistan Founder Mohammed Ali

Jinnah for proclaiming Urdu the new nation's lingua franca.

এই রিপোর্টটি বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার এবং তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলমান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বাসীকে অবহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

মূল রিপোর্টটি পড়ুন টাইম থেকে  
<http://www.time.com/time/printout/0,8816,876898,00.html>

# বিদেশী সংবাদপত্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন

তীরন্দাজ

টাইম ম্যাগাজিন : ২৫ অক্টোবর ১৯৭১

পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের বাড়িঘর,  
হত্যা করা হচ্ছে অগুণতি মানুষকে...

যদি ও ইসলামাবাদ তাদের বাহিনীকে সাধারণ বাঙালীদের ওপর চাপ কমানোর আদেশ দিয়েছে, তারপরও প্রতিদিন গড়ে তিরিশ হাজার শরণার্থী বিভিন্ন পথে ভারতে প্রবেশ করছে। তাদের কাছে জানা যায় যে, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের বাড়িঘর, হত্যা করা হচ্ছে অগুণতি মানুষকে নির্বিবাদে। বিশেষ বিশেষ খ্যাতনামা লোকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যারা আজ অবধি নিখোঁজ। সৈন্যদের বর্বরতার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে, ঢাকা ডিংগী (লেখা হয়েছে ডিংগী, আমার ধারণা টসী হবে) ক্যাট্টনমেটে ৫৬৩ জন বাঙালী নারীদের আটকে রাখা। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই তারা সেখানে বন্দী। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকা থেকে ধরে আনা হয়েছে তাদের। এদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং সবাই তিন থেকে পাঁচ মাসের অস্তঃস্তু। এদের গর্ভপাত করানোও এখন আর সম্ভব নয়। এই অস্তঃস্তু নারীদের অনেককে এই অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়, কত মানুষ এই গৃহযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। করাচীর একটি সূত্র, যার ইয়াহিয়া খানের মিলিটারী জাতার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, জনিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে এক মিলিয়নের (১০ লক্ষ) মতো হবে। মুক্তিবাহিনীর অবস্থান করা এলাকার আশেপাশের গ্রামগুলোতে পাকিস্তান সৈন্যদের হত্যাজ্ঞ ও ধ্বংসালী এখন প্রতিদিনেরই রুটিন।

নিউ ইয়র্ক টাইমস : ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২

২০০০০০ বাংলাদেশী মহিলা পকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন...

খ্রিস্টান গির্জা সংস্থা পরিচালিত একজন রিলিফ কর্মকর্তা জানান যে, প্রায় যে ২০০০০০ বাংলাদেশী মহিলা পকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন ও তারা সমাজে পুনর্বাসনের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।

খ্রিস্টান গির্জা সংস্থা রিলিফ সোসাইটির এশিয়ান অঞ্চলের

কর্মকর্তা রেভারেন্ড কেনাত্রো বুমা এক সাক্ষাতকারে জানান যে, সামাজিক নিয়মের কারণেই কোন মুসলমান স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চান না, যদি তার স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের হাতে স্পর্শিত (এক্ষেত্রে ধর্ষণ) হন। যদি স্ত্রীর উপর জোর খাটানো হয়, তাহলেও একই নিয়ম প্রযোজ।

বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এই ধারাকে দূর করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন মি. বুমা। তারা এই মহিলাদের স্বামীদের বীরাম্বনার সম্মান দিয়ে ফিরিয়ে নেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। কেউ কেউ তাদের স্ত্রীদের ফিরে নিয়েছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা নিভাতই কম।

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় এই মহিলাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান গির্জার সংস্থা সামনের সংগ্রহে আবার আলোচনায় বসার পরিকল্পনা করেছে।

সুমা ম্যাগাজিন : অক্টোবর ১৯৭২

২৬ মার্চের রাতেই ঢাকায় ৫০ হাজার লোককে হত্যা করা হয়...

নাজীদের ইহুদি নিধন, নাগাসাকিতে এটম বোমার ধ্বংসযজ্ঞ, ভিয়েতনামে নাপাম বোমার পৈশাচিক হামলা- এসব হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলংকজনক অধ্যায়। কিন্তু সারা পৃথিবীর সাংবাদিকদের অলক্ষ্যে ঘটে যাচ্ছে আরেকটি বড় গণহত্যা। এবারও এশিয়াতেই। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্বল এই গণহত্যার মুখোমুখি।

পাঁচ মাস আগে পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদেরই ভাই পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা আত্মান্ত হয়। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে নির্বিবাদে, ধর্ষিত হচ্ছে নারীরা। কলেরা ও অনাহারে মারা যাচ্ছেন হাজার হাজার শিশু ও বৃদ্ধ। এ পর্যন্ত প্রায় আট মিলিয়ন মানুষ প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এ পর্যন্ত এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকট।

পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ, তার প্রমাণ ঢাকা শহর। ২৬ মার্চের রাতেই ঢাকায় ৫০ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট মৃতের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি। গড়ে প্রতিদিন তিরিশ হাজার মানুষ আশ্রয় খুঁজছে প্রতিবেশী দেশ ভারতে।

কারাকাস

GENEVA, Jan. 17 (AP) — A church relief official reported today that about 200,000 Bengali wives who were raped by Pakistani soldiers during the war in East Pakistan last month were now ostracized by the Moslem communities and had virtually no place to turn to.

The Rev. Kentaro Buma, Asian relief secretary of the World Council of Churches, said at a new conference that by tradition no Moslem husband will take back a wife touched by another man, even if she was subdued by force.

"The new authorities of Bangladesh are trying their best to break that tradition," said Mr. Buma, who recently returned from a visit to East Pakistan. "They tell the husbands the women were victims and must be considered national heroines. Some men have taken their spouses back home, but these are very, very few."

Mr. Buma said that the World Council's commission on inter-church aid would meet here next week to try to work out some long-term project to help the women.

# বিদেশী পত্রিকার রিপোর্টে একাত্তরের নৃশংসতা

আবুল বাহার

১৯৭১ সালে বাংলি জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে গণহত্যা ও নৃশংসতা চালিয়েছে, আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

অসংখ্য নিরপেক্ষ ও বিদেশী পর্যবেক্ষকের বিবৃতি থেকেও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধপরাধ, পরিকল্পিত হত্যাকান্ত, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের অসংখ্য প্রমাণ মেলে।

## দ্য টাইমসে পিটার হ্যাজেলহাস্টের রিপোর্ট

লন্ডন, ২ জুন ১৯৭১ : থান্ট তথ্যে নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ২৬ ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপারেশন ছিল সুসংগঠিত পরিকল্পনার অংশ, যার উদ্দেশ্য হলো

অধিবাসীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে বশ্যতা স্থাপন করানো। নিশ্চিতভাবে এটা পাকিস্তান সরকারের ঐ দাবিকে অসার প্রমাণ করে, যাতে বলা হয়েছিলো যে, পাকবাহিনী কেবল সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা বিদ্রোহীদের উপরই হামলা চালিয়েছে।

## ডেইলি টেলিগ্রাফে সায়মন ড্রিংয়ের রিপোর্ট

লন্ডন, ৩০ মার্চ ১৯৭১ : সামরিক দমন অভিযানের ভয়াবহতা যথার্থভাবেই অনুধাবন করা যেতে পারে— ছাত্ররা তাদের বিচানায় মরে পড়ে রয়েছে, নারী ও শিশুরা তাদের বাড়িতে জীবন্ত পুড়ে দর্খণ...

## টাইম ম্যাগাজিনে ড্যান কেগিনের রিপোর্ট

লন্ডন, ৩ মে ১৯৭১ : এক বৃদ্ধা জুমার নামাজকে কারফিউর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। তাকে মসজিদে প্রবেশ করার সময় গুলি করে হত্যা করা হয়।

## নিউজিউইকে টানি ক্লিফটনের রিপোর্ট

২ আগস্ট ১৯৭১ : এটা মনে হয়েছে যেন রঞ্জিনমাফিক অনুরোধ, হালুয়াঘাট প্রামের যুবকদেরকে জড়ো করা .... এক পাকবাহিনীর মেজর তাদের খবর দিলেন তার আহত সৈন্যদের জন্য রক্তের প্রয়োজন। তারা কি রক্ত দিতে পারবে? যুবকদের চৌকিতে শুইয়ে তাদের শিরায় সুই চুকিয়ে

দেয়া হয় এবং আস্তে আস্তে তাদের দেহ থেকে সব রক্ত বের করে নেওয়া হয় যে পর্যন্ত না তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

গার্ডিয়ানে রেভ জন হেস্টিংস ও রেভ জন ক্লাফামের রিপোর্ট লন্ডন, ২৭ মে ১৯৭১ : গ্রামবাসীদের দিনে বা রাতে যে কোন সময় ঘৰাও করা হয় এবং আতংকিত গ্রামবাসীরা যে যেভাবে পারতো পালিয়ে যায়, না হয় তাদের যেখানে পাওয়া যেত হত্যা করা হতো। মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ব্যারাকে। নিরস্ত্র কৃষকদের হাজারে হাজারে মেরে ফেলা হয়েছে অথবা বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আহত করা হয়েছে।

## টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্ট

২৫ অক্টোবর ১৯৭১ : লড়াই শুরু হওয়ার প্রথমদিককার ভয়াবহ ঘটনার একটি— ৫৬৩ জন বাংলি তরংগী, যাদের মধ্যে কার ও কারও বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর, তাদেরকে ঢাকার ডিসি মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বান্দি করে রাখা হয়। এদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানুষের ঘরবাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গড়ে তোলা হয় সামরিক বাহিনীর গণকালয়। এদের অনেকেই ছিল তিন থেকে পাঁচ মাসের অন্তঃসন্তা।

## নিউজিউইকের রিপোর্ট

৩ জানুয়ারী ১৯৭২ : নৃশংসতাবহুল গত কয়েক মাসের ধ্বং-সলীলা পুরিয়ে নিতে বাংলাদেশের লেগে যেতে পারে বহু বছর। বাংলাকে পদানত করার লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য বেছে নিয়েছে বাংলালি বুদ্ধিজীবি সমাজকে। মুক্তিযুদ্ধের পর তারা আবিষ্কার করে বহু গণকবর, যাতে পাওয়া যায় ১২৫ জনেরও বেশি সবচেয়ে প্রভাবশালী চিকিৎসক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবীর মৃতদেহ। এদের সবাইকে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে শাস্তির করে অথবা গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের এক কর্মকর্তা বলেছেন, পুরো দেশটাই গণকবর। কে জানে তারা কত মানুষকে হত্যা করেছে।



রোশেনারা

## মুক্তিযুদ্ধের এক মিথ

অমি রহমান পিয়াল

শুন্দি উচ্চারণে রওশন আরাই হয়। গ্রাম-বাংলায় তা রোশেনারাই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ কালে এই রোশেনারাই ছিল টেক্ষেও টেক্ষেও প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার এক অসম্ভব ভালোলাগা প্রত্যয়ের নাম। রোশেনারাকে বোন ভেবে গর্বে বুক ফুলে উঠত তাদের। শরণার্থী শিবিরগুলোতেও তাই।

কে এই রোশেনারা? রোশেনারা মুক্তিযুদ্ধকালে এই বাংলার প্রতিটি নারী। আমাদেরই বোন। যুদ্ধকালে যে পাল্টা আঘাতকেই মেনেছে শ্রেষ্ঠ রক্ষণ বলে। প্রাণ দেবো ইজত দেবোনা।

রোশেনারা আত্মাতী হামলা চালিয়েছিল পাকহানাদার বাহিনীর ট্যাঙ্ক বহরে। বুকে মাইন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'জয় বাংলা' বলে। মৃত্যুকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করা রোশেনারা সেই থেকে কবির কবিতায়, গায়কের গানে, যোদ্ধাদের প্রাণে। রোশেনারা কল্পনার নারী, তরুণ কল্পনা নয়। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার প্রতিটি নারীই ছিলেন রোশেনারা।

রোশেনারাকে নিয়ে গান ও কবিতা  
শুনুন ইম্পিসে

# বীতৎস যৌন নির্যাতন, কিন্তু এড়িয়ে গেছেন সবাই

একান্তরে আমাদের নারীদের ওপর পরিচালিত পাকিস্তানি সৈন্যদের যৌন নির্যাতনের ধরন কতোটা ভয়াবহ, কতোটা বীতৎস ছিল- যুদ্ধ চলাকালে এদেশ থেকে প্রকাশিত কোনো দৈনিকে তা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়নি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত বাংলাদেশের যুদ্ধ সংবাদেও।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর থেকে জাতীয় দৈনিকগুলোতে পাকিস্তানিদের নারী নির্যাতনের বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হলেও ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতনের ধরন, প্রকৃতি, শারীরিক, মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ে খুব কমই গবেষণা হয়েছে। “স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও দলিল প্রামাণ্যকরণ” প্রকল্পের তৎকালীন গবেষক, বর্তমানে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক আফসান চৌধুরী এজন্য ইতিহাস রচনার সনাতনী দ্রষ্টব্যসমূহকে দায়ী করে বলেছেন, দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখনে বরাবরই সশস্ত্র লড়াই, ক্ষমতাসীমা পুরুষদের কৃতিত্ব গ্রহিত করার উদ্যোগ চলছে, কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে লাখ লাখ নারী অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করেও যেভাবে যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হয়েছে, সন্তানী মানসিকতার কারণে কখনই তা নিয়ে গবেষণা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের যৌন সন্ত্রাসের ধরন সম্পর্কে প্রথম তথ্য পাওয়া যায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত আমেরিকান সাংবাদিক সুসান ব্রাউন মিলার রচিত “এগেইনেস্ট আওয়ার উইল: ম্যান, উইম্যান এন্ড রেপ” গ্রন্থে। দেশে এ বিষয়ক গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয় খুব কম এবং যা হয়েছে ১৯৮০ সালের পর থেকে। যুদ্ধের পর ৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত গ্রহণ করা এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাত্কারে একমাত্র প্রকাশিত হয় প্রামাণ্যকরণ প্রকল্পের অষ্টম খণ্ডে। কিন্তু এই খন্দ যাচাই করে দেখা গেছে, এতে মোট গৃহীত ২৬২টি সাক্ষাত্কারের মধ্যে নির্যাতনের সাক্ষাত্কার মাত্র ২২টি। প্রকল্পের তৎকালীন গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, প্রামাণ্যকরণ কমিটি তাদের কার্যালয়ে প্রায় সাড়ে তিনি লাখের বেশি পৃষ্ঠার তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার পৃষ্ঠা গ্রহিত আছে। বাকি লাখ লাখ পৃষ্ঠার তথ্যের মধ্যে নারী নির্যাতন বিষয়ক বেশিকিছু ঘটনা আছে। প্রকল্পের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক কে এম মহসীন বলেন, ‘ডকুমেন্টগুলো এখন জাতীয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পারস্পরিক টানাহেঁড়োয় অরক্ষিত অবস্থায় আছে। যতোন্তর জানি, বেশ কিছু ডকুমেন্ট চুরি ও হয়ে গেছে।’

মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত লিখিত সূত্র, সমাজকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানিদের ধারাবাহিক ধর্ষণ উন্নতভাবে সঙ্গে মধ্য প্রশিল থেকে যুক্ত হতে শুরু করে এদেশীয় দোসর রাজাকার, শাস্তি কমিটি, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর সদস্যরা। এরা বিভিন্ন স্থান থেকে নারীদের ধরে আনার পাশাপাশি ধর্ষণে অংশ নিয়েছে। প্রত্যেকটি ক্যান্টনমেন্ট, পুলিশ ব্যারাক, স্থায়ী সেনা বাস্কার ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল কলেজ, সরকারি ভবন ধর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জানা যায়, একান্তরে পুরো ৯ মাস পাকিস্তানি সৈন্যরা অতর্কিং হামলা চালিয়ে ঘটনাস্থলে, কনসেন্টেশন ক্যাম্পে বাংলান নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন আটকে রেখে ধর্ষণের যে ঘটনা ঘটিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গণধর্ষণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির পুরুষ সদস্য, স্বামীদের হত্যা করার পর নারীদের উপর ধর্ষণ নির্যাতন চালাতো পাকিস্তানী সৈন্যরা। ৯ থেকে শুরু করে ৭৫ বছরের বৃন্দা কেউই পাকিস্তানী সৈন্য বা তাদের দোসরদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সুসান ব্রাউন মিলার তার গ্রন্থের ৮৩ পাতায় উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো মেয়েকে পাকসেনারা এক রাতে ৮০ বারও ধর্ষণ করেছে। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইবিং কমিটির “যুদ্ধ ও নারী” গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এক একটি গণধর্ষণে ৮/১০ থেকে শুরু করে ১০০ জন পাকসেনাও অংশ নিয়েছে। একান্তরে

ভয়াবহ ধর্ষণ সম্পর্কে একমাত্র জবানবন্দিদানকারী সাহসিক ফেরদৌসী প্রিয়ভাবিগী তার সাক্ষাত্কারে (একান্তরের দৃঢ়সহ স্মৃতি, সম্পাদনা শাহরিয়ার কবির) জানান, “রাতে ফিদাইর (উচ্চ পদস্থ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা) চিঠি নিয়ে ক্যাপ্টেন সুলতান, লে. কোরবান আর বেঙ্গল টেডার্সও অবাঙালি মালিক ইউসুফ এরা আমাকে যশোরে নিয়ে যেত। যাওয়ার পথে গাড়ির ভেতরে তারা আমাকে ধর্ষণ করেছে। নির্মম, ন্যূনস নির্যাতনের পর এক পর্যায়ে আমার বোধশক্তি লোপ পায়। ২৮ ঘন্টা সংজ্ঞাহীন ছিলাম”। পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের বীতৎসতার ধরন সম্পর্কে পুনর্বাসন সংস্থায় ধর্ষিতাদের নিবন্ধন গৰিবণি প্রামাণ্যকরণ ও দেখাশোনার সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী মালেকা খান জানান, সংস্থায় আসা ধর্ষিত নারীদের প্রায় সবারই ছিল ক্ষত-বিক্ষত যৌনাঙ্গ। বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিড়ে ফেলা রক্তাক্ত যৌনিপথ, দাঁত দিয়ে ছিড়ে ফেলা স্তন, বেয়োনেট দিয়ে কেটে ফেলা স্তন-উরু এবং পশ্চাত্দেশে ছুরির আঘাত নিয়ে নারীরা পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসতো। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের নারীদের একান্তরে কতো বীতৎসভাবে ধর্ষণসহ যৌন নির্যাতন করেছে তার ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে গৃহীত রাজারবাগ পুলিশ লাইনে একান্তরে সুইপার হিসেবে কাজ করা রাবেয়া খাতুনের বর্ণনা থেকে। প্রামাণ্যকরণ প্রকল্পের অষ্টম খণ্ডে গ্রহিত ঐ বর্ণনার কয়েকটি অংশ : রাবেয়া খাতুন জানান, ‘উন্নত পাঞ্জাবি সেনারা নিরীহ বাঙালী মেয়েদের শুভ্রাত্ম ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই অনেক পশ্চ ছোট ছোট বালিকাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দুপা দুদিকে টেনে ধরে চড়াচড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের ওপর সম্মিলিত ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাস্ক কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টাহসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করতো।’ রাবেয়া খাতুনের আরেকটি বর্ণনায় জানা যায়, ‘প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশলাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসে ওপর তলা থেকে বহু ধর্ষিত মেয়ের ক্ষত-বিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন মেয়েদের চুলের সঙ্গে বেধে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়।’

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পরও পাকিস্তানি সৈন্যরা বাস্কার আটকে রেখে নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে বাঙালী নারীদের। বিচারপতি কে এম সোবহান প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, ‘১৮ ডিসেম্বর মিরপুরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একজনকে খুঁজতে গিয়ে দেখি মাটির নিচে বাস্কার থেকে ২৩ জন সম্পূর্ণ উলস, মাথা কামানো নারীকে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছে পাক আর্মিরা।’

বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, পুরোপুরি পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত পাক আর্মিদের ধর্ষণ-উত্তর অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনের ফলে বেশ কিছু মেয়ে আত্মহত্যা করেছে, কাউকে কাউকে পাকসেনা নিজেরাই হত্যা করেছে; আবার অনেকেই নির্দলিষ্ট হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক ড. রতন লাল চৰুবৰ্তী ৭২- এর প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে জানান, ‘যুদ্ধের পর পর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে বেশকিছু নারীকে। তাদের দ্রেসআপ এবং চলাফেরা থেকে আমরা অনেকেই নিশ্চিত জানতাম ওরা যুদ্ধের শিকার এবং ওদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।’

----

২০০২ সালের ১৮ মে ভোরের কাগজে প্রকাশিত লেখাটি শারীমা বিনতে রহমান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশ যুদ্ধপরাধ- কয়েকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন’ বই থেকে সংগ্রহ করেছেন শেরিফ আল সায়ার।

# একান্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন : কয়েকজন সাক্ষীর বয়ান

রাশেদ

নিচের লেখাটি *Century of Genocide: Eyewitness Accounts and Critical Views* By Samuel Totten, William S. Parsons and Israel W. Charny (New York: Garland Publishing, 1997) বইয়ের দশম চাপ্টার (পৃষ্ঠা ২৯১-৩১৬) থেকে অনুবাদ করা ও সংক্ষেপিত। এই চাপ্টারের নাম *Eyewitness Accounts: Genocide in Bangladesh by Rounaq Jahan.*

এই চাপ্টারে একান্তরের গণহত্যার বেশ কিছু সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। প্রথম দুই অংশে ২৫শে মার্চ কালোরাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঘটে যাওয়া হত্যাকান্দের সাক্ষী দুইজনের কথা বলা হয়। একজন ছিলেন জগন্নাথ হলের ছাত্র আর অন্যজন বুয়েটের একজন শিক্ষক। তৃতীয় ও চতুর্থ সাক্ষী বর্ণনা দেন পাকিস্তানিদের নারী নির্যাতনের। আর পঞ্চম সাক্ষী এক গ্রামে ঘটে যাওয়া কিছু নিরপরাধ কিশোর হত্যার কিছু বিবরণ তুলে ধরেন। আর শেষ সাক্ষীর কথা থেকে বিহারীদের কিছু তাঙ্গবলীর কথা জানা যায়।

## জগন্নাথ হলের হত্যাকান্দ

এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে রশিদ হায়দার সম্পাদিত “১৯৭১: ভয়াভয় অভিজ্ঞতা” (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯) বইয়ের কালি রঞ্জনশীলের “জগন্নাথ হলে ছিলাম” অধ্যায় থেকে (পৃষ্ঠা ৫)।

আমি দক্ষিণ বাংলার ২৩৫ নম্বর রুমে ছিলাম। ২৫ তারিখ রাতে গোলাগুলি আর বোমা-শেল ফাটার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। হতভয় হয়ে চিন্তা করছিলাম কী করা যায়। তারপর আমি ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি সুশীলের কাছে যাবার জন্য ক্রুল করে চতুর্থ তলায় উঠলাম। তার রুমে আরো কিছু ছেলে এরই মধ্যে এসে পড়েছিল কিষ্ট সুশীল তখন রুমে ছিল না। ছাত্রী আমাকে বলল ছাদে যেতে, যেখানে আরো বেশকিছু ছেলে আশ্রয়

নিয়েছিল। কিষ্ট আমি (হয়ত কিছুটা স্বার্থপরের মত) ভাবলাম নিজের মত করে থাকি; আর তাই চতুর্থ তলার উত্তর কোণার দিকে চলে গেলাম আস্তে আস্তে ক্রুল করে। জানালা দিয়ে আমি দেখছিলাম আর্মিরা সার্টলাইট দিয়ে ছাত্রদের খোঁজে রুমে রুমে তল্লাশি চালাচ্ছিল। আর খুঁজে পেলেই তাদেরকে শহীদ মিনারের কাছে নিয়ে যেয়ে গুলি করছিল। পাকিস্তানি আর্মিরা মাঝে মাঝেই মর্টার ব্যবহার করছিল হলের দিকে তাক করে। অ্যাসেম্বলির সামনের টিনশেড আর উত্তর রুকের বেশকিছু রুমে আগুনও ধারিয়ে দেয় তারা।

কিছু সময় পরে ৪০-৫০ জন পাকিস্তানি আর্মি দক্ষিণ বাংলাকে আসে আর ডাইনিং রুমের জানালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। আর লাইট জ্বালিয়ে যেসব ছাত্র সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের উপরে গুলিবর্ষণ করে। আর্মিরা যখন সেই রুম থেকে বের হয়ে আসে, তখন তারা হলের কেয়ারটেকার প্রিয়নাথদাকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বিভিন্ন রুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়ে আমি তাদের দেখতে পারছিলাম না, কারণ আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে চতুর্থ তলার সানশেডে লুকিয়েছিলাম। কিষ্ট গোলাগুলির শব্দ, ছাত্রদের আহাজারির আর আর্মির ভাঙ্গচুরের শব্দ ঠিকই শুনতে পাচ্ছিলাম। আর্মিরা চলে গেলে আমি আবার বাথরুমে এসে লুকাই। জানালা দিয়ে দেখতে

পেলাম সলিমুল্লাহ হলেও

আগুব জ্বলছে।

শহরের

উত্তর

আর

পশ্চিমাংশও জ্বলছিল।

সকাল বেলাতে ছাত্রদের গলার আওয়াজ পেয়ে আমি বের হই। দেখি কিছু ছাত্র প্রিয়নাথদার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে আর আর্মিরা তাদের পাহারা দিচ্ছে। আর্মিরা আমাকেও বলে ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য। হল থেকে মৃতদেহগুলো নিয়ে নিয়ে আমরা বাইরের মার্টে জড়ো করছিলাম। সেই সময়ে আমরা কয়েকজন ছিলাম ছাত্র, কয়েকজন মালি, গেট রক্ষকের দুই ছেলে আর বাকিরা ছিল পয়পরিষ্কারকারী। পয়পরিষ্কারকারীরা আর্মিরের বলল, তারা তো বাঙালি না, তাদের মেন যেতে দেয়া হয়।

আর্মিরা তাদের আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে নেয়। আর্মিরা

সারাক্ষণ আমাদের লাখি

মেরেছিল আর

চিন্কার করছিল

“We will see

how you get

free

Bangladesh!

Why don't you

shout Joy

Bangla”। আমাদের

তিনটি গ্রুপে ভাগ করে

আমি যেই গ্রুপে ছিলাম

সেটাকে নিয়ে তারা

ইউনিভার্সিটির

কোয়ার্টারে যায়

আর পাঁচ তলার

সবগুলো রুম

চেক করে

ছবি :  
কিশোর  
পারেখ



এবং মূল্যবান জিনিসপত্র সব লুট করে। নিচের তলায় আমরা স্তূপ করে রাখা মৃতদেহ দেখেছিলাম বেশকিছু। ফিরে আসার পরে আমাদের দিয়ে মৃতদেহগুলো শহীদ মিনারে নিয়ে আগে থেকেই সেখানে রাখা আরো অনেক মৃতদেহের সাথে জড়ো করায়। আমার সাথী ও আমি যখন সুনীলদার (হলের গার্ড) মৃতদেহ বয়ে নিছিলাম তখন পাশের বস্তি থেকে মহিলাদের চিংকার শুনতে পাই। আর্মিরা ঐ সময়ে পয়সারিকারীদের উপরে গুলির্বর্ষণ করছিল। আমি বুঝলাম যে আমাদেরও সময়ে এসেছে কারণ যারা আমাদের আগে লাইনে ছিল তাদেরকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে আর্মিরা গুলি করছিল। আমি এসময়ে দেখেছিলাম ড. দেবের (ফিলোসফি বিভাগের প্রফেসর) মৃতদেহ। আমি তখন ওনার মৃতদেহের পাশে শুয়ে পড়ি সুনীলদার লাশ ধরে থাকা অবস্থায় আর গুলির অপেক্ষায় থাকি। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে দেখি তারা সবাই চলে গেছে। তারপর আমি যাই পাশের বস্তিতে। সেখানে ইন্দু ভাই (পুরান বই বিক্রিতা) আমাকে অভয় দেন। তারপর পুরান ঢাকা হয়ে নদী পার হয়ে (মাবি টাকা নেন নাই) শিমুলিয়া, নওয়াবগঞ্জ হয়ে আমি এগ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে বরিশালে আমার গ্রামে চলে আসি।

## ড. নূর্জল উলার ডকুমেন্টারি

এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে Amita Malik's *The Year of the Vulture* (New Delhi: Orient Longmans, 1972, pp. 79-83) থেকে।

শিক্ষকদের অন্ত্যোষ্ঠিক্রিয়ার সময়ে বাংলা ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর রফিক উল ইসলাম আমাকে ফিসফিস করে বলেন যে, টিভি স্টেশনে একটি ডকুমেন্টারি আছে ২৫ শে মার্চের গণহত্যার। সাথে সাথে আমি জামিল চৌধুরীকে জিজাসা করি এই ব্যাপারে। তিনি আমাকে কনফার্ম করেন ব্যাপারটা। তিনি আরো জানান ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর এই ভিডিওটি ধারণ করেছিলেন। ৫ই জানুয়ারিতে আমি অনুমতি পাই টিভি কেন্দ্রে এই ভিডিওটি দেখার।

প্রায় ২০ মিনিটের এই ভিডিওটিতে দেখা যায় জগন্নাথ হল থেকে লাশ বয়ে কিছু মানুষ বের হচ্ছে। লাশগুলো বেশ সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়। এভাবে আস্তে আস্তে লাশের স্তুপ করে ফেলা হয়।

শেষ হবার পরে যারা লাশগুলো বয়ে এনেছিল তাদের লাইন দাঁড় করিয়ে রেখে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ (ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের টিচার ড. নূর্জল উলার নিজের ভাষায় বলে যাওয়া) পাবেন এমএমআর জালালের পোস্টে  
[\(\[http://www.sachalayatan.com/mmr\\\_jalal/9806\]\(http://www.sachalayatan.com/mmr\_jalal/9806\)\)](http://www.sachalayatan.com/mmr_jalal/9806)

## নারী নির্যাতন

এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে রশিদ হায়দার সম্পাদিত “১৯৭১: ভয়াভয় অভিজ্ঞতা” (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯) বইয়ের মো। আখতারুজ্জামান মন্ডলের “আমাদের মা বোন” অধ্যায় থেকে (পৃষ্ঠা ১৯৭)।

আমরা ভুরংসামারি স্বাধীন করার জন্য ১১ই নভেম্বর থেকে পঞ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে একযোগে আক্রমণ শুরু করি। ভারতীয় বিমান বাহিনী ঐদিন সকালে উপর্যুপরি বিমান হামলা শুরু করে। ১৩ই নভেম্বরে আমরা নিকটবর্তী হই আর ভারতীয় বিমান বাহিনীও তাদের অ্যাটাক জোরদার করে। ১৪ তারিখ সকালে পাকিস্তানিদের গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায় আর আমরা ভুরংসামারিতে প্রবেশ করি জয় বাংলা বলতে বলতে। ৫০-৬০ জন পাকিস্তানি আর্মিরে আটক করি আর তাদের ক্যাপ্টেনকে (Captain Ataullah Khan) পাই ব্যাক্সারে মৃত অবস্থায়। এই সময়েও সে এক মৃত নারীকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাঁর সারা শরীরে নির্যাতনের দাগ। তাঁকে আমরা কবর দেই।

তখনো ভাবিনি আর কত নির্ম দশ্য দেখা বাকি আছে। ওয়্যারলেসে আমাকে সার্কেল অর্ফিসে যেতে বলা হয়। সেখানে আমরা বেশকিছু অল্প বয়সী নারীকে তালাবদ্ধ অবস্থায় পাই। তাদেরকে দরজা ভেঙ্গে আমরা মুক্ত করি। দরজা ভাঙ্গার পরে আমরা তাঁদেরকে নগ্ন, ধর্ষিত নির্যাতিত অবস্থায় দেখতে পাই। আমরা সাথে সাথে রূম থেকে বের হয়ে চারটা লুঙ্গি আর চারটা বেডশিট ছুড়ে দেই ভিতরে। আমরা তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি কিন্তু তাঁরা খুবই শক্ত অবস্থায় ছিলেন। একজন ছিলেন ছয় সাত মাসের প্রেগনেন্ট। একজন ছিলেন

ময়মনসিংহের কলেজ ছাত্রী। তাঁদেরকে চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়ান আর্মির গাড়িতে করে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা রাস্তার আশেপাশে গর্তে অনেক খুলি আবিষ্কার করি। খুলিগুলোতে লম্বা

চুল আর ছেঁড়া শাড়ি পঁঢ়ানো ছিল, অনেকের হাতে চুড়ি ছিল। ভুরংসামারি হাই স্কুলের একটি রামে ১৬ জন নির্যাতিত নারীকে উদ্ধার করি। আশেপাশের গ্রাম থেকে তাদের নিয়ে আসা হয়েছিল। সার্কেল অফিসের বিভিন্ন রামে আমরা অনেক প্রমাণ পাই যে নারীদের জানালার সাথে বেঁধে রেখে বারবার রেপ করা হয়েছিল। পুরা মেরো ভরে ছিল রক্তে, লম্বা চুলে আর ছেঁড়া কাপড়ে।

## এক কর্মকর্তার স্ত্রী

এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে Amita Malik's *The Year of the Vulture* (New Delhi: Orient Longmans, 1972, pp. 141-42) থেকে।

তিনি (২৫ বছর বয়স) ছিলেন এক সরকারী কর্মকর্তার স্ত্রী। তাঁর তিন ছেলেমেয়ে ছিল। আর্মিরা প্রথমে তাঁর স্বামীকে নিয়ে যায়, আর প্রায় অর্ধ মৃত অবস্থায় ফেরত দেয়। তারপর অন্য একদল আর্মি আসে সকাল ৮-৯ টার দিকে। আর তাঁকে রেপ করে তাঁর স্বামী-স্তানদের সামনে। তারপর আরো একদল আর্মি আসে দুপুর ২.৩০ টার দিকে আর তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। এক বাংকারে আটকে রেখে তাঁকে বারবার রেপ করে, প্রতি রাতে তিনি অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত। তিনি মাস পরে যখন তিনি ফিরে আসেন, তিনি ছিলেন প্রেগন্যান্ট। গ্রামের মানুষজন তাঁকে সহানুভূতি জানায়। কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁকে ফেরত নিতে অস্বীকার করে। গ্রামের মানুষ জোর করায় তাঁর স্বামী আত্মহত্যা করে। আমরা তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা চালাচ্ছি কিন্তু তিনি একটি কথাই বারবার বলে যাচ্ছেন “But why, why did they do it? It would have been better if we had both died”।

## এক মৌলভির কথা

এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে Amita Malik's *The Year of the Vulture* (New Delhi: Orient Longmans, 1972, pp. 102-4) থেকে। এটি শেখ মুজিবের নিজ গ্রামের কাহিনী।

১৯শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে সকাল ৮ টার দিকে প্রায় ৩৫ জন আর্মি লঞ্চে করে আমাদের গ্রামে আসে। কিছুদিন আগে আমি শেখের বাবা মাকে বলেছিলাম গ্রাম ছেড়ে যেতে, কিন্তু তাঁরা রাজি

হন নাই। আর্মিরা এসে আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, এই মৌলভি, শেখের বাবা-মা কোন বাড়িতে থাকে। আমি তাঁর বাবাকে ডেকে আনি। আমরা একটা চেয়ার দিয়েছিলাম কিন্তু আর্মিরা তাঁকে মাটিতে বসতে বাধ্য করে। তারপর শেখের মা আমার হাত ধরেন, আর আমি তাঁকে চেয়ারে বসতে সাহায্য করি। আর্মিরা শেখের বাবার পিঠে স্টেনগান আর আমার পিঠে একটি রাইফেল ধরে আর বলে দশ মিনিটের মাঝে তোমাদের মেরে ফেলবো।

তারা শেখের বাড়ি থেকে একটি ডায়েরি আর কিছু ঔষধ নেয়, আর আমার কাছে চাবি থাঁজে। আমি চাবি দিলে তারা ট্রাঙ্ক ভেঙ্গে তল্লাশি চালায়; যদিও পাঁচটি চামচ ছাড়া আর কিছুই মেলে নাই। তারা একটি ছবি দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে এটা কার। শেখ মুজিবের বলায় তারা সেইটাও নিয়ে যায়।

তারা আমাকে রাইফেল দিয়ে মেরে শেখের বাবার পাশে টেনে নেয় আর আবারো মেরে ফেলার হুমকি দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করি শেখের বাবাকে কেন মারবে? তারা বলে "Is lire, keonki wohne shaitan paida kira hai" ["Because he has produced a devil."] আমাকে কেন মারবে, যে কিনা মসজিদের ইমাম? তারা বলে "Aap kiska imam hai? Aap vote dehtehain" ["What sort of an imam are you? You vote."] ক্যাটেন তখন আরো বলে ৮ মিনিট গেছে আর ২ মিনিট পরে গুলি করা হবে। তখন একজন মেজর দৌড়ে আসে লঞ্চ থেকে, আর নির্দেশ দেয় আমাদের না মারার। পরে শেখের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়।

আমি সাথে সাথে মসজিদে যাই আর প্রায় ৫০ জনের মত গ্রামবাসীকে দেখতে পাই। আর্মিরা এরই মধ্যে তিনজন বালককে টেনে বের করে গুলি করে মারে। খান সাহেবের (শেখ মুজিবের চাচার) একজন কিশোর ভৃত্য ছিল এরশাদ নামে। আর্মিরা আমাকে তার কথা বললে আমি বলি যে সে একজন কাজের ছেলে। কিন্তু তখন এক রাজাকার মৌলভি (পাশের গ্রামের) বলে যে এই ছেলেটা শেখ মুজিবের আত্মীয়, যা আদতে মিথ্যা ছিল। আর্মিরা এরশাদকেও লাইনে নিয়ে যায়। ছেলেটা পানি থেকে চাইলেও দেয়া হয় নাই। ঢাকা থেকে আসা একটি কিশোর যে সেখানে তার বাবার সাথে কাজ করতো তাকেও মেরে ফেলে আর্মিরা। এরশাদকে তার মায়ের সামনে গুলি করে মারে। গুলির পরে এরশাদ একটু নড়াচড়া করলে আবার তাকে গুলি করে।

দুপুর দুইটা পর্যন্ত এই হত্যাকান্ত চলতে থাকে। এ সময়ের দিকে তারা ১০-১২ জন বাঙালির একটি দলকে আনে। আর তাদেরকে দিয়ে গর্ত খুড়িয়ে লাশগুলো কবর দেয়ায় এবং তাদেরকেও মেরে ফেলে অবশেষে। তারপর আনন্দে চিংকার করতে করতে বিহারিগুলো চলে যায়। তখনো অনেক লাশ আশেপাশে পড়ে ছিল।

আর্মিরা ঐদিন মোট ছয়জন নির্দোষ কিশোরকে হত্যা করে কোন কারণ ছাড়াই। তোরাব ইয়াদ আলীর মা বাবার বলেও ছেলেকে কবর দেয়ার জন্য নিয়ে যেতে পারেন নি, কারন আর্মিরা চাছিল এইসব মৃতদেহ দেখিয়ে সবাইকে ভয় দেখাতে। এই বিধবার ১০ বছরের সন্তান মিঠুকেও তারা গুলি করে। কারন ছিল মিঠু মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করেছিল।

### ফয়স' লেকের হত্যাকান্ত

এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে রশিদ হায়দার সম্পাদিত "১৯৭১: ভয়াভয় অভিজ্ঞতা" (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯) বইয়ের আব্দুল গোফরানের "ফয়েজ লেকের গণহত্যা" অধ্যায় থেকে।

পাহাড়তলীর আকবর শাহ মসজিদের কাছে আমার একটা দোকান ছিল। ১০ই নভেম্বর, ১৯৭১ সকাল ৬ টার দিকে প্রায় ৪০-৫০ জন বিহারি আমার দোকানে এসে জোর করে আমাকে নিয়ে যায়। তারা আমাকে ফয়েজ লেকে নিয়ে যায়। সেখানে আমি দেখতে পাই পাস্প হাউজের উত্তর পাশে লেকের ধারে অনেককে হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। বিহারিদের হাতে ছুরি, তলোয়ার বা শার্প অন্য কোন অস্ত্র ছিলো।

বিহারিরা প্রথমে বাঙালিদের মারধোর করছিল আর অন্তর্ধারীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। একদল অন্তর্ধারী বিহারি অসহায় মানুষগুলোর পেটে ঘুষি মারছিল আর তলোয়ার দিয়ে মাথা বিছিন্ন করছিল। আমি বেশ কয়েক গ্রুপ বাঙালিকে এভাবে মেরে ফেলতে দেখি। একজন বিহারি আমার দিকে আগায় আর আমার সোয়েটার খুলে নেয়। তখন আমি তাকে ঘুষি মেরে লেকে বাঁপ দেই। অন্যপাড়ে যেয়ে আমি বোঁপের আড়ালে লুকাই। তারা আমার খোঁজে আসলেও আমি ভাগ্যক্রমে লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হই। বোঁপের আড়ালে থেকে আমি আরো অনেককে একইভাবে হত্যা করতে দেখি।

দুপুর দুইটা পর্যন্ত এই হত্যাকান্ত চলতে থাকে। এ সময়ের দিকে তারা ১০-১২ জন বাঙালির একটি দলকে আনে। আর তাদেরকে দিয়ে গর্ত খুড়িয়ে লাশগুলো কবর দেয়ায় এবং তাদেরকেও মেরে ফেলে অবশেষে। তারপর আনন্দে চিংকার করতে করতে বিহারিগুলো চলে যায়। তখনো অনেক লাশ আশেপাশে পড়ে ছিল।



# যুদ্ধ শিশু '৭১ : মাদার তেরেসা

অমি রহমান পিয়াল

মাদার তেরেসা সম্পর্কে নতুন করে বলতে চাওয়াটা এক ধরনের ধ্বন্তা। শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই মানবতাবাদী এই তপসীকে। তার অনেক পরিচয়ের একটি হচ্ছে '৭২ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন এই দেশটির নিপীড়িতা-নিগৃহীতাদের একটা হিল্লে করতে



সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন তিনিই। বীরাঙ্গনা সমস্যা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। দিশে পাছে না কোনো। একটা চুপ চুপ ভাব চারদিকে। মেরে ফেলা হবে না, আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হবে- এমন নজ্বায় ব্যস্ত সমাজপত্তির। মাদার এলেন। ঢাকার বুকে পাঁচটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে খুললেন বীরাঙ্গনাদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র।

নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক অব্রে মেনেন জুন-জুলাই '৭২ নাগাদ এসেছিলেন এদেশে। তার সাড়াজাগানিয়া আর্টিকেল 'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ' বেরিয়েছিল ২৩ জুলাই '৭২। বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন তিনি। কথা বলেছেন মাদারের সাথেও। কলকাতায় তার আশ্রমে গিয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিক খানিকটা তুলে দিচ্ছি মেনেনের বয়ানে-

'... ফ্যাকাশে নীল পাড়ের সাদা শাড়ি পড়ে তার সহকারীরা আসছেন যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন কেউ কেউ। খানিকগুলি আমার ঠিক পেছনে একজনের নিঃশব্দ উপস্থিতি টের পেলাম। পোশাক দেখে ভাবলাম উনিও মাদারের সহকারীদের একজন। বেটেখাটো একজন মহিলা। তাকালাম তার দিকে। নির্দিষ্ট করে বললে তার চোখের দিকে। বুরো ফেললাম তার পরিচয়।

মধ্যবয়সী। চেহারায় ঝঁক একটা ছাপ পড়েছে। কিন্তু চোখদুটো যুবতী। মায়া মায়া, খানিকটা কৌতুকমাখা। পোপ জন ও মহাত্মা গান্ধীরই ওমন চোখ দেখেছি আমি। মাদার কলকাতায় তার মিশন শুরু করেছিলেন অবহেলিত বয়ক্ষদের নিয়ে। সংসার ও স্বজন যাদের বোৰা ভেবে ত্যাগ করেছে। শেষ বয়সে এসে মাদারের কোলেই পরম আশ্রয় পেয়েছেন তারা। পরোপকার ও জনসেবার এই মহান ব্রতই তাকে গোটা ভারতে কিংবদন্তীর মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলাদেশের (স্বাধীনতা যুদ্ধে) ধর্মতাদের উদ্ধারকল্পে তারই অবদান প্রথম- আমার এই স্মৃতিটা হেলায় পাশ কাটালেন মাদার। 'হাজার হাজার মানুষ ওখানে কাজ করছে এখন'। খুব শান্ত গলায় বললেন। তারপর অবাক করে দিয়েই যোগ করলেন, 'একদিক থেকে ব্যাপারটা ভালো হয়েছে। বাঙালীরা জাতি হিসেবে খুবই দয়ালু। ওটাই তাদের মজাগত। এই ঘটনাটা তাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছে। এর দরকার ছিল। এখন তারা গা বাড়া দিয়েছে। শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে-পুরুষ এগিয়ে আসছে সাহায্যে। আমার ধারণা স্বজাতের এই ট্রাজেডি তাদের মনোজগত বদলে দিয়েছে। তুমি কি জানো, শত শত তরঙ্গ এগিয়ে এসেছে এই মেয়েদের বিয়ে করতে?'

মাদার তেরেসা। কেউ কি সত্যি বিয়ে করেছে? প্রশ্ন করলাম। 'এখনো না। তবে দ্যাখো, এসব মেয়ের বেশিরভাগই গর্ভবতী। বাচ্চা হবে বা হয়েছে। তাই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

গর্ভবতী হয়ে পড়া মেয়েদের জন্য বাংলাদেশ সরকার গর্ভপাত কর্মসূচী নিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সমাজ স্থীকৃত নয়। তবে সমাজ তাদের ঠিক ব্রাত্যও করেনি। বেশিরভাগ শিশুই ভূমিষ্ঠ হবে। মাদার জানালা দিয়ে বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ...'

# একজন ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

## সুশান্ত



কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ দিয়ে তিনি পতাকার লালভূকে ধারণ করেন। যার জীবনের সঙ্গে মিশে আছে এক বীরাঙ্গনা নারীর দুর্বিষহ জীবনগাথা, এক নির্মম ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী যিনি, একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ যার জীবনের সবচেয়ে বড়ো অহংকার তিনি সবার প্রিয় শিল্পী-খ্যাতিমান ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী বলেন, যুদ্ধের শিকার হয়েছে যে নারী তার তো নিজের কোনো লজ্জা নেই। যুদ্ধের সাক্ষী হওয়ার সম্মান কজন পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি তেমন কাউকে সঙ্গে পাননি। তাই প্রিয়ভাষিণী বললেন, আমি ভেবেছিলাম আমি যদি মুখ খুলি অনেকেই সে সময়ের কথা বলবেন, কিন্তু কেউই মুখ খুললেন না। ধর্ষিতা নারীর অধিকার কেউ ফিরিয়ে দিতে চাইবে না। আমাদের নিজেদের সেই অধিকার ছিনয়ে নিতে হবে।

আমাদের অপমান-লাঞ্ছনা আর আত্ম্যগ্রে মধ্যে একটি পতাকার জন্ম হয়েছে। আমরা কেন কানাকাটি করবো, হেয় হবো। এ পতাকার জন্মের সঙ্গে নারীর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

একান্তরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি নরপশুদের লালসা চরিতাত্ত্বের শিকার হয়েছেন ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী। তার মতো নারীর সম্ভ্রম ও দুর্ভোগের বিনিময়েই তো আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। একান্তরের আড়াই লাখ ধর্ষিতার মর্মবেদনা, তাদের আজকের দিনের ক্ষেত্রে আর হতাশাই যেন ফুটে ওঠে প্রিয়ভাষিণীর মুখের ভাষায়।

একান্তরের মার্চে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী পরিবারের সঙ্গে খুলনা শহরে বসবাস করতেন। যুদ্ধের অনেক আগেই তিনি ছিলেন স্বামী পরিত্যক্ত। তিনটি ছেলে। তার ওপর ভাইবোনের দায়িত্ব। এই বিশাল পারিবারিক বহর সামাল দিতে তাকে তরুণ বয়সেই ক্রিসেন্ট জুট মিলে চাকরি নিতে হয়েছে। সেই চাকরিকে কেন্দ্র করে এই নারীকে পাকিস্তানের রোষানলে পড়তে হয়েছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি কোনো একদিন ক্রিসেন্ট জুট মিলের জাহাঙ্গীর প্রিয়ভাষিণীকে চাকরি দেওয়ার নাম করে নিয়ে গেলো খালিশপুর পার হয়ে ওয়্যারলেস কলোনির এক আগাখানির বাড়ি 'মাসকাট হাউস'-এ। সেখানে জাহাঙ্গীর তাকে এক পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার হাতে তুলে দিতে চায়- এটা বুবতে পেরে কোশলে পালিয়ে আসেন প্রিয়ভাষিণী।

সেখান থেকে ক্রিসেন্ট জুটমিলের ভিতরে গিয়ে দেখা করেন মিলের জিএম পিত্তসম ফিদাই সাহেবের সঙ্গে। তাকে জানালেন দুর্দশার কথা। সুযোগটি নিয়ে নিলেন ফিদাই সাহেব। চাকরি দিলেন মিলে। ৩০০ টাকা অগ্রিম বেতনও দিলেন। শুরু হয়ে গেল অন্ধকার জীবন। ফিদাই সাহেবেই প্রিয়ভাষিণীকে তুলে দিলো পাকিস্তানি নেভাল কমান্ডার গুলজারিনের হাতে।

গুলজারিন নির্যাতন করে তাকে। ছেড়ে দিয়ে বললো যখনই ডাকবো তখনই আসতে হবে। এভাবে চললো অত্যাচার। কখনো ক্যাপ্টেন, কখনো বিহারি, আবার কখনো বাঙালি হায়েনাদের লালসার শিকার হতে হয়েছে তাকে। এভাবেই চলেছে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

প্রিয়ভাষিণী বলেন, এই সময়টাতে আমাকে কখনো নেভাল অফিসারদের সঙ্গে গাড়িতে যুরতে হয়েছে, আবার মামলায় হাজিরা দিতে হয়েছে মাঝে মাঝে। খালিশপুর-খুলনার সাধারণ মানুষ বিরক্তি নিয়ে দেখেছে আমাকে। আমাকে ঘৃণা করেছে। কিন্তু আমাকে দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে কেউই মুক্ত করতে এগিয়ে আসেন। তবে আমি এর মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ওষুধ পৌঁছে দিয়েছি। অনেকের বাড়িতে টাকা পৌঁছে দিয়েছি। সর্বশেষ ২ ডিসেম্বর ঘটলো আরেক অগ্রাতিকর ঘটনা। বিহারি ডাইভার রশীদ পর্যন্ত আমাকে ছাড়েন। এছাড়া ক্যাপ্টেন সুলতান, লে: কোরবান আর বেঙ্গল টেডার্সের অবাঙালি মালিক ইউসুফ আমাকে যশোর নিয়ে যাওয়ার পথে গাড়ির ভেতর নির্যাতন করেছে।

প্রিয়ভাষিণী বর্তমান বাংলাদেশকে কালো শক্তির আড়ালে ঢাকা বিমুক্ত দেশ হিসেবে আখ্যা দেন। প্রিয়ভাষিণী স্বপ্ন দেখেন অন্যরকম এক বাংলাদেশের। যে দেশে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী যুদ্ধাপরাধীরা লাল-সবুজ পতাকা নিয়ে কোনো দিন ঘুরে বেড়াবে না।

তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ থামেনি। নাটকের যেমন বিরতি হয় তেমনি ৩০ বছর ধরে চলছে অসমাপ্ত যুদ্ধের বিরতি। এখনো যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি। এ যুদ্ধাপরাধীরা তাদের কালো হাত দিয়ে তেকে দিচ্ছে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা। কারণ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রথম শর্তই হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। খারাপ লাগে যখন দেখি মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে স্বাধীনতাবিরোধীরা আমার অর্জিত পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তিনি ক্ষেত্র প্রকাশ করে বলেন, কীভাবে দেশে মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে থাকতে স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি ক্ষমতায় আসে। এভাবে তারা দেশকে টুঁটি চেপে ধরেছে। হয়তো আমি বেঁচে থাকবো না। কিন্তু এ দেশের স্বাধীনতা যদি সত্যি হয় তবে এসব কালো হাতের থাবা থেকে দেশ মুক্ত হবে। একেকটি বাঙালি একেকটি দেশ। এ দেশের মাটি থেকে আগামী প্রজন্ম স্বাধীনতার বিরোধী শক্তিকে উৎখাত করবেই। তা না হলে আমাদের সমস্ত ত্যাগ, সমস্ত সম্ভ্রম, রক্ত বৃথা হয়ে যাবে।

উৎস: এনওয়াই বাংলা

৩ মার্চ ২০০৮

# সেইসব মা জননীকে আমাদের প্রণাম

## ইরতেজা

১৯৫২ ভাষা আন্দোলনে শহীদ বরকতের মা হাসিনা বিবি থাকতেন সেই সময় থাকতেন ভারতে। তার ছেলে বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হন। আমাদের দেশে স্থায়িভাবে বাসবাস না করেও প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মাতা ছুটে আসতেন ঢাকাতে ছেলের আজিমপুর কবরস্থানে ছেলের কবরের সামনে শুন্দা জানাতে। শহীদ মাতা হাসিনা বিবিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। ৬৮-৬৯ সালে তাকে জোর করে দেশে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি তার পাসপোর্ট আটক করে রাখা হয়। এক মাকে তার ছেলের জন্য প্রাথমিক করতে দেয়া হয়নি। ১৯৮২ সালে তিনি বরকত বরকত করতেই ইন্টেকাল করেন।

মিরপুরে কবি মেহেরনিসাকে তার বৃন্দা মায়ের সামনেই হত্যা করা হয়। পাকিস্তানিরা এক মায়ের সামনে তার মেহের দুই ছেলেকে আর তার তরুণী মেয়েকে শক্ত করে রশি দিয়ে বাধা হয়। এক বৃন্দা মায়ের আকৃতি মিনতি, পায়ে ধরে বিলাপ কিছুতেই ওই পশ্চদের মন গলে নি। সেই সব ভয়ন্কর পিশাচরা ভয়ন্করভাবে ধারালো ছুরি দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে এক মায়ের চোখের সামনে তার সন্তানদের তিল তিল করে ছুরিকাবিদ্ব করে হত্যা করল। আর সেই অসহায় জননীর তাক্ষণ্য আর্তনাদে সেদিন বুবি মীরপুরের ধূসর আকাশের বুক চিরে গিয়েছিল, কিন্তু এতটুকু কাঁপেনি সেই প্রতিবেশী অবাঙালি পশ্চদের বুক।

ভাষা শহীদ আরমা গুলকে যখন ধরার জন্য মিলিটারীরা তাদের বাসা ঘিরে ফেলে তখন উনি তার মায়ের কাছে গিয়ে আনুরোধ করেন ‘আমাকে হয়ত এখনেই গুলি করে মারবে। আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমরা আমার লাশটা বারান্দায় ফেলে রেখো যাতে সকলে আমার মৃতদেহ দেখে মনে মনে সাহস পায় বিদ্রোহ করার জন্যে।’

মুক্তিযুদ্ধের এক দিনে সেক্টর কমান্ডার রফিক ভিতর দিয়ে

হেঁটে যাচ্ছিলেন। চারিদিকে গোলাগুলি, বোমা পড়ছিল। তখন তিনি দেখতে পেলেন কয়েকজন মহিলা দৌড়াচ্ছেন। একজন কিশরের দ্বিখণ্ডিত দেহ পরে থাকতে দেখে উনি থামলেন। একজন মা খুব শাস্ত ভাবে সেই মৃত ছেলের লাশের দিয়া একমনে চেয়ে আছেন। সেই দুঃখ মা চোখ মুছে তাকে দেখে জিগসা করলেন ‘তোমরা কারা গতিনি উন্নত দিলেম ‘মা, আমরা আপনার ছেলে’। ছেলের দ্বিখণ্ডিত দেহের সামনে তখন তার মা আল্লার কাছে হাত তুলে মোনাজাত করল ‘আল্লাহ আমার প্রানপ্রিয় ছেলেটিকে নিয়ে গেছিস সে জন্য আমার কোন অভিযোগ নেই, আমার ছেলের প্রানের বিনিময়ে আমি এখন শুধু এই ছেলেটার জন্য দোয়া চাইছি যারা এই দেশের স্বাধিন তার জন্য যুদ্ধ করছে’। এই কথাটা তাদের সাহস মনোবল অনেক বৃদ্ধি করেছিল। পরে মুক্তিযোদ্ধা রফিক যখন গুলিবিদ্ব হল তখন তিনি বলছিলেন আল্লার তুমি এক দুঃখ মায়ের মায়ের দোয়া করুল কর।

শহীদ আজাদে ছিলেন ঢাকা শহরের সেই সময় সব থেকে ধর্মী ইউনুশ আহমেদের একমাত্র পুত্র। বিপুল অর্থবিত্তের ভিতর বড় হলেও আজাদ জীবনে তার মাকে নিয়ে অনেক কষ্ট করেছে। শহীদ আজাদ ঢাকায় পেরিলা অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। তাকে তার বাসা থেকে তার মায়ের সামনে মারতে থানায় নেয়া হয়। আজাদ, শহীদ জুয়েল ধরা পরার পর টর্চার সেলে মিলিটারীদের প্রচল্ড মারে তাকে সিলিং ফেনের সাথে উলটা করে সারা দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়। সারা শরীরে বেল্ট দিয়ে পিটানো হয়। তার সারা গা রক্তাক্ত হয়ে যায় মুখ থেকে রক্ত পরছে কিন্তু তারা কিছুই ফাঁস করেনি।

আজাদের মনবল ভাসার জন্য মোহাম্মদ কামজামান(জামাতের উর্ধ্বতন নেতা) সাথে করে আজাদের মাকে সামনে নিয়ে আসে। রমনা থানায় তার মাকে বলা হয় আজাদকে তার সিদ্ধিরঞ্জ আর রাজারবাগ অপারেশনে

## যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না কেন, হবে...

### হাসান মোরশেদ

নিজস্ব আগ্রহে কিছুদিন পড়াশুনো করছি, গণহত্যা সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণা, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এইসব নিয়ে।

অবশ্যই, অতি অবশ্যই বাংলাদেশ ৭১ কে মনে রেখে, আসলে সেই তাড়নাতেই। দেখছি, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা ঘোষণা করেছে বেশকিছু মানবাধিকার সংরক্ষণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

যেমন-

1. Geneva Convention
2. Convention of the prevention and punishment of the crime of genocide
3. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or punishment
8. International Convention of Civil and political rights

অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা ঘোষণা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার নিজের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যারই বিচার আয়োজন করেনি। International Criminal court এ বিচার হওয়ার সুযোগ নেই কারণ এ আদালত নিজ উদ্যোগে কেবল বর্তমান অপরাধসমূহের শুনানি আয়োজন করতে পারে, পেছনেরগুলো আয়োজনের এক্তিয়ার তার নেই।

আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হতে হলে জাতিসংঘের সাধারণ বা নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে special tribunal গঠিত হতে হবে এবং অবশ্যই তা হতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের সরকারের আগ্রহে ও অনুরোধে। এ সব কিছুর প্রয়োজন, যদি বাংলাদেশ গণহত্যার জন্য দায়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিচার দাবী করে এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চায়। এটা অসম্ভব নয়। খেয়াল করা জরুরি, মানবাধিকার সংস্থাগুলোর চাপে ব্রিটিশ সরকার তার

অংশ নেয়া বন্ধুদের নাম ঠিকানা বলতে আর অস্ত কোথায় লুকিয়ে রেকেছে তা বলতে। কিন্তু তাদের সামনেই আজাদের মা পুত্রকে সাহস দিয়ে বলে 'বাবা রে, যখন মারবে, তুমি শক্ত হয়ে থাকো। সহ্য কোরো। কারো নাম যেন বলে দিও না।

আজাদ সেই রাতে থানায় মাকে বলল, "মা, ভাত খেতে ইচ্ছা করে, দুই দিন ভাত খাই না। কালকে ভাত দিছিল,



জাহানারা ইমাম

আমি ভাগ পাই নাই" আজাদের মা পরের দিন টিফিন ক্যারিয়ারে করে ভাত, মাংস, আলুভর্তা, বেগুনভাজি হাতে নিয়ে মা সারা রাত থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু তাকে জানান হয় আজাদ রমনা থানায় নেই। উনি সারা রাত এক থানা থেকে আরেক থানা, এমপি হোস্টেল, কেটেরম্যান্ট খুজেও কোথাও আজাদকে পাওয়া যায় নি। আজাদকে আর কখনও খুজে পাওয়া যায় নি।

স্বাধীনতার যে ১৪ বছর আজাদের মা সাফিয়া বেগম বেঁচে ছিলেন তিনি সারা দিন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ডাকপিয়ন আসলে দৌড়ে যান তার ছেলের কোনও চিঠি আছে নাকি দেখতে। একটু শব্দ হলে তার বুক কঁপত। তখন শেষ বার সেলে আজাদকে দেখেছিলেন আজাদ মাটিতে শয়ে ছিল। মাটিতে খালি একটা পাতি ছিল কোন বালিশ ছিল না। আজাদের মা ওই দিনের পর থেকে

কোন দিন বিছানায় শুমান নি। উনি মাটিতে পাটি বিছিয়ে শুমানেন। আজাদ মৃত্যুর আগে ভাত খেতে পারে নি তাই তার মা বাকি জীবনে কোন দিন ভাত খাননি। সুদীর্ঘ ১৪ বছর খালি রুটি খেয়েছেন দুইবেলা কখনো একবেলা শুধু পানিতে চুবিয়ে। ৩১সে আগস্ট, ১৯৮৫ আজাদের ধরা পরার সেই দিনেই এই রত্নগভী নারীর শেষ নিশাস ত্যাগ করে। তার কবরে তার ইচ্ছা অনুযায়ী খালি একটা লাইন লিখা, শহীদ আজাদের মা"।

গত ৩ তারিখ ছিল শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জন্মদিন। রুমি যখন তার মায়ের কাছে এসে মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাইল তখন তার মা বলেছিল 'যা তোকে দেশের জন্য কোরবানী করে দিলাম'। এই শেষ কথাটার জন্য জাহানারা ইমাম সারা জীবন আফসোস করেছেন। আল্লাহ মনে হয় কোরবানী কথাটি কবুল করে নিয়েছেন। উনি কেন বললেন না, যা রুমি যুদ্ধ করে বীরের বেশে স্বাধীন দেশে ফিরে আয় তাহলে হয়তবা তার ছেলে রুমি ফিরে আসত ১৬ ডিসেম্বর।

স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর আজও বাংলার ঘরে ঘরে হাজার হাজার আজাদের মা, রুমির মা, জুয়েলের মায়েরা নিঃতে চোখের পানি ফেলে। প্রথিবীর সব কষ্ট হয়ত সময়ের সাথে সাথে হালকা হয়ে যায় কিন্তু সন্তান হারাবার কষ্ট কি কোন দিন কমে। জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত সেই ছেলে হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে তারা বেঁচে থাকে। মায়ের কাছে সন্তান বিদ্যায় নিয়ে দূরে কথাও চলে গেছে। সেই শহীদ মায়েরা তাদের ছেলের মুখ আর কোন দিনও দেখতে পাবে না, তাদের ছেলেরা বর্ষার তুমুল বর্ষণে মায়ের হাতের আদরে মাথা খিচুরী থাবে না, ঘোমটার ফাঁক গলে চেয়ে থাকা মায়ের দৃষ্টি নিয়ে শরতের আকাশে ঘুড়ি উড়াবে না, কনকনে শীতের রাতে মায়ের বুকের উষ্ণতা নিবে না, ক্লান্ত হয়ে বাসায় এসে মায়ের শাড়ির আঁচলে মুখ মুছবে না, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুরে মায়ের খোলা শীতল পিঠে কচি শরীর লেপটে শুমাবে না, মায়ের অনেক আদরের মানুষটি কখনই মাকে নিয়ে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে দেখতে পাবে না।

১৪ মে ২০০৭

দাসব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও গোষ্ঠীগুলোকে আর্থিক ক্ষতিপ্ররূপ দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও দাসব্যবসা বিলু- প্রির দুশো বছর পার হয়ে গেছে।

কিন্তু যদি বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আল-বদর তথা জামাত গংদের বিচার করতে চায় তাহলে এতো বামেলায় যেতে হবে না। বিদ্যমান সংবিধানের আওতায় এদের বিচার সম্ভব। এ ক্ষেত্রে দুটো পয়েন্ট মনে হলো-

১. আদালত গোলাম আজমের নাগরিকত্ব দিয়েছে। অনেকের মতো আমি ও শুরু হয়েছিলাম এ সিদ্ধান্তে। আসলে কিন্তু শুরু হবার কিছু নেই। আদালত তাকে নাগরিকত্ব দিয়েছে কারণ জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি হিসাবে জন্মসূত্রে প্রাণ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া যায় না, দেশে তুকতে কিংবা বের হতে বাধা দেয়া যায় না কিংবা জোর করে দেশ থেকে বের করে দেয়া যায় না। যে আদালত গোলাম আজমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, সে আদালত কিন্তু তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেনি, যেমনটি জামাতিরা প্রচার করে। বরং এ রায় তার বিচারের পথ সুগম করেছে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এখন সহজেই তার বিচার করতে পারে, যেমনটি সম্ভব হতো না সে যদি পাকিস্তানী নাগরিক থাকতো। এ ক্ষেত্রে আর কোনো কুটনৈতিক বা আন্তজাতিক আয়োজনের প্রয়োজন নেই।

২. বিগত বিএনপি সরকারের সময়েই বাংলাদেশের একটি আদালত জিয়াউর রহমান ও এরশাদের ক্ষমতা দখল ও শাসনামলকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সরকার উচ্চ আদালতে প্রভাব খাটিয়ে এ রায়কে স্থগিত করেছে। রায় কিন্তু বাতিল হয়নি। এ রায় বাস্তবায়িত হলে এ দুই আমলে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোও বাতিল হবে। গুরুতর অপরাধে বিচারাধীন ১০ হাজার দালাল, যারা মুজিব আমলে সাধারণ ক্ষমা পায়নি এবং পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়া জামাতের শীর্ষ নেতৃ যাদের বিহুদে গ্রেপ্তার পরোয়ানা বুলছিল, তাদের সবাইকে আবার বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। সোজা কথায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিচার করার মতো আন্তর্জাতিক প্রভাব বাংলাদেশ অর্জন করতে না পারলেও দেশে থাকা ঘাতক দালাল জামাতী গংদের বিচার হতে পারে, যে কোনো মুহূর্তেই। শুধু প্রয়োজন একটা স্থিতিশীল, সাহসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি সত্যিকারের অঙ্গীকারাবদ্ধ সরকার যারা অপরাধীদের অপরাধী হিসেবেই গণ্য করবে, রাজনীতির গুটি হিসেবে নয়। কে জানে, এরকম একটা সরকার গড়ে না উঠার পিছনে আরো অনেক হিসেবের সাথে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের হিসেবটি ও আছে কিনা!

# চরমপত্র : ইথারে এক অন্য মুক্তিযুদ্ধ

অমি রহমান পিয়াল

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের একটি কথিকা :

দম্ভ মাওলা, কাদের মাওলা!

ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না । এমেতই একটা আওয়াজ করলাম, আর কি!

এত কইরা কইছিলাম- চেতাইস না, চেতাইস না । বঙ্গবন্ধুর বাঙালীগো চেতাইস না । বাংলাদেশের কেঁদো আর প্যাঁকের মইদে হাঁটু হান্দাইস না । নাহ । আমার কাথা হৃলনো না । তহন কী চিরকীত? ৭২ ঘন্টার মাইদে সব ঠাণ্ডা কইরা দিমু । কি হইলো, ঠাণ্টা মালেক্যা, পিংয়াজি-ইয়াহিয়া সাব? অহন হেইসব চোটপাট গ্যালো কই? ৭২ ঘন্টার জায়গায় ২১০ দিন পার হইছে- গেনজাম তো শেষ হইলো না । আইজ কাইলতো কারবার উল্লা কিসিমের দেখতাছি । হানাদার মচুয়াগো অবস্থা দিনকে দিন তুরহান্দ খরতনাক হইয়া উঠতাছে । সাতক্ষীরা-খুলনা, যশোর-কুষ্টিয়া, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর, সিলেট-ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল-মধুপুর, কুমিল্লা-চিটাগাং, মাদারীপুর-পালং আর ঢাকা-মুলগঞ্জ- হগগল জায়গাখনে ওয়ান্দের বেস্ট পাইটিং ফোসর্সা খালি বাইড়া দৌড়াইতাছে ।

জেনারেল পিংয়াজি অক্রে থঃ ।

এইডা কি? এইডা কি?

মেজের শের মোহাম্মদ । তোমারে না সাতক্ষীরায় ডিউটি দিছিলাম? তুমি ঢাকার সেকন্ড ক্যাপিটালে আইলা ক্যামতে? তোমার মুখে এতবড় দাঢ়ি গজাইলো ক্যামতে? তোমার সোলজারগো খবর কি? তোমার পরণে তপহন দেখতাছি কির লাইগ্যা?

ছ্যার কইতাছি, কইতাছি । পয়লা একটুক দম লইতে দেন । সাতক্ষীরা যাওনের আগে বিগ্রেডিয়ার ফকির মোহাম্মদনে বোলা থা- পহেলা আপ, দুসরা বাপ, উসকো বাদ দুনিয়া । সাতক্ষীরায় যাইয়া দেখি পাকিস্তান আমির বহুত খতরনাক অবস্থা । ঈদের নামাজের পর থাইক্যাই বাঙালী বিচ্ছুণ্লা অক্রে পাগলা হইয়া উঠছে । হাজার হাজার বিচ্ছু তিনদিক থাইক্য আইস্য আরে বাড়ি রে বাড়ি । সাতক্ষীরায় আমাগো মর্টার, মেশিনগান, গ্রেনেড, বাংকার, টেঞ্চ কিছুই কুলাইলোনা । আমাগো

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত চরমপত্রের একটি অডিও ফ্লিপ, শুনুন ইম্পিসে

## প্রাক কথন

হৃমায়ন আহমেদের আগনের পরশমণি হিবিতে একটি দৃশ্য আছে । কানের কাছে রেডিও নিয়ে সপরিবারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছেন আবুল হায়াত । শুনছেন চরমপত্র । উজেন্জায় মুঠি পাকাচেন । শোনা যাচ্ছে বিচ্ছু, মচুয়া, গাবুইরা মাইর জাতীয় কিছু শব্দ । এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়কার এক নিয়মিত ছবি । অবরুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা কামী বাঙালীর কাছে চরমপত্র ছিল এক সজীবনী সুধা । মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নাস্তানবুদ হওয়ার সরস বয়ানে তারা হেসে গড়াতেন । কখনোবা মুঠো পাকাতেন যুদ্ধ যোগদানের অক্ষমতা ঢাকতে, যা আসলে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের প্রাণভরা ভালোবাসারই আরেকটি অভিযোগি । আর টেঞ্চে টেঞ্চে মুক্তিযোদ্ধাও শুনতেন সতীর্থদের বীরত্ব গাঁথা । তারা উদ্বেল হতেন । সেইসঙ্গে সোংসাহে বুক বাঁধতেন ওপার বাংলায় শরণার্থী আরো এক কোটি বাঙালী । এত কিছু করে ফেলতেন রেডিওতে ঢাকাইয়া উচ্চারণের এক মুক্তিযোদ্ধা । এম আর আখতার মুকুল । ১৯৭১ সালের ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হওয়ার দিন থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের দিন পর্যন্ত মুকুল পড়ে গেছেন তার স্বরচিত এই অমর কীর্তি । তার ভাষ্য- 'চরমপত্র ছিলো একেবারে ব্যাঙ্গাত্মক ও শ্রেষ্ঠাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একটা একক অনুষ্ঠান । একটা মানসম্মত রেকর্ডিং স্টুডিওর অভাবে প্রতিদিন ছেট্ট একটা ঘরে টেপ রেকর্ডারে চরমপত্র রেকর্ডিং করতে

সোলজারগো লাশ অক্রে পাহাড় । বেগতিক দেইখ্যা একটা মরা রাজাকারের লুঙ্গি পিন্দা হেই কাম করলাম । দিলাম দোড় । যে রাস্তা দিয়া ভাগছি, দেখি খালি মেজিক কারবার । হগ্গল জায়গায় বিচ্ছুরা ওত পাইতা রইছে । এক ঝাপট মাইরা হেরা কালীগঞ্জ থানা দখল কইরা লইলো । হেরপুর আরামসে নদী পার হইয়া বিচ্ছুরা অহন খুলনা টাউনের দিকে যাইতাছে । মুক্তিবাহিনীর আরো দুইটা দল যশোর থিকা ৭ মাইল দূরে

চৌগাছায় আস্তানা গাড়ছে । হেই জায়গায় আমগো পাকিস্তানী সোলজার যেমতে কইরা গর্বের গোসের কাবাব খাইছিল, এইবার বিচ্ছুরা কয়েক ঘন্টার মাইদে আমগো হেইসব সোলজারগো কাবাব বানাইল । গেরামের বাঙালীরা মহাখুশী । হেরা গামছা উড়াইয়া বিচ্ছুগো খেস আমদেন জানাইতাছে । ছ্যার, সত্যি কথা কইতে কি, রাজাকারগো কাছে অহন দুইটা মাত্র রাস্তা খোলা রইছে । হয়, একটা রাইফেল আর ৩০ রাউট

গুলি লইয়া সারেভার করা । আর না হয় ‘মউত তেরা পুকার তা’ । দুই কিছিমের কারবারই চলতাছে । পাকিস্তানী সোলজারগো আঃ বাঃ ফি । মানে কিনা আহার ও বাসস্থান ফি হইয়া গেছে । হগগল সোলজারই আজরাইল ফেরেশতার খাতায় নাম লিখাইতাছে । এই রিপোর্ট পাইয়া লেং জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী কি রাগ ? আতকা ঘাড় তেড়া কইরা দ্যাখে কি, সিলেট সেস্টেরের লেং কর্ণেল জান মোহাম্মদ, মেহেরপুরের মেজর বসির খান, রংপুরের কর্ণেল অস্বর খান আর মাদারিপুর-বরিশালের মেজর মাহবুব মোহাম্মদ মাথা নিচু কইরা খাড়াইয়া রইছে । হগগল জায়গার রিপোর্ট খুব খতরনাক । পিপ-পিপ । পিপ-পিপ । জেনারেল পিয়াজী সা’বে রেডিওগামে মছুয়া স্মার্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলো । ‘আমগো অহন কুফা টাইম শুরু হইছে । আরো সোলজার পাঠান বঙ্গল মুলুকে ।’

ব্যাস । খুনী ইয়াহিয়া খান হাইক্সির প্লাস হাতে শিয়ালকোট থাইক্যা জলদি ইসলামাবাদে ওয়াপস আইলো । এডভাইজারগো লগে গুফতাণ করার করনের পর, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নয়া কিছিমের টিক্স করার লাইগ্যা দোষ্টগো কাছে খবর পাঠাইলো । ফরেন সেক্রেটারি সোলতাইন্যা নিউইয়ার্ক-প্যারিস-বন থাইক্যা ধাওয়া খাইয়া ফেরত আইলো আর বঙ্গল মুলুকের গবণ্ড ঠ্যাটা মালেইক্যা ঢাকার থনে পিভি যাইয়া হাজির হইলো । বুড়া বিলী নুরুল আমীন আগের থনেই পাকিস্তানে রইছে । ইসলামের যম, গোলাম আয়ম আর খুলনার খবরের কাগজের হকার এজেন্ট-মন্ত্রী মওলানা ইউসুইপ্যা ইসলামাবাদে যাইয়া ‘ইয়েচ ছ্যার’ কইলো । আর লারকানার পোটা পেলা জলফিকার আলী ভুট্টো মন্দের গিলাস হাতে তু মেরি মানকি মোতি হায় গান গাইতে গাইতে ঢাকলালা বিমানবন্দরে উপস্থিত হইলো । টেলিগ্রাম পাইয়া নতুন মামু, পুরানা চাচা, পরানের দোস্ত- হগগলে আইস্যা হাজির হইলো ।

এদিকে ঢাকার কারবার হনচেননি ? হেই দিন আতকা কই থনে আমগো কালু মিয়া, যারে মহল্লার মাইনশে আদর কইরা কালু কইয়া ডাকে- হেই কালু আইস্যা হাজির । বেড়ায় চিতকার করতাছিল । ভাইসাবরা কারবার হনচেননি ? পিআইএ প্লেন সার্টিস নাইক্যা । দুই ঢাকার খন যে টেরেন চলতাছিল, হেইগুলার ঢাকা বন্দো । বাস সার্ভিস তো আগেই ইস্তফা । ঢাকা থাইক্যা বাইরাইনের হগগল রাস্তা বন্দ ।

চিল্লানী থামাইয়া কালু আমগো কাছে আগঙ্গইয়া আইলো । আস্তে কইয়া জিগাইলো, আচ্ছা ভাইসাব, বিচু কারে কয় ? হেরা দেখতে ক্যামন ? হেগো ডেরেশ কি রকমের ?

আতকা আমগো বকশিবাজারের ছক্কু মিয়া একটা বাইশ হাজার

টাকা দামের হাসি দিয়া গলাটার মাইদে জোর খাকরানি মাইরা কইলো, আমাগো কাউলা একটা আহাম্মক । যুদ্ধের শুরু হওয়ার সাড়ে আটমাস বাদে হালায় জিগাইতাছে বিচুগো ডেরেশ কি রকমের ! তয় হোন । এরা হইতাছে দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক পলকে মছুয়া ঘষে ।’ হেইদিন যারা বনানীতে প্রাত্ন গবন্ন মোনেম খাঁরে মার্ডার কইরা হের লাস গায়ের কইরা ফালাইলো- হেগো বিচু কয় । এগো কোনো ডেরেশ নাই । হ-অ-অ-অ । হেই দিক্কার কারবার হনচেননি ? লেংড়া, কানা খোড়া, বোচা যেইসব বুড়াবুড়ি পাঞ্জাবি মছুয়া আর্মি থনে চাকরিতে রিটায়ার করনের পর স্মাগলিং আর বিলেক মার্কেটের বিজিনেস করতেছিল, জঙ্গি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হগগলেরেই লড়াই করনের লাইগ্যা কল করছে । রিপোর্ট না করলে ৭ বছরের সশ্রম কারাদাদ । এইগুলারেই কয় কামানের খোরাক । এই খবর শুইন্যা বিচুগো মুখ দিয়া অকরে লালা পড়তে শুরু করছে । মছুয়া কোবায়ে কি আরাম ভাই, মছুয়া কোবায়ে কি আরাম ! যেই রকম খবর পাইতাছি, তাতে মনে হয় রোজার দুর্দের পর থাইক্যাই বাঙালি গেরিলারা পাগলা হয়ে উঠেছে । হাতের কাছে দালাল, রাজাকার আর মছুয়া সোলজার পাইলৈই বাঢ়ি, আরে বাঢ়ি রে বাঢ়ি ! পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা অকরে ছেরাবেরা । এইদিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ারে সাপোর্ট দেওনের লাইগ্যা যে টিক্স করছিল, হেইটা ভি গরবর হইয়া গেল । উথান্ট সাবে ঢাকায় জাতিসংঘের ৩৫ জন সাদা চামড়ার অফিসার পোস্টিংয়ের পর হেগো হাত দিয়া দিবির পাকিস্তান আর্মিরে মালপানি আর রসদ জোগাইতেছিল । হেরাই অহন মুক্তিবাহিনীর মাইরের চোটে বাইড়া ব্যাংকারে দৌড়িতাছে । ব্যাংকারে বইস্যা বিদেশী সাংবাদিকগো কইছে যে ঢাকার অবস্থা খুব খারাপ । সমস্ত ফরেনাররা ভাগনের লাইগ্যা সুটকেস গুছাইতাছে । যে কোনো টাইম আসল কারবার হয়ে যেতে পারে । আসলেই বাঙালি গেরিলারা ডেইঞ্জারাস !

এ্যাঃ এ্যাঃ । ঢাইরো মুড়া পানি পাইয়া মুঙ্গিগঞ্জের বিচুরা একটা জববর কাম কইরা বইছে । তাগো কাথাবার্তার ধরনটাই আলাদা । কই না তো ! আমগো মুঙ্গিগঞ্জে কোনো টাইমেই মছুয়া আছিলো না তো ! আমরা কোনোদিনই পাকিস্তানী কোনো সোলজার দেখি নাইক্যা !

কয় কি ! হাড়ির হিসাব পর্যন্ত নাই, সব লাশ গায়েব । আজরাইল ফেরেশতা পর্যন্ত মাথা খুজতাছে । কেইস্টা কি ! জান কবজ কবলাম ঠিকই । কিন্তু লাস নাইক্যা ! অকরে ভানুমতির খেইল ! এইদিকে সিলেট টাউন আন্দার, রংপুরে কোদালিয়া মাইর, মেহেরপুরে ঘেরাও, স্টশ্বরদি এয়ারপোর্ট ডাবিশ, কুষ্টিয়ায় মছুয়ার মউত কা সামান লে চলে; কিশোরগঞ্জে সাইলেন্ট বায়ক্ষোপ,

চাঁদপুর, বরিশাল মাদারিপুরে দরিয়ার মইদে চুবানি । যশোরে গেঞ্জাম আর বগুড়ায় ইডা কেংকা কইরে হলো রে !

ঢাকা এয়ারপোর্টের কট্টোল টাওয়ার গুড়া, রানওয়েতে অনেকগুলা পুকুর, কংক্রিটের বাংকারে শয়ে শয়ে পাকিস্তানী সোলজারগো লাশ । আজরাইল ফেরেশতা ওভারটাইম কইরাও হিসাব মিলাইতে পারতাছে না । খালি নেট করতাছে, শের মোহাম্মদ খান, লাহোর এবং গয়ারহ । এই গয়ারহের মধ্যে কিন্তু শ তিনেক মছুয়া সোলজারের নাম রইছে । এইদিকে একদল মুক্তিবাহিনী আবার মেহেরপুরে হাজির হইয়া আরে ধাওয়ানী রে ধাওয়ানী । একই সঙ্গে মর্টার আর মেশিনগানের গুলি ।

কইছিলাম না, আমাগো টাইম আইব ? এক মাঘে শীত যাইব না । ভোমা ভোমা সাইজের পাকিস্তানী সোলজারো একদিনের যুদ্ধে গোটা কয়েক ট্যাংক ফালাইয়া চোঁ দৌড় । খানিক দূর যাইতেই দেহে কি ? আরেকদল বিচু খালি ডাকতাছে, আ টি টি টি । গেরামের গৃহস্তরে বউরা যেমন কইরা মুরগিরে আধার খাওনের লাইগ্যা ডাক দেয় । ঠিক হেমতে কইরা বাঙালী গেন্দা পোলাগুলা কী সোন্দর ডাক দিতাছে আ টি টি টি । হেরপর বুবাতেই পারতেছেন । ঘ্যাটাঘ্যাট, ঘ্যাটাঘ্যাট, ঘ্যাটাঘ্যাট, ঘ্যাটাঘ্যাট । কয়েক শ মছুয়া হালাক হইল । এই খবর না পাইয়া, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সেনাপতি ইয়াহিয়া খান অকরে ঘং ঘং কইয়া কাইদ্দা ভৱাইছে । হালাকু খান, তৈমুর লং, নাদির শাহ, হিটলার, মুসোলিনি তোজো আর আবাজান আইয়ুব খানের নামে কসম খাইয়া খালি সমানে বিদেশি রাষ্ট্রগুলারে টেলিগ্রাম করতাছে । হেল্প, হেল্প ।

কিন্তুক মউলুবি সাবে বহুত লেট কইরা ফেলাইছেন । অখন বাংলাদেশের লড়াইয়ের ময়দানে খুন কা বদলা খুনের কারবার চলতাছে । মুক্তিবাহিনীর বিচুরা হইতাছে, দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক পলকে মছুয়া ঘষে ।

হেইর লাইগ্যা শুরুতে কইছিলাম, দম মাওলা, কাদের মাওলা ।

পাদটিকা : চৰমপত্রের যন্দিকালীন কথিকাগুলোর মধ্যে উপরেটি ক্লাসিক পর্যায়ে পড়ে । এক্ষেত্রে সময় ও একটা বড় ভূমিকা রেখেছে । মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলই মুক্ত করে ফেলেছে । তারতকে আক্রমণ করেছে পাকিস্তান আগের দিন ৩ ডিসেম্বর । ওই বিমান হামলা আর ব্র্যাক আউটের মধ্যেই এমতার আখতার মুকুল এটি রচনা করেন যা অসাধারণ বললে কম বলা হয় ।

# স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল : অন্যরকম একদল মুক্তিযোদ্ধা

অমি রহমান পিয়াল

কল্পনার চোখে ভাবুন দৃশ্যটা! সবুজ জমিনে লাল সূর্যের মাঝখানটায় হলুদ মানচিত্র-পত্তপত্তিয়ে উড়ছে তখনো না জন্মানো একটি দেশের কান্নানিক এক পতাকা। আর তা সদর্পে উঠিয়ে মাঠ দাপাছেন একদল তরঙ্গ। এরাও মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু হাতে বন্দুক নেই। জার্সি আর শর্টস পায়ে বুট পরে পতাকার মান রাখতে সারা ভারত জুড়ে খেলে বেড়াচ্ছে তারা। আমি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের কথা বলছি।



আইডিয়াটা শামসুল হকের মাথা থেকে বেরিয়েছে। জনের সেই দুরস্ত দিনগুলোতে কলকাতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি এবং সিন্দানত নেন একটি ফুটবল দল গঠনের যারা সারা ভারতজুড়ে খেলে সমর্থন আদায় করবে আমাদের স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির জন্য। তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন সমিতির প্রথম সেক্রেটারি লুতফর রহমান, কোচ আলী ইমাম ও ইস্ট এন্ড ক্লাবের সাবেক ফুটবলার সাঈদুর রহমান প্যাটেল।

তাদের তৎপরতায় ভারতের আকাশবাণীতে একটি বিবৃতি প্রচার হলো যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ফুটবলারকে যোগ দিতে বলা হলো একটি বিশেষ ঠিকানায়। যোষণা দিতে বাকি, কদিনে মধ্যেই কোচ ননী বসাকের (চলচিত্র অভিনেত্রী শবনমের বাবা) বিশেষ ৩০ জনের মতো খেলোয়াড় ট্রায়ালে যোগ দিলেন। তাদের মধ্য থেকে ২৫ জনকে বাছাই করা হলো। পরে অবশ্য ভারত সফরে আরো বেশ কজন খেলোয়াড় দলে যোগ দেন। পার্ক সার্কাস এভিন্যুর কোকাকোলা বিল্ডিংয়ের একটি রংমে থাকতেন ফুটবলাররা। আর প্র্যাকটিস করতেন পাশের মাঠেই।

২৪ জুলাই এলো সেই ঐতিহাসিক দিন। জাকারিয়া পিট্টুর নেতৃত্বে পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে কৃষ্ণনগর একাদশের বিপক্ষে প্রথম খেলতে নামে। লাল-সবুজরা খেলাটি ড্র হয় ২-২ গোলে। তবে এ নিয়ে হই হটগোল কর হয়নি। বিশ্ব মিডিয়া সমালোচনা করে এমন ম্যাচের। ফলশ্রুতিতে নদীয়ার জেলা প্রশাসক সাসপেন্ড হন অফিসিয়াল একটি দল নামানোয়, আর ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশন (আইএফএ) বাধ্য হয় নদীয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগী পদ বাতিল করতে। সাবেক বিসিবি ম্যানেজার তানভির মাজহার ইসলাম তান্না ছিলেন দলটির ম্যানেজার। তার ভাষায়, 'ভারতের যেখানেই গিয়েছি আমরা, প্রচণ্ড সাড়া পেয়েছি সাধারণ মানুষের।' অধিনায়ক পিন্টুর ভাষায়, 'এই ঘটনার পর প্রতিপক্ষ আর অফিসিয়াল নাম ব্যবহার করতে পারেন। এমনকি মোহনবাগান খেলেছে গোষ্ঠোপাল একাদশ নামে। মজা হয়েছিল মুখ্যাইয়ে- মহারাষ্ট্র একাদশের হয়ে খেলেছিলেন স্বয়ং নবাব মনসুর আলী খান পতেন্দি (ভারতীয় অভিনেতা সাইফ আলী খানের বাবা) এবং আমাদের বিপক্ষে একটি গোলও করেন। আমার এখনো চোখে তাসে স্বয়ং দিলীপ কুমার এসেছিলেন ম্যাচটি দেখতে এবং এক লক্ষ রুপি অনুদানও দেন দলকে।'

মোট ৫টি ম্যাচ খেলেছে স্বাধীন বাংলাদেশ ফুটবল দল। এর মধ্যে জিতেছে ৩টি, ড্র করেছে ১টি আর হেরেছে দুটিতে। দিল্লীতে আর একটি ম্যাচ খেলতে যাবার ঠিক আগে এল অসাধারণ খবরটি- বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। সোন্দিন ছিল ১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীন বাংলা দলের সদস্যদের মধ্যে লুৎফুর রহমান, ননী বসাক, আলী ইমাম, মাহমুদ ও লালু আর আমাদের মাবো নেই। এনায়েত, সাঈদুর রহমান প্যাটেল ও শাহজাহান মার্কিন প্রবাসী। গোবিন্দ কুন্ডু ও নিহার ভারতে অভিবাসন নিয়েছেন। আর গোলকিপার অনিলকুন্দ পাকাপাকিভাবে থাকছেন দুবাইতে। বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন দেশের আনাচেকানাচে, কিন্তু তাদের বীরত্ব গাথা বিবেক থাকলে ভুলবে না বাঙালী।

## স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

জাকারিয়া পিট্টু (অধিনায়ক), প্রাতাপ শংকর হাজরা (সহ-অধিনায়ক), কাজী সালাহউদ্দিন, নওশেরউজ্জামান, লেং নুরজানী, তাসলিম, আইনুল হক, খোকন (রাজশাহী), লুৎফুর (ঘশোর), শেখ আশরাফ আলী, অমলেশ সেন, হাকিম (ঘশোর), আমিনুল ইসলাম সুরজ (বরিশাল), বিমল (চট্টগ্রাম), সুভাষ চন্দ্র সাহা (নরসিংহদী), মুজিবর রহমান, কায়কোবাদ, হির, সাভার, সনজিৎ, মোমেন জোয়ার্দার (চট্টগ্রাম), সাঈদুর রহমান প্যাটেল, পেয়ারা (সাবেক সেক্রেটারি কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা), এনায়েতুর রহমান খান, শাহজাহান, অনিলকুন্দ, নিহার, গোবিন্দ কুন্ডু, প্রয়াত আলী ইমাম, প্রয়াত লালু, প্রয়াত মাহমুদ।

কৃতজ্ঞতা : হাসান মাসুদ (বিবিসি)

# কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

একরামুল হক শামীম

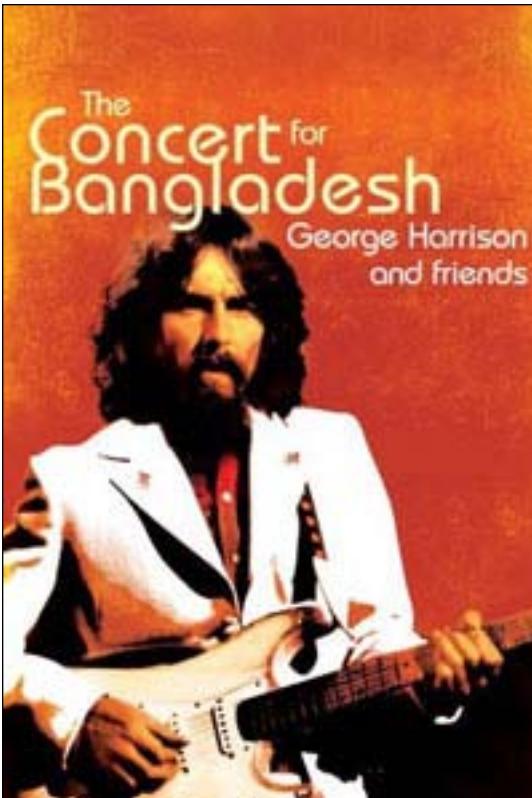
১ আগস্ট ১৯৭১। নিউ ইয়র্ক সিটির মেডিসন স্কয়ারে হাজির হয়েছিলেন ৪০ হাজার মানুষ। পৃথিবীর অপরপ্রাপ্তে অবস্থিত ছেট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ। সেইখানে একই সময়ে মারা যাচ্ছিল হাজার হাজার মানুষ। চলছিল মুক্তিযুদ্ধ। সেই সময়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল একটি কনসার্ট। যার নাম কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। রবিশঙ্কর এবং বিটলস এর জর্জ হ্যারিসন কনসার্টটির আয়োজন করেছিলেন। যেখানে জর্জ হ্যারিসন তার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ গানটির মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন বাংলাদেশকে সাহায্য করতে।

My friend came to me, with sadness in his eyes  
He told me that he wanted help  
Before his country dies

Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try  
Now I'm asking all of you  
To help us save some lives

Bangla Desh, Bangla Desh  
Where so many people are dying fast  
And it sure looks like a mess  
I've never seen such distress  
Now won't you lend your hand and understand  
Relieve the people of Bangla Desh

Bangla Desh, Bangla Desh  
Such a great disaster - I don't understand  
But it sure looks like a mess  
I've never known such distress  
Now please don't turn away, I want to hear you say  
Relieve the people of Bangla Desh  
Relieve Bangla Desh



Bangla Desh, Bangla Desh  
Now it may seem so far from where we all are  
It's something we can't neglect  
It's something I can't neglect  
Now won't you give some bread to get the starving fed  
We've got to relieve Bangla Desh  
Relieve the people of Bangla Desh  
We've got to relieve Bangla Desh  
Relieve the people of Bangla Desh

## বাংলা অনুবাদে সেই কালজয়ী গান

প্রগাঢ় বেদনা চোখে নিয়ে  
বক্ষু এসে বলে আজ তার  
সাহায্য যে কতো দরকার  
যখন মৃত্যুপুরী তারই স্বদেশ

যদিও বেদনার মর্ম বুবিনি  
তবু পাশে দাঁড়াতে দিধা করিনি  
তোমাদের কাছে এই আহ্বান  
এগিয়ে এসো বাঁচাতে কিছু প্রাণ  
নির্বিশেষ

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ  
যেখানে দ্রুত কতো মরহে অনাহারে  
যখন পৌছেছে নিশ্চিত বিশ্বাস্তাৰ দ্বারে  
কখনো দেখি নি আমি এমন ধৰ্মসংজ্ঞজ  
বাড়াবে না হাত সহযোগিতার  
একটু প্রয়াস উপলক্ষি আৱ  
বাচাও মানুষ, নির্বিশেষ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ  
এমন ভয়াল বিপর্যয়  
আমি বুঝি না কেন যে হয়  
নিশ্চিত কেবল বিশ্বাস্তাৰ অবশেষ  
কখনো দেখিনি আমি এমন কৰন্বেশ  
এখন সৱে যেওনা তোমৰা দুৱে  
আমি দেখতে চাই বলছো একই সুৱে  
বাচাও মানুষ, নির্বিশেষ বাংলাদেশ  
বাচাও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ  
হয়তো মনে হবে বহু দুৱ ব্যবধান  
আমাদের যেখানে আজ অবস্থান  
এটি এমনকিছু যাকে পারি না আমৰা কৰতে অবহেলা  
এটি এমনকিছু যাকে পারি না আমি কৰতে অবহেলা  
তুমি কি দিবে না কিছু রুটি এখন  
তাদেৱ, চৰম ক্ষুধায় কাতৱ তাৱা যখন  
আমাদেৱ বাচাতে হবে বাংলাদেশ  
বাচাতে হবে মানুষ, নির্বিশেষ বাংলাদেশ  
আমাদেৱ বাচাতে হবে বাংলাদেশ  
বাচাতে হবে মানুষ, নির্বিশেষ বাংলাদেশ



# লাল সবুজ পতাকার প্রথম নকশা-প্রণেতা

মুনতাসির আলম/ মাকসুদ

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম নকশা-প্রণেতা হিসাবে  
পটুয়া কামরূল হাসানের নাম প্রচলিত থাকলেও সম্প্রতি  
প্রকাশিত পত্রিকার রিপোর্ট ও অন্যত্র থেকে থাণ্ড  
তথ্যানুসারে, বাংলাদেশের পতাকার প্রথম নকশা প্রণেতা  
ছিলেন শিবনারায়ণ দাশ।

শিবনারায়ণ দাশ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম  
ডিজাইনার। তিনি একজন স্বভাব আঁকিয়ে ছাত্রনেতা  
ছিলেন। ১৯৭০ সালের ৬ জুন বাংলাদেশ প্রকৌশল  
বিশ্বিদ্যালয়ের শেরেবাংলা হলের ৪০১ নং (উত্তর) কক্ষে  
রাত এগারটার পর পুরো পতাকার ডিজাইন সম্পন্ন করেন।  
এ পতাকাটি পরবর্তীতে ১৯৭১ এর ২ মার্চ ঢাকা  
বিশ্বিদ্যালয়ের বটতলায় উত্তোলিত হয়।<sup>(১)</sup>

## ১ পরিবার

শিবনারায়ণ দাশের পিতা সতীশচন্দ্র দাশ। তিনি কুমিল্লাতে  
আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ

চলাকালীন পাক হানাদাররা তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করে।  
শিবনারায়ণ দাশের স্ত্রীর নাম গীতশ্রী চৌধুরী এবং এক সন্ত  
ন অর্ধেক আদিত্য দাশ।<sup>(১)</sup>

## ২ ছাত্র রাজনীতি

শিবনারায়ণ দাশ প্রথম ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের হাত  
ধরে রাজনীতিতে আসেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন  
অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন।<sup>(১)</sup>

## ৩ পতাকা ডিজাইনের প্রেক্ষাপট

১৯৭০ সালের ৭ জুন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী  
ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সামরিক  
কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণের  
কথা ছিল। এই লক্ষ্যে ছাত্রদের নিয়ে একটি জয়বাংলা বাহি-  
নী গঠন করা হয়। ছাত্রনেতারা এই বাহিনীর একটি পতাকা

## পতাকার প্রথম নকশাবিদ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি

### বিপ্লব রহমান

স্বাধীন বাংলার পতাকার প্রথম নকশাবিদ সম্পর্কে  
সহরগার লুৎফুল আরেফীন তাঁর সাম্প্রতিক লেখায়  
(<http://www.sachalayatan.com/area-fin/12317>) কিছুটা আলোকপাত করেছেন। এই  
লেখার সূত্র ধরে বাংলা উইকিপিডিয়ার নিরলসকর্মী  
রাগিব ভাইসহ বেশ কয়েকজন জানতে চেয়েছিলেন,  
আসলেই স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকার নকশাবিদ  
কে?

পতাকার প্রথম নকশাবিদ হিসেবে পাঠ্য-পুস্তকসহ  
সর্বত্রই পটুয়া কামরূল হাসানের নামই প্রচারিত হয়ে  
আসছে। ঘন্টাতিনেক অন্তর্জালে অনুসন্ধান চালিয়েও  
পাওয়া গেছে কামরূল হাসানেরই নাম। এ বিষয়ে  
স্পষ্ট ধারণার জন্য আমি শরণাপন্ন হয়েছিলাম,  
মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট গবেষক এমএমআর জালাল  
ভাইয়ের। জালাল ভাইয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী,  
ফরিদা ইয়াসমিনের ব্যক্তি উদ্যোগে ১৯৯৩ সালের  
মার্চে প্রকাশিত 'বাংলার জাতীয় সংগ্রাম: মুক্তিযুদ্ধে  
চট্টগ্রাম' গ্রন্থের লেখক ডা. মাহফুজুর রহমান  
জানাচ্ছেন :

গাঢ় সবুজ জমিনের ওপর কেন্দ্রে লাল বুন্দের মাঝে  
হলুদ মানচিত্রসহ বাংলাদেশের পতাকার প্রথম  
নকশাবিদ কামরূল হাসান নন। এই পতাকাটি  
শিবনারায়ণ দাশের করা।

১৯৭০ সালের ৬ জুন শাজাহান শিরাজের জন্মক্ল  
হক হলের (তখনকার ইকবাল হল) ১১৮ নম্বর রংমে  
পতাকাটির নকশা করা হয়েছিলো। সেলাই করে

## তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় (১)।

এই লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহরুল হক হলের (তৎকালীন ইকবাল হল) ১১৬ নং কক্ষে ছাত্রলীগ মেতা আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমদ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম পতাকার পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বেসেন। এ বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ মেতা স্বপন কুমার চৌধুরী, জগন্নাথ কলেজের ছাত্রলীগ মেতা নজরুল ইসলাম, কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা শিবন-রায়ন দাশ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সাধারণ সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু ও ছাত্রনেতা ইউসুফ সালাউদ্দিন।

সভায় কাজী আরেফের প্রাথমিক প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে সবার আলোচনা শেষে সরুজ জমিনের উপর লাল সুর্যের মাঝে হলুদ রঙের বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। এরপর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা হলের ১১৬ নং কক্ষে রাত এগারটার পর শিবনারায়ণ দাশ পুরো পতাকা ডিজাইন সম্পন্ন করেন (১)।

সেই রাতেই নিউমার্কেট এলাকার বলাকা বিল্ডিংয়ের ৩ তলার ছাত্রলীগ অফিসের পাশে নিউ পাক ফ্যাশন টেইলার্সের টেইলার্স মাস্টার খালেক মোহাম্মদী পতাকার নকশা বুরো কাজ শুরু করেন। তারা তোরের মধ্যেই কয়েকটি পতাকা তৈরি করে দেন (১)।

## ৪ পতাকা উত্তোলন

### ৪.১ জুন ৭, ১৯৭০

৭ জুন ১৯৭০ এ অনুষ্ঠিত কৃতকাওয়াজের নেতৃত্ব প্রদান করেন আ স ম আবদুর রব। অল্প পেছনে পতাকা হাতে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন হাসানুল হক ইনু। রব সেই পতাকা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান সেই পতাকা ছাত্র-জনতার সামনে তুলে ধরেন। এরপর ইনু পতাকাটি তার কক্ষে নিয়ে যান এবং সহপাঠি শরীফ নুরুল আমিয়া শেরে বাংলা হলের ৪০৮ কক্ষের খবরঞ্জামানকে পতাকাটি বাক্সে লুকিয়ে রাখতে বলেন। এরপর একাত্তরের শুরুতে নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ জাহিদ হোসেন পতাকাটি নিয়ে যান তার মালিবাগের বাসায় (১)।

### ৪.২ মার্চ ২, ১৯৭১

১৯৭১ এর ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক বিশাল সমাবেশ হয়। এ সমাবেশে আ স ম আবদুর রব যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন নগর ছাত্রলীগ মেতা শেখ জাহিদ হোসেন একটি বাঁশের মাথায় পতাকা বেঁধে রোকেয়া হলের দিক থেকে মধ্যস্থলে মিহিল নিয়ে এগিয়ে আসেন। রব তখন সেই পতাকা তুলে ধরেন (১)।

### ৪.৩ মার্চ ২৩, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে সারা বাংলায় পাকিস্তানের পতকার পরিবর্তে শিবনারায়ণ দাশের ডিজাইন করা পতাকা উত্তোলিত হয়।

## ৫ পতাকায় পরিবর্তন

১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার শিবনারায়ণ দাশের ডিজাইন কৃত পতাকার মাঝে মানচিত্রটি বাদ দিয়ে পতাকার মাপ, রঙ, ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দিতে বলে পটুয়া কামরুল হাসানকে। কামরুল হাসান দ্বারা পরিমার্জিত রূপটিই বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা (১,২)।

## ৬ বর্তমান অবস্থান

শিবনারায়ণ দাশ বর্তমানে ঢাকার মনিপুরে বসবাস করছেন।

## ৭ তথ্যসূত্র

১. দৈনিক আমাদের সময়, ডিসেম্বর ১৮, ২০০৭
২. কামরুল হাসান-বাংলাপিডিয়া ফেব্রুয়ারি ২০০৭

এই লেখার তথ্যাবলী ও লেখা বাংলা উইকিপিডিয়া থেকে জিএনইউ ছি ডকুমেন্টেশন লাইসেন্সের অধীনে নেওয়া।

ওই রংমে বসে পতাকাটির নকশা করার পরিকল্পনা করেন কাজী আরেফ আহমদ, আসম আব্দুর রব, শাহজাহান শিরাজ, মনিরুল ইসলাম ওরফে মার্শাল মনি, হাসানুল হক ইনু ও শিবনারায়ণ দাস। স্বাধীনতার পরে মানচিত্র বাদ দিয়ে পটুয়া কামরুল হাসানের জাতীয় পতাকাটির চূড়ান্ত নকশা সরকারিভাবে অনুমোদন করা হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, ইতিহাসের ধূসর পাতায় এই পতাকার প্রথম নকশাবিদ শিবনারায়ণ দাশের নাম খুবই অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা।

# ‘৭১ এর ঘাতক-দালাল : রাজাকার পরিচিতি

## অমি রহমান পিয়াল

রাজাকার বাহিনী ও রাজাকারদের সংগঠন করেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে রাজাকার অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। পূর্বতন আনসার, মুজিহিদদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে এ দল গঠিত হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন শ্রেণীর পাকিস্তানপন্থীরা এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা ছিল সশস্ত্র। হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। জেনারেল নিয়াজী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন যে, রাজাকার বাহিনীর তিনিই অষ্টা। তারা যথেষ্ট খেদমত করেছে পাকিস্তানী বাহিনীকে, যে কারণে তার বইটি তিনি তাদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছেন।

রাজাকারের শুরু উচ্চারণ 'রেজাকার'- ফারসি শব্দ। 'রেজা' হল স্বেচ্ছাসেবী, 'কার' অর্থ কর্মী। এক কথায় স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দরাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে মিলনে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠিল করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেওয়া হয়েছিল রেজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত নেতা এ.কে.এম ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সূত্রপাত করেন।

'একান্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী, ১৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পুর্বোক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী- 'প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমত, যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাংলার হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল; দ্বিতীয়ত, যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়ত, গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়- এ ধরনের লোককে প্রলুক্করণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।'

রাজাকার বাহিনী যাদের নিয়েই গঠিত করা হোক না কেন, এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত জামায়াতে ইসলামী।

রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেওয়া, মুক্তিবাহিনীর খোঁজ

করা প্রত্বিত কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঙালীদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোটা দাগে স্বাধীনতাবিরোধীদেরই রাজাকার নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যারা ছিলেন তারা রাজকার ও তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে সবাই পরিচিত। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'ঘাতক দালাল নির্মূল'

আন্দোলন শুরু হলে রাজাকার নামটি আরো পরিচিত হয়ে সাধারণ ভাষ্যে চলে আসে। হুমায়ুন আহমেদের একটি নাটকের সংলাপ ছিল 'তুই রাজাকার'। এসব কারণে স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি, সে আলবদরই হোক বা দালালই হোক, পরিচিত হয়ে ওঠে রাজাকার হিসেবে। জামায়াত ইসলাম, বাংলাদেশের প্রাক্তন আমীর গোলাম আয়ম বলেছেন, তারা 'রাজাকার' ছিলেন না, ছিলেন 'রেজাকার'। হতে পারে রেজাকার শুন্দি, কিন্তু মানুষের কাছে অশুন্দি রাজাকারই পরিচিত।

সূত্র : ডঃ মুনতাসীর মামুন (মুক্তিযুদ্ধ কোষ চতুর্থ খণ্ড)

## রাজাকারের পরিচয়পত্র

this is to certify that Mr. Haroon-ur-Rashid Khan, S/o Abdul Azim Khan, 36 Purana Paltan Lane, Dacca-2 is our active worker. He is true Pakistani and dependable. He is trained Razaker. He has been issued a Rifle No-776... with ten round ammunition for self-protection.

Sd/-illegible  
IN CHARGE  
RAZAKAR AND MUZAHID  
JAMAT-E-ISLAM  
91/92 Siddique Bazar, Dacca

আবু সাইয়িদ তার সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আজম' গ্রন্থে জনেকে রাজাকারের এ পরিচয়পত্র তুলে দিয়েছেন।

এ.এস.এম সামচুল আরেফিন সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান' বই থেকে যোগ করাই :

১৯৭১ সালের মে মাসে মওলানা একেএম ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামাত কর্মী নিয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে প্রথম এই বাহিনী গঠিত হয়। মওলানা একেএম ইউসুফ এই বাহিনীর নামকরণ করেন রাজাকার। জুন মাসের সরকারী অধ্যাদেশে এই নাম রাঞ্জীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান মোঃ ইউসুফকে রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ১০টি জেলায় ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতাদের রাজাকার বাহিনীর নেতৃত্বে দেওয়া হয়। অ্যাডজুটেন্ট বা কোম্পানি কমান্ডার থেকে নিচের স্তরের সকলেই রাজাকার কমান্ডারদের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। কিন্তু ওপরের স্তরের সকলেই ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। শাস্তি কমিটির মাধ্যমে রাজাকারদের রিক্রুট করা হত। এই বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্যই ছিল মাদ্দাসার মোহাদ্দেস ও মোদাছের। দক্ষিণপন্থী রাজনেতিক দলের সদস্য ছাড়াও গ্রামের বহু যুবককেও এই বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ পরিচালিত হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের মাঠ ও ফিজিক্যাল কলেজের মাঠে মূলত রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল দেড় সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ। প্রশিক্ষণ শেষে রাজাকারদের হাতে ৩০৩ রাইফেল তুলে দেওয়া হত। শুধু উচ্চ স্তরের কমান্ডারদের জন্য বরাদ্দ ছিল স্টেনগান।

# বুদ্ধিজীবি হত্যার রূপকার আল-বদর

## অমি রহমান পিয়াল

‘... আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকিস্তানের সহযোগিগতায় এ এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিনশত তরে। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে ৩১৩ জন যুবকের সময়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের সেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আলবদর তরুণ মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাল্লাহ সেই সর্বশুণ্গাবলী আমরা দেখতে পাব।

পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আলবদরের যুবকরা এবারে বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানদের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। ইনশাল্লাহ, বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম। তরুণ যুবকরা আমাদের সশ্রম বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যন্ত করে হিন্দুস্তানকে খত্ম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করবে।’

মতিউর রহমান নিজামী, ১৪ নভেম্বর ১৯৭১, দৈনিক সংগ্রাম ]

আল-বদর ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী বাহিনী। রাজাকার বাহিনী গঠনের পর জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা কর্মীদের দিয়ে গড়া এই স্পেশাল কিলিং ফোয়াড। তবে রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোনো আইনগত বিধানে তা গঠিত হয়নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্তর্শ্রে সজিত হয়ে এই বাহিনী দেশজুড়ে বুদ্ধিজীবি নিধনে নেমেছিল। রাও ফরমান আলীর নোট বইয়ে এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া গেছে।

আল-বদর প্রথম গঠিত হয় জামালপুর শহরে। পাকিস্তান বাহিনী ২২ এপ্রিল জামালপুর দখল করার পর, সেখানকার ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আলবদর বাহিনীর হাতে ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা হত্যার কৃতিত্ব জানাজানির পর জামাতে ইসলামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে রাজাকারদের চেয়ে উল্লেখ্য মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশ্রম ক্যাডার গড়ে তোলার

সুযোগ বর্তমান। ১৯৭১ সালের আগস্ট থেকেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল-বদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরে শেষ সংগ্রাম থেকেই বুদ্ধিজীবিদের তালিকা ধরিয়ে দেয়া হয় তাদের অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য। ধর্মীয় উন্মাদনায় বুদ্ধি করে তাদের এই হত্যাকাণ্ডে উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছিল।

২৫ নভেম্বর ঢাকা শহরে ইসলামী ছাত্র সংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এই পরিষদে বুদ্ধিজীবি হত্যাকাণ্ডের চিফ একজিকিউটর (প্রধান জ্বালা) আশরাফুজ্জামানসহ বুদ্ধিজীবি হত্যাকারী খুনী আলবদরের কমান্ডারো অস্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য শামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিল- ১. মোস্তফা শওকত ইমরান, ২. নূর মোহাম্মদ মল্লিক, ৩. একেএম মোহাম্মদ আলী, ৪. আবু মোঃ জাহাঙ্গীর, ৫. আশরাফুজ্জামান, ৬. আশর রঞ্জুল কুন্দুস, ৭. সর্দার আবদুস সালাম।

রাজাকারদের সঙ্গে আলবদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকারো সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে। অনেকে যুদ্ধকলীন দূরাবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে, কিন্তু আলবদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। প্রকৃতিতে তারা ছিল হিংসা ও নিষ্ঠুর। তারা বাংলার বুদ্ধিজীবিদের সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, যে ধরণের শাসনব্যবস্থা তারা চায়, বুদ্ধিজীবিরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। মুক্তিযুদ্ধতো একটি আদর্শগত লড়াইও।

আলবদরদের নিষ্ঠুরতা ক্ষেত্র বিশেষে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকেও হার মানিয়েছে। এত নির্মতাবে কেউ স্বজ্ঞাতিকে হত্যা করতে পারে! বধ্যভূমির ছবি দেখলে এবং বর্ণনা পড়লে মনে হয় এরা মানসিকভাবে সুস্থ ছিল না, উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের তালিকাভুক্তদের তারা একটি চিঠি পাঠাত। সেটা ছিল এরকম :

শয়তান নির্মূল অভিযান

শয়তান,

ক্রাঙ্ক্যবাদী হিন্দুদের যেসব পা চাটা কুকুর আর ভারতীয় ইন্দিরাবাদের

দালাল নানা ছুতানাতায় মুসলমানদের বৃহত্তম আবাসভূমি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তুমি তাদের অন্যতম। তোমার মনোভাব, চালচলন ও কাজকর্ম কোনোটাই আমাদের আজানা নেই। অবিলম্বে ছশিয়ার হও এবং ভারতের পদলেহন থেকে বিরত হও, না হয় তোমার নিষ্ঠার নেই। এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

শনি

সুপরিকল্পিতভাবে বিকৃত ধর্মোন্দানা সৃষ্টি করে আল-বদরে যোগ দিতে তাদের কর্মীদের উদ্বৃদ্ধ করত ইসলামী ছাত্র সংঘ। এ ব্যাপারে একটি প্রমাণ হতে পারে ১৯৭১ সালের ৭ নভেম্বর আল-বদর দিবস উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ছাপা একটি নাটিক। মাহফুজুল হক নামে এক আল বদর কমান্ডারের লেখা ‘আলবদর, আলবদর, আলবদর-থি ওয়ান থি, থি ওয়ান থি, থি ওয়ান থি’ নামের একাক্ষিকাটি তুলে দেওয়া হলো-

প্রস্তাবনা

ফারাবী, আজাদা, ফারুক, আশফাক, বদরুল। এরা ক'জন তরুণ সঙ্গীদের সাথে করেছে অঙ্গীকার। এরা বলে সঙ্গীন আমার বন্ধু। প্রশংক করলে এরা হাতের দু আঙুলে তুলে দেখায় ‘ভি’ অর্থাৎ ভিট্টি। নিশ্চিত বিজয়। তিনশ তের এদের উজ্জ্বলতম দৃষ্টিত্ব। তাই প্রত্যয়দৃষ্ট শপথে এরা হাতিয়ার তুলে নেয়। রাইফেল, স্টেনগান, এল.এম.জির মাবে খুঁজে নেয় জিন্দেগির স্বপ্নল ফুলবূরি।

এক

( মোহসিন হলে ফারাবীর কক্ষ। টেবিল, চেয়ার, আলনা, এক গাদা বইতে সাজানো কক্ষ। ফারাবী আধশোয়া অবস্থায় বই পড়ছে। আজাদ ও ফারুকের প্রবেশ। )

আজাদ- কিরে এত মনযোগ দিয়ে কি পড়ছিস?

ফারাবী- আরে তোরা- আয় আয় বোস।

ফারুক- কি পড়ছিলি?

ফারাবী- এই সাইয়েদ কৃতবের বইটা

আজাদ- তারপর কবে যাচ্ছিস?

ফারাবী- কোথায়?

আজাদ- কেন আশফাক তোকে কিছু বলেনি?

ফারাবী- ওহ, আলবদর টেনিংয়ের কথা?

আজাদ- হ্যাঁ, আমরা তো সবাই আগামী দশ তারিখে যাচ্ছি ক্যাম্পে।

তুইও যাচ্ছিস তো?

ফারাবী- নিশ্চয়ই। যাৰ না কি বলছিস (একটু থেমে) সত্য এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ এই দেশেৰ বুকে দাঁড়িয়ে এমন প্ৰকাশ্যে সশস্ত্ৰ ট্ৰোনিং লাভেৰ সুযোগ পাচ্ছি দেখে। এতদিন যা ছিল কল্পনা আজ তা বাস্তবে পৱিণ্ঠত হতে যাচ্ছে- (থেমে) সত্য তোদেৱ আনন্দ লাগছে না?

আজাদ- কিন্তু এই আনন্দেৱ সাথে মিশে আছে অনেক বেদনা, অনেক কানার ইতিহাস। আজ সারা দেশে কত শত শত মানুষকে শুধুমাত্ৰ ইসলাম অনুসারী হৰাৰ অপৰাধে নিৰ্ভুলভাৱে হত্যা কৰা হচ্ছে। জীবন্ত খেজুৱেৰ কাঁটা বিছানো গতৰে কৰৰ দেওয়া হচ্ছে। গাছেৰ সাথে বেধে পৈশাচিকভাৱে চোখে, মুখে, বুকে গজাল ঠুকে ঠুকে হত্যা কৰা হচ্ছে। গৱাম লোহাৰ শলাকা দিয়ে চোখ উপড়ে দিয়ে বলছে, বল আৱাও ইসলাম ইসলাম বলবি নাকি? শুধু তাই নয়, এদেৱ কেটে টুকৰো টুকৰো কৰে ছালায় ভৱে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এদেৱ রক্তে পদ্মা-যমুনাৰ রক্ত লালে লাল হয়ে যাচ্ছে-

ফারাবী- থাম, থাম আজাদ- থাম।

আজাদ- এদেৱ দোষ, এদেৱ দোষ এৱা চেয়েছিল পাকিস্তানকে একটা সুন্দৰ দেশৰূপে গড়ে তুলবে। এৱা চেয়েছিল এখানে আল্লাহৰ শ্বাশত জীবন বিধান ইসলামকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰতে। যাতে পাকিস্তানেৰ মানুষ দুবেলা দুমুঠো ভাত, মোটা কাপড়, একটা আশ্রয়, একটু সুখেৰ মুখ দেখতে পায়। সারাদিন মাটিৰ ঘৰ্মকান্ত পৱিশ্বেৰ ফলৰূপ পায় কিছু সুখেৰ হাতছানি-

ফারাবী- সেদিন শুনলাম মণ্ডলানা \*মাদানী সাহেবে শহীদ হয়েছেন (\*সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী পূৰ্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী দলেৰ সহস্ত্যাপতি। ১০ আগস্ট '৭১ ঢাকাৰ অদূৱে মিৱকাদিমে বক্তৃতা দেওয়াৰ সময় এই কুখ্যাত দালালকে গুলি কৰে হত্যা কৰে মুক্তিযোদ্ধাৰা)

আজাদ- শুধু মাদানী সাহেবে কেন, এৱকম প্ৰতিদিন কত শত শত মাদানী আকতৱে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন তাৰা খৰে রাখিস! গতকাল নোয়াখালী হতে টেলিগ্রাম এল, মাৰ্চ ১০ দিনে সেখনে ৫০ জন ইসলামী ছাত্ৰ সংঘেৰ কৰ্মী শহীদ হয়েছেন (উদগত কানাৰ রোধ কৰে)- এসব ইতিহাস বড় কানার ইতিহাসৰে- বড় কৰণ ইতিহাস-

...

ফারাবী- আছছা আমরা ক'জনা যাচ্ছি তাহলে?

আজাদ- প্ৰথম ব্যাচে প্ৰায় শ'দুয়েক, পৱে আৱো আসতে পাৱে ফারাবী- সত্য আমাৰ কিয়ে আনন্দ লাগছে আজ। আগে যখন ইসলামেৰ ইতিহাস পড়তাম- বদৱ, ওহদ, খন্দকেৰ যুদ্ধেৰ ইতিহাস পড়তাম, তখন মনে হতো, আছছা আমৱাও অমন ইসলামী মুজাহিদ

হয়ে যুদ্ধেৰ ময়দানে নামতে পাৰি না কেন? কেন আমৱাও আল্লাহৰ পথে শহীদ হওয়াৰ সুযোগ পাই না? (একটু থেমে) সত্য আজ সেই সোনালী সুযোগ এসেছে, সত্য আজ কি আনন্দ লাগছে- কি আনন্দ। ফারাবী- আলবদৰ আলবদৰ  
সমাখ্যে- জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ  
(সবাই কক্ষ থেকে বেৱিয়ে যাবে)

সেপ্টেম্বৰে বৃন্দিজীৰি হত্যাৰ পৱিকল্পনা পেশেৰ পৱিপৱাই সৱাসৱিৰ পাকিস্তান সামৱিক কৰ্তৃপক্ষ এ উদ্দেশ্যে আলবদৰদেৱ সুসংগঠিত কৰে তুলতে থাকে। এ সম্পৰ্কে নিউ এইজ পত্ৰিকাৰ প্ৰতিবেদনে বলা হয়, আলবদৰ সংগঠনটি সম্পৰ্কে অতি সম্প্ৰতি কিছু জানা গেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই সশস্ত্ৰ দলটি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ধৰ্মীয় সাম্প্ৰদায়িক দল জামাতে ইসলামীৰ দোসৱ। আলবদৰ বাহিনীৰ সদস্যদেৱ (প্ৰধানত ১৮ থেকে ২০ বছৰ বয়সী তৱণণৱাই এৱা অস্তৰুভূত) মাথায় এ কথাটোই দুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰামী ও ভাৱতীয় চৰদেৱ দ্বাৱা ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিগত গ্ৰীষ্ম ও শৰতে দখলদাৰ বাহিনীৰ বিৱৰণে পৱিচালিত জনপ্ৰিয় গেৰিলা তৎপৰতা যখন চৰমে পৌঁছে, তখন পাকিস্তানী জেনারেলোৱা স্থানীয় পুলিশেৰ ওপৱ আস্থা হাৰিয়ে ফেলেন এবং এই ষ্টেচাসেৰক বাহিনীৰ শক্তি বাড়ানোৰ ব্যবস্থা নেন। রাও ফৱমান আলীৰ ডায়েৱিতে লেখা ছিল- পুলিশ বাহিনীকে উঠিয়ে নিতে হবে। আলবদৰদেৱ ব্যবহাৰ কৰতে হবে। এদেৱ অবশ্যই উন্নত অস্ত্ৰ দিতে হবে।

আলবদৰ বাহিনীৰ তৎপৰতা সম্পৰ্কে আৱেকটি দলিল দেয়া যেতে পাৱে। দৈনিক সংগ্ৰাম পত্ৰিকায় ১৬ সেপ্টেম্বৰ পৰা ১৯৭১ সালে 'সম্পাদক সমীপেষ্য' কলামে আবুল বাৰী নামে এক আলবদৰ কমান্ডারেৰ এই চিঠিটি ছাপা হয় :

জনাব,  
ষ্টেচাসেৰী প্ৰতিষ্ঠান আলবদৰ বাহিনীৰ নাম আজ প্ৰদেশেৰ প্ৰত্যন্ত প্ৰান্তেৰ পৌঁছে গেছে। গত ২৭ জুন জামালপুৰ মহকুমায় আলবদৰ বাহিনী গঠিত হৰাৰ পৱ আজ সমগ্ৰ মোমেনশাহী জেলা ও প্ৰদেশেৰ আৱো দুৱেকটি জেলায় এৱ কাজ শুৰু হয়েছে বলে সংবাদ পোওয়া যাচ্ছে। আলবদৰ বাহিনী পাকিস্তানবাদী ইসলামপঞ্চী দেশপ্ৰেমিক ছাত্ৰদেৱ দ্বাৱা গঠিত। এতে ইস্কুলেৰ ১২ বছৰেৰ ছেলে থেকে আৱস্তু কৰে বিশ্ববিদ্যালয়েৰ বহু ছাত্ৰ রয়েছে।

যতদূৰ জানা যায়, পূৰ্ব পাকিস্তানেৰ মধ্যে জামালপুৰ মহকুমাতেই পূৰ্ণ স্বাভাৱিক অবস্থা বিৱাজ কৰতে। এখানে এসএসসি ও এইচএসসি পৱৰিক্ষায় ৪০% থেকে ৫০% ছেলে পৱৰিক্ষা দিয়েছে। জামালপুৰ মহকুমাৰ শেৱপুৰ, নলিতাবাড়ি, ইসলামপুৰ, দেওয়ান গঞ্জ ও জামালপুৰ

শহৱে দুষ্কৃতিকাৰীদেৱ নিশ্চিহ্ন কৰে দেওয়া হয়েছে।

জামালপুৰেৰ বিভিন্ন জায়গায় সীমান্তবৰ্তী এলাকায়

আলবদৰ বাহিনী সাহসিকতা ও সাফল্যেৰ সঙ্গে ভাৱতীয়

অনুপ্ৰবেশকাৰীদেৱ মোকাবেলা কৰেছে। আলবদৰ বাহিনীৰ তৎপৰতা দেখে ভাৱতীয় অনুচূৰ নাপাক বাহিনীৰ লোকেৱা জামালপুৰ ছেড়ে অন্যত্ৰ চলে যাচ্ছে বলে ক্ৰমাগত সংবাদ পোওয়া যাচ্ছে। আলবদৰ বাহিনীৰ বৈশিষ্ট্য হলো এৱ প্ৰতিটি ছেলেই শক্তিত এবং নামাজ পড়ে।

ধনসম্পদ ও নারীৰ প্ৰতি কোনো লোভ নেই। বদৱ বাহিনীৰ গত তিনমাসেৰ কাজে কোনো চাৱিক্ৰিক দুৰ্বলতা দেখা যাবনি। এজন্যই জনগণেৰ কাছে আশাৰ আলোকবতিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেৱ প্ৰিয় নাম আলবদৰ। জামালপুৰেৰ রেজাকার, পুলিশ, মুজাহিদ ও রেঞ্জারাৰ পুল ও বিভিন্ন গুৱাত্মপূৰ্ণ জায়গা পাহাৰা দিচ্ছে আৱ পাক ফৌজ ও আলবদৰ বাহিনীৰ অপাৱেশন কৰাচে।

আমি পূৰ্ব পাকিস্তানেৰ দেশপ্ৰেমিক ইসলামপঞ্চী ছাত্ৰজনতাৰ কাছে আহবান জানাচ্ছি সামৱিক কৰ্তৃপক্ষেৰ সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়ে দ্রুত প্ৰদেশেৰ সৰ্বত্র আলবদৰ বাহিনী গঠন কৰতে। বদৱ বাহিনী ছাড়া শুধু রেজাকার ও পুলিশ দিয়ে সম্পূৰ্ণ পৱিস্তুতি আয়ত্বে আনা সম্ভব নয়। আমাদেৱ কাছে রেজাকার, বদৱ বাহিনী ও মুজাহিদেৱ মধ্যে কোনো পাৰ্থক্য নেই। আমাৰ সবাইকে মনে কৰি সমান। ভাৱতীয় অনুপ্ৰবেশকাৰী ও তাৰ দালালদেৱ শায়েস্তা কৰতে আজ তাই প্ৰদেশেৰ সৰ্বত্র আলবদৰ বাহিনী গঠন কৰা প্ৰয়োজন।

দেশেৰ বৰ্তমান নাজুক ও সংকটপূৰ্ণ পৱিস্তুতিতে যত তাড়াতাড়ি আলবদৰ বাহিনী প্ৰদেশেৰ সৰ্বত্র গঠিত হয় ততই দেশ ও জাতিৰ মঙ্গল। আল্লাহ আমাদেৱ তাৰ পথে কাজ কৰা তোফিক দান কৰন্ব। আমিন।

মোহাম্মদ আব্দুল বাৰী

ইন্চাৰ্জ, আলবদৰ ক্যাম্প, ইসলামপুৰ থানা, মোমেনশাহী ও প্ৰচাৰ সম্পাদক, জামালপুৰ মহকুমা শাস্তি কমিটি

স্বাধীনতাৰ পৱ এই আব্দুল বাৰীৰ ব্যক্তিগত ডায়েৱিটি উন্নার কৰা হয়। ১৯৭২ সালেৰ ১০ মাৰ্চ দৈনিক ইন্ডেপেন্ডেণ্টে মুদ্ৰিত ডায়েৱিৰ প্ৰধান বিবৰণগুলি হচ্ছে :

টাঙ্গাইলে successful operation হয়েছে। হাজাৰ দেড়েকেৰ মতো মুক্তিফৌজ মাৰা পড়েছে আলবদৰ ও আৰ্মিৰ হাতে।

1.Haidar Ali 2. Nazmul Haque. Rs 2500.00

তিতপ়লাৰ শিমকুড়া গ্রাম- জৰুৱাৰেৱ কাছে ২৯/১০/৭১ আৱ তিন হাজাৰ নেওয়াৰ পৱিকল্পনা আছে

24-10-71... Prostitution Quarter

26-10-71... Raping Case... Hindu Girl

# গোলাম আয়ম : একজন খুনীর প্রতিকৃতি

অমি রহমান পিয়াল

স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক বাহিনীর দোসর রাজাকারদের প্রধান গোলাম আয়ম একজন কুখ্যাত যুদ্ধাপারাধী । ১৯৭১ সালের বর্ষ গণহত্যা, ৪৫ লক্ষ বাঙালী নারীর ধর্ষণ ও লাঞ্ছনা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বল্প দেখা শতাধিক বুদ্ধিজীবিদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে এই মুখোশধারী দানব ।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার আর্কাইভ থেকে পাওয়া এক ছবিতে দেখা গেছে ডান হাত মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে পাকিস্তানী জেনারেলদের হাতে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের তালিকা তুলে দিচ্ছে সে তাদের হত্যার জন্য । স্বাধীন বাংলাদেশে চরমপক্ষী ইসলামী মতাদর্শের গুরু মানা হয় তাকে । ৭০ হাজার রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসের নেতা ছিল সে । (নিউইয়র্ক টাইমস, ৩০ জুলাই, ১৯৭১)

গণহত্যা চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়া পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এক পর্যায়ে ভার করাতে সিদ্ধান্ত নেয় সহযোগী একটি বাহিনী স্থিতির । অবাঙালী মুসলমান ও ডানপক্ষী ইসলামিক দলগুলোর বাঙালী দালালদের তালিকা বানিয়ে তাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এজন্য । আল-বদর ও আল শামস নামের এই আধা-সামরিক বাহিনী শুধু তথ্য জোগানোর দায়িত্বেই পালন করেনি, বাঙালী হত্যায় সক্রিয় অংশ নিয়েছে পাক বাহিনীর চাপ করাতে । ১৯৭১ সালের জুন মাসে সিডনি শ্যানবার্গ এসব বাহিনীর ওপর একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন, যাতে বলা হয়েছে "গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে সেনাবাহিনী আধা-সামরিক একটি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলছে, নয়তো সশস্ত্র করছে তাদের অনুগত নাগরিকদের যাদের অনেকেই শান্তি কর্মটি গঠন করেছে । বিহারি ও অন্যান্য উর্বুভাষী অবাঙালী ছাড়াও এসব বাহিনীতে অত্যুক্ত করা হয়েছে গোলাম আয়ম, মতিউর রহমান নিজামীর জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লিগের মতো ডানপক্ষী ইসলামিক দলগুলোর সদস্যদের । এসব বাঙালী মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলেও সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ সমর্থন দিয়েছে ।

একত্রিতভাবে এসব বাহিনীকে 'রাজাকার' বলা হয় । বাঙালি জনপদে এসব বাহিনী রীতিমতো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে । স্থানীয় হওয়ায় গণহত্যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ভুক্ত মুসলিম তাকে জুতাপেটা করেন ।



১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারি গোলাম আজম বায়তুল মোকাররমে এলে উপস্থিত মুসলিম তাকে জুতাপেটা করেন ।

হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে এরা ।"

জুন মাসেই পুলিঙ্গার জেতা সাংবাদিক সিডনি শ্যানবার্গ বিভিন্ন শহর থেকে প্রত্যক্ষদর্শীদের ব্যানে বেশ কিছু প্রতিবেদন পাঠান নিউইয়র্ক টাইমসে । জবাবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ৩০ জুন তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করে ।

পরায় যখন নিশ্চিত, তখন বর্বরতার শেষ কীর্তি হিসেবে বাঙালী সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার এক মরিয়া প্রয়াস নেয় পাকবাহিনী । ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনী জামাতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন আধাসামরিক বাহিনী আল-বদর ও আল-শামসকে লেলিয়ে দেয় বুদ্ধিজীবিদের হত্যার জন্য । লক্ষ্য ছিল বাঙালী রাজনেতিক চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, কবি, চিকিৎসক, আইনজীবি, সাংবাদিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের খুঁজেপেতে হত্যা করা । আল-বদর ও আল-শামস খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবিদের ন্যূনত্ব হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের নামের তালিকা তৈরি করে । তাদের গ্রেঞ্জার করে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার জলাভূমি রায়ের বাজারের দিকে ।

পিঠমোড়া করে হাত ও চোখ বাধা এসব বুদ্ধিজীবিকে গুলি করে হত্যা করা হয় । জামাতে ইসলামী ও এর নেতারা ছিল এসব বুদ্ধিজীবি হত্যার পরিকল্পনা ও কার্যকর করায় সন্দেহ

অংশগ্রহণকারী । গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে দুশোর ওপর বুদ্ধিজীবি ও পদ্ধতি লোককে হত্যা করে আল-বদর ও আল-শামস । শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পী, প্রকৌশলী, লেখকদের জড়ো করে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুর, মোহাম্মদপুর, নাখালপাড়া, রাজারবাগ এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন টাচার সেলগুলোতে । এদের বেশিরভাগকে একসঙ্গে নির্বিচারে হত্যা করা হয়, বেশিরভাগকে রায়ের বাজার ও মিরপুরে ।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫ মার্চ রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর নিহত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে আছেন ড. জি.সি দেব (ঢাবির দর্শনের অধ্যাপক), ড. মুনীর চৌধুরী (নাট্যকার, ঢাবি অধ্যাপক), ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (ঢাবি অধ্যাপক), ড. আনন্দের পাশা (ঢাবি অধ্যাপক), ড. ফজলে রাবি, ড. আলীম চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার (সাংবাদিক), নিজামুদ্দিন আহমেদ (সাংবাদিক), সেলিনা পারভীন (সাংবাদিক), আলতাফ মাহমুদ (সুরক্ষার ও গীতিকার), ড. হাবিবুর রহমান (গণিতবিদ, রাবি শিক্ষক), ধীরেন দত্ত

(রাজনীতিবিদ), দানবীর আরপি সাহা, সাবেক সেনা কর্মকর্তা লে. ক. মোয়াজেম হোসেন, পুলিশ কর্মকর্তা মামুন মাহমুদ এবং আরো অনেকে ।

ড. রশীদ আকসারি লিখেছেন, পাকবাহিনীর পুর্বাঞ্চলের অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আল-বদর বাহিনীর জন্য যারা ওই গোপন গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল । তাদের উদ্দেশ্য ছিল অপহরণ ও হত্যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা । তথাকথিত গভর্নর নুরুল আমিনের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এই উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর বিনাশের নীলনক্ষার প্রণেতা । আর এক সপ্তাহ হাতে পেলে তারা এদেশের বাকি সব বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করত । সত্য বলতে বদর বাহিনী ছিল মৌদুদী, গোলাম আয়ম ও আন্দুর রাহিমের দল জামাতে ইসলামীর একটি বিশেষ সন্ত্রাসবাদী অংশ ।

তিনি আরো লিখেছেন, হত্যার তালিকা পেশ করার পরপর গোলাম আয়ম, রাজাকার বাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস ও শাস্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিসার মাহবুবুর রহমান গুর্হাকে নিয়ে মোহাম্মদপুর শরীরীর শিক্ষা কেন্দ্রে রাজাকার ও আলবদরদের প্রশিক্ষণ দেখতে যায় । তারপর থেকেই গোটা দেশে ইসলামী ছাত্র সংঘকে (এখন ইসলামী ছাত্র শিবির) আলবদরে ঝুপাত্তির করা হয় । এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথমভাগ পর্যন্ত তাদেরকে অপহরণ ও হত্যার জন্য বুদ্ধিজীবিদের তালিকা সরবরাহ করা হয় ।

৪ ডিসেম্বর থেকে কারফিউ ও ব্ল্যাক আউট আরোপ করা হয় অপহরণের সুবিধার্থে । ১০ ডিসেম্বর থেকে বড় মাপে অপারেশন শুরু করে আল বদরুরা । কারফিউ আর ব্ল্যাক আউটের মধ্যে কাঁদামাখা বাস নিয়ে বেরতো তারা, তারপর তালিকা মিলিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিত বুদ্ধিজীবিদের । এরপর মোহাম্মদপুর ফিজিকাল টেনিং কলেজে তাদের জেরা ও নির্যাতন করা হতো । গভীর রাতে রায়েরবাজার বধ্যভূমির ইটখানায় তাদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করত এসব ঘাতকেরা । মিরপুর ও ছিল আরেক বধ্যভূমি ।

ঘাতক শিরোমণি গোলাম আয়ম (জন্ম ১৯২২) বাংলাদেশের শীর্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বসেছে । ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকবাহিনীর দোসর হিসেবে কুখ্যাত এই লোক শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে স্বীকৃত । রাজাকার ও আল-বদরের মতো

দুটো ঘৃণ্য ঘাতক দলের স্থষ্টা হিসেবে বাঙালী আজীবন তাকে ঘৃণা করবে । পাক সরকার সাম্প্রতিক সময়ে কিছু দলিল প্রকাশিত করেছে যাতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তার পক্ষে জোরালো প্রমাণ রয়েছে । ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়ের পর এই স্বাধীনতাকে মেনে নেয়ানি সে । ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সে পাকিস্তানে বসবাস করে এবং ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তার পাকিস্তানের নাগরিকত্ব বহাল ছিল ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উঠিত ছাত্র নেতা হিসেবে গোলাম আয়ম ১৯৫৭ সালে উগ্রবাদী জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারি নির্বাচিত হয় । ১৯৬৯ সালে সে পূর্ব পাকিস্তান জামাতের আম্বর (প্রেসিডেন্ট) হয় । স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণে তার বিরুদ্ধে দালালী ও যুদ্ধপরাধের অভিযোগ ওঠে ।

নয় মাস ধরে ঢাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে গুরুত্ব মৌদুদির টেলিগ্রাম পেয়ে ২২ নভেম্বর লাহোর যায় গোলাম । এরপর শেখ মুজিব সরকার তার নাগরিকত্ব বাতিল করলে তার আর দেশে ফেরা সম্ভব হয়নি । বাংলাদেশে ফিরতে ব্যর্থ এই ঘাতকশিরোমনি হজ্জের নাম করে এর পর মকায় যায় । সৌদি আরব থেকে গোলাম দুবাই, আরু ধাবি, কুয়েত, বৈরুত ও লিবিয়া যায় শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা ও পাল্টা অভুথ্যান ঘটানোর জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে ।

স্বাধীন বাংলাদেশ বিরোধী এই কার্যক্রমের এক পর্যায়ে গোলাম লভন আসে । সেখান থেকে জামাতের মুখ্যপত্র হিসেবে সংগ্রাম পত্রিকাটি সে সাংগীক্রিয় হিসেবে প্রকাশ করা শুরু করে । ১৯৭৮ সালে সাংগীক্রিয় বিচিত্রা গোলামের কার্যক্রম নিয়ে চাঁধল্যকর একটি প্রতিবেদন ছাপায় । এতে বলা হয়, ১৯৭৮ সালের শুরুর দিকে ইস্ট লন্ডনের একটি বাড়িতে এক কমিটি মিটিংয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী একটি নীলনক্ষা প্রণয়ন করে সে । একই বৈঠকে অংশ নেয়া কয়েকজন পাকিস্তানী সূত্র তা নিশ্চিত করে । বৈঠকে ছিল : এটি সাদী, তোয়াহা বিন হাবিব, আলি হোসাইন, ব্যারিস্টার আখতারউদ্দিন, মেহের আলী ও ড. তালুকদার । পাকিস্তানী নাগরিকদের মধ্যে ছিল সদ্য প্রয়াত মাহমুদ আলী । বৈঠকের সভাপতি গোলাম বলে, লভন থেকে আমাদের কার্যক্রম চালানোটা কঠিন হবে । তাই আমাদের কাউকে দেশে ফিরে যেতে হবে । আমাদের ঝুঁকি নিতেই হবে, নয়তো ফায়দা হবে না । তবে দেশে ফিরলে যোগাযোগের মধ্যে

থাকতে পারবে, কারণ আমার লোকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে । সব কিছু ঠিকঠাক ।

উপস্থিতদের মাঝে একটি লিফলেট ধরিয়ে দিয়ে গোলাম বলে, এই লিফলেটটি বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে বিলি করতে হবে । জনগণ আমাদের সাথে আছে ।

কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে লিফলেটে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি কনফেডারেশন গঠনের কথা লেখা ছিল । আরেকটি সূত্র বলেছে মসজিদ ব্যবহার করে গোপনে একটি ইসলামি বিপ্লব সংঘটনের কথা বলা হয়েছিল এতে । ঢাকার আশেপাশে লিফলেটধারী বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তা করা হয় । গোলাম অবশ্য এই পরিকল্পনায় পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সমর্থন আছে বলে জানায় । (জিয়ার মতো) গোলামও বলেছিল, টাকা পয়সা কোনো সমস্যা না (মানি ইজ নো প্রবলেম) ।

শোনা যায় যুদ্ধকালে বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদগুলো নির্মাণের অজুহাতে গোলাম সাড়ে ৪ কোটি রিয়াল সংগ্রহ করেছিল সৌদি আরব থেকে । ধূর্ত গোলাম সে টাকার একটা বড় অংশ খরচ করে লন্ডনের ম্যানচেস্টারে একটি বাড়ি কিনে । তার ছেলে মেহেদি হাসান এখন সে বাড়িতে থাকে ।

যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সরকার মৌলিবাদ ও দালালদের প্রতাব উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়, গোলামের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় তখন । ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ও লন্ডনে বসবাসের পর সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে রাজনীতি উন্মুক্ত করে দিলে এর আগে নিষিদ্ধ ইসলামিক দলগুলো মাঠে নামে । গোলামকে অস্থায়ী ভিসায় বাংলাদেশ আসার সুযোগ দেয়া হয় ।

গোলাম বেআইনীভাবে বাংলাদেশে থাকা শুরু করে (তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, সে প্রকাশ্যেই চলাফেরা শুরু করে) এবং জামাতের আনঅফিসিয়াল আমির নির্বাচিত হয় । ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট তার নাগরিকত্ব বহাল রাখেন ।

২০০০ সালের শেষ দিকে গোলাম প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ায় । তার জায়গা নেয় আরেক মূণ্য ঘাতক মতিউর রহমান নিজামী । গোলাম ১৯৬৯ থেকে ২০০০ পর্যন্ত ৩১ বছর জামাতের আমির ছিল । কাকতালীয়ভাবে তার শুরু মৌদুদীও তাই (১৯৪১-১৯৭২) ।

# পাকিস্তানের জন্য গোলাম আয়মের আক্ষেপ ফুরাবে না!

## শওকত হোসেন মাসুম

গোলাম আয়মের লেখা আত্মজীবনী মাত্রই শেষ করলাম। একটা মানুষকে বোঝার জন্যই কষ্ট করে তিন খন্দ জীবনী পড়া। পড়ে বুঝালাম এই লোকটার মতো অভাগা আসলেই কেউ নেই। বুকে পাকিস্তান নিয়ে বাস করছে বাংলাদেশে। তাই সারা বই জুড়েই পাকিস্তান নিয়ে আক্ষেপ। এটা পড়ে বুঝালাম তার আভা-বাচ্চারাও কি পরিমাণ মনোকণ্ঠে থাকে।

আসুন দেখি কী লিখেছেন গোলাম আয়ম।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় অধ্যাপক গোলাম আয়ম নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় জনগণকে আওয়ায়া লীগকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলতেন, ‘তারা ক্ষমতা পেলে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে (বর্তমান বাংলাদেশ) আলাদা করে ফেলতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে আপনারা পাকিস্তানের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগই হয়ত পাবেন না।’ (৩য় খন্দ, পৃষ্ঠা- ১০৭)

তৃতীয় খন্দের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গোলাম আয়ম মুক্তিযুদ্ধবিরোধী নানা মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর সাফাই গেয়েছেন, পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করার যুক্তি খুঁজেছেন, বর্ণনা করেছেন শাস্তি কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট। তার দাবি, শাস্তি কমিটির সঙ্গে জনগণের কোনো শক্তি ছিল না, মুক্তিযোদ্ধাদের কারণেই জনগণের সঙ্গে তাদের দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

গোলাম আয়মের মতে, ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ কোনো গৌরবময় অর্জন নয় বরং তা হলো ‘পাকিস্তান বিভক্তি ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশাদময় কাহিনী’ (পঃ-২১১)। একই পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন, ‘১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সংকট ছিল বহি-ঝংকি জড়িত দলাদলির ব্যাপার, যাতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উপাদানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক উপাদানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির যোগসূত্র ছিল।’

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে জামায়াতের আঁতাতের সাফাই গেয়ে গোলাম আয়ম লিখেন, ‘সামরিক বাহিনীর অভিযানের ফলে জনগণ যে অসহায় অবস্থায় পড়ে আমাদের কাছে আসছে আমাদেরকে যথাসাধ্য তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এ পরিস্থিতিতে জনগণের সামান্য খিদমত করতে হলে সামরিক

সরকারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমেই তা সম্ভব’ (পঃ-১৪৩)। জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেই সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে গোলাম আয়ম পরের পৃষ্ঠাতেই উল্লেখ করেন। টিক্কা খানের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার আহ্বান জানিয়ে রেডিওতে ভাষণ দেন বলেও তিনি একই পৃষ্ঠায় লিখেন। ভাষণে গোলাম আয়ম মুক্তিযুদ্ধের অজুহাতে ভারত বাংলাদেশ দখল করতে চায় উল্লেখ করে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। এই ভাষণ প্রচারের পরই সারা দেশে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা আওয়ায়া লীগের হৃষকির মুখে পড়ে- এটাও উল্লেখ করেন তিনি।

পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করে জামায়াত দেশবাসীর উপকার করেছে- জীবনীতে এমন দাবি ও করেছেন জামায়াতের সাবেক আমির। জনেক সুর্য্য মিয়াকে পাক সেনাবাহিনী তার সুপারিশে ছেড়ে দিয়েছিলেন উল্লেখ করে তিনি লিখেন, ‘চোখবাঁধা অবস্থায় তাকে (সুর্য্য) জিপ থেকে এক সৈনিক লাথি দিয়ে ফেলে দিয়ে গেল। লাথি মারার সময় নাকি বলল, কোন গোলাম আয়ম নাকি সুপারিশ করেছে, যা বেঁচে গেল’ (পঃ-১৪৫)। তিনি আরো লিখেছেন, ‘শেখ মুজিবের আত্মায় হওয়া ছাড়া তার (সুর্য্য) আর কোনো অপরাধ নেই’ (পঃ-১৪৮)।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর নানা অপকর্মের সহযোগী রাজাকার বাহিনীকে দেশপ্রেমিক এবং মুক্তিযুদ্ধকে নাশকতামূলক ততপরতা উল্লেখ করে তৃতীয় খন্দের ১৫০ পৃষ্ঠাতে গোলাম আয়ম লিখেন, ‘যে রেয়াকারা (রাজাকার) দেশকে নাশকতামূলক তৎপরতা থেকে রক্ষার জন্য জীবন দিচ্ছে তারা কি দেশকে ভালবাসে না? তারা কি জন্মভূমির দুশ্মন হতে পারে?’

গোলাম আয়ম মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারাই পাক সেনাবাহিনীকে হিংস্র হতে বাধ্য হয়েছে বলেও দাবি করেন ১৫২ পৃষ্ঠাতে। তার দাবি, মুক্তিযোদ্ধারা অবাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করেছে এবং এর প্রতিশোধ নিতেই পাক বাহিনী বাঙালিদের প্রতি নৃশংস হতে বাধ্য করেছে। গোলাম আয়ম পাক সেনাবাহিনীর নৃশংসতাকে ‘মোটাবুদ্ধির সৈনিকদের অনর্থক’ কাজ বলেও উল্লেখ করে পরের পৃষ্ঠাতে লিখেন, ‘মোটা বুদ্ধির সৈনিকরা এভাবে কিছু

হিন্দুকে অনর্থক মেরে হিন্দু সম্প্রদায়কে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করল।’

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে শাস্তি কমিটি গঠনের লক্ষ্যে প্রাদেশিক গভর্নর নূরল আমিনের বাসায় এক বৈঠকে গোলাম আয়ম বলেছিলেন, ‘পাকিস্তান টিকে থাকুক, আমাদের দেশ ভারতের থপ্পর থেকে বেঁচে থাকুক- এটা অবশ্যই আমাদের আন্তরিক কামনা’ (পঃ-১৫৬)। দুই পৃষ্ঠা পরেই তিনি আপে করে লেখেন, ‘মুক্তিযোদ্ধারা শাস্তি কমিটির সঙ্গে শত্রুতা না করলে জনগণের পর্যায়ে শাস্তি কমিটি ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো না।’

জীবনীর তৃতীয় খন্দের ‘১৬ ডিসেম্বরে আমার অনুভূতি’ শীর্ষক অধ্যায়ে গোলাম আয়ম লিখেন, ‘ডিসেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে তা ধারণা করিন বলে মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলাম না।’ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার অনুভূতি জানাতে গিয়ে মাসিক উর্দু ডাইজেস্টের সম্পাদক আলতাফ হোসাইন কুরাইশীকে তিনি বলেছিলেন, ‘উপমহাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দু ও শিখ বাহিনীর নিকট প্রায় এক লাখ সশস্ত্র বাহিনী আন্তসমর্পণ করলো। ইংরেজ আমলে মুজাহিদ বাহিনী শিখদের নিকট আন্তসমর্পণ করেননি। তারা শহীদ হয়েছেন।’ (পঃ-২৪২)

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের আগেই গোলাম আজম ’৭১ এর ২২ নভেম্বর জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে পাকিস্তান যান। এরপর তিনি দীর্ঘদিন আর দেশে ফিরেননি। গোলাম আয়মের আত্মজীবনীর প্রথম খন্দে ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে তার মন্তব্যেও তার পাকিস্তান প্রীতি স্পষ্ট হয়েছে। ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল পাকিস্তান দলকে পরাজিত করায় শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ৭১-এর মতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে খেলার ফলেই বিজয় সম্ভব হয়েছে। এই মন্তব্যের সমালোচনা করে গোলাম আয়ম লিখেন, ‘খেলা খেলাই। এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকে টেনে তিনি (শেখ হাসিনা) অথবাই হাস্যল্পন হলেন।’ অর্থাৎ পরের অনুচ্ছেদেই গোলাম আয়ম লিখেন, ‘পাকিস্তান মাঝে মাঝে সাধারণ দলের নিকট প্রায়জিত হলেও ভারতের নিকট খুব কমই প্রায়জিত হয়েছে। জানি না পাকিস্তানী দল ৪৭ এর চেতনা নিয়েই ভারতের বিরুদ্ধে খেলে কিনা (পঃ-১২৬)।’

গোলাম আয়ম এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, ঢাকা স্টেডিয়ামে যতবার ভারত ও পাকিস্তান দলের খেলা হয়েছে প্রতিবারই বাংলাদেশী দর্শকের শতকরা প্রায় ১৯ জনই পাকিস্তান দলের প্রতিই আবেগপূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ব্যানার প্রদর্শন করলেও তা দর্শকদের মনে সামান্য প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি। দর্শকরা এই ব্যানার দেখে মন্তব্য করেছে ‘রাখ মিয়া মুক্তিযুদ্ধের কথা, এখানে মুসলমানদের বিজয় চাই’।

একই খন্দে জামায়াতের সাবেক আমির আরো লিখেন, ‘ধর্মনিরপেক্ষাদী ও ভারতপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের মন্তব্যের কথা শুনেছি। তারা নাকি বলেন, আমরা বছরের পর বছর চেষ্টা করে যুবসমাজের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঞ্চারের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করি তা স্টেডিয়ামে পাক-ভারত খেলায়ই নস্যাত হয়ে যায় (পঃ-১২৭)।’ স্বাধীনতাবিরোধীদের রাষ্ট্রক্ষমতার অংশিদার করায় সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন গোলাম আয়ম। আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খন্দের ১৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন, রাজনৈতিক প্রজার কারণেই তিনি ‘স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের বিভাজন বর্জন করে সকলকেই তার সংগঠনে সমবেত করেন। ৭১-এ তার বিপরীত ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও শাহ আজিজুর রহমানের ওপর প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতার দায়িত্ব অর্পণ করেন।’ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারেরও ঘোর বিরোধী গোলাম আয়ম। তার মতে, ‘মুজিব হত্যার বিচার জনগণের উপর মহা অবিচার।’ দ্বিতীয় খন্দে তিনি লিখেন, ‘কয়েকজন দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তা সফল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশকে উদ্ধার করেন।...এটা যদি সাধারণ হত্যা হয়ে থাকে তাহলে গোটা দেশবাসীকেই আসামি করা প্রয়োজন ছিলো। কারণ এ হত্যায় তারা আনন্দ ও উল্লাস করেছে।’ (পঃ-১৭৪)।

কৃতজ্ঞতা : ওয়াসেক বিলাহ

# চট্টগ্রাম গণহত্যার নায়ক মীর কাশেম আলী

## অমি রহমান পিয়াল

একান্তরে চট্টগ্রাম গণহত্যার নায়ক, রাজাকার মীর কাশেম আলী এখন শত কোটি টাকার মালিক, রাবেতার কান্তি ডিরেক্টর, ইবনে সিনা ট্রাস্টের কর্ণধার। ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে। আজকের এই ধনকুবের রাজাকারের সূচনা একেবারে দীনহীন অবস্থা থেকে। মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানার চালা গ্রামের পিডারিউডি কর্মচারী তৈয়ার আলীর চার ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় মীর কাশেম। ডাক নাম পিয়াল, সবাই চিনে মিন্ট নামে। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে পিতার চাকুরির সুবাদে চট্টগ্রাম গিরোছিল পড়তে। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র থাকার সময় জড়িয়ে পড়ে মওদুদীর মৌলবাদী রাজনীতিতে। জামায়াতের অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের দায়িত্ব পায় স্বাধীনতার আগে।

৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জামায়াত পক্ষ নেয় পাকিস্তানের। রাজাকার অভিন্ন্যাঙ্গ জারির পর জামায়াতে ইসলামী তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংঘের নেতাদের স্ব স্ব জেলার রাজাকার বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করে। সেই সুবাদে মীর কাশেম আলী চট্টগ্রাম জেলার প্রধান হয়। চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত রাজাকারী কর্মকান্ডের নাটের গুরু ছিল সে। ‘৭১ এর ২ আগস্ট চট্টগ্রাম মুসলিম ইস্পাটিউটে তার নেতৃত্বে স্বাধীনতা বিরোধী সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সভাপতি হিসেবে সে তার ভাষণে বলে গ্রামেগঞ্জে প্রতিটি এলাকায় খুঁজে খুঁজে পাকিস্তান বিরোধীদের শেষ চিহ্নটি মুছে ফেলতে হবে।

তার স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার সময় ছাত্র সংঘের নতুন প্রাদেশিক পরিষদ গঠন হয়। মীর কাশেম হয় তার সাধারণ সম্পাদক। ছাত্র সংঘের নেতারা শুরু থেকেই বুদ্ধিজীব হত্যার পরিকল্পনা করতে থাকে। নভেম্বরে ঘটা করে পালিত হয় বদর দিবস। এদিন বায়তুল মোকাররমে ছাত্র সংঘের সমাবেশে মীর কাশেম আলী বলে, পাকিস্তানীরা কোনো অবস্থাতেই হিন্দুদের গোলামী করতে পারে না। আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও পাকিস্তানের এক্য ও সংহতি রক্ষা করব।

৪ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান জরুরী অবস্থা জারির পর মীর কাশিম এক ব্রিতি দিয়ে বলে হিন্দুস্তানকে হশিয়ার করে দিতে চাই পাকিস্তান ভাঙতে এলে হিন্দুস্তান নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দেশপ্রেমিক সকলে শত্রুর বিরুদ্ধে মুক্ত আঘাত হানুন। এরপর শুরু হয় বুদ্ধিজীবি হত্যার পরিকল্পনা। মীর কাশেমের নির্দেশে চট্টগ্রামের টেলিগ্রাফ অফিসের লাগোয়া ডালিম হোটেলে রাজাকার বাহিনীর বন্দি শিবির খোলা হয়। বহু লোককে ওখানে এনে খুন করা হয়। পানির বদলে অনেক বন্দীকে খাওয়ানো হতো প্রস্তাব। ১৭ ডিসেম্বর সেখান থেকে সাড়ে তিনশ বন্দীকে প্রায় মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বুদ্ধিজীবি হত্যার তালিকা প্রণয়নকারীদের অন্যতম ছিল মীর কাশেম আলী।

স্বাধীনতার পর মীর কাশেম পালিয়ে ঢাকা চলে আসে। মিন্ট নামে নিজেকে পরিচয় দিত, বলত সে মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু চিহ্নিত হয়ে পড়ার পর আরেক ঘাতক মঙ্গনুদ্ধিনের সঙ্গে পালিয়ে চলে যায় লক্ষণ। সেখান থেকে সৌদি আরব। সেখানে স্বাধীনতা বিরোধীদের সংগঠিত করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশে ফিরে আসে মীর কাশিম। একটি উজ্জ্বলযোগ্য ঘটনা হলো মুশতাক সরকার মুজিবের ঘাতকদের বাচাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি প্রত্যাহার করে নেয় দালাল আইন। জিয়ার শাসনামলে নতুন করে সংগঠিত হয় ইসলামী ছাত্র সংঘ, নাম বদলে হয় ইসলামী ছাত্র শিবির। ছাত্র শিবিরের প্রথম কেন্দ্রীয় সভাপতি হয় মীর কাশেম আলী। এরপর রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের নামে রাবেতা আল ইসলামী গড়ে তুলে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর টাকায় আস্তে আস্তে বানায় ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সিনা ট্রাস্ট ও ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিকালস। জামাতে ইসলামী ও শিবিরের আয়ের এবং কর্মসংস্থানের বড় উৎস হয়ে দাঁড়ায় এসব প্রতিষ্ঠান।

তথ্যসূত্র : মুক্তিযুদ্ধ কোষ/ তৃতীয় খন্দ

সম্পাদক : মুনতাসীর মামুন

# গণতন্ত্র কমিশনের রিপোর্ট : যুদ্ধাপরাধী কামারুজ্জামান সম্পর্কে

অমি রহমান পিয়াল

মোহাম্মদ কামারুজ্জামান জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল। সান্তানিক সোনার বাংলার সম্পাদক, জামাতে ইসলামীর মুখ্যত্ব দৈনিক সংগ্রামের সাবেক নির্বাচী সম্পাদক। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কামারুজ্জামানের স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা ও যুদ্ধাপরাধের বিবরণসমূহ তৎকালীন সংবাদপত্র, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক এন্ট ও নির্যাতিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা গেছে। ৭১ সালে কামারুজ্জামান জামাতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের ময়মনসিংহ জেলার নেতা ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামালপুরে প্রথম আলবদর বাহিনী গড়ে উঠে যার প্রধান সংগঠক ছিলেন কামারুজ্জামান।

১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের ২৫তম আজাদী দিবস উপলক্ষ্যে গত শনিবার মোমেনশাহী আলবদর বাহিনীর উদ্যোগে মিছিল ও সিস্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুসলিম ইনসিটিউটে আয়োজিত এই সিস্পোজিয়ামে সভাপতিত্ব করেন আলবদর বাহিনীর প্রধান সংগঠক জনাব কামারুজ্জামান। এক তারবাতার্য প্রকাশ সিস্পোজিয়ামে বিভিন্ন বক্তাগণ দেশকে ধ্বংস করার মড়য়স্ত্রে লিঙ্গ দুশ্মনদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

জামালপুরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসেবে আলবদর গড়ে উঠার সাথে সাথে জামাত নেতৃত্ব হস্তয়ুক্ত করতে পারে যে ছাত্র সংঘকে তারা সশস্ত্র করে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা ছাড়াও বুদ্ধিজীবি হত্যার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রাদ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। প্রথমত পরীক্ষামূলকভাবে সারা ময়মনসিংহ জেলার ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীদের আলবদর বাহিনী হিসেবে সংগঠিত করে সশস্ত্র ছেনিং দেওয়া হয়। এই সাংগঠনিক কার্যক্রমের পরিচালক ছিলেন কামারুজ্জামান। কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে মাসখানেকের মধ্যেই ময়মনসিংহ জেলার সমষ্ট ছাত্র সংঘ কর্মীকে আলবদর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (তথ্যসূত্র : একান্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, মুক্তিযুদ্ধ চেনা

কমিশনকে জানিয়েছেন, তার ছেলে শহীদ বদিউজ্জামানকে মুক্তিযুদ্ধের সময় আঘাত মাসের একদিনে তার বেয়াইর বাড়ি থেকে কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে ১১ জনের একটি দল ধরে নিয়ে যায়। শহীদ বদিউজ্জামানকে আহমদ নগর পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর শহীদের বড় ভাই হাসানুজ্জামান বাদী হয়ে নালিতাবাড়ি থানায় মালা দায়ের করেন। এই মালার ১৮জন আসামীর অন্যতম ছিলেন কামারুজ্জামান। মালাটির নম্বর -২(৫)৭২। জিআর নং-২৫০(২)৭২।

শেরপুর জেলার শহীদ গোলাম মোস্তফার চাচাত ভাই শাহজাহান তালুকদার জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ২৪ আগস্ট আলবদররা গোলাম মোস্তফাকে শেরপুর শহরের সড়ক থেকে ধরে বলপূর্বক তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। শেরপুর শহরের সুরেন্দ্রমোহন সাহার বাড়িত দখল করে আলবদররা তাদের ক্যাম্প বানিয়েছিল। সে ক্যাম্পে গোলাম মোস্তফাকে ধরে নিয়ে আলবদররা তার গায়ের মাংস ও রগ কেটে, হাত বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় শেরী বিজের নিচে। সেখানে তারা গুলি করে হত্যা করে গোলাম মোস্তফাকে। কামারুজ্জামানের প্রত্যক্ষ নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল।

শহীদ গোলাম মোস্তফার হত্যাকাণ্ড যে কামারুজ্জামানের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল এই তথ্য শেরপুরের আরো অনেকেই দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শেরপুর জেলা শাখার সাবেক সভাপতি শহীদ পিতার সন্তান তাপস সাহা জানিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় কামারুজ্জামান ও তার সহযোগীরা শেরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আলবদর ক্যাম্পে নারী-পুরুষ-যুবক ধরে নিয়ে তাদের উপর অত্যাচার চালাত। আলবদররা তাদের চাবুক দিয়ে পেটাতো। কামারুজ্জামান বাহিনী শেরপুর পৌরসভার সাবেক কমিশনার মজিদকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল টর্চার ক্যাম্পে। সকালে ধরে নিয়ে পুরোদিন তাকে টর্চার ক্যাম্পের অন্ধকার কূপে আটকে রাখে।

১৯৭১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি এক দুপুরে শেরপুর কলেজের তৎকালীন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক সৈয়দ আবদুল হান্নানকে খেলা গায়ে, মাথা ন্যাড়া করে,

গায়ে মুখে চুনকালি মাখিয়ে, গলায় জুতার মালা পঁড়িয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় চাবুক দিয়ে পেটাতে পেটাতে কামারুজ্জামান ও তার সহযোগীরা শেরপুর শহরে প্রদক্ষিণ করায়।

শেরপুর জেলার আওয়ামী লিগের সাবেক নেতা জিয়াউল হক জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ২২ আগস্ট বিকেল ৫টায় কামাড়িচৰে তার নিজের বাড়ি থেকে গাজির খামারে যাবার সময় তজন সশস্ত্র আলবদর তাকে ধরে নিয়ে শেরপুর শহরে আলবদর টর্চার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তিনি সেই ক্যাম্পে কামারুজ্জামানসহ তার সহযোগীদের দেখেন। তারা জিয়াউল হককে দুদিন টর্চার ক্যাম্পের অন্ধকার কূপে আটকে রাখে। এরপর শেরপুর ছেড়ে যাবার শর্তে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যথায় তারা তাকে হত্যার হৃষকি দেয়।

শেরপুর জাতীয় পার্টির নেতা মুক্তিযোদ্ধা এমদাদুল হক হীরা জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই কামারুজ্জামানের সহায়তায় পাকিস্তানীরা তার বাড়ীঘর জালিয়ে পুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সেখানে তারা পাঁচটি বাক্স করেছিল। তার বাড়ির লিচুগাছের নিচে মানুষ ধরে এনে হত্যা করেছে।

অপর একজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্তমানে শেরপুরের নকলার হাজী জালমামুদ কলেজের শিক্ষক মুসফিকুজ্জামান জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় তিনি আনি বাজারস্থ বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি লুট করা হয়েছিল কামারুজ্জামানের নির্দেশে ও উপস্থিতিতে।

শেরপুরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, রাজাকার ও আলবদর কর্তৃক নিরীহ লোকজনদের ধরে আনা এবং তাদের লাশ বহন করার জন্য ব্যবহৃত ট্রাকগুলোর একজন ডাইভার জানিয়েছেন কামারুজ্জামান নকলার মুক্তিযোদ্ধা হত্তার বাড়ি পোড়ানের জন্য পাকিস্তানী বাহিনীকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যান। তখন হত্তার বাড়ি থেকে কামারুজ্জামান প্রায় ১০০ মন চালও লুট করে। এছাড়াও কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে আলবদররা সাধারণ মানুষের গরু-ছাগল ধরেন নিয়ে আসত এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিসহ অন্যান্য জমি সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিত বলে জানিয়েছেন এই ট্রাক ড্রাইভার। কামারুজ্জামানের নেতৃত্ব সে সময় ডাকাতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

# যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং প্রাসঙ্গিক আইনের বিশেষণ

## একরামুল হক শামীম

১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই জাতীয় সংসদে তৎকালীন আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর বলেছিলেন, ‘আজকে বাংলাদেশে যে সব যুদ্ধাপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেজন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে যদি তারা বিনা বিচারে, বিনা শাস্তিতে রেহাই পেয়ে যান, তাহলে সমস্ত সভ্য জাতির চোখে আমরা পরিহাসের পাত্র হবো। এবং আমরা অত্যন্ত কর্দম নজীর স্থাপন করব। এই বিচার আমাদের পরমতম কর্তব্য’।

১৯৭৩ সালের পর পেরিয়ে গেছে দীর্ঘ সময়। এই পর্যায়ে এসে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে যদি আমি বলি, আমরা সভ্য জাতির চোখে কেমন পরিহাসের পাত্র হয়েছি? এই কি আমরাই বাংলাদেশ, যাদের রক্ষের বিনিময়ে স্বাধীন এই দেশ তাদের হত্যার বিচার আজতক করতে পারে নি যে দেশ? এই কি বাংলাদেশ, যেখানে স্বাধীনতার এতো বছর পরেও প্রতিহিসিকভাবে স্বীকৃত সত্যকে কথার তুবড়িতে মিথ্যা বানাতে চান স্বীকৃত কোন যুদ্ধাপরাধী।

যদি সারা বাংলাদেশে গণভোট চাওয়া হয়, কারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান? তবে এটা দৃঢ়ভাবে বলা যায় প্রায় সবাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে থাকবেন। এতোকিছুর পরও কেন এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে না? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাটা কোথায়? যেখানে প্রজাতন্ত্রের বেশিরভাগ লোক এই দাবির পক্ষে।

আইনের ছাত্র হিসেবে আমি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তার আইনগত দিক নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রথম আইন পাশ করা হয় ১৯৭২ সালে। আইনটির নাম Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972। এটি দালাল আইন নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা প্রবর্তিত দালাল আইনটির প্রয়োগ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী আইনটির আদেশ জারী হলেও পরবর্তীতে একই বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি, ১ জুন এবং ২৯ আগস্ট তারিখে তিনদফা সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটি চূড়ান্ত

হয়। পরবর্তীতে দালাল আইনের অধীনে ৩৭ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে প্রে�েতার করা হয় এবং বিভিন্ন আদালতে তাদের বিচার আরম্ভ হয়। এর পাশাপাশি সরকারি চাকুরিতে কর্মরতন্ত্রের কেউ দালালী এবং যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা তা যাচাই করার জন্য ১৯৭২ সালের ১৩ জুন একটি আদেশ জারি করে যা তখন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে আটক যে সকল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর থেকে প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ৫৬২ ধারার (ক) অনুচ্ছেদে যে বিধান রাখা হয় তাতে সত্যিকার অর্থে কোন যুদ্ধাপরাধী মুক্তি পাওয়ার কথা নয়। কারণ ঘোষণার ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে - ‘যারা বর্ণিত আদেশের নিচের বর্ণিত ধারাসমূহে শাস্তিযোগ্য অপরাধে সাজাপ্রাণ অথবা যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে অথবা যাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ধারা মোতাবেক কোনটি অথবা সবকটি অভিযোগ থাকবে

- (১) ১২১ (বাংলাদেশের বিরোদ্ধে যুদ্ধ চালানো অথবা চালানোর চেষ্টা),
- (২) ১২১ ক (বাংলাদেশের বিরোদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ষড়যন্ত্র),
- (৩) ১২৮ ক (রাষ্ট্রদ্রোহিতা),
- (৪) ৩০২ (হত্যা),
- (৫) ৩০৪ (হত্যার চেষ্টা),
- (৬) ৩৬৩ (অপহরণ),
- (৭) ৩৬৪ (হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ),
- (৮) ৩৬৫ (আটক রাখার উদ্দেশ্যে অপহরণ),
- (৯) ৩৬৮ (অপহত ব্যক্তিকে গুম ও আটক রাখা),
- (১০) ৩৭৬ (ধর্ষণ),
- (১১) ৩৯২ (দস্যুত্ব),
- (১২) ৩৯৪ (দস্যুত্বিকালে আঘাত),
- (১৩) ৩৯৫ (ডাকাতি),
- (১৪) ৩৯৬ (খুনসহ ডাকাতি),

(১৫) ৩৯৭ (হত্যা অথবা মারাত্মক আঘাতসহ দস্যুত্ব অথবা ডাকাতি),

(১৬) ৪৩৫ (আগুন অথবা বিক্ষেপক দ্রব্যের সাহায্যে ক্ষতিসাধন),

(১৭) ৪৩৬ (বাড়িঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগুন অথবা বিক্ষেপক দ্রব্য ব্যবহার),

(১৮) ফৌজদারী দন্তবিধির ৪৩৬ (আগুন অথবা বিক্ষেপক দ্রব্যের সাহায্যে কোন জলযানের ক্ষতি সাধন) অথবা এসব কাজে উৎসাহ দান। এসব অপরাধী কোনভাবেই ক্ষমার যোগ্য নন।

এখন প্রশ্ন হলো সুনির্দিষ্টভাবে এই ১৮টি ধারা উল্লেখ করার পরও কি কেউ বলতে পারে যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের ছাড়া পেয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে? সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তি এসকল অপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিল এবং তাদের বিচার কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়।

সেই প্রসঙ্গে এই রচনায় আলোচনা না করে ফিরে যাই সাধারণ ক্ষমা প্রসঙ্গে। এই সাধারণ ক্ষমা নিয়ে একটা বিতর্ক থেকেই যায়। শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন কিসের ভিত্তিতে? সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি কি শুধুই সহানুভূতির বিষয়, নাকি সেখানে সাংবিধানিক কোন বৈধতা রয়েছে? বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমা প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে। লক্ষ করি বর্তমান সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদ (১৯৭২ সালের সংবিধানের ৫৭ নং অনুচ্ছেদ)

‘The President shall have power to grant pardons, reprieves and respites and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority.’

অর্থাৎ ‘কোন আদালত, টাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্তের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঙ্গল করিবার এবং যে কোন দন্ত মওকুফ স্থগিত বা আস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।’

সুতরাং বলা যায়, শুধুমাত্র শাস্তি এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার আছে রাষ্ট্রপ্রধানের। কিন্তু যারা শাস্তি কিংবা দণ্ড পাননি তাদেরকে কি সাধারণ ক্ষমা করা যাবে? সেই বিতর্কে না গিয়ে ফিরে আসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে। দালাল আইন বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না কিংবা বিচার সম্ভব নয় এমনটা মোটেও নয়। কারণ এখনো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে খ্যাত সংবিধানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি রয়েছে; রয়েছে ৪৭(৩) অনুচ্ছেদ। এছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার সবচেয়ে কার্যকরী আইন The International crimes (Tribunals) Act 1973 এখনো রয়েছে।

এ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই আমাদের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী সম্বন্ধীয় ৪৭(৩) অনুচ্ছেদ। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয় এবং এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ১৭ জুলাই। এই প্রথম সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণহিতৈষীদের বিচারের বিধান নিশ্চিত করা।

সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৭(৩) অনুচ্ছেদ অন্তভুক্ত করা হয়। এই অনুচ্ছেদটির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক -

*“Notwithstanding anything contained in this Constitution, no law nor any provision thereof providing for detention, prosecution or punishment of any person, who is a member of any armed or defence or auxiliary forces or who is a prisoner of war, for genocide, crimes against humanity or war crimes and other crimes under international law shall be deemed void or unlawful, or ever to have become void or unlawful, on the ground that such law or provision of any such law is inconsistent with, or repugnant to, any of the provision of this Constitution.”*

অর্থাৎ, “এই সংবিধান যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশ্রম বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডনান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমংজস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া হবে গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।”

অসমংজস্য বা পরিপন্থীর কথা কেন আসছে, সে বিষয়টি বুঝতে হলে আলোকপাত করতে হবে সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা শিরোনামে বিধিবন্ধ ৪৭ (ক) (১) এবং ৪৭ (খ) (২) অনুচ্ছেদ।

৪৭ (ক) (১) - “যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য নয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৮ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হবে না।”

৪৭ (ক) (২) - “এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।”

এখন সংবিধানের ৩৫ (১) নং অনুচ্ছেদের দিকে লক্ষ্য করি - “অপরাধের দায়মূল্য কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।”

অনুচ্ছেদ ৪৭ (৩) এর পর অনুচ্ছেদ ৩৫ (১) এর আলোচনা নিয়ে আসার কারণ হলো সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর অন্যতম উপলক্ষ্যই হলো এই ৩৫ (১) নং অনুচ্ছেদ। “ex post facto” laws বলে আইনে একটা টার্ম রয়েছে।

Ex post facto law is one which, in its operation, (1) makes that criminal which was not so at the time the act was not so at the time the act was performed, or (2) which increases the punishment, or in short which in relation to the offence or its consequence, alters the situation of a party to his detriment or disadvantage.

আমাদের সংবিধানে ex post facto law সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি হলো ৩৫ (১)। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে কোন আইন যাতে ex post facto টার্মটির সঙ্গে বিরোধ না করে সেজন্যই সংবিধানে ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়।

এবার ফিরে আসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত কার্যকরী আইন The International crimes (Tribunals) Act, 1973

প্রসঙ্গে। ১৯৭৩ সালের ২১ জুলাই জাতীয় সংসদে সর্বসমত্বে পাশ হয় এই আইন। আমরা লক্ষ্য করি ১৭ জুলাই সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ার তিনদিন পরেই The International crimes (Tribunals) Act, 1973 পাশ হয়। তার মানে সংবিধানের ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যে আইনটির কথা বলা হয়েছিল The International crimes (Tribunals) Act, 1973 -ই হচ্ছে সেই আইন। অর্থাৎ এই আইনটি সংবিধানের অন্য কোন অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসমংজস্য বা পরিপন্থী হলেও বাতিল হবে না। সুতরাং যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে এর দোহাই দেখান তাদের জন্য মোক্ষম জবাব হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদ। এখানে একটি অজুহাতের জবাব দেয়া হলো। সংবিধানের চেয়ে বড় আইন তো বাংলাদেশে অন্য কোন আইন নয়।

আরেকটি অজুহাত হচ্ছে সিমলা চুক্তি। সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালের ২ জুলাই। এই চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীদের বিনি-নয়ম হয়েছে। কিন্তু এই চুক্তিতে কোথাও বলা নাই যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না।

এ সবকিছু পর আরেকটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই সংবিধান এই দেশের সর্বোচ্চ আইন। অন্য যেকোন আইনের সাথে অসামংজস্য কিংবা পরিপন্থী হলে সংবিধানের আইন প্রাধান্য পাবে। সংবিধানের ৪৭ (৩) ধারায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলা হয়েছে। এবং এই ধারার ভিত্তিতেই পরবর্তীতে The International crimes (Tribunals) Act, 1973 কার্যকর হয়। এই অ্যাট্রিটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে বলে, যার সমর্থনে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদ। কোন ধরনের চুক্তি কিংবা আলোচনা নিশ্চয়ই সংবিধানের আইনের উপরে স্থান পেতে পারে না। তাহলে এটা স্বতংসিদ্ধ যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নেই। প্রসঙ্গত একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের শিরোনাম মৌলিক অধিকার। এর অধীনে ২৬ নং থেকে ৪৭ (ক) নং অনুচ্ছেদ রয়েছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য এই অনুচ্ছেদগুলো অবশ্যই কার্যকর করা। ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার অংশে পড়ে। সংবিধানের ২য় ভাগে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি যার অধীনে আছে ৮ থেকে ২৫ নং অনুচ্ছেদ। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। কিন্তু মৌলিক অধিকার অংশের যেকোন অনুচ্ছেদের দাবি রাষ্ট্রের নাগরিক করতেই পারে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা ৪৭ (৩)

নং অনুচ্ছেদ কার্যকর এবং বাস্তবায়নের দাবি করতেই পারি ।  
সুতরাং জোর গলায় বলতে পারি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে ।

এখন ফিরে আসি The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর খুটিটাটি বিষয়ে । ১৯৭৩ সালের এই আইনটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন ।

The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর Jurisdiction অর্থাৎ বিচারের একত্তিয়ার আলোচিত হয়েছে আইনটির ৩(১) ধারায় । সেখানে বলা হয়েছে-

“A tribunal shall have the power to try and punish any person irrespective of his nationality who, being a member of any armed, defence or auxiliary force commits or has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the following crimes.”

উপরিউক্ত ধারাটির দুটি কি লক্ষ্য করি । বলা হয়েছে any person irrespective of his nationality আবার বলা হয়েছে whether before or after the commencement of this Act; অর্থাৎ যেকোন দেশের নাগরিককে এই আইনের মাধ্যমে বিচার করা যাবে । পাশাপাশি অপরাধ এই আইন প্রয়োগের আগে কিংবা পরে যে সময়ই হোক না কেন, অপরাধের বিচার সম্বর এই আইনের মাধ্যমেই ।

৩(২) ধারায় বেশ কিছু ধরনের অপরাধের কথা বলা হয়েছে, যেগুলোর জন্য এই আইন অন্যয়ায়ী Jurisdiction রয়েছে ।

এগুলো হলো (a) Crimes against Humanity (b) Crimes against Peace (c) Genocide (d) War crimes (e) Violation of any humanitarian rules applicable in armed conflicts laid down in the Geneva Convention of 1949 (f) any other crimes under international law (g) attempt, abetment on conspiracy to commit any such crimes (h) complicity in our failure to prevent commission of any such crimes.

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগী বাহিনীরা এর প্রতিটি অপরাধ করেছে । সুতরাং এই আইনের অধীনে তাদের বিচার হতেই হবে ।

লক্ষ্য করা যাক সংবিধানের ৪৭(৩) ধারা এবং The International Crimes (Tribunals) Act 1973 দুই জায়গাতেই auxiliary forces এর কথা বলা হয়েছে । এই auxiliary forces এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ১৯৭৩ সালের আইনের

২(ধ) ধারায় । সেখানে বলা হয়েছে-

“auxiliary forces includes forces placed under the control of the Armed Forces for operational, administrative, static and other purpose.”

সংজ্ঞার control of the Armed Forces কথাটি মনে রাখি এবং পরবর্তীতে রাজাকার বাহিনী গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করি । ১৯৭১ সালের ২ আগস্ট রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় The East Pakistan Razakars Ordinance, 1972 এর মাধ্যমে ।

পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি গেজেট নোটিফিকেশনের (No.

4852/583/PS-1y/3659/D-2A) মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীকে সরাসরি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে আনা হয় । গেজেট নোটিফিকেশনের (b) clause টি লক্ষ্য করি-

The officer of the Pakistan Army under whose command any member of the Razakars is placed shall exercise the same powers in relation to that member as he is authorized to exercise under the side Act in relation to a member of the Pakistan Army placed under his command.

সুতরাং আমরা বলতে পারি ১৯৭৩ সালের আইনটির মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী, আল বদর বাহিনী এবং আল শামস বাহিনীর সদস্যদের বিচার করা সম্ভব । এবং শিগগিরই এই বিচার কাজ শুরু করা উচিত ।

এই যে পর্যালোচনা শেষে বললাম The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব, তারপরেও কেন এত বছর হয়ে গেলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে না? সেটা রীতিমতো বড় রকমের প্রশ্ন বটে । The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর অধীনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করতে হলে tribunal গঠন করতে হবে । আর সেই tribunal গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর ৬ নং ধারায় । ৬(১) ধারায় বলা হয়েছে-

“For the purpose of section 3, the Government may, by notification in the official Gazette, set up one or more Tribunals, each consisting of a Chairman and not less than two and not more than four other members.”

এখানে লক্ষ্য করুন may শব্দটির ব্যবহার । অর্থাৎ সরকার ইচ্ছে করলে এক বা একের অধিক tribunal গঠন করতে পারবে ।

কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সরকারেরই এই ইচ্ছাটা হয়নি । তাই এত বছর পরেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয় নি । তিন অক্ষরের দুর্বল শব্দের ব্যবহার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ দীর্ঘায়িত করেছে । অথচ এখানে may শব্দের পরিবর্তে shall অথবা will ব্যবহার করলে সরকারকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য অবশ্যই tribunal গঠন করতে হতো । আর tribunal গঠন হলে নিঃসন্দেহে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব । বর্তমান সরকারের আমলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি আলোচিত বিষয় হয়ে দাঢ়িয়েছে । মিডিয়ায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে । জনসাধারণও চাচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক ।

আমরা প্রত্যাশা করতে পারি- সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য tribunal গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করবে । আর এই কাজটি যদি বর্তমান সরকারের পক্ষে সম্ভব না ও হয় তাহলে অস্তত এই সরকার যেন The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর ৬(১) ধারায় may শব্দের পরিবর্তে shall অথবা will শব্দের প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করে যায় । যাতে পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ এগিয়ে যায় ।

আলোচনার সবশেষে পরিস্কার করে বলা যাক, স্বাধীনতার এত বছর পরেও কেন আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই । মানবতার বিরক্তে ১৯৭১ সালে যে অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল তার বিচার অবশ্যই প্রত্যাশিত । পরবর্তীতে যাতে কখনোই এ ধরনের অপরাধ সংগঠিত না হয় তা নিশ্চিতের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে । যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে Limitation Act প্রযোজ্য নয় ।

৫ জানুয়ারি ২০০৮

সূত্র :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ।
- The Bangladesh Collaborators (social Tribunals) (Amendment) Order 1972
- The International Crimes (Tribunals) Act 1973
- Constitutional Law of Bangladesh; Mahmudul Islam
- যুদ্ধাপরাধ এবং জেনেভা কনভেনশন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত-আইজ্যাক রবিনসন/জান্ডে হাসান মাহমুদ
- যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং বাংলাদেশের সংবিধান : কে এম সোবহান
- একাত্তরের ঘাতকদের কেন বিচার চাই : আমান-উদ-দৌলা

# যে কারণে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ব্যর্থ হলাম

মিরাজুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের ইতিহাসের একটি অন্যতম ভয়াবহ যুদ্ধ যাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন ৩০ লক্ষ নারী পুরুষ এবং যাদের সিংহভাগই ছিলেন নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ। এর বাইরে হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হয়েছেন, যৌনদাসী হিসাবে নির্যাতিত হয়েছেন। এই নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি এমনকি শিশুরাও। ১৯৪৯ সালে গৃহীত জেনেভা কনভেনশন কর্তৃক এই ধরণের ঘৃণ্য কর্মকান্ডের প্রতিটিই যুদ্ধাপরাধের অস্তর্ভূত (১)। ২০০২ সালের জুলাইতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত যুদ্ধাপরাধের যে আওতা নির্ধারণ করে তার মাধ্যমেও এই অপরাধগুলো যুদ্ধাপরাধের অস্তর্ভূত। তবে পাকিস্তানী বাহিনীর যুদ্ধাপরাধের সময় কাল ১৯৭১ হবার কারণে তা ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের আওতায় আলোচনা করাই বেশি যুক্তিসংগত হবে।

বাংলাদেশ প্রথিবীর একমাত্র দেশ নয় যেখানে যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়নি তবে সম্ভবত: একমাত্র দেশ যে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যাহার করেছে। আমি এখানে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের কথা বলছি। এইসব পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের এ দেশীয় দোসর যেসব যুদ্ধাপরাধী আছে তারা সময়ের পালাবদলে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছে, এখন সময় সুযোগমত তাদের করা যুদ্ধাপরাধকেও অস্থীকার করেছে। পরবর্তীতে এইসব কুলাংগারদের কথাও আসবে, এদের যুদ্ধাপরাধের বিচারে আমাদের ব্যর্থতার কথাও আসবে। তবে এই পোষ্টে আমি মূলত: পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী যারা আটক ছিল, যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ ছিল, বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নেবার পরও কোন পরিস্থিতিতে, কী কারণে একটি নব্য-স্বাধীন দেশ তার জন্মযুদ্ধের সময় যারা মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটন করলো তাদের বিরুদ্ধে আনা সকল চার্জ "as an act of clemency" বা "দয়াশীলতা ও ক্ষমার মহত্ত্ব" দেখিয়ে প্রত্যাহার করলো সেটি তুলে আনার চেষ্টা করবো। (২,৯)

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ভারত-বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের পরে প্রায় ৯০,৫০০ জনকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক হয়। এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিল প্রায় ৮০,০০০ উর্দিধারী সদস্য যার মধ্যে ছিল আর্মি (৫৫,৬৯২), নেতৃত্ব ও এয়ার ফোর্স (১,৮০০),



প্যারামিলিটারি (১৬,৩৫৪) বা পুলিশ সদস্য (৫,২৯৬) এবং বাদবাকী ১০,৫০০ ছিল সিভিলিয়ান (মূলত: বিহারী) যারা পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। (৩)

এই যুদ্ধবন্দীদের সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে জেনেভা কনভেনশন

অনুযায়ী পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ করে আটক রাখার মত অবকাঠামো না থাকায় সিদ্ধান্ত হয় ভারত এই ৯০,৫০০ যুদ্ধবন্দীকে আটক রাখবে এবং এদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তাসহ ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের ভারতের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এই যুদ্ধবন্দীদের

জন্য তখনকার হিসাবে প্রতিমাসে ভারতের খরচ ছিল ১,০০০,০০০ মার্কিন ডলার। (৮)

এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকে প্রাথমিকভাবে প্রায় ১৫০০ জনকে চিহ্নিত করা হলেও চূড়ান্তভাবে সর্বমোট ১৯৫ জনকে সুনির্দিষ্টভাবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং এদের যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারের সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার। (৫) বাদবাকি যুদ্ধবন্দীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মৌখিক উদ্যোগে আলোচনা শুরু হয়। বাংলাদেশ তখন স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রয়োজন ছিলো।

পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি এবং পাকিস্তানের মিত্র রাষ্ট্র চীনের প্রদত্ত ভেটোর কারণে বাংলাদেশ তখনো জাতিসংঘের সদস্যপদ ও লাভ করে নাই। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে চীন বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেয়ার ব্যাপারে আনা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভেটো দেয়। এটি ছিল চীনের জাতিসংঘে প্রদত্ত প্রথম ভেটো। (৬)

এই অবস্থায় ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৫০০ জন যুদ্ধাপরাধী থেকে ১৯৫ জনকে সুনির্দিষ্ট যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের উদ্যোগ নিল এবং জুলাই মাসে সংসদে "International Crimes Act 1973" পাশ করলো তখন পাকিস্তান এই বিচারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললো। (৭) পাকিস্তানের মতে এটি জেনেভা কনভেনশনের লংঘন কেননা বাংলাদেশ তখনো জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র নয়। জেনেভা কনভেনশনের আর্টিকেল ৫, ৬ অন্যায়ী বাংলাদেশের এই বিচার প্রক্রিয়ার উদ্যোগের কোন সমস্যা ছিলোনা। বাংলাদেশ পাকিস্তানের দাবি প্রত্যাখ্যন করে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের এই বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা পর্যবেক্ষণ করার আমন্ত্রণ জানায়। পাকিস্তান এই পরিস্থিতিতে পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে আটকেপড়া ৪০০,০০০ বাঙালীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিতে অধীকার করে। (৭)

পাকিস্তানের অবস্থান বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছন ফিরে তাকাতে হবে। ১৯৭২ এর ২ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয় যেটি "সিমলা চুক্তি" নামে পরিচিত। এই চুক্তি অন্যায়ী ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে সকল প্রকার যুদ্ধ-বিবাদ এবং আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করে দুইপক্ষের কাছেই আটককৃত যুদ্ধবন্দী ও আটকে পড়া নাগরিকদের বিনিয়য় কর্মসূচি চালুর

ব্যাপারে সম্মত হয়। (৮) উল্লেখ্য আটককৃত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের সিংহভাগ মুক্তিযুদ্ধের সময় আটক হলেও সিমলা চুক্তিতে বাংলাদেশ কোনো পক্ষ ছিলো না। এর প্রধান কারণ ছিলো পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে কোন প্রকার আলোচনায় রাজি ছিলো না। বাংলাদেশ সিমলা চুক্তিকে স্বাগত জানায় এবং যুদ্ধবন্দীদের রিপ্যাটিয়েশন চালু করার ব্যাপারে ভারতের কাছে সম্মতি প্রদান করে। (৯)

এরপর ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল ভারত এবং বাংলাদেশ এক যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে বিদ্যমান হিউম্যানিট্যারিয়ান ক্রাইসিস মোকাবেলায় একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করলো। যৌথ ঘোষণায় বলা হলো "they are resolved to continue their efforts to reduce tension, promote friendly and harmonious relationship in the sub-continent and work together towards the establishment of a durable peace". এই ঘোষণার মাধ্যমেই ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী ছাড়া বাদবাকি সকল যুদ্ধবন্দীর পাকিস্তানে রিপ্যাটিয়েশনের পথ উন্মুক্ত হলো। (৯, ১০)। একই দিন রেডিও বাংলাদেশের এক ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ ১৯৫ জনের বিচারের ব্যাপারে তাদের অনড় অবস্থান পুনর্ব্যুক্ত করলো। (১১)

বাংলাদেশ এই বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ করে এবং ভারত সেই প্রস্তাবে সম্মত জ্ঞাপন করে। এই অবস্থায় পাকিস্তান ভারত কর্তৃক পাকিস্তানী নাগরিক এই ১৯৫ জনকে বাংলাদেশ (যার সার্বভৌম অস্তিত্বে তখনো পাকিস্তান স্বীকার করেনা) হস্তান্তরের পরিকল্পনার প্রতিবাদ করে এবং আটকেপড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের পণবন্দী হিসাবে ব্যবহারের হুমকি দেয়। (৭)

এরপরও বাংলাদেশ বিচার প্রক্রিয়া চালাবার ব্যাপারে অনড় অবস্থানে থাকলে ১৯৭৩ সালের ১১ই মে পাকিস্তান এই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে (পাকিস্তানের ভাষায় যুদ্ধবন্দী) ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরের বিপক্ষে এবং এই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বিচার প্রক্রিয়া জেনেভা কনভেনশনের লংঘন উল্লেখ করে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে একটি মামলা দায়ের করে। মামলার নথি নম্বর ৪২৬। এই মামলার আর্জিতে পাকিস্তান সরকার হেগে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসের কাছে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করার নির্দেশ দান এবং বাংলাদেশে প্রস্তাবিত বিচার প্রক্রিয়াকে অবৈধ ঘোষণার দাবি জানায়। (১২)

এই আর্জিতে পাকিস্তান এই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর কর্তৃত দাবি করে তাদের আন্তর্জাতিক আদালতে নিরপেক্ষ ও যোগ্য বিচারকের মাধ্যমে একটি টাইবুন্যাল গঠনের প্রস্তাৱ দেয় এবং বাংলাদেশে গঠিত টাইবুনালের আইনগত ভিত্তি বাতিলের দাবি জানায়। মামলার মূল নথি থেকে "Pakistan does not accept that India has a right to transfer its prisoner of wars for trial to Bangladesh and claims that by virtue of Article VI of genocide convention, persons charged with genocide shall be tried by a Competent Tribunal of the state in the territory of which the act was committed. This means that Pakistan has exclusive jurisdiction to the custody of persons accused of the crimes of genocide, since at the time acts are alleged to have been committed, the territory of East Pakistan was universally recognised as part of Pakistan.

....That a competent tribunal means a Tribunal of impartial judges, applying international law, and permitting the accused to be defended by counsel of their choice. .... in the atmosphere of hatred that prevails in Bangladesh, such a competent tribunal cannot be created in practice...." (১১)

পাকিস্তান এই আর্জিতে সুকৌশলে যেটি এড়িয়ে যায় সেটি হলো ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ। এর ফলে যুদ্ধাপরাধ সংঘটন হবার স্থল পূর্ব-পাকিস্তান পাকিস্তানের অস্তর্ভূত এবং সেই স্বাবাদে সকল যুদ্ধবন্দীর কর্তৃত, পাকিস্তানের এই দাবির আইনগত ভিত্তি ছিল দুর্বল। অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল জাতিসংঘের তত্ত্বাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান না করা।

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস মামলাটি শুনান্তর জন্য গ্রহণ করে এবং ভারত-পাকিস্তান উভয় পক্ষকে তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রদান করার নির্দেশ দান করে। এই মামলাটি বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করিবার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও অনিচ্ছয়া সৃষ্টি করে। (১২)

পাকিস্তান এই মামলা করলেও ভারতের সাথে যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণের জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে এবং বিপরীতে

বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য টাইব্যুনাল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে। এর প্রাথমিক ধাপ হিসাবে সংসদে গৃহীত International Crimes Act 1973 বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশের নাগরিক ছাড়াও যে কোন দেশের নাগরিককে যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের ক্ষমতা প্রদান করে।

International Crimes Act এর মূল কপি থেকে

"It gives Bangladesh the power to try and punish any person irrespective of his nationality, who, being a member of any armed, defence or auxiliary forces commits or has committed, in the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the following crimes... namely crimes against humanity, crimes against peace, genocide, war crimes, violations of humanitarian rules applicable in armed conflicts laid down in the Geneva Convention of 1949 and any other crimes under international law." (১৩)

এর মাঝে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস ১৯৭৩ সালের ১৩ই জুলাই একটি সংক্ষিপ্ত সেশনে পাকিস্তানের দায়ের করা মামলাটি আদৌ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসের আওতার মধ্যে পড়ে কিনা তা নির্ধারণের জন্য পাকিস্তানকে ১ অক্টোবর ১৯৭৩ এবং ভারতকে তার জবাব দেবার জন্য ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। (১৪)

পাকিস্তান মামলাটি মূলত ভারতকে চাপে ফেলার জন্য করলেও মামলাটি চালাতে উৎসাহী ছিলো না। এর চাইতে তারা দ্বিপক্ষীয় আলোচনার দিকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। যদিও প্রকৃতপক্ষে আলোচনা হচ্ছিল ত্রিমুখী। ভারত আর পাকিস্তানের সাথে আলোচনার পাশাপাশি সেই আলোচনার সূত্র ধরে আলোচনা হচ্ছিল ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে।

অবশেষে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯ দিনব্যাপী আলোচনার পর বাংলাদেশের সম্মতিতে ২৮শে আগস্ট ১৯৭৩ দিনিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এই তিন দেশের মধ্যে যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণ ও আটকেপড়া নাগরিকদের বিনিময় অবিলম্বে শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। এই ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের সম্মুখীন করতে অনড় থাকে। (১৫)

এই চুক্তি মোতাবেক সকল যুদ্ধবন্দীর প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হবার পর বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান প্রথমবারের মত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর ভাগ্য নির্ধারণ করতে সম্মত হয়। এই বিষয়টি নিস্পত্তির আগ পর্যন্ত এই যুদ্ধাপরাধীরা ভারতের তত্ত্ববধানে থাকবে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ থেকে দিল্লি চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণ এবং আটকেপড়া নাগরিক বিনিময় শুরু হয়। (৯)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত একটি বড় মাপের আন্তর্জাতিক সংস্থায় রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ পান আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ন্যাম (নন এ্যালায়েপ্স মুভমেন্ট) সম্মেলনে।

## পাকিস্তান এই মামলা করলেও ভারতের সাথে যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণের জন্য আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে এবং বিপরীতে বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য টাইব্যুনাল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে

১৯৭৩ সালের ৫-৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলির সাথে বাংলাদেশের একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে প্রায় সকল মুসলিম দেশই ন্যাম এর সদস্যরাষ্ট্র তাই জাতিসংঘের সদস্য না হবার পরও বাংলাদেশকে ন্যাম এর সদস্যপদ প্রদান করা হয়। (১৬)

এই সম্মেলনে আরব নেতৃত্বনের সাথে শেখ মুজিবের ফলপ্রসূ আলোচনা হয় এবং আরব লীগ নেতৃত্বন্দি বাংলাদেশকে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট ও দেশ পুনর্গঠনে সর্বতোভাবে সহায়তার আশ্বাস দেয়। এরই সূত্র ধরে কুয়েত সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিকে চাঙ্গা করার জন্য বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ মজুদ রাখে। এই আলোচনা ও সহযোগিতার রেশ ধরেই ৭৩ পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আরব লীগ নেতৃত্বনের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। (১৭)

মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের নেতৃত্বে সৌদি আরবের রাজা ফয়সাল, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট

বুমেডিয়েনের সহযোগিতায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যার মূলে ছিল ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী যাদের বিচারে বাংলাদেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো এবং এজন্য তখনো পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। আর পাকিস্তানের মিত্র হিসাবে চীন বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে যোগদানে ভেটো প্রদান করছে। এর মধ্যে চীন পুনরায় জানিয়ে দেয়  
""After resolution of the war trials issue, Peking will recognise Dacca, and the way will be open for Bangladesh to be admitted to the United Nations" (১৮)।

এর মাঝে আন্তর্জাতিক আদালতে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী হস্তান্তর বিষয়ে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের মামলার সকল কাগজপত্র জমা দেবার তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ থেকে ১৭ই মে ১৯৭৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলেও যুদ্ধাপরাধী সমস্যা নিরসনে আরব লীগ নেতৃত্বনের নেওয়া উদ্যোগের ফলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক আদালতের রেজিস্ট্রারের কাছে একটি চিঠিতে পাকিস্তান মামলাটি আর না চালাবার সিদ্ধান্ত জানায় এবং মামলাটি আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারাধীন মামলার তালিকা থেকে বাদ দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস ১৫ ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ এক আদেশের মাধ্যমে, আদেশ নং - ৩৯৩, এই মামলাটি বাতিল ঘোষণা করে এবং তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। (১৮)

আন্তর্জাতিক আদালত থেকে পাকিস্তানের মামলাটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত আরব লীগ নেতৃত্বনের একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য বলে বিবেচিত হয় এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিদ্যমান সমস্যা ভারতের মধ্যস্থতা ব্যতীত সরাসরি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়। এবার আরব লীগ নেতৃত্বন পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগ করেন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করার জন্য। এর জবাবে জুলফিকার আলী ভূট্টো জানান যে বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করলেই কেবলমাত্র পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

এই কূটনৈতিক উদ্যোগ আরো গতি লাভ করে ১৯৭৪ সালের ২২-২৪শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশ তখনো ওআইসির সদস্য নয়। প্রায় সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও

(ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তান ব্যতীত), পাকিস্তানের আপত্তির কারণে বাংলাদেশের ওআইসির সদস্যপদ অনিচ্ছিতার মধ্যে পড়ে। এর মধ্যে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, সৌদি রাজা ফয়সাল এবং জর্ডানের রাজা হুসেইনের উদ্যোগে সাতটি মুসলিম দেশের প্রতিনিধি ঢাকা সফর করেন ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের উদ্যোগ থেকে সরে আসার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজি করাতে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিকভাবে কোন শর্তসাপেক্ষে পাকিস্তানের স্বীকৃতি গ্রহণে অস্বীকার করেন এবং এই বিষয়ে আরো আলোচনা প্রয়োজন বলে অভিমত দেন। এরপর এই প্রতিনিধিদল বৈঠক করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে। তারা সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান জানান এবং যুদ্ধাপরাধী সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশের ওআইসি সম্মেলনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। (১৯, ২১)

এর মধ্যে আরব লীগ নেতৃবৃন্দ লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ওআইসি শীর্ষসম্মেলনে যোগ দেবার জন্য বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগ করে কিন্তু পাকিস্তান স্বীকৃতি না দিলে ওআইসি সম্মেলনে যোগ না দেবার সীতিগত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ পুনরায় জানিয়ে দেয়। (২০)

এই অবস্থায় আরব লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে শেষ মুহর্তের আলোচনায় অনেকটা নাটকীয়ভাবে ১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। একই দিন ইরান এবং তুরস্ক ও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। (২১) তবে পাকিস্তান স্বীকৃতি দিলেও যুদ্ধাপরাধী সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে অস্বীকৃতি জানায়। এর মাধ্যমে পাকিস্তান আরব লীগ নেতৃবৃন্দের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় কৌশলগত কারণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েও চীনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে প্রক্রিয়া থেকে সরে না আসা পর্যন্ত জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার ব্যাপারটি আটকে রাখে।

২২ শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের স্বীকৃতি লাভ করার পর বাংলাদেশের একই দিন থেকে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ওআইসি শীর্ষসম্মেলনে যোগ দেয়াতে আর কোন বাধা থাকে না। এই অবস্থায় ২২শে ফেব্রুয়ারী সকালে কুরেতের আমীরের ভাই কুরেতের পরাষ্ঠমন্ত্রীর নেতৃত্বে মুসলিম দেশগুলোর একটি প্রতিনিধিদল একটি বিশেষ বিমানে করে ঢাকা আসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এসকর্ট করে লাহোরে নিয়ে যান ওআইসি শীর্ষসম্মেলনে যোগ দেবার জন্য। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পাকিস্তানে রাষ্ট্রবন্দী হিসাবে আটক শেখ মুজিবুর

রহমান এবার স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখেন। (২০)

লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আনোয়ার সাদাত, সৌদি আরবের রাজা ফয়সাল এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর মাঝে পাকিস্তান লাহোর সম্মেলনে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর মুক্তির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রস্তাৱ পেশ করে এবং এর সম্পর্কে কূটনৈতিক তৎপৰতা শুরু করে। (১৯, ২২) লাহোর সম্মেলনে পাকিস্তানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে আরব লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর মুক্তির ব্যাপারে মীতিগতভাবে সম্মত হয় এবং এ ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা শুরু করে। এর রেশ ধরে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান

## ইতিহাসের ঘৃণ্যতম যুদ্ধাপরাধ সংঘটন করার পরও, তাদের বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় আইন থাকা সত্ত্বেও এবং সকল প্রমাণাদি থাকার পরও মুক্তি পেয়ে গেল ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী

এবং জুলফিকার আলী ভূট্টোর মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শেখ মুজিব ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে তার অনড় অবস্থান থেকে সরে আসার প্রতিশুতু প্রদান করেন এবং দেশে ফিরে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার কথা জানান। আনোয়ার সাদাতের এই উদ্যোগ এর সাফল্য নিয়ে ১৯৭৪ সালের ১১ই মে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে যার টাইটেল ছিলো "The Return of the Magician"। টাইম থেকে উদ্ধৃতি "In the most dramatic event of the summit, however, Sadat was able to reconcile Pakistan's Premier Zulfikar Ali Bhutto and Bangladesh Premier Sheik Mujibur Rahman, who have been enemies since Bangladesh split off from Pakistan two years ago. Bhutto solemnly recognized the independence of Pakistan's former east wing, while Sheik Mujib hinted that he will no longer press wartime atrocity

charges against 195 Pakistani officers held prisoner in India. Mujib promised also to do "my bit" to reconcile Pakistan and India, a task that would tax even Henry Kissinger." (২৩)

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিশুতুকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য লাহোর সম্মেলনের পরপরই একটি সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে আসেন আনোয়ার সাদাত এবং আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হউরি বুমেদিন (Houri Boummedine)। কয়েক ঘণ্টার এই সফরে তারা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীদের বিবরণে চার্জ প্রত্যাহারের পুনরায় প্রতিশুতু লাভ করেন। এর বিনিময়ে তারা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেবার প্রতিশুতু দেন। বাংলাদেশে তখন চৰম অর্থনৈতিক মন্দা ও দুর্ভিক্ষা বস্তা চলছে। এর একটি বড় কারণ ছিলো ১৯৭৩ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর থেকে যুদ্ধবিধবস্ত বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘের চলমান United Nations Relief Organization in Bangladesh (UNROB) কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া। (১৯, ২৪)

আরব লীগ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দকে প্রতিশুতু দিলেও বাংলাদেশের পক্ষে তখন মিত্র দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের সম্মতি ব্যতীত এত বড় একটি প্রধান সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন ছিল। এই অবস্থায় শেখ মুজিব চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মক্ষে যান ১৯৭৪ এর মার্চ মাসে। সেখানে দুই সপ্তাহ অবস্থান করে চিকিৎসাকালীন সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রিন সিগন্যাল পাবার পর তিনি সম্মতি পাবার পর তিনি দেশে ফেরেন। মক্ষে থেকে ফিরে একটি সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি দিল্লি যান। (২) এই ব্যাপারে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শের জন্য। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাপত্তির পর, শেখ মুজিবুর রহমানের ওআইসি সম্মেলনে এবং আরব লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে করা প্রতিশুতু পূরণে আর কোন বাধা থাকে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু যেই কাজটি করেননি সেটি হলো বাংলাদেশের মানুষের মতামত নেয়া এবং এই ব্যাপারে সংস্দেও কোন বিল উত্থাপিত হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান সমস্যাগুলিকে সমধানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ৫ই এপ্রিল থেকে নয়াদিল্লিতে এই তিনি দেশের পররাষ্ঠমন্ত্রীদের বৈঠকে শুরু হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন পররাষ্ঠমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পক্ষে শরণ সিং এবং পাকিস্তানের পক্ষে আজিজ আহমেদ। ৫ দিন ব্যাপী আলাপ

আলোচনা চলার পর ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেটি "TRIPARTITE AGREEMENT" নামে বেশি পরিচিত। এই চুক্তিতে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারটি নিষ্পত্তির পাশাপাশি এই তিনি দেশে আটকে পড়া নাগরিকদের প্রত্যর্পণের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয়।

এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে আনা সকল চার্জ "as an act of clemency" বা "দয়াশীলতা ও ক্ষমার মহত্ব" দেখিয়ে প্রত্যাহার করে নেয়। মূল চুক্তি থেকে উদ্ভৃতি "In the light of the foregoing and, in particular, having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past, the Foreign Minister of Bangladesh stated that the Government of Bangladesh has decided not to proceed with the trials as an act of clemency. It was agreed that the 195 prisoners of war may be repatriated to Pakistan along with the other prisoners of war now in process of repatriation under the Delhi Agreement." (৯)

এর বিপরীতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কৃত যুদ্ধাপরাধের জন্য বাংলাদেশের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন যার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারটিকে স্থীকার করে নেয়া হয় যেটি পাকিস্তান সরকার অস্বীকার করে আসছিলো। আবারো মূল চুক্তি থেকে উদ্ভৃতি "The Minister of State for Defense and Foreign Affairs of the Government of Pakistan said that his Government condemned and deeply regretted any crimes that may have been committed"। বৈঠকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যকার বিরাজমান একটি কষ্টদায়ক অধ্যায়ের সমাপ্তির মূল কৃতিত্ব প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। (In a magnanimous gesture, Pakistan's Foreign Minister Ahmed gave chief credit for bringing an end to a "painful chapter" in South Asia's history to Bangladesh's Prime Minister Sheik Mujibur Rahman.) (২)

এভাবেই ইতিহাসের ঘৃণ্যতম যুদ্ধাপরাধ সংঘটন করার পরও, তাদের বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় আইন থাকা সত্ত্বেও এবং সকল প্রমাণাদি থাকার পরও মুক্তি পেয়ে গেল ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী। ১৯৭৪ এর ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে সকল যুদ্ধাপরাধী ভারত থেকে পাকিস্তানে ফেরত গেল।

দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিশেষ করে যারা মুক্তিযুদ্ধে প্রিয়জন হারিয়েছেন এবং সুরক্ষিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের কাছে এই ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমার বিষয়টি ব্যাপক হতাশা ও নেতৃত্বাচক প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠি করে। বিশেষ করে তৎকলীন বামপন্থী সংগঠনগুলি এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে। (২৫)

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে উপজীব্য করে টাইম ম্যাগাজিন ১৯৭৪ সালের ২২ শে এপ্রিল "End of a Bad Dream" নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে লাহোর সম্মেলনের পরে এই চুক্তিটিকে একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করলেও বাংলাদেশের ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে চার্জ প্রত্যাহারকে একটি বড় ছাড় হিসাবে উল্লেখ করা হয়। একই রিপোর্টে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংকে উদ্ভৃত করে লেখা হয় "The trials, tribulations and conflicts of our subcontinent will become a thing of the past—something of a bad dream that is best forgotten."। (২)

কিন্তু আসলেই কি আমরা এই bad dream কে ভুলতে পেরেছি নাকি ভোলা উচিত? মুক্তিযুদ্ধে শহীদ লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী, ধর্ষিত ও নির্যাতিত হাজার হাজার মা বোন, তোমরা আমাদের ক্ষমা করো। আমরা সহজেই অনেক কিছুই ভুলে যাই। তোমাদের উপর করা পাশবিক বীভৎসতার বিচার আমরা করতে পারিন। তোমাদের এই অর্থৰ সন্তানদের ক্ষমা করো।

## তথ্যসূত্র

1. <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/91.htm>
2. End of a Bad Dream, Time, Monday April 22, 1974
3. en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani\_War\_of\_1971
4. Time, Monday September 17, 1973
5. Bangladesh in 1972: Nation Building in a New State Rounaq Jahan, Asian Survey, Vol. 13, No. 2 (Feb., 1973), pp. 199-210
6. China, the Soviet Union, and the Subcontinental Balance Sheldon W. Simon, Asian Survey, Vol. 13, No. 7 (Jul., 1973), pp. 647-658
7. The weakness in the International Protection of Minority Rights, Javaid Rahman, Kluwer Law International, Page 96-97
8. সিমলা চুক্তি, এখানে দেখুন এবং আরো একটি লিংক
9. Tripartite Agreement between India, Bangladesh and Pakistan for normalisation of relations in the subcontinent. New Delhi, April 9, 1974.
10. AHMED, Ziauddin. The case of Bangladesh : bringing to trial the perpetrators of the 1971. genocide. Page 103
11. International court of Justice, Proceedings of Trial of Pakistani Prisoners of War (India vs Pakistan)
12. International court of Justice, Trial of Pakistani Prisoners of War, Oral Arguments - Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from 4 to 26 June 1973
13. Act No.XIX of 1973 (published in the Bangladesh Gazette, Extra, on July 20, 1973): An Act to provide for the detention, prosecution and punishment of persons for genocide, crimes against humanity, war crimes and other crimes under international law.
14. International court of Justice, Trial of Pakistani Prisoners of War, Official Order of 15 December 1973, bw\_bs 393
15. Time, Monday September 17, 1973
16. The Non-aligned World, University of California, Page 396
17. Bengal and Bangladesh: Politics and Culture on the Golden Delta By Elliot Tepper, Glen Alexander Hayes, Page 101
18. The Observer, London, 24 February 1974
19. Asian Tribune, 9 August 2007
20. Bangladesh and the OIC, Syed Muazzem Ali, The Daily Star supplement, February 19, 2006
21. South Asia in World Politics By Devin T. Hagerty, page 73
22. The Economist, London, 2 March 1974
23. The Return of the Magician, Time, Monday, Mar. 11, 1974
24. Bangladesh in 1974: Economic Crisis and Political Polarization, Talukder Maniruzzaman
25. Asian Survey, Vol. 15, No. 2 (Feb., 1975), pp. 117-128
26. The Case of Bangladesh: Bringing to Trial the Perpetrators of the 1971 Genocide, Page no. 105-106

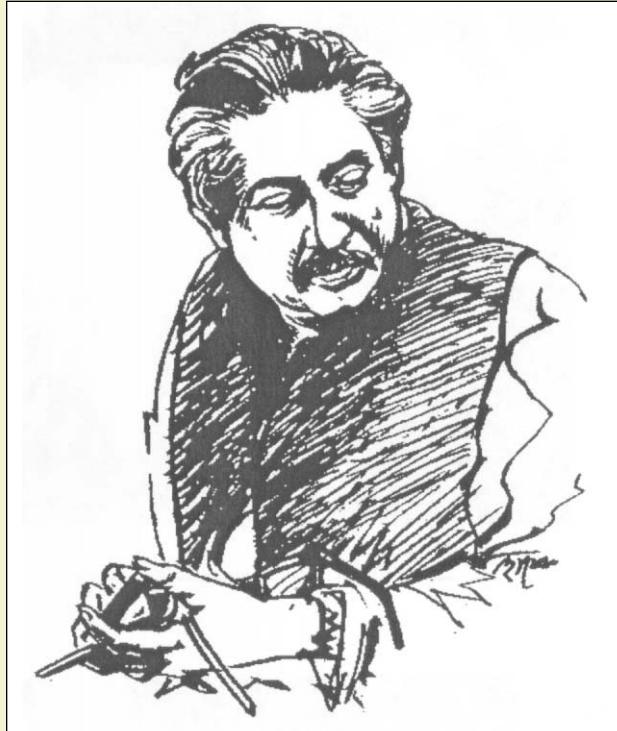
# দালাল আইন ও রাজাকারদের ক্ষমা : বঙ্গবন্ধুর কস্টলি ভুল

অমি রহমান পিয়াল

মুক্তিযুদ্ধের ৩৫ বছর পর আজ ফের রাজাকার ও তাদের সুযোগ্য উভরসূরীদের প্রতাপে কাঁপছে বাংলা। এতটাই যে ঘরের এক কোণে ঘাপটি মেরে থাকা চারাটা নিজের মতো করে বড় হয়ে আজ ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই ডালের আঘাতে বাড়ির দরজা-জানালা চূর্ণ, শেকড় চুকে পড়েছে ভিটেয়- ফাটল আজ দেয়ালে। বাঙালীর মুখ থেকেই তারা বলিয়ে নিতে চায় একান্তের তাদের ভুল হয়নি।

ভুলটা কার? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমানের। ফিদেল কাস্ত্রোকে অভিভূত করেছেন। কিউবার বিপ্লবী নেতা আলজিয়ার্সে তাকে জড়িয়ে বলেছিলেন, 'আপনাকে দেখি আর মুঝ্ব হই। আপনি জেলখোনায় বন্দী, আর আপনার নামে স্বাধীন হয়ে গেল একটা গোটা দেশ।' একান্তেরে ঠিক তাই হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরের সামরিক বিজয়ের পর পূর্ণাঙ্গ বিজয় হিসেবে বাঙালী মেনেছে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ কে। সেদিনই পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। যে স্মৃতি দেখিয়েছিলেন। তারই বাস্ত বায়নের প্রত্যয় শোনা গেল তার মুখে।

যুদ্ধের এবং লাশের স্তুপে ও গঙ্গে বিদীর্ণ এ বাংলায় তখন কোনো বিদেশী সাহায্য আসেনি ভারত ও রাশিয়া ছাড়া। এক ধরনের নিষেধাজ্ঞার ঘেরাটোপেই বন্দী থাকা। হাজার হোক মার্কিনদের চটানো যাবে না, চীনকেও না। আরব দেশগুলো আছেই। বাংলাদেশ তাদের কাছে স্বীকৃত নয়। কেন রাজাকারদের ক্ষমা করা হয়েছিল জানতে চাইলে অনেক ধরনের বিবৃতি পাওয়া গেছে তখনকার নেতাদের কাছ থেকে। কেউ বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি আর হত্যা চাননি। ভেবেছেন, এরা দেশেরই সন্তান- ক্ষমা পেলে ঠিক শুধরে যাবে। কুটুন্তিক বিশ্লেষণে গেছেন কেউবা। তখনও পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী আমাদের লাখো বাঙালী। সেনা অফিসার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও তাদের পরিজন। এদের ফিরিয়ে আনতে এই পদক্ষেপ। পাল্টা যুক্ত ছিল ১৬ হাজার বন্দী পাকিস্তানী আর্মির সঙে এই বিনিময় কেন হলো না? এইখানে ভারতের কূটনীতির কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। কারণ বন্দী পাকিদের তারা নিজেদের বন্দী বলেই মেনেছে, দরকষাকষিটাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। সেটার বিনিময়ে মুজিব যা করতে



পেরেছেন তা হলো মার্চের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে সর্বশেষ ভারতীয় সেনাটির প্রত্যাহার। গোটা বিশ্বকে অবাক করেই। এই কৃতিত্ব এবং শত সীমাবন্ধতাতেও তার ভুলটি ছিল ক্ষমার অযোগ্য ভুল। যার মূল্য এখন প্রতিদিন চুকোতে হচ্ছে আমাদের। হাসান আজিজুল হক ও জাফর ইকবালের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় বাঙালীকে আঙুল তুলে হৃষকি দেয়া হয় কেটে ভাসিয়ে দেওয়া। সবকিছুর মূলেই ওই যে সাধারণ ক্ষমা। ১৬ ডিসেম্বর '৭১। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় ঘাতক-দালালদের বাঁচানোর খেলা। রাজনীতি ব্যাপারটা কত জ্বল্য হতে পারে এবং শ্রেণী স্বার্থ, ব্যক্তিগত মোক্ষ ও লোভ কীভাবে আদর্শচ্যুত করে মানুষকে- এর প্রমাণ দিয়েছিলেন

তখনকার প্রভাবশালী বেশকিছু আওয়ামী লীগ নেতাই। মুজিবকে ঘিরে ছিলেন এরাই, এদের ধানাবাজি না রুঁবো তোষামোদিতেই তুষ্ট 'মুজিব ঠিকাছে ঠিকাছে' বলে সায় দিয়ে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ও ব্যাপক যুদ্ধে বাঙালীর হার শুরু তখন থেকেই। রেসকোর্সে পাকবাহিনী যখন আত্মসমর্পণ করছে, দেশে ফেরা আওয়ামী নেতাদের সঙ্গে তখন শীর্ষ দালালদের জবর বৈঠক ও দরকষাকষি। পরিস্থিতির কারণেই একমাত্র সমাধান ছিল গ্রেপ্তার ও কারাগার। ছবিটা অনেকটা এরকম। একজন ছিনতাইকারী অথবা খুনী প্রকাশ্যে হত্যার পর জনগণের হাতে ধরা পড়ল। সে ধোলাই খেল। পুলিশ তাকে উদ্ধার করল ও থানায় নিয়ে গেল। সেখান থেকে সে আরামে শিশ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। একান্তেও তাই ঘটেছিল। দালালরা তৎক্ষণিক আশ্রয় হিসেবে মানল কারাগারকেই। আওয়ামী প্রশাসনে প্রায় ১১ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল সে সময়, যাতে আবেদনকারী দালালরা আকৃতি জানিয়েছিল তাদের গ্রেপ্তার ও জেলে পুরতে। আর বিচারে শুরু হয় কালক্ষেপণ।

১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার মন্ত্রপরিষদ নিয়ে এক বৈঠকে গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। হাইকোর্টের কর্মরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কোনো বিচারপতি বা সমর্পযায়ের কোনো মনোনীত ব্যক্তির নেতৃত্বে কমিশন পাকবাহিনী ও তাদের দালালদের হাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মৌখিক ও লিখিত সাক্ষাত্কার নিয়ে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু রমনায় কেঁদেকেটে বললেন, বিশ্বকে মানব ইতিহাসের এই জ্বন্যতম হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক দল এই বর্বরতার তদন্ত করুক তাই আমার কামনা।' (দৈনিক বাংলা ১১ জানুয়ারি '৭২)। এরপর মিডিয়া এবং যে কোনো বজ্রবেই যে কোনো সাক্ষাত্কারেই আপোষহীন স্বরে জানিয়েছেন বাংলার মাটিতে দালালদের বিচার অনুষ্ঠানের প্রত্যয়ের কথা। সেদিনের জনসভার ভাসগেই ছিল, যারা দালালী করেছে, আমার শত শত দেশবাসীকে হত্যা করেছে, মা-বোনকে বেহজত করেছে, তাদের কী করে ক্ষমা করা যায়? তাদের কোনো অবস্থাতেই ক্ষমা করা

হবে না। বিচার করে তাদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।' এই দায়িত্ব তার সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে আবেদন জানান মুজিব, 'আমরা দেখিয়ে দিতে চাই শাস্তিপ্রিয় বাঙালীরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে জানে, তেমনি শাস্তি ও বজায় রাখতে জানে।' দুদিন পর আনন্দনিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেওয়ার পর একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে মুজিবের ভাষার শব্দ চ্যান। দালালদের বিরঞ্জে প্রতিশোধমূলক তৎপরতার বিরোধিতা শোনা যায় তার মুখে, 'লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কথা আমি শুনেছি, তবু বাংলার মানুষ এত নিচে নামবে না। বরং যা মানবিক তাই করবে, তবে অপরাধীদের আইনঅনুযায়ী বিচার অবশ্যই হবে।' (দৈনিক বাংলা ১৩ জানুয়ারি '৭২)। পরদিন আওয়ামী লীগ অফিসে দলের নেতাকর্মীদের প্রতিশোধ নেওয়ার পথ থেকে সরে আসার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'দালালদের অবশ্যই দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।'

এবং এ সময় তার প্রতিটি ভাষণ বিব্রতিতে ঘুরে ফিরে এসেছে কথাগুলো। এই বলছেন ক্ষমা করব না, এই বলছেন ওদের আইনি বিচার হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্যারেড গ্রাউন্ডে বলেন, 'যারা গণহত্যা করেছে, তারা সমগ্র মানবতার বিরঞ্জে অপরাধ করেছে, এদের ক্ষমা করলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না।' (দৈনিক বাংলা ৭ ফেব্রুয়ারি '৭২)। ২১ ফেব্রুয়ারি বলেন, 'বাংলার মাটিতেই খুনির বিচার হবে।' ৩০ মার্চ চট্টগ্রামে ঘাতকদের 'নমরং' বিশেষণ দিয়ে জনতার কাছে জানতে চাইলেন দালালদের ক্ষমা করা হবে কীন। সবাই হাত তুলে বলল 'না, না।' (পূর্বদেশ ৩১ মার্চ, '৭২)।

বিশেষ ইতিহাসে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যার স্বাধীনতার এক দশক না পেরে তেই এর শাসনভার চলে গেছে একান্তরের দালালদের হাতে। নয় মাসের দীর্ঘ যুদ্ধক্ষেত্রে সে অর্থে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাজ করেনি। কথিত আছে আওয়ামী লিগ নেতারা কলকাতায় গিয়ে ভারতীয় ভাতায় মৌজ ফুর্তি করেছেন। দেশে ফিরে এই মাবারিপাল্লার নেতারাই কেউকেটা হয়ে নতুন দালাল নিয়েছেন। সেই দালালিটা একান্তরের দালালদের বাঁচানোয় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালনের। মুজিব যখনই তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়েছেন, তখন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের দোহাই দিয়ে তাকে নমনীয় হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর স্টেডিয়ামে কাদের সিদ্ধিকীর দুর্ঘতিকারী মুক্তিযোদ্ধা হত্যার সরাসরি সম্প্রচার, দেশের বাইরে থাকা গোলাম আয়ম ও অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধীরা বাংলাদেশের নেতৃত্বাচক প্রচারণায় সফলভাবে ব্যবহার করে। এবং সেই যুক্তি দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরন্ত

## ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ সালে কুখ্যাত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৭ হাজার ৪৭১ জন অভিযুক্তের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছিল ২ হাজার ৮৪৮ জনের মামলা



একান্তরে রাজাকাদের ট্রেনিং

করা ও পাইকারী দালাল হত্যার মতো সিদ্ধান্তগুলো নিতে মুজিবকে প্ররোচিত করা হয়। এখানে বড় একটা ভূমিকা ছিল খন্দকার মোশতাক আহমেদের। আর অতুল এক কৌশলে নজরুল ইসলামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একটা দূরত্ব সৃষ্টি করা হচ্ছিল। যুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান নজরুল ইসলাম যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার আগেই অপরাধীদের শাস্তির ঘোষণা দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠনের সব আয়োজন সেবে ফেলেছেন, তখন তাতে নানান খুঁত বের করে তা পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। মুজিবের কথা ও কাজে যে পরিবর্তন আসছে তার প্রথম প্রমাণ মেলে '৭২ সালের মাবামাবি। ৬ মে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এবিসি)তে এক টিভি সাক্ষাত্কারে তিনি যুক্তাপর-ধীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদের বিচার করব, এ

ব্যাপারে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। যেখানে তারা ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে সেখানে কোনো দেশ কী তাদের ছেড়ে দিতে পারে?' একই সাক্ষাত্কারে একই প্রসঙ্গে আবার নমনীয় এবং ভিন্ন সুর মুজিবের, 'দালালদের কেসগুলো একটি তদন্ত কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হবে। আমরা তদন্ত করছি এবং নির্দোষ লোকদের ছেড়ে দিচ্ছি। অবশ্য যারা অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী তাদেরকে নিশ্চিতভাবেই দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।' (আজাদ, ১৫ মে '৭২)

শেখ মুজিব ও তার সতীর্থৰা যখন বক্তৃতাবাজি চালাচ্ছেন তখন অন্যদিকে চলছে দালালদের সুরক্ষার আয়োজন। চারদিক থেকে তখন সরব আওয়াজ উঠছে সংক্ষিপ্ত আদালত গঠন করে দ্রুত বিচারের। কিন্তু ২৪ জানুয়ারি সেসব দাবিকে উপেক্ষা করে জারি হলো 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ টাইবুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২'। অভিযুক্ত প্রমাণ হলে ২ বছর কারাবাস থেকে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড হলো শাস্তি। আসামিদের হাইকোর্টে আপিল করার সুযোগ থাকল, যদিও কেড়ে নেওয়া হলো অন্য কোনো আদালতে বিচার চাওয়ার অধিকার।

অনেক ফক্ষা গেঁড়ে। সবচেয়ে বড় ছিল ৭ম ধারাটি। বলা হয়েছে থানার ওসি যদি কোনো অপরাধকে অপরাধ না বলেন তবে অন্য কারো কথা বিশ্বাস করা হবে না, অন্য কারো অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করা হবে না এই টাইবুনালে। অন্য কোনো আদালতেও মামলা করা যাবে না। মামা বাড়ির আদ্দার যাকে বলে আর কী! দালাল যারা তাদের তো অচেল অর্থকড়ি। ওসি কিনতে আর কত লাগে? সেটা স্বজনহারানো শোকপীড়িত সবখোয়ানো দরিদ্র জনগণের ছিল না তো।

২৮ মার্চ নাগাদ মোট ৭৩টি এ ধরনের টাইবুনাল গঠিত হয়। সারাদেশের সমস্ত জেলা ছিল এর আওতায়। এবং অন্য কোনো আদালতের এতে নাক গলানোর অধিকার রইল না বিশেষ অধ্যাদেশে। এগ্রিম মাসে শুরু হলো বিচার। আর স্পষ্টই বোঝা গেল দালাল আইন দালাল ধরতে নয়, দালালদের বাঁচাতেই প্রগয়ন করা হয়েছে। ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ সালে কুখ্যাত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৭ হাজার ৪৭১ জন অভিযুক্তের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছিল ২ হাজার ৮৪৮ জনের মামলা। এদের মধ্যে দ্বাদশে পেয়েছে ৭৫২ জন, বাকি ২ হাজার ৯৬ জনকে দেওয়া হয় বেকসুর খালাস। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় মাত্র একজন রাজাকার।

তথ্যসূত্র : একান্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়

# যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও নানাবিধ যুক্তি : শিশুর সাথে আলাপচারিতা

আরিফ জেবতিক

: আবু, আজ যদি এই বিষয়ে কিছু বলতে। এই যে সবাই বলছে দেশে যুদ্ধাপরাধী নেই, এবং এদের ব্যাপারে আগ্রহী যে কেউ মামলা করতে পারবে, এই বিষয়ে একটু বুঝিয়ে দাও।

:: এ বিষয়ে কথা বলতে হলে, তোমাকে আগে কিছু প্রশ্ন করি। তুমি বলতো আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে কবে? আমাদের স্বাধীনতা দিবস কোনটি?

: আমরা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন হয়েছি। ২৬ মার্চই আমাদের স্বাধীনতা দিবস।

:: গুড়, তাহলে দেখ, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে। কিন্তু আমাদেরকে আরো ৯ মাস যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর মানে হলো, এই ৯ মাস যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, এরা বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধ করেছে। এরা বাংলাদেশের কেউ নয়, এরা বহিঃশত্রু। তাই যারা বাংলাদেশকে স্বীকার করবে, তারা বাংলাদেশের হোক, আর প্রথিবীর যেকোন দেশেরই হোক, তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে এই যুদ্ধটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ।

সুতরাং যারা এটাকে গৃহ্যযুদ্ধ বলে বিদ্রোহ করতে চাইছে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদেরকে শয়তানি তথ্য দিয়ে কনফিউজড করতে চাচ্ছে।

: মানলাম যে আমরা পাকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ করেছি, এবং এটি একটি যুদ্ধ ছিল, গৃহ্যযুদ্ধ নয়। তাহলে যারা বাঙালি হয়েও পাকিস্তানীদের সাথে থাকতে চাইছিল, তাদেরকে কেন যুদ্ধাপরাধী বলা হবে? তারা তো পাকিস্তানী আর্মি না। ইদানিং শুনছি বলা হচ্ছে যে রাজনৈতিক ভিন্নতার কারণে তাদেরকে হয়রানি আর বদনামের শিকার হতে হচ্ছে।

:: এটা আরেকটি শয়তানি কথা। দাঁড়াও, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যারা পাকিস্তানীদের সাথে থাকতে চাইছিল, এটা যুদ্ধাপরাধ না। কিন্তু তারা তো থাকতে চেয়ে চুপ করে বসে থাকেনি। তারা কিন্তু যুদ্ধ করেনি সরাসরি, তাদের সেই সাহস ছিল না। তারা যে কাজটি করেছিল এটি ভয়াবহ, এটি মর্মান্তিক।

তারা নিরীহ মানুষকে ধরে ধরে মেরে ফেলেছিল, তারা মানুষের ঘরবাড়ি লুটপাট করেছিল, তারা বিভিন্ন জায়গায় আস্তানা গাড়া মুক্তিযুদ্ধাদের খবর পাকিস্তানীদের কাছে পৌছে দিয়েছিল। এটা ছোটখাটো যুদ্ধাপরাধ না, নিরীহ মানুষকে খুন করা খুব বড়ো অপরাধ। তারা এই অপরাধে অপরাধী।

: ঠিক আছে, বুঝলাম এই কথাটিও। কিন্তু সরকার তো বলছেই যে এদের বিরুদ্ধে মামলা করে দিতে যে কাউকে। এমনকি ওরাও তো এই কথা বলছে।

:: যারা এটা বলছে, তারা খুব কৌশলে তাদের নষ্ট বিষয়টিকে স্টার্বিলিশ করছে। তোমাকে একটা উদাহরণ দেই। কয়েক বছর আগে, মাত্র দুই তিন বছর আগে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বোগে রাহেলা নামের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে তিনদিন ফেলে রেখে হত্যা করা হয়েছিল, এটা জানো?

: জানি।

:: অথচ দেখো, তার স্বামী কিন্তু একদিনও থানায় যায়নি বিচার দিতে বা মামলার খোঁজখবর নিতে। সে আরেকটি বিয়ে করে ফেলেছে। এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষের স্বভাব। তার খুবই সহজ সরল, তারা তাদের বিরুদ্ধে করা সব অবিচারের জন্য আল্লাহর কাছে বিচার দেয়, থানা পুলিশে যেতে ভয় পায় কারণ তারা এই সব প্যাচ বুঝে না। এখন রাহেলার ঘটনাটি মাত্র তিন বছর আগের, এখনে রাহেলার ডেথবেড সাক্ষী আছে, তবু এই মামলাটি তার পরিবার চালাতে আসেনি। এখন তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, ১৯৭১ সালের বেশির ভাগ বীভৎস হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ এগুলো হয়েছে গ্রামের দিকে। তখন যাতায়াত ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এগুলো আরো অনেক অনেক খোরাপ ছিল। তাই বিশ্বের সবার চোখ এড়িয়ে বেশিরভাগ ন্শংস হত্যাযজ্ঞ হয়েছে সাধারণ গৱীর মানুষের উপর। তাছাড়া, শহরে যেসব জায়গায় হয়েছে, সেই মানুষেরা শহরের সেই জায়গায় এখন নেই অনেকেই। এরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, এদের পক্ষে সাক্ষী জোগাড় করে আনা কঠিন, এক কথায় অসম্ভব প্রায়। তাই

সরকার জানে যে এই মামলাগুলো প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তখন মামলাগুলো থেকে বেকসুর খালাস পাবে রাজাকারণা, তারপর তারা বুক ফুলিয়ে চলবে। তাদেরকে আর যুদ্ধাপরাধী বলা যাবে না।

: তাহলে, কী আর করা? এদের শাস্তি হবে কিভাবে?

:: এখানেই তো পুরো শয়তানি। বিচার করতে হবে সরকারকে, মামলা করতে হবে সরকারকে, এটা তারা বলছে না। ধরো এই যে গ্রেনেড হামলা হলো এতোগুলো, এই যে বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াবা উদ্ধার হচ্ছে, এই মামলাগুলো কি মানুষ করেছে, তাহলে এদের ধরছে কেন?

: ধরছে, কারণ এটা করা সরকারের দায়িত্ব।

:: ঠিক, এটা সরকারের দায়িত্ব, কারণ সরকার তার জনগণের অভিভাবক। সরকারকে তো কেউ গ্রেনেড মারতে যায়নি, ইয়াবা খাওয়াতেও যায়নি, তবু সরকার মামলা করছে, অপরাধীদের শাস্তি দিচ্ছে, কারণ এগুলো করা হয়েছে দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে। এখানেই সরকারকে ফাঁশনাল ভূমিকা নিতে হয়। ১৯৭১ সালে যে জন্য গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট হয়েছে এগুলো হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে, তাই এর বিচার করার জন্য সাধারণ মানুষের মামলা করার দরকার নেই, এই মামলা সরকারকেই করতে হবে। কিন্তু সরকার এই দিকে যাচ্ছে না, তারা এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে।

: কিন্তু আবু, তুমই বলছো যে এখন সাক্ষী জোগাড় করা কষ্ট হবে, কারণ বিষয়টি ৩৭ বছরের পুরোনো।

:: এটারও পথ আছে। এখন করতে হবে টাইবুনাল। স্পেশাল টাইবুনাল করার নজির প্রথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশেই আছে। বিশেষ পরিস্থিতির জন্য বিশেষ বিচার। ধরো, আজকে ঢাকায় একটা খুন হয়েছে, একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলেছে। তখন এর সাক্ষীস্বীন নিয়ে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হবে, এই খুনের খবরটি পত্রিকায় এসেছে কিনা তা বড়ো হয়ে দেখা দেবে

না । কিন্তু এই দেশেই কিন্তু একটা অপশন আছে যেটির নাম "চাথঞ্চল্যকর অপরাধ সংক্রান্ত বিশেষ সেল" এর মানে সরকার স্বীকার করেছে যে কিছু অপরাধ মানুষের মনে বিশেষ চাথঞ্চল্য সৃষ্টি করে, এগুলোর বিচার দ্রুত করতে হবে । এগুলো সাধারণ মামলা নয় । ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, যখন সাধারণ মানুষ প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল, তখন তাদের পক্ষে নিখুঁত সাক্ষীসাবুদ জমা রাখা সম্ভব ছিল না । তাই পরিস্থিতি বিচার করে, কার্যকারণ বিচার করে বিচার করা যাবে, এটা স্বাভাবিক বিষয় বিশেষ পরিস্থিতিতে । তারপর এই মামলাগুলোর অনেকগুলোই সামরিক আইনে করা যাবে । স্বাধীনতা ঘোষণার পরে সব মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে, কারণ যুদ্ধের সামরিক নেতৃত্ব দিচ্ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী । তাই বিশেষ সামরিক আইনেও তাদের বিচারের বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে ।

কিন্তু আবু, অনেকে অন্য কথা বলছেন । তারা বলছেন যে দেশে এখন অনেক সমস্যা । দ্রব্যমূল্য হু হু করে বাড়ছে, নতুন কর্মসংস্থান নাই তাই বেকারত্বের হার বেড়ে চলছে, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসে বিপর্যয়, গণতন্ত্র পুনৰ্থিতিষ্ঠা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই সব জটিলতার মাঝে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করাটা কি আমাদের প্রায়োরিটি হওয়া উচিত, নাকি বর্তমান সময়ের অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলা করাটাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত?

শোনো, একটা কথা মনে রাখবে যে দুর্জনের ছলের অভাব নেই । এসব কথাবার্তা সেই ছলেরই একটা অংশ । তুমি যে সমস্যাগুলোর কথা বললে সেগুলোর সমাধান অবশ্যই দরকার । তবে রাষ্ট্র প্রায়োরিটি বলে কোন বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয় । প্রত্যেক অংশ প্রত্যেকে কাজ করবে । দ্রব্যমূল্য, বেকার সমস্যা এগুলো নিয়ে আদালত কাজ করে না । এমন নয় যে আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজে লাগিয়ে দিয়ে সেই সমস্যাগুলোতে কাজ করা যাবে না । আদালতের কাজ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা । দ্রব্যমূল্য বা বেকার সমস্যা হচ্ছে

অর্থনীতিবিদদের কাজ । অর্থনীতিবিদরা তাদের কাজ করে যাবেন, বিচার বিভাগ এবং টাইবুনাল তাদের কাজ করে যাবে । দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে কি দেশের কোর্টকাচার বন্ধ করে দেয়া হয় নাকি? কখনোই হয় না । কারণ প্রত্যেকের কাজই আলাদা । সুতরাং অন্যান্য সমস্যার সমাধান করার নামে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করাটা পেছনে চলে যেতে পারে না ।

বর্তমান সময়ে এই বিচার দাবী করাটা কি সৎ উদ্দেশ্যে হচ্ছে? অনেকেই মনে করতে পারেন যে এর পেছনে আওয়ামী লীগের ইন্দ্রন আছে । যেহেতু বিএনপি-জামাত জোট একটি শক্তিশালী জোট সুতরাং জামাতকে দুর্বল করে দিতে পারলে ভোটের রাজনীতিতে এই আওয়ামী লীগ সুবিধাজনক স্থানে চলে যাবে । এই কারণে দাবিগুলো তোলা হচ্ছে । আসলে আওয়ামী লীগের কোন ইচ্ছা নেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার ।

এই সন্দেহ করাটা অযৌক্তিক নয় । প্রতিপক্ষের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে সেটা থেকে ফায়দা উঠানো রাজনৈতিক চর্চার অংশ । এর একটা ভালো জবাব হতে পারে অবিলম্বে সব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করা । সেটা আওয়ামী লীগের নূরুল ইসলাম আর বিএনপির সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী আর জামাতের নিজামী মুজাহিদ, সবাইকেই এক টাইবুনালে আনা হোক । এতে করে এটা থেকে কেউ রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারবে না । তবে যুদ্ধাপরাধীদের বেশিরভাগই যেহেতু জামাতের সাথে জড়িত, তাই এই দলের জন্য এটা বেশি সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু এর জন্য তো বিচার থেমে থাকতে পারে না । আওয়ামী লীগের বা বিএনপির পক্ষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ শুরু করার ইচ্ছা নাও থাকতে পারে । সেখানে রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ আছে । বর্তমান সরকারের কিন্তু তেমন কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই বলে দাবী করছেন সরকারের সবাই । তাহলে বর্তমান সরকারের পক্ষেই এই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করাটা সহজ ।

২৩ মার্চ ২০০৮

## সিমলা চুক্তিতে যুদ্ধাপরাধ থেকে মুক্তির কথা নেই

শঙ্কুত হোসেন মাসুম

আলবদর নেতা আলী আহসান মুজাহিদ দাবি করেছে যে দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নাই । তার মতে, সিমলা চুক্তির মাধ্যমে সব যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং এ কারণেই দেশে আর কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই ।

সিমলা চুক্তিতে সহ হয় ১৯৭২ সালের ২ জুলাই । সহ করেছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ।

চুক্তির সম্পূর্ণ বিবরণ এখন ওয়েবসাইটেই পাওয়া যায় । যে কেউ দেখতে পারেন । সেখানে যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে একটি লাইনও নেই । কোথাও বলা নেই যে যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হবে বা বিচার হবে না । সে সময় ভারতের কাছে বন্দি ছিল ৯৩ হাজার যুদ্ধাপরাধী । এর মধ্যে ৮০ হাজার সামরিক এবং বাকিরা বেসামরিক ব্যক্তি । সবাইকে পাকিস্তান নিজ দেশে নিয়ে যায় । কোনো চুক্তির আওতায় না বরং ভারত তাদের ছেড়ে দিয়েছিল সৌহার্দের নির্দশন হিসাবে । ভারত যে পাকিস্তানের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক চায় তারই নির্দশন হিসাবে ভারত এই সৌহার্দ্য দেখায় । রাও ফরমান আলীর বইয়েও বলা আছে যে তারা বন্দি হিসাবে বাংলাদেশে থাকতে রাজী ছিলেন না । তাদের ধারণা ছিল মুক্তিবাহিনী তাদের মেরে ফেলবে ।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী আরও বলেছেন, বন্দি থাকার সময়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের জানায় যে ৯০ জন ব্যক্তির বিচার করতে চায় বাংলাদেশ । এই ৯০ জনের মধ্যে রাও ফরমান আলীও ছিলেন । ফরমান আলী সেসময় নিরপেক্ষ একটি দেশে বিচার চেয়েছিলেন । এ কথা পরিষ্কার যে নানা চাপে সে সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি । তা বলে এখনো যে করা যাবে না তা নয় । বিচার না করার কোনো চুক্তিও নেই ।

২৪ ডিসেম্বর ২০০৭

# যে আইনে ঘাতক-দালালদের এখনো বিচার সম্ভব

অমি রহমান পিয়াল

এই আইনটার কথা কেউ তোলে না। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এই আইনের কবচ নিয়েই লড়তে চেয়েছিলেন একান্তরের ঘাতক-দালাল ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে।

## ACT NO XIX OF 1973\*

An Act to provide for the detention, prosecution and punishment of persons for genocide, crimes against humanity, war crimes and other crimes under international law

(Published in the Bangladesh Gazette, Extra., on July 20, 1973)

Whereas It is expedient to provide for the detention, prosecution and punishment of persons for genocide, crimes against humanity, war crimes and other crimes under international law and for matters connected therewith;

It is hereby enacted as follows :-

1. Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called the International Crimes (Tribunals) Act 1973.
- (2) It extends to the whole of Bangladesh.
- (3) It shall come into force at once.

## 2. Definitions.

In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-:-

(a)

## 7. Prosecutors.

- (1) The Government may appoint one or more persons to conduct the prosecution before a Tribunal

on such terms and conditions as may be determined by the Government; and every such person shall be deemed to be a Prosecutor for the purpose of this Act.

(2) The Government may designate one of each such persons as the Chief Prosecutor.

## 8. Investigation.

(1) The Government may establish an Agency for the purpose of investigation into crimes specified in section 3; and any officer belonging to the Agency shall apply to such Prosecutor.

(2) Any person appointed as a Prosecutor is competent to act as an Investigation Officer and the provisions relating to investigation shall apply to such Prosecutor.

(3) Any Investigation Officer making an investigation under this Act may, by order in writing, require the attendance before himself of any person who appears to be acquainted with the circumstances of the case; and such person shall attend as so required.

(4) Any Investigation Officer making an investigation under this Act may examine orally any person who appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case.

(5) Such person shall be bound to answer all questions put to him by an Investigation Officer and shall not be excused from answering any question on the ground that the answer to such question will

criminate, or may tend directly or indirectly to criminate, such person;

Provided that no such answer, which a person shall be compelled to give, shall subject him to any arrest or prosecution, or be proved against him in any criminal proceeding.

(6) The Investigation Officer may reduce into writing any statement made to him in the course of examination under this section.

(7) Any person who fails to appear before an Investigation Officer for the purpose of examination or refuses to answer the questions put to him by such Investigation Officer shall be punished with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to taka two thousand, or both.

(8) Any Magistrate of the first class may take cognizance of an offence punishable under sub section (7) upon a complaint in writing by an Investigation Officer.

(9) Any investigation done into the crimes specified in section 3 shall be deemed to have been done under the provisions of this Act.

## 9. Commencement of the proceedings.

(1) The proceedings before a Tribunal shall commence upon the submission by the Chief Prosecutor, or a Prosecutor, authorised by the Chief Prosecutor in this behalf, of formal charges of crimes alleged to have been committed by each of

the accused person.

(2) The Tribunal shall thereafter fix a date for the trial of such accused person.

(3) the Chief Prosecutor shall, at least three weeks before the commencement of the trial, furnish to the Tribunal a list of witnesses intended to be produced along with the recorded statement of such witnesses for copies thereof and copies of documents which the prosecution intends to rely upon in support of such charges.

(4) The submission of a list of witnesses and documents under sub-section

(3) shall not preclude the prosecution from calling, with the permission of the Tribunal, additional witnesses or tendering any further evidence at any stage of the trial:

Provided that notice shall be given to the defence of the additional witnesses intended to be called or additional evidence sought to be tendered by the prosecution.

(5) A list of witnesses for the defence. If any, along with the documents or copies thereof, which the defence intends to rely upon, shall be furnished to the Tribunal and the prosecution at the time of the commencement of the trial.

#### 10. Procedure of trial.

(1) The following procedure shall be followed at a trial before a Tribunal, namely:-

(a) the charge shall be read out;

(b) the Tribunal shall ask each accused person whether he pleads guilty or not-guilty;

(c) if the accused person pleads guilty the Tribunal shall record the plea, and may, in its discretion con-

vict him thereon;

(d) the prosecution shall make an opening statement;

(e) the witnesses for the prosecution shall be examined, the defence may cross-examine such witnesses and the prosecution may re-examine them;

(f) the witnesses for the defence, if any, shall be examined, the prosecution



may cross-examine such witnesses and the defence may re-examine them;

(g) the Tribunal may, in its discretion, permit the party which calls a witness to put any question to him which might be put in cross-examination by the adverse party;

(h) the Tribunal may, in order to discover or obtain proof of relevant facts, ask any witness any question it pleases, in any form and at any time about any fact; and may order production of any document or thing or summon any witness, and neither the prosecution nor the defence shall be entitled either to make any objection to any such question or order or, without the leave of the Tribunal, to cross examine any witness upon any answer given in reply to any such question;

(i) the prosecution shall first sum up its case, and thereafter the defence shall sum up its case:

Provided that if any witness is examined by the defence, the prosecution shall have the right to sum up its case after the defence has done so;

(j) the Tribunal shall deliver its judgement and pronounce its verdict.

(2) All proceedings before the Tribunal shall be in English.

(3) Any accused person or witness who is unable to express himself in, or does not understand, English may be provided the assistance of an interpreter.

(4) The proceedings of the Tribunal shall be in public:

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, take proceedings in camera.

(5) No oath shall be administered to any accused person.

## 11. Powers of Tribunal.

### (1) A Tribunal shall have power-

- (a) to summon witnesses to the trial and to require their attendance and testimony and to put questions to them;
- (b) to administer oaths to witnesses;
- (c) to require the production of document and other evidentiary material;
- (d) to appoint persons for carrying out any time designated by the Tribunal.

(2) For the purpose of enabling any accused person to explain any circumstances appearing to the evidence against him, a Tribunal may, at any time of the trial without previously warning the accused person, put such questions to him as the Tribunal considers necessary:

Provided that the accused person shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers to them; but the Tribunal may draw such inference from such refusal or answers as it thinks just.

### (3) A Tribunal shall-

- (a) confine the trial to an expeditious hearing of the issue raised by the charges;
- (b) take measures to prevent any action which may cause unreasonable delay and rule out irrelevant issues and statements.

(4) A Tribunal may punish any person who obstructs or abuses its process or disobeys any of its orders or directions, or does anything which tends to prejudice the case of a party before it, or tends to bring it or any of its members to hatred or

contempt, or does anything which constitutes contempt of the Tribunal, with simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to Taka five thousand, or with both.

(5) Any member of the Tribunal shall have power to direct, or issue a warrant for, the arrest of, and to commit custody, and to authorise the continued detention in custody of, any person charged with any crime specified in section 3.

(6) The Chairman of a Tribunal may make such administrative arrangements as he considers necessary for the performance of the functions of the tribunal under this act.

## 12. Provision for defence counsel.

Where an accused person is not represented by counsel the Tribunal may, at any stage of the case, direct that a counsel shall be engaged at the expense of the Government to defend the accused person or may also determine the fees to be paid to such counsel.

## 13. Restriction of adjournment.

No trial before a Tribunal shall be adjourned for any purpose unless the Tribunal is of the opinion that the adjournment is in the interest of the justice.

## 14. Statement or confession of accused persons.

(1) Any magistrate of the first class may record any statement or confession made to him by an accused at anytime in the course of investigation or at anytime before the commencement of the trial.

(2) The Magistrate shall, before recording any such confession, explain to the accused person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him and no magistrate shall record any such con-

fession unless upon questioning the accused making it, he has reason to believe that it was made voluntarily.

## 15. Pardon of an approver.

(1) At any stage of the trial, a Tribunal may with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to any of the crimes specified in section 3, tender a pardon to such person on condition of his making a full and close disclosure of the whole and the true circumstances within his knowledge relative to the crime and for every other person concerned whether as principal or abettor, in the commission thereof.

(2) Every person accepting the tender under this section shall be examined as a witness in the trial.

(3) Such person shall be detained in custody until the termination of the trial.

## 16. Charge, etc.

(1) Every charge against an accused person shall state-

(a) the name and particulars of the accused person;

(b) the crime of which the accused person is charged;

(c) such particulars of the alleged crime as are reasonably sufficient to give the accused person notice of the matter with which he is charged.

(2) A copy of the formal charge and the copy of the documents lodged with the formal charge shall be furnished to the accused person at a reasonable time before the trial; and in case of any difficulty in furnishing copies of the documents, reasonable opportunity for inspection shall be given to the

accused person in such manner as the Tribunal may decide.

#### 17. Right of the accused person during trial.

(1) During trial of an accused person he shall have the right to give any explanation relevant to the charge made against him.

(2) An accused person shall have the right to conduct his own defence before the Tribunal or to have the assistance of counsel.

(3) An accused person shall have the right to present evidence at the Trial to support his defence, and to cross-examine any witness called by the prosecution.

#### 18. No excuse from answering any question.

A witness shall not be excused from answering any question put to him on the ground, that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly will criminate such witness, or that it will expose or tend to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind.

Provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding, except a prosecution for giving false evidence.

#### 19. Rules of evidence.

(1) A Tribunal not be bound by technical rules of evidence; and it shall adopt and apply to the greatest possible extent expeditious and non-technical procedure, and may admit any evidence, including reports and photographs published in newspapers, periodicals and magazines, films and taperecordings and other materials as may be tendered before

it, which it deems to have probative value.

(2) A Tribunal may receive in evidence any statement recorded by a Magistrate or an Investigation Officer being a statement made by any person who, at the time of the trial, is dead or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which the Tribunal considers unreasonable.

(3) A Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof.

(4) A Tribunal shall take judicial notice of official governmental documents and reports of the United Nations and its subsidiary agencies or other International bodies including non-governmental organisation.

#### 20. Judgement and Sentence

(1) The Judgement of a Tribunal as to the guilt or the innocence of any accused person shall give the reasons on which it is based :

Provided that each member of the Tribunal shall be competent to deliver a judgement of his own.

(2) Upon conviction of an accused person, the Tribunal shall award sentence of death or such other punishment proportionate to the gravity of the crime as appears to the Tribunal to be just and proper.

(3) The sentence awarded under this Act shall be carried out in accordance with the orders of the Government.

#### 21. Right to appeal.

A person convicted of any crime specified in section 3 and sentenced by a Tribunal shall have the right

to appeal to the Appellate division of the Supreme Court of Bangladesh against such conviction and sentence :

Provided that such appeal may be preferred within sixty days of date of order of conviction and sentence.

#### 22. Rules of procedure.

Subject to the provision of this Act, a Tribunal may regulate its own procedure.

#### 23. Certain laws not to apply.

The provisions of the Criminal Procedure Code 1898 (V of 1898) and the Evidence Act 1872 (I of 1872) shall not apply in any proceedings under this Act.

#### 24. Bar of Jurisdiction.

No order, Judgement or sentence of a Tribunal shall be called in question in any manner whatsoever in or before any Court or other Authority in any legal proceedings whatsoever except in the manner provided in section 21.

#### 25. Indemnity.

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any person or anything in good faith, done or purporting to have been done under the Act.

#### 26. Provisions of the Act over-riding all other laws.

The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

# পশ্চিমা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আর যুদ্ধাপরাধের বিচার বিষয়ক কিছু ভাবনা

## জামাল ভাস্কর

শাসক শ্রেণীর মৌনতা আমারে অসহায় করে। শাসক শ্রেণীর প্রগল্ভতা আমারে ভাবায়। শাসকশ্রেণীর প্রতিশুতিবান হওনের আচরণ আমারে সন্দিহান করে। শাসক শ্রেণীর উপর আস্তাশীল হইতে পারি বাস্তবায়নেই...যদিও বাস্তবায়নেও দূরভিসন্ধি থাকে। পুঁজিতন্ত্রের ফিল্ডম কেন্দ্রিক যেই ধারণা তারে নিয়া আমার দোলাচল আছে...পুঁজিতন্ত্রের ফিল্ডম ধারণার উন্নত কাল হইতে বিবেচনা করবার গেলেই বুবান যায় তার অস্তর্নিহিত উৎসের ধারা। যার আসলে খুব বেশি জটিলতা নাই, অতীব সরল এই কোশলেই তারা তাগো উদ্দেশ্য হাসিল করবার পারছে। বিশ্ব ব্যবস্থায় যখন প্রতিযোগিতা ছিলো, বিশ্ব ব্যবস্থায় যখন মুক্তির অর্থ নির্ধারনের দর্শনিক বিতর্ক ছিলো তখন থেইকাই পুঁজিতন্ত্রিক ফিল্ডমের ধারণা আসে...এই ফিল্ডম ব্যক্তির, একান্ত ব্যক্তির মুক্তি বিষয়ক ধারণা।

মানুষের আল্টিমেট মুক্তির কথা নিয়া আসলে ভাবছিলেন কার্ল মার্ক্স, আর এই মুক্তির ধারণা আসছিলো দ্বিদিক জগতের স্বাভাবিকতা থেইকা। মানুষ আসলে মানুষের সাথেই দ্বিদিকতার সম্পর্কের বন্ধনে থাকে বইলা তাগো মধ্যে বৈষম্যমূলক সম্পর্কের ধারণা বিদ্যমান থাকে আর এই বৈষম্য মানুষের-সমাজের সকল আচরণে সকল প্রকাশে বিচ্ছুরিত হয়, প্রতিফলিত হয়। আর এই বৈষম্য থাকে কারণ সমাজে ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা থাকে, সমাজে মূল্যবোধ কেন্দ্রিক একরম শ্রেণী কর্তৃক মান নির্ধারণী খেলা থাকে। শ্রেণী-শাসিত, শ্রেণীবিভাজিত সমাজে শাসক শ্রেণীর মানইতো সকলের মান হইবো...এইটাই স্বাভাবিক। অহেতুক বাগাড়বৰ হয় আমার এতোক্ষণ কওয়া কথাগুলি। কার্ল মার্ক্স এবং এঙ্গেলস সাহেবৰা একটা সংগ্রামের ধারণা দিছিলেন এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থেইকা উত্তরণের। যার ধারাবাহিকতায় বিশ্বে সমাজতন্ত্রিক আন্দোলনে আস্তাশীল হইয়া উঠেছিলো অনেক বিপ্লবী মানুষ, যার ভিত্তিতে প্রথিবীর একটা বড় অংশ পুঁজিতন্ত্রিক বিশ্বের বাজার ব্যবস্থার লেইগা ভূমিক্ষেত্র সামনে আসতে শুরু করলো।

আর যেই কারণে মানুষের এই সংগ্রামকালীন সময়ের যা কিছু

নেতিবাচকতা তার বিরুদ্ধে প্রচারণায় গেলো পুঁজিতন্ত্রের ধারকেরা। মূলত সমাজতন্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আর সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা, দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী মানসিকতার বিদ্যমানতা নিয়া মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতামূলক মতাদর্শিক স্বাধীনতা...এইসব বিষয়ের তারা সামনে নিয়া আসলো। পাশাত্যের পুঁজিতন্ত্রিকতায় এই স্বাধীনতার সর্বোকৃষ্ট প্রকাশ সম্ভব, এই প্রচারণায় নামলো তারা। স্বাধীনতা হইলো তাগো রাষ্ট্রনির্তির সবচাইতে চিন্তাকর্ষক বেচাবিক্রির পয়েন্ট। বেচাবিক্রির এই প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের সকল সমস্যায় তারা ছিলো সর্বদা সচেষ্ট...যেই কারণে প্রতি দশক পরপর তারা অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হইছে। ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকনে তারা সেই মন্দা সময় কাটাইছে অথবা প্রচারণার মায়া জাল তৈরি করছে। কিন্তু তবুও নববই দশক পর্যন্ত তারা বাধ্য ছিলো এই স্বাধীনতাকামী মতাদর্শ(?)'এর প্রচারণায়।

নববই পরবর্তী সময়ে তাগো মত প্রকাশের এই সংগ্রামে নতুন মাত্রা আসলো। নিজেগো তৈরী করা ধর্মীয় বিদ্রোহী অবস্থান ধীরে ধীরে খোলস অবমুক্ত করলো। ধর্মের সামনে আনছিলো তারা একটা অপিনিয়ন হিসাবেই। ধর্মের তারা দাঁড় করাইছিলো সমাজতন্ত্রিক রাষ্ট্র সংগ্রামের বিপরীতে...আর সেই ধর্মই তাগো সামনে আরেকটা মত হিসাবে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নিয়া দাঁড়াইয়া গেলো, তাগো চৈতন্য ভাঙে। তারা বুঝে মতপ্রকাশের সকল ফিল্ডম আসলে জুইতের হয় না।

তয় ফিল্ডমের যেই ধারণা পশ্চিমে শুরু হইলো, সেইটার বিস্তৃতি ঘটেছে বাজার সম্প্রসারণের মতোই। সকল অপিনিয়নের প্রকাশ বাঞ্ছনীয় কইয়া তারা আসলে স্টেইটমেন্টের বাজার তৈরি করছে, যেই স্টেইটমেন্টের সারবত্তা নাই, যৌক্তিক কোন প্রেমিজ নাই...কিন্তু যেহেতু তারা একরম আঝ্টা স্বাধীনতার মতাদর্শের সামনে আনতে চাইছে...তাই সবকিছুরই একটা বাজারমূল্য স্থাপিত করতে তারা পারসম হইছে। তারা জাতীয়তা বিসর্জন দেওনেরও চেষ্টা করছে...কিন্তু সক্ষম হয় নাই...তারা আধিপত্যবাদের

বিরুদ্ধে বক্তব্য সামনে আসতে দিছে...কিন্তু নিজেরা আধিপত্যকামী মানসিকতা থেইকা কখনো সইরা আসে নাই। ধীরে ধীরে তারা ব্যক্তির স্বাধীনতার তত্ত্ব বেইচা পরিবার প্রথারে হৃষিকীতে ফালাইছে। এতসব কিছুর প্রচার আসলেই যেই কারনে ঘটেছে সেইটা খুব সাধারণ...ভোক্তার সংখ্যা বাড়ে...

পশ্চিমের বুনিয়াদি পুঁজিতন্ত্রিকতায় তা'ও এই ফিল্ডমের চৰ্চা চালাইতে তারা সক্ষম হইছে। ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অনিচ্যতার প্রসঙ্গ সেইখানে প্রধান হইয়া উঠে নাই। ব্যক্তি সেইখানে ব্যক্তিগত অভিযোগীর প্রশ্নে তাই একেরে ব্যক্তিগত ধারণারেই লালন করতে পারছে অনেক ক্ষেত্রেই। যদিও প্রত্যেক মহামন্দার কালেই তারা যখন আবার নিয়ন্ত্রণ করতে গেছে, তখন আবার ছোট ছোট নেরাজ্যবাদী গোষ্ঠী সামনে চইলা আসছে তাগো শিল্প-সাহিত্য-জীবন যাপনের ধরণের কারনে। এই নেরাজ্য নেতিবাচক অর্থে না...পরিবর্তনের অর্থেই তারা নেরাজ্যের চৰ্চা করছে। কিন্তু উপনিবেশিকতা উত্তর কালে উপনিবেশগুলি যখন জাতি রাষ্ট্র হইছে তখন সেইখানে পশ্চিমা এই ফিল্ডম আসছে বাজারী পণ্যের সাথে...পছন্দ আর উপযোগিতাকেন্দ্রীক এই ধারণার প্রচারণা হইছে...আসলে এখনো হইতাছে।

আর এই ফিল্ডম চৰ্চার ধারাবাহিকতায় এই দেশেও জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন জীবনদাশের প্রসারও স্থলভাবে শুরু হইলো। এই দেশে সমাজতন্ত্রীগো অতীত ভূমিকার লেইগা, সকল সংগ্রামে আপোষহীন ভূমিকার লেইগা দেশের সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে এই বাজারী ফিল্ডমের চৰ্চা কম হইছে। তয় নববইয়ের সোভিয়েত বিপর্যয়ের পর স্বায়ত্ত্বমুক্ত, মুক্তবাজারের শোগানময় পরিবেশে এই অঞ্চলেও ফিল্ডমের এই আঝ্টা ফরম্যাটের প্রসার ঘটে। কিন্তু পশ্চিমের মতোন নিশ্চয়তার জীবনতো নাই এই দেশের তরুণ সমাজের...তাগো ভাবনা আর কল্পনায়ও লাগাম পরাইতে হয়...ইতিহাসে যেহেতু বিপ্লবের গন্ধ, তাই ইতিহাস পঠনের দারিদ্র্যের মহার্ঘ্য করা হইলো এই এই ফিল্ডমে। যার পথ ধইরা আবার বিকশিত হওনের সুযোগ পাইলো

হিপি মানসিকতা, স্থীকার করতে কুঠা নাই সেই জীবনের চর্চা আমি নিজেও করছি।

নবরহিয়ের পর ফিল্ড অফ এক্সপ্রেশন-স্পিচ আর অপিনিয়নের বিষয়গুলি অনেক প্রিমিন্যান্ট হইলেও, এই ধারণার যথেচ্ছাচার আর সামাজিক মূল্যবোধের কথিত এতিহাসিক মাহাত্মা নিয়া ধর্মও হইলো আরেকটা অবস্থান...যার সাথে পরিবর্তনকারী-শ্রেণীহীন সমাজের স্ফপ্ত, বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনা আর মননের প্রবল বিরোধ থাকলেও এই ফিল্ডমের কেরম জানি যোগসূত্র তৈরী হয়। বাজারী ফিল্ড তাই সমাজে একরম উন্নাসিকতার সুযোগ তৈরী করে। উন্নাসিকতার সাথে সমন্বয় সাধিত হয় ধর্মভিত্তিক চেতনারও...কাবন দুইজনেই চায় আমাগো ইতিহাসের স্মরণীয় মুহূর্তগুলিরে ভুলতে...যেই ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত সেই সমাজতাত্ত্বিক সংগ্রামের সন্তাবনা, যেই সন্তাবনা ছিলো মানবের চূড়ান্ত মুক্তির প্রয়াস।

যুদ্ধাপরাধীগো বিচার না চাইয়া ভবিষ্যত উন্নয়নের কথা ভাবতে হইবো এইরম চিন্তার অবকাশ তৈরী হয় রাষ্ট্রে...কিন্তু যুদ্ধাপরাধীরা যেই ধর্মের দোহাই দিয়া একটা রাষ্ট্রের স্বাধীনতার বিরোধীতা করছিলো তার চর্চা এই সমাজে আবার তারা শুরু করছে...বিভিন্নজনের কান্দে চাইপা নিজেগো অস্তিত্ব প্রমান করনের চেষ্টাও নিয়মিত করে তারা। সেই ধর্মকেন্দ্রিকতার বিভাজনে আমাগো আল্টা স্বাধীনতাকারীগো কোন আগ্রহ না থাকলেও মৌন সম্মতি আছে। মৌন সম্মতি শব্দটা হয়তো খুব জুইতের হইলো না, কিন্তু মৌনতায় সম্মতির সন্তাবনা থাকে...কিন্তু সমাজের স্বাভাবিক নিয়মেই আসলে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে/পাটাতনে পূর্বে নেতৃত্বাচক অধ্যায়গুলি বিস্মরণের প্রয়োজন পড়ে। যেই বিস্মরণ মানে অস্থীকার না, যেই বিস্মরণ মানে শিক্ষাহীনতা না।

এখন সময় হইছে ভাববার...আল্টা ফিল্ডমের নামে আমাগো মুক্তির চেতনবিরোধী সকল পরিত্যক্ত আদর্শের অবমুক্ত করুম!? যুদ্ধাপরাধীগো বিচারে দাবীরে অহেতুক মনে করুম!? যুদ্ধাপরাধীগো চেতনার লগে সহাবস্থানের লগে আপোষ করুম!?

...আসলেই এই অবস্থানসমূহ কি অগ্রগমনের নির্দেশিকা!?

## ‘বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান’

### ফারহান দাউদ

“আবু মোহাম্মদ কাওসার, বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান”। নাম জিজ্ঞেস করার পর ছেলেটার এমন উভর শুনে একটু অবাক হয়ে তাকাই। কত বয়স? ১০-১১ হবে। উত্তরটা ঠিকমত শুনলাম কিনা ভেবে আবারো প্রশ্ন করি--“কী নাম?” এবার একটু মনোযোগ দিই, কান পাতি। না, একই কথা--“আবু মোহাম্মদ কাওসার, বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান”। মায়ের দিকে তাকাই, ব্যাখ্যার আশায়। মা বলে, সুলতানের ছেট ছেলে। পরিষ্কার হয় ব্যাপারটা এতক্ষণে। সুলতান মামা, আমার মায়ের চাচাতো ভাই, গ্রামের বাড়িতে থাকে। যখন শহরে আমার নানাবাড়িতে আসে, মাঝে মাঝে কথা হয়। সহজ-সরল মানুষ, বাড়িতে গেরস্থালি দেখে, চাষবাস করে, অবস্থা খুব একটা ভাল না।



তবে, মায়ের কাছে তাঁর গল্প শোনা অন্য কারণে। মামা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তা এ বাড়িতে আরো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, মায়েদের এই বাড়ি যুদ্ধের সময় পুড়িয়ে দেয় পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল ছিল বলে। এই মানুষটা তাহলে আলাদা কোথায়? আলাদা, কারণ এই দুঃসাহসী মানুষটি মুক্তিযুদ্ধে যখন যোগ দেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর। সম্মুখ্য করেছেন এই বয়সেই রাইফেল হাতে, বিশ্বাস হতে চায় না, রূপকথা মনে হয়। এখনো যখন মানুষটাকে দেখি, কেমন যেন লাগে, অবাক হতেও ভুলে যাই। এ তো একটা খুব সাধারণ খেটে খাওয়া লোক, যা বয়স, পরিশ্রম আর দারিদ্র্যের কারণে তার চেয়েও বেশি দেখায়। নিরীহ চেহারা, কোথাও খুঁজে পাই না যুদ্ধদিনের সেই আগুন, কথাতেও না। কোন নেতা নয়, মুক্তিযুদ্ধ ভাবিয়ে খাওয়া বা ইজারা নেয়া কোন রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী নয়। যখন হৃদয়ের ভেতর খেকে দেশের ডাক এসেছে, অস্ত হাতে জীবনবাজি রেখে নেমেছিলেন ময়দানে, দেশ স্বাধীন হবার পরে তাঁরই মত আরো হাজারো গণযোদ্ধার সাথে মিশে গেছেন জনসমুদ্রে। কোন বাড়তি সুবিধা পাননি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। অভিযোগ নেই কোন, যুদ্ধ করে কি পেলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আরো অনেকের মতই বলেছিলেন, দেশের জন্য যুদ্ধ করছিলাম, যুদ্ধ বেইচা খাওয়ার জন্য তো করি নাই। এখন আমি ভাবি, এমন মানুষগুলোর সন্তানরা তো মাথা উঁচু করে সগর্বে নিজের নামটা বলে বলতেই পারে--“বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান!” আমরাও কি এ কি কথা বলতে পারি না? আমরাও তো এদেরই দেয়া রক্তের সন্তান, এই যোদ্ধারাই তো জাতি হিসেবে আমাদের জন্য দিয়েছে, সৃষ্টি করে গেছে এমন এক মহাকাব্য, প্রথিবীর সমস্ত বীররসের কাব্য যার কাছে মূল একদমই। অভিমন্যু কি '৭১ এর সেই ১৩ বছরের কিশোরের চেয়েও বেশি সাহসী ছিল? একিলিস বা হেস্ট্রের কি ছিল আমাদের সিপাহী মোস্তফা বা নূর মোহাম্মদের চেয়েও মস্ত কোন বীর? এংদের মত আরো কত নাম জানা বা না জানা মহাবীররা সেই আগুনের দিনগুলিতে যে রূপকথা লিখে গেছে, তেমন গল্প কেউ কি কথনো লিখেছে?

# মায়ের মুখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

ঝড়ো হাওয়া

... তখন এতো কিছু বুঝাতাম না । আববাকে দেখতাম সবসময় খুব টেনশনে থাকতেন । মনমারা হয়ে অফিসে যেতেন । বিকালে কলোনীর মাঠে অন্যন্য প্রতিবেশীদের সাথে রেডিও শুনতেন । দেশের ভিতর উত্পন্ন অবস্থা । শহরজুড়ে অস্ত্রিতা । কয়েকদিন আগে গ্রাম থেকে মনি খালাম্বা ঢাকায় এসেছেন চিকিৎসা করাতে । ২৪ মার্চ ১৯৭১, সকালে ওনার কি যেন একটা অপারেশন হলো ঢাকার এক হাসপাতালে । খালু আর তাদের ছেট দুই ছেলে আমাদের বাসায় । দেশের পরিস্থিতি দেখে আববার সাথে পরামর্শ করে খালু রাতেই মনি খালাম্বাকে বাসায় নিয়ে আসলেন । তাছাড়া হাসপাতালে ডাক্তারও পাওয়া যাচ্ছিল না ।

রাতে কলোনীর বাসাটাতে শুয়ে আছে দুটি পরিবারের ১২ জন মানুষ । মনি খালাম্বার ঘুমের নেশা মাত্র কেটেছে । খালাম্বা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন, দেখ তো বাইরে খটখট আওয়াজ কিসের? আমি জানলা খুলে দেখি পাকিস্তানী আর্মি কলোনীর রাস্তাতে উহুল দিচ্ছে । আমি অন্য রূপে গেলাম । আববাও উঠে গেছেন । সবাইকে চুপ করে ফ্লোরে বসে থাকতে বললেন । তিনি নিঃশব্দে সিঁড়ি গেটের লাইট বন্ধ করে দিয়ে আসলেন ।

পাকিস্তানী আর্মির বুটের আওয়াজ জোরালো হচ্ছে । একটু পর পর গাড়ীর শব্দ আসছে । এমনি একসময় হাঁটু গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলো ব্যষ্টির মত । সেই রাত ভোলার মত নয় । আমারা তো ধরেই নিয়েছি আমরা মরতে যাচ্ছি । আমার ছেট ভাই (৮) আর দুই খালাতো ভাই হৃষ্মায়ন (৫) ও সেলিম (৩) পালকের নীচে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে ।

অবশেষে জীবনে আরেকটা সকাল আসলো । ঢাকাতে কারফিউ চলছিল । আববা ও কাকা কেউই অফিসে যেতে পারেনি । প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিভিন্ন উড়া খবর শুনা যাচ্ছে । কলোনীতে সরকারী কর্মকর্তারা থাকতো বলে পাকিস্তানী আর্মিরা এদিকটায় তেমন আসতো না । আমরা জানলা দিয়ে দেখেছি

কলোনী বাউন্ডারি বাইরে বাড়িতে পাকিস্তানী আর্মি তলাশী করেছে । অনেককে ধরে নিয়ে যাওয়ার সংবাদও কানে আসছিল । কলোনীর ছেলেরা গাছ কেটে মেইন রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছে ।

২৭ মার্চ ১৯৭১, কারফিউ ভেঙ্গে গেছে । সকালে আববা অফিস গেলেন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে । আববা বললেন, আমি আসি আর নাই আসি তোমরা সবাই আজ গ্রামে চলে যাবা । অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাবার, টাকা-পয়সা, স্বর্ণ সব গাতি বেধে ছেট কাকা আর খালুর সাথে আমরা সবাই কলোনী থেকে বের হয়ে গেলাম । বাসায় দরজায় আমি কয়লা দিয়ে লিখে রাখলাম "আববা আমরা চলে গেলাম", কিন্তু আমরা যে কোথায় যাচ্ছি জানি না ।

লালবাগের ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছি দেখলাম পাকিস্তানী আর্মিরা উহুল দিচ্ছে । রাস্তাভর্তি রক্ষ । আমি তো এতো পথ চিনি না । ছেট কাকা আর খালুর সাথে সাথে আমরা সবাই যাচ্ছি কখনো পায়ে হেঁটে কখনো রিঙ্গায় । মনি খালাম্বা অপারেশনের রোগী, কত কষ্ট করেই না পথ পাড়ি দিচ্ছে । আমার হাতে বড় একটা স্যুটকেস । আসলে সবার হাতেই বিভিন্ন ছেট-বড় ব্যাগ । অনেক পথ ঘুরে আমরা জিঞ্জিরায় পৌছালাম । অসংখ্য মানুষ নদী পার হচ্ছে ।

নদীতে গুটিকয়েক নৌকা । মনি খালাম্বা দৌড়ে গিয়ে একটা নৌকায় উঠে পড়লেন । জোর গলায় বললেন, এই নৌকা আমাদের রিজার্ভ করা! আমরা সবাই আঁটসাট হয়ে সেই নৌকায় গিয়ে বসলাম । অন্য নৌকাগুলোও দ্রুত তর্তি হচ্ছে । আমাদের নৌকা ছেড়ে দিয়েছে, এ যাত্রায় বুবি বেঁচে গেলাম ।

নৌকা মাঝেই ওপার ভিড়েছে, অমনি গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলো । পাকিস্তানী আর্মিরা নদীর ওপার থেকে গুলি ছুঁড়েছে আমাদের দিকে । নদীর দু'পাড়ের মানুষ উর্দ্ধ্বাসে দৌড়ে পালাচ্ছে । কয়েকজন সেখানেই শেষ । নৌকা থেকে অনেকে ঝাঁপ দিয়ে

পড়লো মাঝ নদীতে । আমি ছেটে সেলিমকে এক হাতে আর অন্য হাতে স্যুটকেস নিয়ে দৌড়ে পালালাম । শত মানুষের ঢল সেখানে । এক মহিলাকে দেখলাম চিংকার করে কাঁদছে, গোলাগুলির সময় সে তার বাচ্চাকে কোথায় যেন ফেলে আসছে ।

কত মাইলের পর মাইল যে হেঁটেছি তার কোন হিসাব নাই । পথে আমাদের সাথে এস.এম হলের এক ছাত্রের দেখা । ২৫ মার্চের সেই কালরাতে সে হলের ম্যানহোলের ভিতর লুকিয়ে ছিল । ম্যানহোলের ঢাকনার উপর দিয়ে কত বুটের আওয়াজ যে কানে এসেছে । প্রতিটা ক্ষণ তাকে মৃত্যুর প্রহর গুণতে হয়েছিল । পরে গভীর রাতে কিভাবে যেন পালিয়ে আসতে পেরেছে । সে কখনো আমাদের ব্যাগ বহন করে কখনো ছেটে সেলিমকে কোলে নিয়ে অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়েছে । আরেক লোক সদরঘাট থেকে এসেছে । সে দেখেছে লঞ্চ টার্মিনালে রক্তের বন্যা আর লাশের স্তুপ ।

শহর থেকে হাজার হাজার মানুষ গ্রামে আসছে । গ্রামের মানুষরা কেউ মিষ্টি আলু, ঝুটি, ভাত, বাচ্চাদের জন্য দুধ দিয়ে আমাদের মত ঘরছাড়া মানুষদের সাহায্য করছে । আমাদের ব্যাগে ঝুটি ছিল কিন্তু খাওয়া হয়নি । আসলে এ সময়ে খাওয়া যায় না ।

সন্ধ্যার দিকে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছালাম । আমাদের দেখে নানা দৌড়ে আসলেন, চোখের পানি মুছে বললেন "তোরা বেঁচে আছস! আমি মনে করছি তোরা সবাই শেষ!" মাকে জিজেস করলো, জামাই কই? কিন্তু, আমরা জানি না আববা কোথায়?

গুমোট একটা সময় পার করছি । আববা'র কোন খবর আমরা জানি না । ছেট কাকা আববা'র খবর আনতে ঢাকায় আসতে চেয়েছিল, মা রাজী হয়নি । "তোর বড় ভাইকে হারাইছি, তোকে মারার জন্য ঢাকায় পাঠাতে পারবো না" । কঠিন এ কথাগুলো কত সহজেই না মা বলে ফেলল । যদু মনে হয় মানুষকে অনুভূতি শুন্য বানিয়ে ফেলে ।

গ্রামে আমাদের ৬/৭ দিন কেটে গেছে। এখন পরিস্থিতি কিছুটা ঠাণ্ডা। ছোট কাকা ঢাকায় রওনা দিলেন, আববার খোঁজে। তাছাড়া সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ছোট কাকাও আববার সাথে এটর্নি জেনারেল অফিসে চাকরি করতেন। অফিসে যেয়ে উদ্ভাস্ত অবস্থায় আববার সাথে কাকার দেখা হলো। দুই ভাইয়ের গঢ়াগড়ি দিয়ে সে কি কান্না! আববা ভেবেছিলেন আমরা মারা গেছি, আর আমরা ভেবিছি আববা মারা গেছেন। কাকাকে নিয়ে আববা এই দিনই গ্রামে চলে আসলেন আমাদের সাথে দেখা করতে।

এপ্রিল '৭১ এর শেষের দিকে আমরা ঢাকায় চলে আসলাম। আজিমপুর কলোনী তখন মোটামুটি নিরাপদ ছিল। সম্ভবত পাকিস্তানী আর্মিরা সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিজেদের পক্ষের লোক মনে করতো! পাক-হানাদাররা অন্য সব জায়গায় অত্যাচার-নিপীড়ন করলেও এখানে তেমন কিছু করতে দেখিনি। তবে সবসময় খুব টহল দিতো। ছোট কাকা দিনে সরকারী ঢাকরী করতেন আর রাতে 'গণ-সঙ্গীত' গেয়ে এলাকার যুবকদের সংগঠিত করতেন। আববা সম্মুখ্যে যেতে পারেননি ঠিকই তবে অর্থ, তথ্য, খাবার, ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন।

আজিমপুর কলোনী তখন এতো জনবহুল ছিল না। বিল্ডিংগুলো ছিল তিন তলা। যুদ্ধের কারণেই হয়তো তখন অনেক বাসা শূন্য ছিল। আমরা সবসময় বাসায় বাড়তি রঞ্চি বানিয়ে রেখে দিতাম। প্রায় সময় ভিক্ষুক, ফেরীওয়ালার ছান্নবেশে মুক্তিবাহিনীর ছেলে এমনকি মেয়েসদস্য বাসায় আসতো। আমরা তাদেরকে রঞ্চি দিয়ে দিতাম। মা যে কত মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের ঘরে এনে ভাত খাইয়েছে। প্রায় সবার মুখে একটা কমন কথা ছিল 'মা, আজ ২ দিন বা ৩ দিন পর ভাত খেলাম'।

মে মাসের দিকে সরকার ঘোষণা দিল 'ইন্টার পরীক্ষা' হবে। দেশের এই অবস্থায় কেউ কি পড়ালেখা করতে পেরেছে? কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই পরীক্ষা দিতে গেলাম, শুধুমাত্র জান রক্ষার্থে। আমার সিট পড়েছিল বদরুল্লেখনেসা কলেজে। নামেমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে। সবাই বই খুলে দেখে দেখে পরীক্ষা দিচ্ছে। টিচাররা কেউ কিছুই বলছে না। পাহারার পাক-আর্মিরা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের বই এনে দিয়েছে, পরীক্ষায় লেখার জন্য! পরবর্তীতে দেশ স্বাধীনের পর এই পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়। তখন আমরা ভালমত পড়ালেখা করে আববা পরীক্ষা দিলাম।

নতুন জীবন লাভ আর মৃত্যুর আশঙ্কাই ছিল আমাদের নিয়সনী। প্রতিদিন সকালে আববা অফিসে যেতেন আমাদের সবার কাছ থেকে 'বিদায়' নিয়ে। একবার তো আববাকে ধরে নেওয়ার জন্য পাক-বাহিনী সুপ্রীম কোর্টে হাজির। তখন আববার এক বিহারী কলিগ রেজা সাহেব পাক-বাহিনীর অফিসারকে বোঝালেন, উনি আমার ভাই, অনেক ভালো মানুষ, ভালো সরকারী অফিসার। .....। আল্লাহপাক যেন নিজ হাতে আমার আববাকে হেফাজত করলেন।

## বাবার কাঁধে বন্ধুর লাশ

নাদান



আমি যখন ক্ষুলে পড়ি তখন গল্পটা আববুর মুখে শুনেছিলাম। ১৯৭১ সাল, আববু তখন কলেজে পড়ে। দেশমাত্কার টানে এই বাংলার আরও লাখো যুবকের মত নিজেকেও ধরে রাখতে পারেনি। যদিও বাবা, মার একমাত্র ছেলে হওয়ায় দাদু, দাদি কেউ আববুকে যুদ্ধে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। তাই রাতের অন্ধকারে ঘুমস্ত এক মাকে সালাম করে আর এক মায়ের টানে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

তারপর ছেনিং নিয়ে ফেরার পর তাদের ছয় বন্ধুর উপর দায়িত্ব পড়ে রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের কাটাখালি নদীর উপর যে ব্রিজটা আছে (বর্তমানে গাইবান্ধা জেলার অর্তগত) সেটি উত্তিয়ে দেবার। হাইকমান্ড থেকে নির্দেশ পাবার পর প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ তারা ভাল করে প্যাক করে নিয়ে গভীর রাতে তারা নদীতে নেমে পড়েন। মাথার উপর কচুরিপানা ঠেলে ধীরে ধীরে ব্রিজের দিকে এগোতে থাকেন। ব্রিজের উপর তখন পাকি আর্মি আববা রাজাকারদের নিয়মিত টহল। নদীর পাশে তখন পাট

ধোয়ার পর অনেকগুলো পাটখড়ির স্তুপ করা ছিল। পাকি আর্মি আববা রাজাকারদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারা ছয়জন তিন ভাগ হয়ে এক একটি পাটখড়ির স্তুপের মধ্যে দুই জন করে ঢুকে পড়েন। অপেক্ষা করতে থাকেন সুযোগের। কিন্তু ভাগ্য সহায় না থাকায় সুযোগ বুঝে বের হবার সময় দেখে ফেলে পাকি আর্মি। এরপর শুরু হয় বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ। আববুর পাশের বন্ধু তখন গুলি থেয়ে লুটিয়ে পড়েন। সেদিন তিনি তার আহত বন্ধুকে কাঁধে করে দুই কিলোমিটার রাস্তা বয়ে নিয়ে আসেন। যদিও আববুর কাঁধেই মারা যান তার বন্ধু। সেদিন তিনি তার খুব কাছের দুই বন্ধুকে হারান। এই বাংলা মায়ের জন্য সেদিন তার দুই সন্তান বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে শহীদ হয়ে যায়।

আববুর কাছে এই গল্প শোনার পর তার মত কঠিন মানুষের চোখে যে পানি দেখেছিলাম, তারপর কোনদিন আববা তার কাছে ৭১ সম্পর্কে জানতে চাইনি। কোন এক অজ্ঞান কারণে উনি কোনদিন মুক্তিযোদ্ধার সাত্তিফিকেটও আনতে যাননি।

## বাবার খোঁজে

আমি রহমান পিয়াল

নাদিম কাদির একজন সাংবাদিক। শুধু সাংবাদিক নন, বিখ্যাত সাংবাদিক- ওকাবের প্রেসিডেন্ট। উপস্থাপক। বাজারে তিনটি বই বেরিয়েছে। আমার কাছে তার এসব পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে তিনি একজন শহীদের সন্তান। উত্তরসূরী ফোরামে তার একটি লেখা পড়ে চোখে জল এলো। মনে পড়লো জহির রায়হানের ছেলে অনল রায়হানের কথা। বাবার মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছিলেন, সফল হয়েছিলেন। অনলের সঙ্গে নাদিমের তফাত, তিনি জানতেন তার বাবাকে কারা মেরেছে। অনলের মতোই নাদিম তার বাবার কবর খুঁজে বেরিয়েছেন। সফল হয়েছেন, কিন্তু ট্রাজেডিটা এখানেই। তার বাবা কোথায় শায়িত জেনেও কিছু করতে না পারার অক্ষমতা কুড়ে খাচ্ছে তাকে। এ গল্প এক অসহায় সন্তানের গল্প। যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে তার আশপাশ দিয়ে ছিলো আমার নিত্যকার আসায়াওয়া। সে কারণেই বেদনাটা হয়তো বেশীই বুকে বেজেছে আমার।

১৫ এপ্রিল ১৯৭১। ঘুম ভাঙলো ফজরের আজানে। বিশ্বাসীদের উপাসনার ডাক দেয়া হচ্ছে। অবশ্য এদের বেশীরভাগই ততদিনে হয় পালিয়েছেন, নয়তো মারা পড়েছেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে। বাবাকে দেখলাম লুঙ্গি আর গেঞ্জি পড়ে বাসার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, “কোথায় যাচ্ছে বাবা?” উনি আমার দিকে তাকালেন, তারপর থেমে আমার কাছে ফিরে আসলেন। আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে থরে বললেন, “তোমার বাবা কোথাও যাচ্ছে না।”

এরপর এলো সেইদিন, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। দুয়ারের ঘণ্টি বাজলো, সেইসঙ্গে বুর্টের সপাটি লাখি। অনেকগুলো সেপাই নিয়ে একজন পাকিস্তানী ক্যাট্টেন আমাদের বাসায় ঢুকলেন। দরজা খুলতেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, “তোমার বাবা কোথায়?” আমার পিছু নিয়ে তারা শোবার ঘরে ঢুকল আর বাবাকে বললো, “তুমি একজন বেইমান। তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো... তৈরি হয়ে নাও।” এরপর সেই ক্যাপ্টেন আমার বাবা লেফট্যানেন্ট কর্ণেল মোহাম্মদ আবদুল কাদিরকে (ইঞ্জিনিয়ারিং কোর) স্তুর সঙ্গে জরুরী কোনো কথা থাকলে সেরে নিতে বললো। আমার গর্ভবতী মা তখন নিথর নিশ্চুপ তার পাশে দাঁড়িয়ে। একটা নেভি জিপে করে তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি দৌড়ে গেলাম সিডির দিকে, তাকে হাত নেড়ে বিদায় দিলাম। বাবাও হাত নাড়লেন। আমি কখনোই ভাবিনি এটাই আমাদের শেষ দেখা হতে যাচ্ছে। এরপর আমি অনেক প্রার্থনা করেছি যাতে বাবার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। ভাবিনি কয়েক যুগ পরে এসে তাকে সশ্রান্তির না পেলেও তার শেষ বিশ্বামের জায়গাটাকে খুঁজে পাবো।

আমি শুধু সত্যিটা জানতে চেয়েছি। জানতে চেয়েছি ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লে. কর্ণেল মোহাম্মদ আবদুল কাদিরের ভাগে কি হয়েছিল। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর তার আর

খোঁজ মেলেনি। তার ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনে শুনে ১৯৯৯ সালে মারা গেছেন তার স্ত্রী হাসনা হেনা কাদির। আমার ভাইবোনদের মতো আমিও একই কথা বিশ্বাস করতে চেয়েছি। কিন্তু একইসঙ্গে চেয়েছি সত্যের মুখোমুখি হতে। ভালোভাবেই জানতাম সেটা সুখকর কিছু হবে না। তারপরও তার শেষ ঠিকানাটা জানা আমার কাছে খুব জরুরি ছিলো।

১৬ বছর খোঁজাখুজির পর আমি অবশেষে একটা সূত্র পেলাম। সূত্রের সূত্র আমাকে নিয়ে গেলো চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকায় বধ্যভূমিতে। ১৯৭১ সালে ৭০ নং পাঁচলাইশে থাকতাম আমরা, তার খুব কাছেই অবস্থান সেই গণকবরের। সে জায়গায় একটা দালান উঠেছে। মালিকপক্ষ মুখ খুলতে নারাজ। সেখানে মাটি খোঁড়ার সময় তারা কিছু পেয়েছিল কিনা নাকি তারা স্বেচ্ছায় তা আবার মাটিচাপা দিয়েছে সেটা জানা গেলো না। আমি সেখানে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। চেচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিলো, “বাবা, শেষ পর্যন্ত পেয়েছি তোমাকে। দ্যাখো তোমার অন্ত বাবা এসে গেছে।” চিন্কার করে কাঁদতে পারছিলাম না, কেউ না দেখে মতো চোখ মুছছিলাম শুধু। সেই অর্ধ-নির্মিত ভবনের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি নিরবে প্রার্থনা করছিলাম আমার বাবার জন্য।

মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলাম, খুব অসুস্থ লাগছিল। কিন্তু আমার উপায় ছিল না কোনো। আঙ্গাহর কাছে প্রার্থনা করছিলাম আমাকে শক্তি দিতে যাতে বাবার সহযোগিদের সাহায্য নিয়ে জায়গাটা বিনির্মাণ করতে পারি। উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে এবং আশা করছি শুধু তার কবরটিই সুবিচার পাবে না, সেইসঙ্গে যোগ্য সম্মান দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তার ভূমিকাও স্পষ্ট করা হবে। লেখাটা যখন লিখছি, তখনও আমার বড় বোন ও ছোটভাই এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। লেখাটা বেঁচেনোর আগেই তাদের বলবো অবশ্য। বোনের জন্যই বেশী চিন্তা

হচ্ছে কারণ উনি কতটা শক্ত থাকতে পারবেন তা নিশ্চিত বলতে পারছি না । আর কবরটা সংরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গিয়ে বাবার জন্য প্রার্থনা করাও তার জন্য সম্ভব হবে না । কিন্তু এটাই বাস্তবতা যার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়েছে ।

চট্টগ্রামে বেশ ক'বার আসা-যাওয়ার পর মাকে বলেছিলাম যে তার প্রিয়জনের কবরের খোঁজ পেয়েছি । কিন্তু তাকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি । রেডক্সের টেসিং এজেন্সি ১৯৭৪ সালেই বলে দিয়েছিলো যে বাবা 'নিখোঁজ এবং ধারণা করা হয় তাকে মেরে ফেলা হয়েছে' । কিন্তু তাতে তার পরিবার সম্মত হয়নি । অনেক খোঁজবর নেয়া হয়েছে কিন্তু কেউ বলতে পারেন তাকে কোথায় মারা হয়েছে ।

শুরুতে কেউ কেউ বলেছিল তাকে চট্টগ্রামের ফয়'স লেকের ওখানে মারা হয়েছে । আমি প্রতিবছর সেখানে যেতাম । ফুল দিতাম, প্রার্থনা করতাম । ১৯৯১ সালে পেশাগত কারণে চট্টগ্রাম যাওয়ার কারণে আমি জোরেসোরেই তার হাদিশ বের করতে উঠেপড়ে লাগলাম । বাবার ছবি নিয়ে পাঁচলাইশ এলাকায় অনেকবার গিয়েছি । চিনতে পারে ভেবে যুদ্ধের সময় কিংবা তার পরপর চট্টগ্রামে ছিল এমন লোকজনকে দেখিয়েছি । কিন্তু কিছুই মেলেনি । ২০০৪ সালের দিকে কে যেন বলল শহরের কোন পাহাড়ে নাকি হত্যা করা হয়েছে তাকে । কিন্তু কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।

যখন হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, মহান আল্লাহতায়ালা আমাকে চট্টগ্রাম নিয়ে গেলেন একটা বিশেষ কাজে । ২০০৭ সালে আমি সুন্দানে ছিলাম, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতেই জাতিসংঘের একটি শান্তি মিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে লেকচার দিতে সেখানে গিয়েছিলাম । কথায় কথায় অফিসারদের বলেছিলাম যে ১৯৭১ সালে আমার বাবাকে সেই শহরে হারিয়ে ফেলেছি, তার আর খোঁজ পাইনি । এরপর বিশাল একটা সূত্র মিললো । চট্টগ্রাম বিগড়ের লে. কর্ণেল বায়েজিদ আমাকে ডা. মাহফুজুর রহমানের লেখা 'বাঙ্গালীর জাতীয়বাদী সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম' নামে একটি বই দেখালেন । লেখক শুধু খ্যাতিমান চিকিৎসকই নন, বিখ্যাত গবেষকও । সেই বইয়ের ৩৭১ নং পৃষ্ঠায় উনি লিখেছেন যে পাঁচলাইশে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সামনে এপোলো পলি ফ্লিনিকের পেছনে আরো ৩৫ জনসহ কর্ণেল কাদিরকে হত্যা করা হয়েছিল ।

আমি ডাক্তার রহমানকে খুঁজে বের করলাম, তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন প্রধান সাক্ষীর কাছে । নুরুল ইসলাম নামে এই ব্যবসায়ী

১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে আওয়ামী লিগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন । পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি ভেঙে পড়লেন । জানালেন কর্ণেল কাদিরকে তিনি চিনতেন । ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল পাঁচলাইশের একটা খালি জায়গায় কমপক্ষে আরো ১৮ জন সহ তাকে গুলি করে মেরেছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, যাদের সমাহিত করেছেন তিনি । কমপক্ষে পাঁচটি বুলেট বুকে নিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন কর্ণেল কাদির । এও নিশ্চিত করলেন কর্ণেল কাদির তার অফিসের (অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, যা এখন পেট্রোবাংলা) স্টোর থেকে বিস্ফোরক বিলি করেছিলেন এবং ১৯৭১ সালের মার্চে অফিসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তীর্ণ হিলেন । তার পরিবারের সদস্যরা তাকে দেখেছে ৭০ নং পাঁচলাইশের সরকারী বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে ।

জিজেস করলাম আমার বাবাকে কিভাবে চিনতেন । উত্তর দিলেন কর্ণেল কাদিরের মতো লোকজনের সঙ্গে স্বাক্ষর গড়তে দলীয় পরিকল্পনার অংশ ছিলো তা । নির্বাচন পরবর্তী অচলাবস্থা শুরু হওয়ার পর থেকে নিয়মিতই তার অফিস আর বাসায় আমি যেতাম । ইসলাম সাহেবে একটি স্ট্রোকের শিকার হওয়ার পর থেকে আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত । তারপরও কষ্ট স্বীকার করে আমাকে সেখানে (দার উস সালাম, ৩৪/এ পাঁচলাইশ) নিয়ে গেলেন । একাংশে দার উস সালাম, অন্য অংশে নতুন একটি ভবনের কাজ চলছে । এখানেই অবস্থান সেই গণকবরের । বললেন, 'নির্বাচনের পরপরই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল । অনেকবার তার অফিসে গেছি, বাসায়ও ।' ইসলাম সাহেব যোগ করলেন যে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল দুপুর দুটোর দিকে তিনি গুলির শব্দ শোনেন । কাছাকাছি বিভিন্ন বাড়ির দারোয়ান এবং চাকরদের কাছে জানলেন কর্ণেল কাদিরসহ অনেক লোককে মেরে ফেলা হয়েছে ।

যোগ করলেন, 'অনেক ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম... সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিলো... কাছেই মক্কি মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে এনেছিলাম আমরা । খুব দ্রুত আর কেউ না জানে মতো আমরা মৃতদের ঠিকমতো দাফন করতে চাইছিলাম ।' জানাজা পড়িয়ে একটা খালি জায়গায় তাদের দাফন করা হয় । কাছেই এলাকার একটা বড় ড্রেন গেছে জমিটার উপর দিয়ে ।

এরপর হঠাৎ করেই ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের একজন শিক্ষিকা মিসেস রোকেয়া চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়

আমার । উনিও আমাকে গণকবর হিসেবে একই জায়গা দেখিয়ে দিলেন । উনিও শুনেছেন যে একজন বাঙ্গালী সেনা কর্মকর্তাকে সেখান সমাহিত করা হয়েছিল । ভবনটির কেয়ারটেকারকে দেখিয়ে বললেন, 'ভবনের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই আমি এখানে এসে শ্রমিকদের জিজেস করেছি তারা দেহবশেষ পেয়েছে কিনা... কিন্তু তারা সবসময় চুপ থেকেছে নয়তো অস্বীকার করেছে ।' এও বললেন, 'গণকবরের জায়গাটা অন্য অংশের থেকে একটু উঁচু ।'

দাফনের জায়গার খুব কাছাকাছি থাকেন এমন একজন সাবেক ব্যবসায়ীকে খুঁজে বের করলাম । উনি তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক । জানালেন তার অল্পবয়সী চাকর (দোহারের অধিবাসী আলাউদ্দিন, এখন আর তার ওখানে নেই) দাফনকারীদের সঙ্গে ছিলেন । জায়গাটাও দেখিয়েছেন । ১৪ থেকে ১৮ জন ছিলেন ওখানে । বললেন আগে কিছু মানুষ সেখানে এসে কবর জেয়ারত করতেন, কিন্তু তারা এখন আর আসেন না । তার ছেলেও সায় দিয়ে জানালেন যে তারা জমির মালিককে অনুরোধ করেছিলেন কবরের ওপর একটা বাগান বানাতে, কিন্তু 'কিছু কারণে' বেশি চাপাচাপি করেননি । ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সেই এলাকায় সেনাদের নেতৃত্ব দেওয়া ক্যাপ্টেনের কথাও বললেন । লুটপাটসহ তার কিছু কর্মকান্ডের কথাও জানলাম ।

আমার এই তদন্তের সময় কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যারা গোটা ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন । খোঁজ নিয়ে জানলাম যুদ্ধকালে তাদের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত । স্থানীয় টাক্সফোর্সের কাছে আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে এক সপ্তাহের জন্য ভবনের নির্মাণকাজ বন্ধ ছিল । গণকবরে কর্ণেল কাদিরের লাশও ছিলো জানতে পেরে কর্ণেল রেজা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদের সম্মান করতেই আমাদের এখন এলাকাটা দ্রুত সংরক্ষিত করতে হবে । আমাদের স্বাধীনতায় অবদান রাখার জন্য আমাদের উচিত হবে কর্ণেল কাদিরকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া । সেজন্য এটাকেই সঠিক সময় বলে মানছে তার পরিবার । হয়তো এজনাই আল্লাহ আমাকে সেখানে নিয়ে গেছেন যাতে দীর্ঘ এক যত্নগ্রামের যাত্রার শেষ হয় ।

কৃতজ্ঞতা : উত্তরসূরী, জন্মযুদ্ধ

# আমাদের টমি আর শের আলীর গল্প

## এক্ষিমো

সেই তো অনেক দিন হয়ে গেল— প্রায় সাড়ে তিন দশক । এতোদিন পর আপনাদের টমির গল্প বলতে হবে এমনটা কখনও ভাবিনি । টমি যে কখন - কিভাবে আমাদের বাসায় এসেছিলো মনে নেই । এটা মনে রাখার মতো কোন ঘটনাও না । কিন্তু টমির অস্তিত্ব - বিশেষ করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে বসবাস করার কাহিনীটা অবশ্য একটা বিষয় বটে ।

ও হো! আমি তো টমির কাহিনী শুরু করে দিলাম আর বেচারা টমির সাথে আপনাদের পরিচয়ই করিয়ে দিলাম না । এইটা ঠিক হলো না! টমি ছিলো আমাদের পরিবারের একমাত্র পোষা কুকুরের নাম । প্রথম দিন থেকেই মাঝারি গড়নের ধৰ্মবৰ্ষে সাদা কুকুরটা ছিল আমাদের পরিবারের সবার পছন্দ (অবশ্য মা'র পছন্দের ছিলো না - মা ওজু নষ্টের ভয়ে ওকে এড়িয়ে চলতো) । একটা ছেট্টা বাচ্চা কুকুর থীরে থীরে আমাদের পরিবারে মিশে গিয়ে ছিলো । রাতে বিরাতে কোন মানুষের পক্ষে আমাদের বাসার কাছ দিয়ে টমির সন্তানগ না শুনে যাতায়াত সম্ভব হতো না । বিশেষ করে আবার রাতে চলাফেরার একান্ত অনুগত সহচর ছিলো টমি । সকালের নাস্তায় রুটি, দুপুরে ভাতের মাড় আর রাতে উচ্ছিষ্ট ছিলো টমির জন্যে বরাদ্দ ।

টমি আমাদের সাথে বসবাস করার করার সময়ই দেশ উত্তাল হলো— এলো একান্তর । ঢাকা আক্রান্ত হলো । দেশের সকল ক্ষুল কলেজের সাথে আমাদের ক্ষুলও বন্ধ হয়ে গেল । আমরা সবাই বাসায় বসে অলস সময় কাটানো শুরু করলাম । সেই সময়ই টমি আমাদের খেলার সাথী হয়ে উঠেছিলো । সবার ঘরের বাইরে যাওয়া নিষেধে । তাই বাসার বারান্দায় টমিকে নানান কসরত শেখাতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন বড় ভাই বোনেরা । আমরা ছেট্টরা তালি দিয়ে উত্সাহিত করতাম । এভাবে হৈ চৈ আর আনন্দ করে সময় কাটাচ্ছিলাম ।

যদুর মনে পড়ে দিনটি এপ্রিল মাসের কোন একদিন হবে । কারন মার্চের শেষের দিকে ঢাকা থেকে চলে এসেছিলো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া করেকজন পাড়ার ছেলে । এরা মাঠে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে

প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতো - মার্চপাস্ট করতো । যেদিনের কথা বলছি - সেইদিন দুপুরে বাসার বারান্দা দিয়ে কে যেন দৌড়ে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলো । আমরা তয় পেয়ে গিয়েছিলাম । টমি ও তারস্বরে যেউ ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিয়েছিলো ।

কিছুক্ষণ পর পাড়ার কিছু ছেলে আর স্থানীয় যুবকদের একটা দল আমার বাসার সীমানার ভিতরে ঢুকে গেল । তাদের উত্তেজিত ভঙ্গি আর হাতে রামদা আর বলাম ধরনের অন্ত দেখে বোনরা প্রথম চিংকার শুরু করলো - যুবকদের থেকে কেউ একজন আশ্বাস দিয়ে আমাদের ভিতরে পাঠিয়ে দিলো । ভিতরে গিয়ে দেখলাম একটা রংমের দরজা বন্ধ - মা তার সামনে বসে সেলাই মেশিনে কী যেন সেলাই করছে । আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আসলে বাসার ভিতরে কী হচ্ছিলো ।

এর মধ্যে পাশের বাসার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বড় ভাই ভিতরে ঢুকে গেলো । উনাদের অবশ্য আমাদের বাসায় অবারিত প্রবেশাধিকার ছিলো । উনি ভিতরে এসে মার কাছে জানতে চাইলো - 'খালাম্মা, বাসার ভিতরে কি কোন লোক ঢুকেছে?' মা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু উলার দিকে একবার তাকালো । মার তাকানোর ভঙ্গিতে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছিলো । বাইরের ঘরে আবরা একটা বই পড়ছিলেন । উনি এমন ভাবে পড়ছিলেন - মনে হচ্ছিলো জগত সংসারের থেকে উনি বিছিন্ন । কিছুক্ষণ ভেতরে থেকে যুবকদের দল বিফল মনে চলে গেলো ।

ওদের চলে যাবার পর আবরা উঠে একটা জলস্ত কুপী বাতি নিয়ে বন্ধ ঘরটাতে গেলেন । তখন এমনিতেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিলো না - তাই একটা কুপি বাতির আলোতে বাসার সবচেয়ে বড় চালের ডামটা খুললেন । আমরা অবাক হয়ে দেখলাম ভিতর থেকে একটা জলজ্যান্ত মানুষ বেরিয়ে আসছে - আরে এতো শের আলী ভাইয়ের বাবা, এর ভিতরে ঢুকলেন কিভাবে! ডাম থেকে বেরিয়ে উনি - আবাকে উর্দ্দুতে কিছু বলছিলেন, যার অর্থ আমরা বুঝতে পারিনি । তবে যা বুঝতে পারলাম - আবাক সেই রুমটা আপাতত উনার জন্যে বরাদ্দ করে দিলেন । আমাদের কিছুটা মন খারাপ

হলো - কারণ এখন সবাইকে অন্য রংমে গাদাগাদি করে ঘুমাতে হবে ।

২.

গল্পের এই পর্যায়ে মনে হয় শের আলী ভাইকে পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার মনে করছি । ছিপছিপে গড়নের উঠতি যুবক শের আলীর গায়ের রং কালো । শায়েস্তাগঞ্জ রেল কলোনীর যে দিকটায় থাকতাম - সেখানে রেলওয়ের একটা নিজস্ব একটা রাস্তা আছে - সেই রাস্তার অপর পার্শ্বে বস্তিমতো একটা এলাকায় কয়েকটা বিহারী পরিবার থাকতো । এদের কেউই রেলওয়েতে চাকুরী না করলেও কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনায় ওদের সেখানে থাকতে দেওয়া হতো । সেই বস্তির ছেলে শের আলী ভাই । হাড়ডু খেলায় বিশেষ দক্ষতার কারণে উনি ছিলেন শের আলী । আমাদের কাছে একজন প্রিয় মানুষ ছিলেন ।

ছিপছিপে শরীর নিয়ে যখন 'ডাক' দিয়ে বিপক্ষের সীমানায় যেতেন - তখন আমরা ছেট্টরা জগত সংসারের সবচেয়ে আনন্দিত মানুষে রূপান্তরিত হতাম - কারন জয় ছিলো আমাদেরই । শের আলীর কারণে আমাদের পাড়া ছিলো হাড়ডুতে চ্যাম্পিয়ন । তাছাড়াও আবার মাছ শিকারী দলের সহকারী হিসাবে শের আলী আবার খুবই প্রিয় ছিলো । শীতের রাতে পাঁচ মাইল হেঁটে কোন পুকুরে চারা (মাছের জন্যে বিশেষ খাবার) ফেলে আসতে হবে - শের আলী এক বাক্যে রাজি হয়ে যেত ।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে । তবে তখনও শায়েস্তাগঞ্জে পাকিস্তানী আর্মি যায়নি । ছাত্র-যুবকরা নিশ্চিত যুদ্ধের আশংকায় প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকে । গুজব শোনা গেল, বিহারী পাড়া থেকে সেই যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর ও প্রস্তুতি গ্রহণের ছাত্র-যুবকদের নামধার কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়েছে । সন্দেহভাজনদের ধরার জন্যে সেই ছাত্র-যুবকদের অভিযানের সময় শের আলীর বাবা দৌড়ে আমাদের বাসায় চলে আসে এবং নিশ্চিত আশ্রয় পায় । তারপর থেকে কয়েকদিন আমাদের বাসায় লুকিয়ে ছিলো শের আলীর বাবা । রাতে আসতো শের আলী আর ওর ছেট ভাই । কিছুক্ষণ থেকে চলে যেতো । সেই সময় রুমটিতে আমাদের প্রবেশাধিকার

থাকতো না । এভাবে মনে হয় চার বা পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হলো । একদিন ভোরে হৈ চৈ শুনে সবার ঘুম ভেঙে গেল । শোনা গেল মিলিটারী শাহজীবাজার পর্যন্ত এসে গেছে । দুই একদিনের মধ্যে শায়েস্তাগঞ্জে চলে আসবে । এই খবর শুনে প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণর ছাত্র-যুবকের দল কোথায় যেন হারিয়ে গেল - (পরে শুনেছিলাম ভারতে চলে গিয়েছিলো মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে) । সেই সুযোগে শের আলীর বাবা দিনের আলোতে বেরিয়ে এলো । শের আলী আসলো তার মাকে নিয়ে আবাকে শুকরিয়া জানাতে অনেক কানাকাটা করলো । শের আলী কথাগুলোর শুধু একটা লাইন মনে আছে- 'চাচা, আমার চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে আপনার পায়ে পরিয়ে দিলেও আপনার খণ্ড শোধ হবে না ।' এই বাক্যটার কার্যকারণের ক্ষেত্রে একটা অন্তু চিত্র - একজন মানুষ তার চামড়া নিচে আর আরেকজন জুতার মাপ দিচ্ছে..... মনে হয় সেই কারণেই লাইনটা মনে আছে এখনও ।

৩.

তারপর আর্মি চলে আসলো । আমরা স্থানান্তরিত হলাম । ঘুরে বেড়ালাম অনেক আশ্রয়ে । অবশেষে শায়েস্তাগঞ্জের বাসায় সেপ্টেম্বরের দিকে ফিরে আসলাম । নিজের আবাসে ফিরে আসার যে কী আনন্দ - তা একটা ছোট মানুষকে কিভাবে আন্দোলিত করে - তা আজও সতেজ । হাবিগঞ্জ থেকে রিঙ্গায় পুরো পরিবার আর লটবহর নিয়ে দুপুরের দিকে বাসার সামনে নামি । যখন টিভিতে কোন দেশের উদ্বাস্তুদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে দেখি - তখনই আমাদের সেই রিঙ্গা প্রমগের কথা এখন মনে হয় । কয়েকটা লেপ আর তোষক, কিছু পরিধেয় বস্ত্র আর কিছু রান্নার তৈজসপত্র নিয়ে যখন বাসায় গেটের সামনে নামি - হঠাৎ করে কোথা থেকে উমি এসে হাজির । দীর্ঘ ছয় মাসের উদ্বাস্তু জীবনে টিমির কথা মনে হয় কেউ একবারও মনে করেনি - আমি যে করিনি - সেইটা নিশ্চিত । কিন্তু টিমি আমাদের ভোলেনি । এসেই সবার কাছে ছুটে গেল, গড়াগড়ি খেল, নানান ধরনের কুইকুই ধ্বনি তৈরি করলো । আমরা একটু আদর দিতেই সুবোধের মতো বাসার ভিতরে ঢুকে গেল ।

গেট পেরিয়ে খানিকটা খোলা জায়গা, তারপর পাকা বারান্দামতো সিমেন্টের চাতাল । সেই খোলা জায়গায় ঘাস গজিয়ে আমাদের মতো ছেটাদের গলার সমান উচু হয়ে গেছে । সেই ঘাস সরাতেই পাঁকা টমেটোর গন্ধ, ঘাসের ভিতরে দেখলাম শশা গাছ আর তাতে প্রচুর শশা ধরে আছে । মিষ্টি কুমড়া আর চাল কুমড়ার

ফলানও দেখা গেল । জঙ্গলে সাপ থাকতে পারে বলে আবাকা সাবধান করে দিলেন । টমি আগে আগে গিয়ে শুঁকে শুঁকে আমাদের আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিলো । আমরা ছেটারা যখন এই প্রাকৃতিক প্রাচুর্য নিয়ে ব্যস্ত - মা আর বড় বোনরা বাসার ভিতরে যেতে এগিয়ে গেল । হঠাৎ মার একটা তীব্র আর্তনাদ আমাদের সব আনন্দকে ভেঙে খান খান করে দিলো । সবাই দৌড়ে গেলাম মার কাছে । গিয়ে মাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বুবাতে পারি, মা কেন এমনভাবে কাঁদছেন । মার দীর্ঘদিনের সাজানো সংস্কারের কিছু পুরোনো কাপড় আর ভাসা চিনেমাটির থালাবাসন হয়ে উচিষ্ট তলানীর মতো মেরোতে পড়ে আছে । বাসার মূল দরজা ভাঙ্গা । একটা কপাট অর্ধেক হয়ে ঝুলে আছে । শুধু মেরোর উপর কিছু ছত্রিয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা কাপড় আর বাসনকোসন ছাড়া - ভিতরে পুরোটাই খালি । বাসার সামনে আবাবার সখের ঝুল বাগানটা পরিণত হয়েছে বিরাট জঙ্গলে আর তার সে জঙ্গলের ভিতরে দেখা যাচ্ছিলো ভিজে মোটা হয়ে যাওয়া আবাবার প্রিয় লাল বইগুলো ।

বিষাদের একটা গভীর কালো ছায়া সবাইকে ঘিরে ধরলো । শুধু আমাদের বাসায় বড় হওয়া মফিজ ভাই বললেন - যা হইছে তা তো আর ফিরানো যাবে না । সবাই ভিতরে যাও, দেখি কী করা যায় । যাই হোক বিকেলের মধ্যে কিছু থালা-বাসন, বিছানা আর মশারি যোগাড় হলো । রাত্রিতে মেরোর ওপর পাতা বিছানায় ঘুমিয়ে আমার নতুন জীবন শুরু হলো ।

৪.

শায়েস্তাগঞ্জের নতুন জীবনের দ্বিতীয় দিনের ঘুম ভাঙ্গলো টমির চিৎকারে । বিশ্রীভাবে হৈচৈ করছে টমি । বিষয়টা কী? সকালে চোর আসবে কোথা থেকে! আবাবা দরজা খুলে বেরিয়ে দেখে শের আলী ভীত ভঙ্গীতে দাঢ়িয়ে আছে আর টমি ঘেউ ঘেউ করেই যাচ্ছে । আবাবা টমিকে থামালেন । আমরা অবাক - শের আলীতো এই বাসায় পরিচিত এবং টমি ওকে ভালভাবে চেনেও । আজ কি হলো ও শের আলীকে আসতে দিতে চাচ্ছে না!

আবাবার হস্তক্ষেপে অবশেষে শের আলী বারান্দায় এসে দাঢ়ালো । আবাবা ভিতরে ঢুকে গেলে দরজার ফাঁক দিয়ে উকি দিয়ে দেখি, একটা সাদা প্যান্ট নীচের দিকে গুটানো, সাদাশার্ট আর গলায় লাল ঝুমাল বাঁধা শের আলী বিরক্ত মুখে দাঢ়িয়ে আছে । আমাদের একজনকে দেখে একটা দেশলাই দিতে বলে প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করলো । আমরা সবাই বোকা হয়ে গেলাম, বোনদের একজন বললো - 'শের

আমাদের বাসায় সিগারেট খাবে!' এর মধ্যে আবাবা এসে গেলেন । বাইরে দাঢ়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে শের আলী চলে গেল ।

ভিতরে এসে আবাবা যা বললেন তার মর্মার্থ হলো - শের আলীদের বাসায় কিছু আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র আছে । সেগুলো সে বিক্রি করতে চায় । বিকালে আবাবা রেলের কয়েকজন লালশার্ট পড়া রেলকুলির সহায়তায় আমাদের আসবাবপত্র আর তৈজসগুলি শের আলীর থেকে নগদমূল্যে কিনে আনলেন । মজার বিষয় হলো - এই সবই আমাদের বাসার জিনিস ছিলো ।

রাতে থেকে বসে আবাবা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন - টমি শের আলীকে দেখে হৈ চৈ করে উঠেছিলো কেনো জানো? মা মাথা নেড়ে নেতিবাচক জবাব দিলে - আবাবা বললেন - 'টমি প্রত্বত্বত ও কৃতজ্ঞ । শের আলীরাই যে আমাদের বাসা লুট করেছে - টমি তার সাক্ষী ।'

৫.

একসময় ডিসেম্বর মাস আসলো । দেশ স্বাধীন হলো । ইতোমধ্যে অবশ্য টমির সাথে আমাদের আরেকবার বিছেদ ঘটে । আমরা শায়েস্তাগঞ্জ ছেড়ে অনেকপথ ঘুরে গামের বাড়ি মুনশীগঞ্জে চলে যাই । পরে ফেরুয়ারি মাসে আবাবার বাসায় ফিরলে - যথারীতি টমি আমাদের কাছে এসে হাজির । এই বিছেদের দিনগুলো নিয়ে টমিরও যেমন কোন বিকার ছিল না - নির্বাচ প্রাণীটির কৃতজ্ঞতার প্রতি আমাদেরও তেমন ভুক্ষেপ ছিলো না । টমি যথারীতি বাসার বারান্দায় থাকা শুরু করলো । আমরা নতুন দেশে ক্ষতিবিক্ষত পরিবারটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম । আমাদের স্কুল খুলে গেল । আমাদের খেলার মাঠের উপর গড়ে উঠা রাজাকার টেনিস ক্যাম্প সরে গেল - আমরা নিয়মিত খেলা শুরু করলাম । কিন্তু রাস্তার ওপরের বিহারী পাড়াটা আর আগের মতো থাকলো না । দুই-তিনটা পরিবার ছাড়া বাকিগুলো কোথায় যেন চলে গিয়েছিলো । কেউ কেউ বলেছে - শ্রীমঙ্গলে রেডক্স ক্যাম্পে ওরা আশ্রয় নিয়েছিলো । এর মধ্যে শের আলী ও তার পরিবারও থাকতে পারে । মোদাকথা তারপর শের আলী আর ওর বাবাকে কোনদিন দেখিনি ।

৬.

মুক্তিযুদ্ধ আর তার পরবর্তী সময় আমাদের পরিবারকে অনেক চড়াই উত্তরাই পার হতে হয়েছে । সেই কঠিন সময়ে আমাদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক - টমি আমাদের সাথে ছিলো ।

আমাদের বাসার বারান্দায় থেকে অতন্ত্রপহরীর ভূমিকা নিয়েছে। হয়তো সেই কারণেই টমিকে একটা কঠিন আঘাত পেতে হয়েছে। আমাদের বোনরা বড় হয়েছে - আর পাড়ার বখাটে ছেলেদের নিয়মিত হাঁটার রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হতো আমাদের বাসার সামনের রাস্তাটা। কিন্তু টমির কারণে সেই রোমিওদের কাব্যিক আচরণ ব্যাহত হতো হয়তো - তাই একদিন রাতে দেখি বারান্দায় রক্ত আর টমি এককোণে বসে কুই কুই করে কাঁদছে। কাহে আলো নিয়ে দেখি টমির গায়ে বিরাট একটা ক্ষত - কেউ একজন দাদীয়ে কোপ দিয়ে একটা গভীর ক্ষত তৈরী করেছে। এদিকে আবার খুবই অসুস্থ। টমিকে পশু হাসপাতালে নিতে অনেক চেষ্টা করি। একজন ছোট মানুষের যা সবচেয়ে বড় অস্ত্র তা হলো কান্না আর অনশনের হৃষ্কি দেওয়া - তাই ব্যবহার করেছি। অবশেষে আবার অফিসের পিয়ন কোথা থেকে কিছু মলম আর ব্যক্তিগত এনে টমিকে ডেসিং করে দিয়েছিলো। কিন্তু এতে শেষ রক্ষা হলো না। টমির ক্ষতস্তুতে মাছি বসা শুরু করলো। টমি সারাদিন ঘুমিয়ে থাকতো - খাওয়া দাওয়াও ছেড়েই দিয়েছিলো। একসময় প্রচন্ড দুর্ঘন্ধ ছড়ানো শুরু হলো টমির ক্ষত থেকে। ওর সামনে ঘাওয়াও কঠিন হয়ে গেল।

৭.  
একদিন তোরে উঠে টমিকে দেখতে গেলাম। কিন্তু হায়, টমি কই? ওর কুভলী পাকিয়ে শুয়ে থাকার জায়গাটা খালি। সারাদিন অপেক্ষা করলাম। টমি এলো না। এদিকে আবার শরীরও ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। রাতের টেনে আবারাকে ঢাকা পাঠানো হবে। সবাই সেই আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। টমির মতো পথের কুকুরের জন্যে কারো একটু সময়ও নেই। সেইটাই স্বাভাবিক। রাতে যখন আবারাকে টেচারে করে বের করা হচ্ছে - সুরুমা মেইলে উঠানো হবে - তখন আবারা আমাকে ডাকলেন। মুখের খুব কাছে গিয়ে আবারা কথা

শুনতে হলো - কারণ ডাক্তার কথা বলতে নিষেধ করেছে।

আবারা জানতে চাইলেন - টমি কি ফিরেছে? আমি মাথা নেড়ে না বোধক জবাব দিলাম। আবারা বললেন - টমি জীবনের শেষ দিনে ওর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। কারণ আমাদের বাসায় যদি ও মারা যেত তা হলে আমাদের কষ্ট হতো। সেই কষ্টটা থেকে আমাদের বাঁচাতে দূরে গিয়ে মারা গেছে।'

আমার ভিতর থেকে একটা কান্না এসে আমাকে প্রচন্ড ধাক্কায় যেন আমাকে বাঁকুনি দিয়েছিলো। আমি উচ্চস্থরে কেঁদে উঠলে সবাই ধরে আমাকে আবার টেচার থেকে সরিয়েছিলো।

সেই দিনটা ছিল ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর। পরের দিন ১৬ ডিসেম্বর - মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে প্রথম বিজয় দিবস পালিত হলো। দারূণ আনন্দের পরিবেশ চারিদিকে। কিন্তু আমাদের পরিবারের ছিলো গভীর অন্ধকার আর অনিচ্ছিত ভবিষ্যতের যাত্রা শুরু দিন। আমারা শঁকিত ছিলাম - আবার কি কখনও সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন? সংসারের একমাত্র উপর্যুক্ত মানুষটি যদি ফিরে না আসে আমাদের জন্যে ভবিষ্যতের সময়গুলো কেমন হবে? ভাবছিলাম - যদি যুদ্ধটা না হতো - তবে কি আমাদের কঠিন অবস্থায় পড়তে হতো?

এই রকমের হাজারো দুশ্চিন্তা মনকে বিষণ্ণ করে ফেলেছিলো। অন্যদিকে টমির অস্তর্ধানে আমাদের বাসায়ও একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে ছিলো। এই সব অনিশ্চয়তা আর শূন্যতাকে মাথায় নিয়ে সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে যখন দেখি সূর্য ডুবে গেছে - তখন অন্ধকার মনে করিয়ে দিলো - বাসায় ফিরতে হবে। অবশেষে অন্ধকারকে ভয় পেয়ে ফিরে এলাম বিশাদময় বাসায় - যেখানে টমি নেই - আবারাও নেই।

১ জুন ২০০৮

## রাজাকার-আলবদরদের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের লিফলেট

### এসো মুক্তির ও ন্যায়ের সংগ্রাম...

ত্রৈক আদর্শিক কারণে। কিংবা হয়তো পরিস্থিতির চাপেই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের মতোই এক বাস্তব ছিল রাজাকার-আল বদর। স্বাধীনতাকামীদের বিপরীত অক্ষ। মুদ্রার অন্যপিঠ। জাতিগতভাবে তারাও বাঞ্ছলী। বাংলারই জলে-হাওয়ায় বেড়ে গঠিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের মাথায় ব্যাপারটা ছিল। তাই যুদ্ধশেষে বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা যোৗৱার আগে তাদের তরফেই আহ্বান জানানো হয়েছিল এসব ঘাতক-দলালদের। কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়ে তারা যেন বিবেকের ডাক শোনে।

কিন্তু কে শোনে! যাহোক, মুক্তিযুদ্ধের দু নম্বর স্টেরের দলিলপত্রে পাওয়া গোছে একটি লিফলেট। এতে রাজাকার ও বদর বাহিনীর বাঞ্ছলীদের প্রতি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে যে ডাক দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল এরকম :

সমগ্র বাসালীজাতি আজ মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছে। ঘণ্ট্য পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত নিশ্চিহ্ন করে মুক্ত করতে হবে সোনার বাংলাদেশ। তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ভাই, বন্ধু, আতীয়-স্বজনকে হত্যা করেছে বিজাতীয় পাকসেনারা, বাঙ্গলী মা-বোনদের উপরে এসকল দস্যুরা করেছে পাশবিক নির্মম অত্যাচার, শহরে ও গ্রামের বাসায় রাস্তায় স্থুপীকৃত হয়েছে বাঙ্গলীর মতদেহ। ভাইসব, বাঙ্গলী হয়ে দেশের ও জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে তোমরা যোগ দিয়েছে বাঙ্গলীর বিরুদ্ধে বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর সাথে। শত্রুর পুতুল সেনা হয়ে নিজের জাতির এবং নিজের ভাই-বোনদের উপরে নির্যাতন মুখ বুজে মেনে নিতে এবং এই অন্যায় কার্যে শত্রুর সহায়তা করতে তোমাদের কি লজ্জা করে না?

পাকসেনারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন বজায় রাখার জন্য তোমাদের বলির পাঁঠা বানিয়েছে। তোমার জীবনের বিনিয়য়ে তুমি তোমার আতীয় স্বজন ও স্বদেশবাসীর নিকট পাবে ধিক্কার, অপমান ও লাঞ্ছনা। তোমার আমাদের ভাই, আমাদের জাতীয় স্বার্থ অভিন্ন। খেচায় তোমাদের অনেকেই হয়ত রাজাকার বা বদর হয়ে বাঙ্গলীর বিরুদ্ধে অন্ধধারণ করনি। অবস্থার চাপে পড়েই হয়ত করতে হয়েছে।

তোমাদের নিকট একাত্ম অনুরোধ, তোমরা শত্রুর চক্রান্ত বানচাল করে দাও। তোমাদের অন্তর্শস্ত্র সঙ্গে নিয়ে নির্ভর্যে মুক্তি বাহিনীর নিকটস্থ শিবিরে চলে এসো। এ পর্যন্ত রাজাকার ও বদর বাহিনীর বহু বাঙ্গলী যুবক মুক্তি বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তারা প্রত্যেকে পেয়েছে ক্ষমা এবং তাদের অনেকে আজ মুক্তি বাহিনীর বীর সৈনিক। তোমারও মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের ও জনসাধারণের সেবা করে তোমাদের জীবন ধন্য কর। প্রতি সপ্তাহে দুই শতাধিক রাজাকার ও বদর অন্ধকার প্রাণ হারাচ্ছে মুক্তিফৌজের হাতে শুধু এই রণাঙ্গনে। পেশাদার বানু দলালদের আমরা ক্ষমা করি না, কিন্তু যেসকল বাঙ্গলী যুবক অবস্থার চাপে পড়ে বা ভুলবশতঃ শত্রুর চক্রান্তে পড়ে রাজাকার বা বদর দলে যোগ দিয়েছে তারা আমাদের কাছে চলে এলে পাবে ক্ষমা, বিশ্বাস, উপযুক্ত সম্মান ও জ্যেহ।

জয় আমাদের অনিবার্য। বাংলাদেশের সকল জনসাধারণ, সকল দেশপ্রেমিক ও সকল চিন্তাশীল নাগরিক আমাদের পক্ষে। বিশ্বের সকল সৎ ও ন্যায়বান মানুষ আমাদের পক্ষে, কারণ আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতিতের সংগ্রাম। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ন্যায় ধরে পক্ষে। তিনিই আমাদের সহায়ক। ইনশাল্লাহ, বাঙ্গলী জাতি অচিরেই বিজয়ের, স্বাধীনতার ও গৌরবের অধিকারী হবে। এসো মুক্তির ও ন্যায়ের সংগ্রামে শরীক হয়ে তুমি ও সেই গৌরবের অধিকারী হবে।

জয় বাংলা।

# ভুইয়া বাড়ির দোতলায় আনোয়ারের শেষ দিনটি

## ধুসর গোধূলি

৭১ সালের মাঝামাঝি কোন একটা সময়। আমার স্মৃতিশক্তি বিটে করছে ইদানিং আমার সাথে, নাহলে তারিখটা সহ বলা যেতো। আমাদের মাধবদী এলাকায় যুদ্ধে লিঙ্গ আছে কয়েকটা মুক্তিসেনার গ্রুপ। তেমনি এক গুপের কমান্ডার আনোয়ার। ভীষণ সাহসী আর নির্ভিক। আলগী নামক গ্রামে এক অপারেশনে আসে। এই আলগী গ্রামের অবস্থান মাধবদী বাজার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মাধবদী বাজারে অপারেশন চালানোর জন্য কান্দাপাড়া আর আলগী গ্রামের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

মুরালাপুর হয়ে আনোয়ারের গ্রুপ আলগী ভুইয়া বাড়িতে অবস্থান নেয়। পাক-হানাদারদের ভয়ে আলগী গ্রাম প্রায় ফাঁকা তখন। আলগী গ্রামে তখন ইতস্তত বোঁপোরাড় আর জসল। একটা বড়, মাটির রাস্তা একেবেঁকে মাধবদী বাজারের দিকে চলে গেছে। ভুইয়া বাড়ির দোতলা দালানটিতে গড়ে ওঠে আনোয়ারদের আস্তানা। উদ্দেশ্য, এখান থেকেই আস্তে আস্তে মাধবদী বাজার মুক্ত করে সামনে পাঁচদোনার দিকে এগুবে তাঁরা। সব প্ল্যান ঠিক হয়। কবে অপারেশন হবে, কে কোথায়, কোনদিক দিয়ে অতর্কিতে হামলা চালাবে— সবকিছু। অপারেশনের আগের রাতে, যখন সবাই গভীর ঘুমে। তখনই হঠাত বুটের ধূপধাপ আওয়াজে ঘূম ভেঙে যায় আনোয়ারদের। কিছু বোঝার আগেই বাড়িটি তিনিদিক থেকে ঘিরে ফেলে পাক সেনারা। বাকি একদিকে কাঁটাবন। লম্বা চাবুকের মতো লতার সারা গায়ে কঁটা। এ কঁটার ঘন জসল ছিলো সেদিকটায়। কয়েকজন ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে সেই কাঁটায়। কোন মতে সারা শরীর ছিলে বের হয়ে দৌড়ে চলে যায় ডোকাদীর দিকে। পালাতে পারে না আনোয়ারসহ কয়েকজন। আটকা পড়ে তারা।

ঘরে ঘরে তল্লাশি হয়। পাওয়া যায় যুদ্ধের নানা সরঞ্জাম। "সাক্ষাৎ মুক্তি"- প্রমাণিত। এগিয়ে আসে রশীদ, রাজাকার রশীদ নামে যিনি এখন সর্বাধিক পরিচিত। মাধবদীর অদৃয় বাগবাড়ি নামক জায়গায় যার বাড়ি। তার নির্দেশে বেঁধে ফেলা হয় আনোয়ার আর তাঁর সঙ্গীদের। আনোয়ার শুধু

একবার বলে, "আপনে না আমার চাচতো ভাই...! আপনে এই জালিমগো হয়া আমারে মারোনের লাইগ্যা লইয়া যাইতাছেন, রশীদ ভাই? অহনো সময় আছে আমরা ইচ্ছা করলেই এগোরে শ্যাষ কইরা দিতাম পারি...।" রাজাকার রশীদ তখন আনোয়ারকে ধমক দিয়ে বলে, "দশের লগে গান্দরী করছস তুই। এহন তোরে মায়া কইরা আমি মরমু নিহি"?

বাড়ির নিচে কাঠাল গাছের সাথে বাঁধা হয় তিনজন মুক্তি সেনানীকে। তারপর রাজাকার রশীদের নির্দেশে তাঁদের বুক বরাবর চালানো হয় গুলি। গুলির ধাক্কায় দেহগুলো লাফিয়ে ওঠে, রক্তে ভেসে যায় কঁঠাল গাছের তলা...। রশীদেরা ফিরে যায় একসময়। আনোয়ারদের লাশ ফেলে রেখে যায় রক্তের নালায়।

আমি যতোবাই এই বাড়িটির সামনে দিয়ে যেতাম, ততবাই মনে হতো- হয়তো ঠিক এখানটাতেই পড়েছিলো আনোয়ারের মুক্তিকামী শরীরটি, হয়তো এখনো তিনি ঘোলা চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এক জিজসু দৃষ্টি নিয়ে। আমি, স্বাধীনতা-উত্তর এক প্রজন্ম, কী-ই বা করতে পেরেছি আনোয়ারদের জন্য?

কিছু যে করিনি তাও তো নয়। যখন সেভেনে পড়ি তখন রশীদ রাজাকারের ছোট ভাই আমাদের বাড়িতে আসে। আমি সবার সামনেই চিৎকার দিয়ে বলেছিলাম, "তোমার ভাই একটা রাজাকার...।" প্রবল শাসনের ভেতর রাখা আমার মা আমার এমনতর 'ওন্দত্যে' সেদিন কিছুই বলেনি। কেউ যদি ঢাকা থেকে সিলেট যান, পাঁচকুরী বাজারের পর একটা জায়গায় 'উট মার্কা চেটেচিন'-এর কারখানা দেখতে পাবেন। জায়গাটার নাম বাগবাড়ি। লোকাল বাসের এখানে একটা স্টেপেজ আছে, "রশীদ রাজাকারের বাড়ি"।

বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর মনে হয় স্টেপেজটা ঐভাবে আর বলে না কেউ।

লোকটি এখনো জীবিত যে!

৩১ শে মার্চ, ২০০৭

## লাশ ঘিরে শকুনের বিকৃত উল্লাস

### তীরন্দাজ

মরিচাকান্দি থেকে নরসিংদী। লপ্তে গ্রামের সাধারণ

মানুষের সাথে শহরে সাহেবদের ভাইড়। প্রতিটি চেহারাতেই ভয় আর দুর্ভাবনার ছাপ। প্রতিটি মানুষই যেন মুত্যকে সামনে রেখেই বেরিয়েছে পথে। কারো সাথে কারো কথা নেই, সে সাহসও হারিয়ে ফেলেছে সবাই। নদীর পানি থেকে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ। ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, ভয়াল দুর্গন্ধ। সবার চোখ নদীর বুকে নিবন্ধ, দৃষ্টিতে বেদনার ছাপ। কিসের এই দুর্গন্ধ?

লাশ! লাশ! লাশ! এ দুর্গন্ধ লাশের। পশুর নয়, মানুষের লাশ। শত শত বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে।

নরসিংদী থেকে ঢাকা অবধি বাসযাত্রা। রাস্তায় রাস্তায় বাস থামিয়ে তল্লাশি। হায়েনার কুটিল চেহারায় আজরাইল সেজে পাকিসেনাদের দল, আর তাদেরকে সহায়তায় রাজাকারের শকুনি চোখ। এ যাত্রা অপরিচিত নয়। পাঁচদোনা বাজার। প্রায় প্রতিটি দোকান পুড়ে ভস্মীভূত। রাস্তার দু'পাশে লাশ। আগুনে পোড়া লাশ, বন্দুকের গুলিতে ক্ষতিবিন্দুত আমার ভাইবোনের লাশ! আর সে লাশ ঘিরে শকুনের বিকৃত উল্লাস! রাস্তার ধারে খালে বিলে লাশ। কারো শরীর খুবলে খেয়েছে মাছ, কাক আর শকুনের দল। একটি লাশের কথা এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। অর্ধেক পানিতে, অর্ধেক ডাঙ্গায়। শক্ত হয়ে যাওয়া দু'হাত উঠ করে তলা। দুই হাতে জলজ আগাছা খুলে তসবিহর মতো। মনে হচ্ছে, আঞ্চলিক কাছে ফরিয়াদ তার মৃত্যুর আগে। এ দৃশ্য কারো দেয়া বর্ণনা

# একজন মুক্তিযোদ্ধা বাবা ও তাঁর সন্তান

প্রচেত্য

বিজয়ের এ দিনে কোন স্মৃতিশোধে যাওয়া হয় না, না কোন সমাধির পাটাতনে একগুচ্ছ লাল-সবুজ গোলাপ দেয়া হয়, কোন শোভাযাত্রায় পিছনের সারিতেও আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কোন আনন্দ মিছিলে উল্লাসরত তরঙ্গ-তরঙ্গীর ভীড়েও এই মানুষটির অস্তিত্ব নেই, সকালে পত্রিকার পাতায় বড় বড় করে পৃষ্ঠা জুড়ে দেওয়া মন্ত্রী মহোদয়ের বিজয়ের বাণীও পড়া হয় না, টেলিভিশনের রঙিন পর্দায় স্বাধীনতার বছরগুলোর কোন যুদ্ধ স্মৃতির দৃশ্যও দেখা হয় না, আমার অক্ষমতা, আশংকা এ দিনেও আমাকে সংকুচিত করে রাখে।

এ বিজয়ের দিনে আমার একমাত্র প্রধান এবং সর্বউত্তম কর্ম, তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করা, তিনিই আমার বাবা, একজন মুক্তিযোদ্ধা বাবা। বিজয়ের দিনটি শুরু করি এভাবেই, কারণ তিনিই আমার কাছে একটি স্মৃতিশোধ, একটি

শোভাযাত্রার উপলক্ষ, আনন্দ মিছিলের উল্লাস, পত্রিকার সব কটি কবিতার বাণীর ছন্দ, তিনিই মুদ্যুদ্ধ, যুদ্ধের অস্ত্র, রসদ, কঠের বজ্রস্বর, অর্জন এবং সর্বোপরি বিজয়। বিজয়ের সব অর্জনকে দেখতে পাই আমার মুক্তিযোদ্ধা বাবার দৃষ্টিতে যেমনটি অনুভব করি সমস্ত হারিয়ে যাওয়া, বেঁচে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের চেখের ভাষায়।

বাবার কাছ থেকে তার অনুভবটি কিছু সময়ের জন্য হলেও ধার চেয়ে নিই, টগবগে রক্তের এক যুবক, মায়ের আঁচল ছেড়ে নিয়েছের তোয়াক্তা, যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রহাতে এক স্বাধীন দেশ গড়ার প্রত্যয়ে সাধারণ সৈনিক, অসাধারণ বনে

বাবার নেশায় দশটা বুলেট বিন্দু শকুনের দেহ আর একটি বুলেটের অপেক্ষা, ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে পাশের ভাইয়ের রক্তমাখা শার্ট, বোনের ইঞ্জত হারানোর দৃশ্যে চোখদুটাকে অভিশাপ দেয়া, সন্তান হারানো মা-এর হাহাজারির আর্তনাদ আরো বিদ্রোহী করে তোলে, অবশ্যে যখন বিজয় এল উল্লাস তখন রক্ষে রক্ষে, উল্লিসিত হতে পারিনি খুঁজে ফিরেছি হারিয়ে যাওয়া মা, ভাই আর বোনকে।

সময় গড়িয়েছে, পার হয়েছে আরও কঠটি বছর, উল্লিসিত হতে পারি না আজও, উল্লাসের এ দিনে শোক, ব্যথা, বেদনা, হারানোর কষ্টগুলোও আমাকে ভাবায়, কাঁদায়। একটিই কষ্ট আজও, আমাকে বাস করতে হচ্ছে তাদের সাথে, যাদের সাথে যুদ্ধের আগে ও পরে যুদ্ধ হয়েছে, জয় হয়েছে একটি দেশের কিন্তু হারাতে পারেনি রাজাকারদেরকে তাদের দোসরদেরকে, রক্তের পিশাচদের।

পরাজিত এক সৈনিকের আত্মকষ্টে ভোগা মুক্তিযোদ্ধা বাবার সমস্ত দায়িত্বকু যখন আমার হাতে হস্তান্তরিত হয় তখনও সমস্ত বিস্ময়, ভয়, আশংকা কাজ করে আমিও কি পারব? না আমার উত্তরসূরীদের হাতে এভাবেই হয়ত হস্তান্তরিত হবে দায়িত্বটি যা যুগ যুগ ধরে বয়ে চলবে তাদের উত্তরসূরীদের কাছে? আজ গর্ব করতে পারি আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান- যে গর্ব এদেশ করবে, দেশের মানুষ, আমার সন্তান, তার সন্তান তার তার এবং তার কোনদিন মৃত্যু হবার নয় এ গর্বের।

১৬ ডিসেম্বর ২০০৭

নয়। নিজে দেখেছি। এখনও ঘুমের ঘোরে, দৃঢ়স্বপ্নে দেখি। জামাত, ধর্মান্ধদের উল্লাসে আরো বেশি দেখি।

মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা। মধুমিতা সিনেমা হল। স্তুপীকৃত করে জমিয়ে রাখা লাশ! মানুষের লাশ। এদেশের মুক্তিকামী মানুষের লাশ। আর শকুনের উল্লাস! আজও দেখি সেই শকুনেরই উল্লাস! কেন এত লাশ? কারা এই গণহত্যার হোতা আর তাদের দোসর? ইতিহাস কি নিজেই নিহত? আজও কি তার প্রমাণ দিতে হবে যে, এর হোতা পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী আর তাদের দোসর রাজাকার, আল বদর, আর আল শামসের পৈশাচিক গণহত্যার ফসল?

জামাতের শকুন মুজাহিদ এতদিনে একটি কাজের কাজ করেছে। নিজের ফাঁদে নিজেই দিয়েছে ধরা। নব্য জামাতীর দল এতদিন রাজাকার, আল বদর, আর আল শামসের হত্যাকারীদের সাথে জামাতের সম্পৃক্ততা অঙ্গীকার করে এসেছে। এবার মুজাহিদ “বাংলাদেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই” বলে হত্যাকারীদের সাফাই গেয়ে নিজেদের অপরাধের প্রমাণ দিয়েছে। এই নব্য রাজাকের প্রতি সার্বক্ষণিক ঘৃণা। এরা ধর্মের প্রমাণ দিতে চৌদশো বছরের আগের কাহিনী গড় গড় করে বলে যায়, অর্থচ ৩৭ বছর আগের কাহিনী ভাবতে গিয়ে কোন সঠিক যোগসূত্র খুঁজে পায় না।

আমার কাছে এই চৌদশো বছর আগের কাহিনীর চেয়ে ৩৭ বছর আগের এই অনেক বেশী মর্মান্বাহী। আমি হিন্দু না মুসলিম, তাতে কিছু যায় আসে না, আমি নাস্তিক না আন্তিক এটাও কোন বিবেচনার বিষয় নয়, আমি মানুষ বলেই আমার কাছে আমার কাছে ৩৭ বছর আগের এই গণহত্যা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, আমার মানসে অনেক জামাতিরা তো মানুষ নয়। এরা শকুনের দল!

# একটি সাধারণ ঘটনা, যা একটি পরিবারের জন্যই শুধু অসাধারণ

সাজেদ

আমার বাপ-চাচারা ছিলেন সাতজন। ত্রিটিশ আমলে স্কুল ইংসিপেন্টের আমার দাদা অত্যন্ত রাশভারী, রক্ষণশীল এবং অতি সৎ মুসলমান ছিলেন। বাপ-চাচারা আমার দাদার মতই কর্মজীবনে সততার ত্রুটি করেননি। তবে অতিরিক্ত শাসনের কারণে হয়তো কখনও কেউ তেমন প্রতিবাদী, উচ্ছল চরিত্র পায়নি। অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিবাদ আমাদের প্রথম জেনারেশনের মধ্যে তেমন দেখা যায়নি। এর ব্যতিক্রম ছিলেন আমার মেজ চাচা। উনি বাড়ির একঘেঁয়েমির মধ্যে অনেক সময়ই নতুন কিছু করতেন, কোন অন্যায় দেখলে উনি প্রতিবাদ করতেন। দাদার কথার ওপরে কেউ কোন কথা বলতে সাহস না পেলেও মেজ চাচা অনেক সময় এগিয়ে যেতেন। বড় পরিবারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আর্থিকভাবে অস্বচ্ছ সদস্যদের ব্যাপারে তিনি সবসময় খেয়াল রাখতেন। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ১৯৭০ সালের ভয়াবহ প্লাবনের সময় ঘরের প্রায় সবকিছু তিনি আগের জন্য দিয়ে দেন। আমার মেজ চাচার মতন মানুষ দেশে বিরল নয় অবশ্যই, কিন্তু আমাদের পরিবারে উনি ছিলেন ব্যতিক্রম। মেজ চাচা পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে এমএসসি ফাইনাল দেয়ার পরপরই পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে অফিসার পদে যোগ দিয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। খুব সম্ভবত প্রায় ১৬বছর পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে চাকরি করেন। পাকিস্তানিদের বৈষম্য খুব সম্ভবত তার কাছে শেষের দিকে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদে থাকাকালীন চাচা স্বেচ্ছা অবসরে যান এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য তৎকালীন ওয়াপদাতে কাজ নেন। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে নির্দেশের আলোকে প্রাক্তন সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে আমার মেজ চাচা শহীদ মিনারে এবং পরে বায়তুল মোকাররম প্রাসনে শপথ নেন বাঙালীর স্বাধীনতা আদায়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রস্তুত হবার। ৭১এ চাচা ছিলেন সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে কর্মরত। সেখানে স্থানীয় শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাথমিক সামরিক প্রেরণ করতে করতে লাগলেন। এ পর্যায়ে পাকিস্তানী কর্মকর্তা এবং সেখানকার এক জেসিও-এর সাথে তার বচসাও হয়। এরপর ২৫শে মার্চ ১৯৭১। স্বাধীনতাকামী বিমানবাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মসূলসহ প্রায় সারা দেশ তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তিনি তার দুই কন্যা আর স্ত্রীকে দেশে রেখে ভারতে পাড়ি দেবার মনস্তির করেন। যাবার পথে পৈতৃক বাড়িতে অসহায় অবস্থায় তার দুই ভাইয়ের (আমার ছোট দুই চাচা)।

একটা ব্যবস্থা করার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করে প্রায় হেঁটে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কুষ্টিয়াতে পৌছেন। কুষ্টিয়া তখনো পাকিস্তানীদের দখলে আসেনি। তবে কুষ্টিয়া পতনের লক্ষ্যে চারিদিক দিয়ে সাঁড়াশি আক্রমণ করার জন্য পাকিস্তানী আর্মি জড়ো হতে থাকে। কুষ্টিয়ার প্রতি পাকিস্তানীদের আক্রমণ প্রবল ছিল কয়েকটি কারণে। কুষ্টিয়ার একটি গ্রামে (বৈদ্যনাথতলা) আনন্দানিকভাবে মুজিবনগর সরকার ঘোষণা, মুক্তিবাহিনী কুষ্টিয়াকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুক্তাঞ্চল হিসাবে রক্ষা করে এবং সামরিক অভিযানকালে তারা কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানী বাহিনীর বেশ কিছু সামরিক ও বেসামরিক সদস্যদের হত্যা করেছিল। এর সবকিছুই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অবহিত ছিল। ফলে প্রচল আক্রমণে প্রাণী এবং সম্পদ সবকিছু ধ্বংস করতে করতে তারা শহরে প্রবেশ করে, যাকে বলে 'পোড়ামাটি নীতি'। ১৪ এবং ১৫ই এপ্রিল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তদারিকের শহরের সাধারণ জনতা শহর ছেড়ে গ্রাম এবং ভারতের দিকে চলে যেতে থাকে এবং ১৬ই এপ্রিল পাকিস্তানী বাহিনী প্রচল ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে শহরের ঢুকতে শুরু করে।

আমার মেজ চাচা খুব সম্ভবত এপ্রিলের ১০/১২ তারিখে কুষ্টিয়াতে পৌছেন, তার পরিকল্পনা ছিল ছোট ভাই দুজনকে সাথে নিয়ে ভারতের পথে রওনা দেবেন অথবা ভাই দুজনকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে, তিনি পরিস্থিতি বুঝে পরে যাবেন।

১৬ এপ্রিল ১৯৭১ কুষ্টিয়া শহরের পতন হলো। পাকবাহিনী শহরে কারফিউ দিয়ে তাদের সাগরেদের নিয়ে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এই সময় খুব সম্ভবত আমার চাচা পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত শাস্ত বা কারফিউর বিরতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তার পৈতৃক বাড়িতে বসে প্রতিবেশী এক বৃন্দ ব্যবসায়ী ও অন্য একজনের (সমবয়সী বন্ধুসম) সাথে দেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এরপরের ঘটনা খুব দ্রুত এবং সে সময়ের জন্য সাধারণ। পাকিস্তানী সেনারা আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। দরজায় লাঠি মারার সাথে সাথে তিনি (আমার মেজ চাচা) দরজা খুলে দেন। হানাদাররা পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিজের পরিচয় দেন। পরিচয় পাওয়ার পর প্রাক্তন বাঙালী সামরিক কর্মকর্তা হিসাবে ওরা নিশ্চয় ভেবেছিল ভাল শিকারই পাওয়া গেছে। তাকেসহ তার সঙ্গীদের (বৃন্দ ব্যবসায়ী ও বন্ধু) বাড়ির আসিনায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে হানাদাররা। আমার মেজ চাচার রক্তে রঞ্জিত হলো পৈতৃক ভিটা। চাচা এবং বৃন্দ ব্যবসায়ী

শহীদ হলেন। বন্ধুটি বেঁচে গেলেন (?)। হানাদাররা বাড়িতে ঢুকে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাদের লাশ সমাধিস্থ করার সুযোগ আর হয়নি। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমার চাচার সেই বন্ধুটির কাছ থেকে সেই সময়ের ঘটনার বিবরণ আমরা জানতে পারি। তিনি এবং তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরা তৎকালীন সময়ে কুষ্টিয়ার জামাতে ইসলামীর প্রতিবাশলী নেতা ছিলেন, এখনও আছেন। এডভোকেটসম্মন্দ এই পরিবারের একজন সদস্য তৎকালীন মালেক মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হয়েছিলেন। আমার চাচার হত্যাকালীন সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী, আশ্চর্যজনক বেঁচে যাওয়া সঙ্গীটি ঢাকায় এসে আমাদেকে সেই কর্ণ সময়ের বর্ণনা দেন। তার ভাষ্যমতে, তাদের তিনজনকে (সে, আমার চাচা আর বৃন্দ ব্যবসায়ী) বাড়ির আসিনায় দাঁড় করায় হানাদাররা। এ সময় আমার চাচার সাথে সেনাদলের কোন অফিসারের বাকবিতভা চলছিল। এক পর্যায়ে তিনজনের দিকে খুব স্বল্পন্দরতে গুলি ছোড়ে একাধিকবার, বেয়েনেটও চার্জ করে তারা। কিন্তু এই জামাতি এডভোকেটে বন্ধুটি সেই সন্ধিক্ষণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেয়ে অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যায়। পরবর্তীতে যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে সে নিজেকে দুটি লাশের পাশে আবিষ্কার করে এবং আগুনে প্রজ্বলিত নির্জন বাড়ি থেকে সে অর্থমৃত অবস্থায় পালিয়ে আসে। এসব ঘটনা যখন সে বর্ণনা দিচ্ছিল তখন সদ্য বিধবা আমার চাচী লক্ষ্য করেন যে, তার মৃত স্বামীর ঘড়িটি জামাতি এডভোকেটটির হাতে শোভা পাচ্ছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়, প্রচল ক্ষমতা তখন তাদের। তারপরও বিষয়টি তার গোচরে আনেন আমার বাবা, নিতান্ত বাধ্য হয়ে। কারণ এই স্মৃতিচিহ্নটি ছিল আমার চাচার পরিবারের জন্য মূল্যবান। তার (জামাতী এডভোকেট) ভাষ্য অনুযায়ী, স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেই সে আমার চাচার লাশের হাত থেকে খুলে রেখেছিল। যা হোক, পরে সে চাচার এই ঘড়িটি ফেরত দেয়। এর বেশ কিছুদিন পর আমাদের আর এক প্রতিবেশী (আমাদের বাড়ির নিকটস্থ বসবাসকারী) জানায় যে, ১৬ই এপ্রিল কুষ্টিয়া পতনের সময়, প্রচল গভগোলের মুহূর্তে কুষ্টিয়া শহর থেকে পালাতে ব্যর্থ হয়ে শহরে থেকে যায়, এই ঘটনার মুহূর্তে সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে, বিশিষ্ট জামাতি এডভোকেটটি পাকিস্তানী সেনাদলকে সাথে নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকছে। যেখানে মেজ চাচা এবং সেই বৃন্দ ব্যবসায়ী অপেক্ষা করছেন শহরের পরিস্থিতি শাস্ত হবার।

# বাবার মুখে শোনা মুক্তিযুদ্ধ

আহমেদ শারফুদ্দীন

একান্তরে আমার বাবা ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কলেজের একজন মুক্তিপাগল ছাত্র। ২০/২১ বছরের তাগড়া যুবক। মিটিৎ মিছিলে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আস্ফালন। রক্তবারা দিনগুলির শুরুতেই নাড়ির টানে ছুটে গিয়েছিলেন গ্রামে। বর্তমানে কর্মবাজার জেলার রামু থানার স্টেডগড় নামের এক অর্থ্যাত গ্রাম। সেই সময়কার পার্বত্য চট্টগ্রাম। সারা দেশে জুলছিল মুক্তিযুদ্ধের লোলিহান শিখা। বাবা ও কয়েকজন বন্ধু ঠিক করলেন যুদ্ধে যাবেন। রাতের বেলা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জোয়ান ছেলেদের যুদ্ধে যাওয়ার ডাক দিচ্ছিলেন। তাদের এই কাজ সহ্য হয়নি কিছু কুভার। গভীর রাতে বাবার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় এসে খবর দিল রাজাকার আর পাঞ্জাবীরা আসছে উনাদের ধরার জন্য। সেই রাতেই আমার বাবা, কাশেম আকেল, মুরল ইসলাম বাংগালী (মুক্তিযুদ্ধে দুর্দান্ত ভূমিকার কারণে এতদঅঞ্চলের লোকজনের কাছে তাঁর বাংগালী বলে বেশি পরিচিত), সিরাজ ডা. বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে চলে আসেন বান্দরবানে। নাম লেখান মুক্তিবাহিনীতে, শপথ নিয়েছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন করার। প্রায় একমাস টেনিং নেয়ার পরে এক রাতের অন্ধকারে উনারা ফিরে আসছিলেন গ্রামে, দাদীর কাছ থেকে বিদায় নিতে। সেই রাতে দাদী নাকি বিলাপ করে চিংকার করে কেঁদেকেটে নিশ্চিত রাতের আসমান জয়িন এক করছিলেন।

মুক্তিবাহিনী ঘাঁটি গাড়ছিল কালো পাহাড় নামের গহীন অরণ্যে ছন্দোলার ভিতরে। যুদ্ধ করছিলেন স্টেডগড়, স্টেডগড়, উখিয়া, ডুলাহাজারা ও রামুতে। অরণ্যের মগ, মুরং বা চাকমারা তখনো জানেনা যুদ্ধ কী। শুধু জানে ১৫-২০ জনের একটা দল পাঞ্জাবী মারার জন্য ফেরারী হয়েছে। মুরংরা মুক্তিবাহিনীর খাওয়া দাওয়া সবকিছুর ব্যাপারে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন কয়েকজন মুরং যুবকও।

বাবার ভাষায়, সচক্ষে দেখা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল স্টেডগড় বাস স্টেশনের পাশে ছেউ লোহার ব্রীজটাতে। বাস স্টেশনটা কর্মবাজার শহর থেকে ২৫ কি.মি. আগে। খবর আসে, কর্মবাজারে পাকি মিলিটারীর একটা দল আসছে

আর স্টেডগড়তে ছিল পাকিদের দুর্বল ডিফেন্স। মুক্তিবাহিনীর কাছে পর্যাপ্ত গোলা বারংবার ছিল না। পাহাড়ি যুরংদের পাঠানো হল গ্রামে। গ্রামবাসী তাদের চেরাগের শেষবিন্দু কেরোসিনটুকু ঢেলে দিলো ভামে, যুদি দোকানিরা দিল তাদের দোকানের সব কেরোসিন। গ্রামে না হয় আর কোনদিন চেরাগ-ই জুলবে না!!! বন্ধ হল কয়েকটা গ্রামের ডিজেলচালিত রাইসমিল। আমার দাদী দিলেন সারা বছরের খোরাক ২০০ আড়ি ধান বেচা টাকা।

সূর্য ডুরতেই চারটা মৌকা নিয়ে মুক্তিবাহিনী রওয়ানা হলো। সারা রাত মৌকা চলল ভাট্টি, স্টেডগড় থেকে স্টেডগড়, গন্তব্য-স্টেডগড় ব্রীজ। ভোর হতে আরো দেরি ছিল। লোহার ব্রীজের কাঠের পাটাতনে কায়দা করে বিছানো হল কয়েকশত চট্টের বস্তা। একজন উঠে গেল বিরাট এক মেহগনি গাছের আগায়। ব্রীজের দুই মাথায় মুক্তিবাহিনীর দুইটা দল বসে আছে, কখন আসবে হায়েনার দল? কখন মেহগনি গাছের উপর থেকে তাদের দিকে টর্চ মেরে সংকেত দেয়া হবে?? অবশ্যে মিলিটারিদের আসার সংবাদ পাওয়া গেল, গাছের ওপর থেকে টর্চ মারা হল, ব্রীজের উপরে চেলে দেয়া হল গ্রামে গ্রামে কেরোসিন। হ্যাঁ, মিলিটারির দুইটা ট্রাক উঠে গেছে ব্রীজ। ব্রীজের দুই মাথা থেকে একই সাথে লাগিয়ে দেয়া হল আগুন। রাতের কালো আকাশ লাল হল, প্রচন্ড যুদ্ধ হল। বেরিসিক আগুন আর দুই দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ! ২০-২৫ জন মুক্তি সেনার হাতে শিয়াল কুভার মত মরল ৫/৬ ডজন পাইক্যা 'হাইওয়্যান'।

'অ - মা - রে'- গগনবিদারী আর্তচিকারে সবাই পিছনে ফিরে এলেন। হায়েনার বুলেট বিধেছে শাস্তির পায়রার বুকে! রক্তে লাল হলো স্টেডগড় খাল। ভোরের প্রথম আলোয় অন্ধকারে স্থিমিত হল দুটি চোখ, বুকের মানিক হারালেন এক মুরং মাতা। রক্ত দিয়ে লেখা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অলিখিত সৈনিক হয়ে গেলেন মঙ্গোলীয় বংশধারার এক আদিবাসী মুরং যুবক।

১০ এপ্রিল ২০০৮

## বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী যোদ্ধা শহীদ গিরীন্দ্র সিংহ

কুস থাং

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য জাতিসভার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অনেকেই বিষয়টা প্রায় ভূলে থাকতে চান। ফলে ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ পড়ে যায় তারা। হিসাব-নিকাশ না করে কেবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শুন্দি জাতিসভার মানুষ কীভাবে জীবনবাজি রেখে বাঁপিয়ে পড়েছিল, ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ পড়ে যায় সেই পরিচেছেন।

এ রকমই এক শহীদের নাম গিরীন্দ্র সিংহ। জাতিগত পরিচয়ে মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ভূক্ত। জন্ম তার ১৯৩০ সালে তৎকালীন মৌলভীবাজার মহকুমার কমলগঞ্জের মাধবপুরে আউলেকি গ্রামে।

মণিপুরী গ্রামের পেছনে নদী সংলগ্ন শ্যাশানঘাট থেকে পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের সাথে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তার সংগঠন ও নেতৃত্বে ছিলেন গিরীন্দ্র। সাধারণ অস্ত্র লাঠি, বর্শা এবং আরো নানান প্রাচীন অস্ত্রকে সম্বল করে পরিচালিত হয় এই লড়াই। রক্তে লাল হয় ধলাই নদীর পানি। ১৯৭১ সালের আগস্টের ১২ তারিখে হানাদাররা মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া সমাজের পুরোহিত সার্বভৌম শর্মাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। এরপর ফুসে উঠে গিরীন্দ্রের নেতৃত্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের তরুণ সম্প্রদায়। মুক্তিবাহিনীতে মণিপুরী যোদ্ধাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাবুসেগা সিংহ, থিবী সিংহ, নিমাই সিংহ, বাসত্তী সিংহ, বসাত্তুকুমাৰ সিংহ, পদ্মাসেন সিংহ, রবীন্দ্র সিংহ, আনন্দ সিংহ, মন্ত্রী সিংহ, নীলমণি চ্যাটার্জিসহ অসংখ্য বীর তরুণ জীবনবাজি রেখে মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ সংবাদবাহক হিসাবে, কেউ বা সংগঠকের ভূমিকায়, আর গিরীন্দ্র ছিলেন তাদের মধ্যমণি।

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মান্তরে অন্যতম এই কারিগরের পরিবার ও উত্তরসূরীরা কেউ আজ পর্যন্ত রাখ্তের কাছ থেকে কোন আনুকূল্য পায়নি, কারণ গিরীন্দ্রকে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা সাটিফিকেট বা পদক দিয়ে জাতে তোলা হয়নি। কয়েক বছর আগে স্থানীয় উদ্যোগে শিববাজারের মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী প্রাঙ্গনে শহীদ গিরীন্দ্র সিংহের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। অভাবক্রিয় গিরীন্দ্রের উত্তরসূরীরা সেই স্মৃতিস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে পাওয়া ন্যন্তর সাত্ত্বনায় রাষ্ট্রের উদাসীনতাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না।

৯ মার্চ ২০০৮

# ‘৭১ এর বুড়ি : সাধারণ কিছু মানুষের গল্প

## ফারহান দাউদ

একটা গল্প শোনাই । সাধারণ গল্প, ছেট গল্প । বর্ণনার রঙচঙে হয়তো অসাধারণ হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু সাদাকালো সত্যি ঘটনার ছেঁড়া অংশে রঙের প্লেপ দিয়ে সেটাকে আর কিন্তুকিমাকার করে তুলতে চাই না । গল্প যুদ্ধের, তবে বীরত্ব, নাটকীয়তা, নায়ক-নায়িকা, ক্লাইম্যাক্স আছে কিনা বিচার করতে পারিনি । সময়টা খুব পরিচিত ১৯৭১ । মাস, মনে নেই, কারণ কথক দেবাশিষ দারও মনে ছিল না, তিনি আবার শুনেছিলেন কোন এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের কাছে, যে যোদ্ধা এই গল্পের আপাত নায়ক ।

স্থানটা ভালুকার কাছাকাছি কোথাও । মুক্তিযোদ্ধাদের ছেট একটা দলের দায়িত্ব সেখানকার একটা বিজ উড়িয়ে দেয়া । কারণ? কারণ পাকবাহিনী বেশ বড়সড় একটা দল আর সাঁজোয়া বহর নিয়ে এগোচ্ছে বিজের ওপরে ক্যাম্প ফেলবে বলে, ওদিকের মুক্তিবাহিনীকে নির্মূল করাই যাব উদ্দেশ্য । কাজেই ঠেকাতে হবেই, যেভাবেই হোক ।

সবকিছু দেখেশুনে রেকি করে বিজ উড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়ে গেল । যে রাতে পাকবাহিনী আসবে, তার বেশ খানিক আগে এসে বিজে ডিনামাইট পাতার কাজ শেষ । ইচ্ছা, পাকবাহিনীর মোটামুটি বেশিরভাগ অংশটা বিজে উঠলে সেটা উড়িয়ে দেয়া হবে, ক্ষয়ক্ষতি যতটা বেশি হয় আর কি । রাত গভীর হচ্ছে, ছেলেরা ওঁত পেতে বসে থেকে মশার কামড়ে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, মাথামোটাগুলোর দেখা নেই । মোটামুটি অধৈর্য হয়ে গেছে যখন সবাই, ভারি গাড়ির শব্দ শোনা গেল । বোৰা গেল, মহাজনরা আসছে । সবাই যার যার জায়গা নিয়ে তৈরি । আস্তে আস্তে পুরো বহরটা দেখা গেল, বেশ বড় । দ্রুত ঠিক করা হয়ে গেল, প্রথম সাঁজোয়া গাড়িটা বিজের মাঝাখানটা পার হলেই বিজটা উড়িয়ে দেয়া হবে । কিন্তু প্রথম গাড়িটা যখন বিজের কাছে চলে এসেছে, তখনি লাগলো গোলমাল । হঠাত করেই ক্ষেত্রে মাঝাখান থেকে এক বুড়ি উদয় হল, আর হলো তো হলো, রাস্তা পার হয়ে অন্যদিকে যাবার বদলে সোজা বিজের উপর উঠলো । এইবাবে সবার মাথায় হাত । গাড়িগুলোও বিজের খুব কাছে চলে

এসেছে । এদিকে খুড়খুড়ে বুড়ি দেখেই কিনা পাকবাহিনীও বুড়িকে না থামিয়ে যেতে দিচ্ছে । এদিকে ঐপারে চাপা গলায় তর্ক শুরু হয়ে গেছে, কী করা যায় তা নিয়ে । কারণ বুড়ির যে হাঁটার গতি আর ভাব, তাতে বোঝাই যাচ্ছে বুড়ি বিজ পার হতে হতে পাকবাহিনীও পগড় পার হয়ে যাবে । কমবয়সী একজন পরামর্শ দিলো যেহেতু এই বহরটাকে থামাতে না পারলে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় রকম বামেলায় পড়তে হবে, কাজেই বুড়ি থাকলেও কিছু করার নেই, উড়িয়ে দেয়া হোক বিজ । কিন্তু বেঁকে

‘ ’

কমান্ডার, প্রায় ২০ বছর পরও, এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি । শুধু চোখ মুছে বলেছিলেন, আমরা সবাই, এদিন থেকেই জানতাম, যে দেশে এমন মা আছে, এই দেশের মানুষকে দুনিয়ার কেউ আটকাতে পারবে না । আজ হোক কাল হোক স্বাধীন আমরা হবই ।

‘ ’

বসলেন কমান্ডার স্বয়ং । না, কিছুতেই না । পাকবাহিনীকে থামানো কর্তব্য, তাই বলে নিরপোধ এক বুড়ো মানুষকে মেরে ফেলবো? সেটা হবে না । তর্ক আরো ঘোরালো হয়ে উঠলে কমান্ডার শেষমেষ হৃষি দিলেন, কেউ এ কাজ করার চেষ্টা করলে তিনি সোজা গুলি করবেন, এরপর যা হয় হোক । বাধ্য হয়ে অন্যরা মেনে নিলো । যাই হোক, দেখা গেল অনুমান ঠিক, বুড়ি বিজ পার হয়েছে । পাকবাহিনীও প্রায় পার হয়ে

এসেছে, এখন আর খামোখা ডিনামাইট ফাটিয়ে লাভ নেই । মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছেন ব্যাপারটা কি হলো, এমন সময় সবাই আবার একটু সজাগ হয়ে উঠলেন । কারণ সেই বুড়ি বিজ পার হয়ে তাদের খুব খুব কাছে চলে এসেছে । হাতে কিছু একটা আছে, পুঁটিলির মত । দেখে মনে হলো কাউকে খুঁজছে । এবার যোদ্ধাদের পালা । আটপট বুড়িকে ঘিরে ফেলা হলো । বুড়িকে দেখে অবশ্য মনে হলো না ভয় পেয়েছে । সোজা জিজ্ঞেস করলো- “বাবারা তোমরা মুক্তিবাহিনীর পোলা?” কমান্ডারের উত্তর-- “ক্যান আপনের কী দরকার?” এবার বুড়ির উত্তর-- “কালকে শুনছি এইপারে মুক্তির পোলারা আসে, অনেক কষ্ট কইয়া পোলাগুলি যুদ্ধ করে, খাইতে পায় না ঠিকমত । মনে করছি ঘরে যা আসে নিয়া যাই, দিনে তো পারি না বাবারা, রাইতে কেউ দেখে না, এইজন্য বাইর হইছি খাওয়া নিয়া, এইদিকে কোন জায়গায় কাউরে পাইলে খাওয়াগুলো দিতাম ।” কমান্ডার আর যোদ্ধারা এবার নীরব, মুখে ভাষা আসবার কথাও না । একটু আগেই কিনা এই বুড়িকেই তারা বিজসহ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল । বুড়ির এই পুঁটিলিতে বেশ কিছু খাবারদাবার, না-দেখা না-চেনা কোন মায়ের সন্তানের জন্য, যারা যুদ্ধ করছে তাদের মায়ের জন্য, দেশের জন্য । কোথা থেকে এল এই মমতা? কিসের জন্য পরের সন্তানের জন্য নিজের সন্তানের খাবার নিয়ে অন্ধকার পথে কোন মা ছুটে আসে? কমান্ডার, প্রায় ২০ বছর পরও, এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি । শুধু চোখ মুছে বলেছিলেন, আমরা সবাই, এদিন থেকেই জানতাম, যে দেশে এমন মা আছে, এই দেশের মানুষকে দুনিয়ার কেউ আটকাতে পারবে না । আজ হোক কাল হোক স্বাধীন আমরা হবই । যুদ্ধে আমরা জিতবোই, জিতবোই ।

এই সত্যি ঘটনাটা দেবাশিষ দার মুখে শোনা, ময়মনসিংহের এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের কাছে । জানি না কারো স্মৃতি হিসাবে কোথাও লেখা হয়েছে কিনা । খুব দাগ কেটেছিলো, চোখ মুছেছিলাম সবাই, শ্রোতারা । মনে হলো, সবাইকে একবার শোনাই, নাইবা থাকলো অসাধারণ কোন বীরত্বগাথা, শোনাতে তো সমস্যা নেই ।

# একান্তরের ঘটনা : এক বুড়ি কামরাঙ্গা...

মেহরাব শাহরিয়ার



[আমার বাবার কাছ থেকে শোনা ছেট এক টুকরো ঘটনা]

ঢাকা মেডিকেলের নতুন যে ব্যাচটির ক্লাশ শুরু হওয়ার কথা ৭১ এর শুরুতে, তার একজন আমার বাবা। বয়স তখনো ১৮ পার হতে বেশ কয়েক মাস বাকি। মার্চের শুরুর দিন গুলোতে বাবা ঢাকাতেই ছিলেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বসবন্দুর মিটিংয়ে অংশ নেন। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে এমন আশংকায় ৭ মার্চের পরেই বাবা ঢাকা ছেড়ে দেশের বাড়ি চলে যান।

ঢাকা-আরিচা সড়কে তখন অনেকগুলো ব্রিজ ছিল না, মাঝের নদীগুলো পারাপারের একমাত্র উপায় ছিল নোকা। যাবার পথে তিনি দেখেন, অসংখ্য মানুষ ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসে বাবা রাজশাহী চলে যান ভারত সীমান্তে অস্ত্রের টেনিং নিতে। রাজশাহী থেকে পাবনা আসার পথে নাটোরের কাছাকাছি পাক আর্মির ৪/৫ জন যাত্রীবাহী বাস থেকে সবাইকে নামিয়ে সার্চ শুরু করে। ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়েসীদের আলাদা একটা লাইনে দাঁড় করিয়ে বলা হয়, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়...

হবে। বাস ডাইভারকে বলা হয় নারী শিশুসহ অন্যান্যদের নিয়ে চলে যেতে। বাবা ছিলেন লাইনে সবার পেছনে, বাসের পেছন দরজার কাছাকাছি। লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করা ছিল পাক আর্মির নিয়ন্ত্রিত ঘটনা। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে বাবা তখন কালেমা পড়ছেন। এর মাঝে খেয়াল করেন লাইনের শুরুর দিকে পাক সৈন্যদের জটলা করে খুব মনযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখতে। বাসে একজন বৃদ্ধ যাত্রী খাঁচায় ভরে কামরাঙ্গা নিয়ে যাচ্ছিলেন। পাকিস্তানি গাধাগুলোর কাছে অচেনা এ ফলটিকে সন্দেহজনক মনে হয়। গ্রেনেডের সাথে আকৃতিতে সামান্য মিল থাকায় তারা দাবি করে এগুলো গ্রেনেড। বৃদ্ধ তখন ফল থেকে প্রমাণ করছেন এগুলো গ্রেনেড না। আর তখন তাকে ঘিরে দাঁড়ানো গ্রেনেড বিস্ফোরণের ভয়ে তটসৃ ৪/৫ জন পাকসেনা।

বাবাসহ লাইনে দাঁড়ানো আরও একজন সুযোগটা কাজে লাগাতে সক্ষম হন, কামরাঙ্গাতে নিবন্ধ সেনাদের দ্রষ্ট এড়িয়ে পেছনের দরজার পা-দানিতে বসে পড়েন, শরীরটা ক্রল করে করে বাসের পাটাতনে টেনে তোলেন। এর সাথে সাথেই বাস ছেড়ে দেয়...

## এক রাত্রির গল্প

রাত্তিম

রাত সাড়ে ৯টা কি ১০টা বাজে। নাজমুল স্যার মাত্র চাচীকে বললো তাড়াতাড়ি খেয়ে লাইট অফ করতে। দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। যত সাবধানে থাকা যায় ততই ভালো। কথাটা শেষ না হতেই ঘরের কড়া নাড়ানোর শব্দ হলো। সবার বুক কেঁপে গেলো। শিউলি আর চয়ন মার আচলের নিচে জড়সড় হয়ে কাঁপছে। নাজমুল স্যার চাচীকে শিউলি আর চয়নকে নিয়ে ভেতরের ঘরে যেতে বললেন। চাচী বারবার বারণ করলো ঘরের দরজা খোলার দরকার নেই, কিন্তু যেভাবে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে শেষে ভেঙে ফেলবে বলে দরজা খুলে দিলো। খাকি পোশাক পরা ৭-৮জন ঢুকলো। তার মধ্যে একজনের মুখ বাঁধা। চাচী পর্দার আড়াল দিয়ে দেখলো খাকি পোশাকের মানুষগুলো এই ঘরে আসছে। নাজমুল স্যারকে এর মধ্যে হাত বেঁধে ফেলেছে। শিউলি আর চয়নকে টান মেরে এপাশে নিয়ে আসল। দুনিয়াটা খুব ছেট হয়ে আসল। নাজমুল স্যারকে ঘরে নিয়ে গোলো। চাচী পাগলপ্রায় হয়ে সারাদিন ঘরে বসে থাকেন। শিউলী আর চয়ন খেলা করে বেড়ায় বাড়ির ছোট উঠানটাতে। পাশের বাড়ীর ভাবীরা চাচীকে বাপের বাড়ি থেকে আসতে বললো কয়েকদিনের জন্য। একদিন সকাল না হতেই রওয়ানা দিলো চাচী, শিউলী, চয়ন ও পাসের বাড়ীর কামালের বাবা। সারা রাত্তিয় ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল চাচী। কামালের বাবা শিউলী আর চয়নকে নিয়ে বসে আছে। পাশেই একটা নদী। অনেক শৈবাল জমেছে। অনেক লোকের ভীড় দেখা যাচ্ছে। কি মনে করে কামালের বাবা ভ্যান দাঢ় করিয়ে ভীড় ঠেলে সামনে গোলো। ডান পা আর বাম হাত কাটা একটা লাশ। ফুলে উঠেছে সাথে দুর্গংস সবার নাকে কাপড়। চাচী একবারেই চিনতে ভুল করলো না। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। কিছুদিন পরের কথা। শিউলীর মা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর মারা যায়। শিউলি ও চয়ন মামাবাড়িতেই মানুষ হতে থাকে।

# বেগমগঞ্জ কালো পুলের বধ্যভূমি

গোলাম আকবর

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ৩১ তম বার্ষিকী পালিত হয়ে গেল গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০২। তারই প্রাক্কালে নোয়াখালী'র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার একটি অকথিত কাহিনী নিয়ে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ছুটলাম নোয়াখালী জেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তরে বেগমগঞ্জ চৌরাস্তায়। সেখানে কালোর স্বাক্ষী চৌরাস্তা "কালো পুল" যা বর্তমানে পাকা ব্রিজ। তারই দক্ষিণে তথ্য চৌরাস্তা সংলগ্ন বেগমগঞ্জ টেকনিক্যাল হাই স্কুল। এই উভয় স্থানই ছিল মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার আলবদর বাহিনীর মানবতা বিরোধী জঘন্য হত্যাযজ্ঞের কেন্দ্র। সেখানে আজও নির্মিত হয়নি কোন স্মৃতি ফলক। স্বীকৃতি পায়নি বধ্যভূমি। এই স্থানের মাটির গভীরে আজও আছে অসংখ্য নারী পুরুষের গণকবর। সেই গণকবরে শুরুরে কাঁদে শহীদের আত্মা। আমরা কেউ কখনও তার খবর রাখিনি। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে নিরপরাধ মানুষকে হত্যার রোমহর্ষক বিবরণী তথ্য হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আনার চেষ্টা থেকে এ তথ্যানুসন্ধান।

একান্তরের ২৬ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করার পর ২২ এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত নোয়াখালী জেলা ছিলো হানাদার মুক্ত। ২২ এপ্রিল বিকেল ৫টায় ৬০-৭০ টি যান্ত্রিক বহর নিয়ে পাকিস্তানী সামরিক কনভয় কুমিল্লা-লাকসাম-সোনাইয়ুড়ি হয়ে বেগমগঞ্জের মীরওয়ারিশপুর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে চৌরাস্তা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এই দিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সে সময়ের মিরওয়ারিশপুর গ্রামের তরঙ্গ যুবক বর্তমানে আইনজীবী এবিএম ফারুক (৫০) বলেন, "ঐ দিন পাকবাহিনী বেচার দেকান সংলগ্ন আমাদের পৈতৃক বাড়িতে অবস্থানরত আমার বাবা জনাব ফরিদ মিয়া (টিটি) এবং আমার ভাই মোঃ ফয়েজকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। আমি তখন বাড়ির আন্দরে লুকিয়ে এই হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করি। এর পর পাকবাহিনী কালো পুল অভিমুখে রওয়ানা হয়।

পুলের সন্ধিক্টে এসে পাক সামরিক কনভয় থমকে দাঁড়ায়। পাক সামরিক কনভয় আসার আগেই স্থানীয় জনসাধারণ কালো পুল ধ্বনি করে দেয়। এতে উভয়ের দক্ষিণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাক সামরিক কনভয় চৌরাস্তায় আসার পথে কালো পুলের

দক্ষিণ প্রান্তে একটি প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্মুখিন হয়। সেই প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় শহীদ সালেহ আহমদ, জহিরুল ইসলাম, পিটু প্রমুখ। এই পাক সামরিক শক্তির নিকট পরাভূত হয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ স্থিমিত হলে পাক সামরিক বাহিনী ঝুলন্ত সেতু নির্মান করে সন্ধ্যা নাগাদ কালো পুল অতিক্রম করে বেগমগঞ্জ টেকনিক্যাল হাই স্কুলে অবস্থান নিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে।"



একান্তর এর ৯ মাসে অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সেদিনের মিরওয়ারিশপুর গ্রামের কিশোর সারোয়ার আলম (৪৫) জানান, "বেগমগঞ্জ টেকনিক্যাল হাই স্কুলের ক্যাম্পে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার ছিলো মেজর বোখারী। এই ক্যাম্পটি ছিলো পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নোয়াখালী জেলার মূল ঘাঁটি।" একান্তর এর টিগবগে যুবক আবদুস সোবাহান বর্তমান বয়স ৬৫

বছর। বাড়ি চৌরাস্তা সংলগ্ন নাজিরপুর থামে। একান্তরের পুরো নয় মাস আবদুস সোবাহান চৌরাস্তার কালো পুলের পূর্ব পার্শ্বের বেহাল জালে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। তখন কালো পুল, কাঠের পুল ছিলো অনেকটাই ভাঙাচোরা। তার পাশেই নির্মিত হয়েছে বর্তমানের পাকা ব্রীজ। আবদুস সোবাহান বলেন, "পাক সামরিক বাহিনী টেকনিক্যাল হাই স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করার পর পরেই মাইজন্ডী থেকে ৫ জন নিরপরাধ স্বাধীনতাকামী বাঙালীকে ধরে এনে কালো পুলের উপরে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে। একজন সৌভাগ্যক্রমে সেদিন বেঁচে যান। এভাবে পাক হানাদার বাহিনী এ অঞ্চলে নিরপরাধ মানুষ হত্যা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাসে প্রতিদিন কালো পুলে সর্বনিম্ন ৫/৬ জন ও সর্বোচ্চ ১৫/২০ জন করে মানুষ হত্যা করতো পাকিস্তানী সৈন্যরা। নানা নিষ্ঠুর পঞ্চায় ওরা হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠতো। নোয়াখালী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিরপরাধ মানুষগুলোকে ধরে এনে প্রথমে টেকনিক্যাল হাই স্কুল ক্যাম্পে শারীরিক নির্যাতন করা হোত-তারপর প্রতিদিন সন্ধ্যার পর কালো পুলের উপর দাঁড় করিয়ে বুলেট বেয়নেটে বাঁবারা করা হতো। এভাবেই চলতো স্বাধীনতাকামী নিরপরাধ মানুষদের উপর মানবতাবিরোধী জঘন্য হত্যাযজ্ঞ। বুলেট বেয়নেট এ বাঁবারা হওয়ার পর লাশগুলো ওয়াপদা খালের পানি খুন রাঙা রঙে রঙিয়ে ভাসতে ভাসতে পশ্চিমে চলে যেতো। এই টেকনিক্যাল হাই স্কুলের ক্যাম্পেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় চৌমুহনী কলেজের প্রাত্নক প্রধান করণিক মিরওয়ারিশপুর গ্রামের গুলজার হোসেনকে।"

মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস এভাবেই হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে অবশেষে ডিসেম্বর ৫-৬ তারিখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনে টেকনিক্যাল হাই স্কুলের ক্যাম্প গুটিয়ে লাকসাম হয়ে কুমিল্লা ক্যাস্টলমেন্ট অভিমুখে চলে যায়। কিন্তু তারা রেখে যায় সেখানে অনেক নৃশংসতার চিহ্ন। বহু নারীর সন্ম হারানোর অব্যক্ত কাহারা। অসংখ্য মৃত-অর্ধমৃত নর নারীর কক্ষালসার দেহ।

১০০৩ সালের মার্চে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক স্বাধীনতা থেকে লেখাটি রুগে পোস্ট করেছেন মুকুল।

# গোপালপুরে গণহত্যা

## গোলাম আকবর

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানা সদর থেকে আনুমানিক নয় কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর দিকে গোপালপুর বাজারের অবস্থান। এরই পশ্চিমপার্শে কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে গোপালপুর মির্জানগর পরগণার এক সময়ের প্রভাবশালী জমিদার বাড়ী। এছাড়া বাজারের কোলঘেঁষে গোপালপুর আলী হায়দার উচ্চ বিদ্যালয়। পশ্চিম-উত্তর মাথায় ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাংক ও পোস্ট অফিস।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আবু কায়েস মাহমুদ, মোঃ মোহসীন দুলাল, জাকির হোসেন, মাহমুদুল হোসেন চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এ এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অনিচ্ছুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা নিম চন্দ্র ভৌমিক, সাহাবউদ্দিন মিন্টু ও স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদ নেতৃত্বদের সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়। এপ্রিলে পাকিস্তানি বাহিনী নোয়াখালীতে প্রবেশ করার কিছুকাল পরও গোপালপুর রয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্জয় ঘাঁটি হিসাবে; পরিণত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের রিস্কুটিং সেন্টারে। চলতে থাকে যুদ্ধের প্রাথমিক কলাকৌশলের ট্রেনিং। সময়ের সাহসী সন্তানেরা দলে দলে প্রাথমিক ট্রেনিং সমাপ্ত করে চূড়াস্ত ট্রেনিং গ্রহণের জন্য গোপনে চলে যেতো বজরার বগাদিয়া আফানিয়া হয়ে ভারতের দিকে। গোপালপুর এভাবেই পালন করে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এক অগ্রণী ভূমিকা। এ খবর পৌঁছে যায় জামাত, মুসলীম লীগ ও শাস্তি কমিটির মাধ্যমে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কাছে। তারা কয়েক দফা চেষ্টা চালায় এ এলাকার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের খুঁজে বের করার জন্য। দেখতে দেখতে চলে আসে বর্ষা।

সময়টা ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস। প্রচুর বৃষ্টি হয় সেবার ১৮ আগস্ট রাতে। ভোরাতে বেগমগঞ্জ লক্ষ্মীপুর সড়কের কাছে বাংলাবাজার শামসুন্নাহার হাইস্কুলে এসে অবস্থান নেয় বেশ কিছু পাকিস্তানী মিলিশিয়া ও রাজাকার। ১৯ আগস্ট সকাল বেলা - সূর্য তখনো মেঘের আড়ালে ঢাকা। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ গোপালপুর বাজারে পৌঁছে যায় প্রায় কয়েকশ পাকিস্তানী আর্মি ও রাজাকার। তারা দুভাগে

বিভক্ত হয়। রাজাকারদের কুড়ি/পঁচিশ জনের একটি দল বাজারের পশ্চিমদিক দিয়ে এবং বাকীরা মূল রাস্তা দিয়ে এসে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। সকাল থেকেই বাজারের প্রায় অর্ধশতাধিক দোকান অগণন মানুষের প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত ছিলো। কেউ চা পানে রত। আবার কেউ গতরাতে আশেপাশের কোন কোন এলাকায় গোলাগুলি হয়েছে তার অবস্থান নির্ণয় নিয়ে বিতর্করত। এমন সময় অতর্কিত হানা দিলো পাকিস্তানী হায়েনার দল। যারা পালাতে পারলো তারা বাঁচলো। যারা পারেনি এরকম অর্ধশতাধিক দুর্ভাগ্য নিরীহ গ্রামবাসী ও দোকানী শিকার হল নির্মম হিস্তাতার। একে একে ওদের সবাইকে ধরে এনে এক লাইনে দাঁড় করানো হয় বাজারের পূর্বপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছেট্ট খালটির পাড়ে। এ দলে ছিলেন এ এলাকার শাস্তি কমিটির নেতা। তার অপরাধ তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতেন। তাঁর কাছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার জানতে চায়- আনিস ডাঙ্কার, সুবেদার মেজর জবেদ আলী কোথায়? কোনো দেশপ্রেমিক মুক্তিপাগল মানুষ তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয় এবং তারা এর কোন জবাব কোনদিনই পায়নি। বাজারের দোকানে দোকানে তল্লাশি করে খুঁজতে থাকে স্বাধীন বাংলার পতাকা। জনৈক ছিদ্রিকল্যাহর দোকানে ওরা পেয়ে যায় স্বাধীন বাংলার একটি পতাকা। - ক্রোধে ফেটে পড়ে ওরা। লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন মুসলিমকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকী প্রায় পঞ্চাশজন নিরপরাধ নিরন্তর মানুষকে ব্রাশফায়ার করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ব্রাশফায়ারের পরও যারা বেঁচেছিলো তাদেরকে বেয়েনেটে চার্জ করে পৈশাচিক উঞ্জ্লাস প্রকাশ করার পর পাকিস্তানী পশুরা হত্যা করে। মানুষের তাজা রক্তে সয়লাব হয়ে যায় খালের পানি। রক্ত আর পানিকে পার্থক্য করা যায়নি। এই হতভাগ্য মানুষদের অপরাধ ছিলো- তারা বলেনি কারা এগুলাকার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, কারা মুক্তিযোদ্ধা। তাদের অপরাধ, দোকানে পাওয়া যায় স্বাধীন বাংলার পতাকা।

এই হত্যাকান্ত জঘন্য বর্বরতা। মানবতাবিরোধী। নোয়াখালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গোপালপুরের এই গণহত্যা এক কালো অধ্যায়। এই ঘটনায় যারা শহীদ হন তাদের পঁচিশ জনের নাম পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়:

১. মাহবুবুল হায়দার চৌধুরী [নশা মিয়া] (গোপালপুর)
  ২. দীন ইসলাম (তুলাচরা)
  ৩. হাবিব উল্যাহ (তুলাচরা)
  ৪. ইসমাইল মিয়া (তুলাচরা)
  ৫. অহিদউল্যাহ (সাহাদাপুর)
  ৬. মোহাম্মদউল্যাহ (সাহাদাপুর)
  ৭. মোহাম্মদ উল্যাহ (সাহাদাপুর)
  ৮. দুলাল মিয়া (সাহাদাপুর)
  ৯. সামছুল হক মাস্টার (আটিয়াকান্দি)
  ১০. মজিবউল্যাহ (আটিয়াকান্দি)
  ১১. বশিরউল্যাহ (আটিয়াকান্দি)
  ১২. আবুল কাশেম (মির্জানগর)
  ১৩. আবুল বশির ছিদ্রিক (মির্জানগর)
  ১৪. হারিছ মিয়া (দেবকালা)
  ১৫. ছিদ্রিক উল্যাহ মিয়া (সিরাজউদ্দিনপুর)
  ১৬. মিনিউল্যাহ মিয়া (মহল্লাপুর)
  ১৭. মন্তাজ মিয়া (মহল্লাপুর)
  ১৮. নূর মোহাম্মদ (মহল্লাপুর)
  ১৯. আবদুল মল্লান (মহল্লাপুর)
  ২০. মোবারক উল্যাহ (পানুয়া পাড়া)
  ২১. মোহাম্মদ উল্যাহ দর্জি (চাঁদ কাশেমপুর)
  ২২. আবদুর রাসিদ (আমিরাবাদ)
  ২৩. আবদুল সাতার (বারাহীনগর)
  ২৪. আবদুল করিম (হীরাপুর)
  ২৫. ডাঃ মোহাম্মদ সুজায়েত উল্যাহ (দশমরিয়া, চাটখিল)
- ১৯৭১ সালের ১৯ আগস্টের এই নিষ্ঠুর গণহত্যার স্মরণে গোলাম ছাত্রার নোমান, তপন কুমার ভৌমিক প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৯৮০ সালে শহীদদের নাম খোদাই একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদ স্মৃতি সংসদ গড়ে উঠে। প্রতি বছর এই দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।
- 
- ২০০৩ সালের মার্চে প্রকাশিত গোলাম আকবরের লেখাটি রুগে পোস্ট করেছেন মুকুল।

# চন্দ্রগঞ্জ ও সোনাইমুড়ির মুক্তিযুদ্ধ

## সত্যেন সেন

মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের চর এসে সংবাদ দিল, সামরিক ভ্যান বোৰাই একদল পাকিস্তানি সৈন্যরা ফেনী থেকে চন্দ্রগঞ্জের দিকে আসছে। ওদের যখন চন্দ্রগঞ্জের দিকে চোখ পড়েছে, তখন ওরা সেইখানে লুটপাট না করে ছাড়বেনা। খবর পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন সুবেদার লুৎফর রহমান। বেসল রেজিমেন্টের লুৎফর রহমান, যিনি এই অঞ্চলে একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন। সৈন্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাটজনের মত হবে। এদের প্রতিরোধ করতে হোলে দলে কিছুটা ভারী হয়ে নেওয়া দরকার। খোঁজ-খবর করে অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র ছয়জন মুক্তিযোদ্ধাকে জড়ো করা গেল।

সাতজন মানুষ, সাতটি রাইফেল- এই সামান্য শক্তি নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে যাওয়াটা ঠিক কি? মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন। কথাটা মিথ্যা নয়- এটা একটা দৃঃসাহসের কাজ হবে। অথচ হাতে সময় নেই। মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, তার মধ্যে এই লুঁনকারী দস্তুরা এদের কাজ হাসিল করে সরে পড়বে। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে যাবে আর তারা বসে বসে তাই দেখবে। না, কিছুতেই না, গর্জে উঠলেন সুবেদার লুৎফর রহমান, যেভাবেই হোক এদের প্রতিরোধ করতেই হবে। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ওরা অক্ষতভাবে হাসতে হাসতে চলে যাবে, এ কিছুতেই হতে পারেনা। ওরা আমাদের রক্ত নিয়েছে, তার বিনিময়ে ওদেরও কিছুটা রক্ত দিতে হবে।

রাস্তার ধারে একটা বড় রকমের ইটের পাঁজা। কে যেন করে একটা দালাল তোলবার জন্য এখানে এই ইটগুলি এনে জড় করে রেখেছিলো, অনেকদিন হয়ে গেল, সেই দালাল এখনো তোলা হয়নি, ইটগুলো যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। চন্দ্রগঞ্জে ঢুকতে হলে সৈন্যবাহী গাড়ীগুলিকে এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। সুবেদার লুৎফর রহমান আর ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা, সেই ইটের পাঁজার পেছনে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালেন। এখান থেকেই তাঁরা সেই হামলাকারী দস্তুরের প্রতিরোধ করবেন, এটা খুবই দৃঃসাহসের কাজ তাঁরা জানতেন, তাঁরা তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চলেছেন। কিন্তু এমন এক একটা সময় আসে যখন জেনে শুনে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন-মৃত্যু

পায়ের ভূত্য চিন্ত ভাবনাহীন। অবস্থা বিশেষ বামন হয়েও তাঁদের দানবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে হয়। মুক্তিবাহিনীর সুবেদার লুৎফর রহমান বললেন, এখনকার অবস্থা হচ্ছে তেমনি এক অবস্থা। কিন্তু বেশী কথা বলার সময় ছিল না। দূর থেকে অক্ষুট সামরিক ভ্যানের গর্জন শোনা গেলো। এই যে, এই যে আসছে। ওরা! তাঁরা সাতজন সাতটি রাইফেল নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ালেন। সেই অক্ষুট আওয়াজ ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। তারপর একটু বাদেই দেখা গেলো সামরিক ভ্যান পথের ধুলো উড়িয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। উভেজিত প্রতীক্ষায় তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন ইস্পাতের মত দৃঢ় আর কঠিন হয়ে এল।

সামরিক ভ্যান দ্রুত আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেলো। না থেমে উপায় ছিল না, কাদের অদ্র্শ্য হস্তের গুলিতে গাঢ়ির টায়ারের চাকা ফুটে হয়ে গেছে। একই সঙ্গে কতগুলি রাইফেলের আওয়াজ। বিস্ময়ে, আতঙ্কে সৈন্যরা ঝুপবাপ করে গাঢ়ী থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো। কিন্তু সেই অদ্র্শ্য হস্তের গুলিবর্ষণের যেন শেষ নেই। সৈন্যদের মধ্যে যারা সামনের দিকে ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে হতাহত হয়ে ভূমিশয়া নিল। একটু বাদেই রাইফেলের আওয়াজ থেমে গিয়ে পল্লী-প্রকৃতির নিষ্ঠবন্ধন আর শাস্তি ফিরে এল। সৈন্যরা সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তান করে চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। অদ্র্শ্য শত্রুরা কি তবে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে? না, ওদের বিশ্বাস নেই, একটু বাদেই হয়তো ওরা আরেক দিক থেকে আক্রমণ করে বসবে। রাস্তার দু'পাশে অনেক ঝোপঝাড় জঙ্গল। তাদের মাঝখানে ওরা কোথায় আশ্রয় নিয়ে বসে আছে কে জানে। তবে দলে ওরা ভারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা না হলে তাদের বিরুদ্ধে এমন করে হামলা করতে সাহস পেত না।

চন্দ্রগঞ্জ সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে এসে অবাধে লুটপাট করা যাবে, এই আশা নিয়ে তারা এখানে এসেছিল। এই অঞ্চলে তাদের একজন দালাল ছিল। তার কাছ থেকে খবর পেয়েই তারা লুটের আশায় এখানে ছুটে এসেছে। তারা শুনেছিলো এখানে তাদের বাস্তু দেবার কেউ নেই। কিন্তু হঠাৎ করে কে জানে কোথা থেকে এই শয়তানের দল মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কে জানে, হয়তো ওরা ইতিমধ্যে তাদের চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছে। প্রতিটি

গাছ আর প্রতিটি ঝোপঝাড়ের আড়ালে যে একজন করে শত্রু লুকিয়ে নেই এমন কথাই বা কে বলতে পারে। ওদের রাইফেলগুলি এবার এলোপাথাড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করে চলল। এইভাবে বহু গুলি অপচয় করার পর তারা থামল।

কিছু সময় নিঃশব্দে কেটে গেলো। সৈন্যরা ভাবছিল, তাদের অদ্র্শ্য শত্রুরা সম্ভবত পালিয়ে গেছে। এমন প্রবল গুলি বৃষ্টির মধ্যে ওরা কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু অহলে যারা হতাহত হয়ে ভূমিশয়া নিয়েছিলো, ওরা তাদের একজন একজন করে ভ্যানের উপর তুলছিল। ঠিক সে সময়ে আবার কতগুলি রাইফেল এক সঙ্গে গর্জে উঠলো। গুলির পর গুলি আসছে, বিরতি নেই। সৈন্যদের মধ্যে এক অংশ আছে ভ্যানের উপরে, অপর অংশ রাস্তায়। অদ্র্শ্য হস্তগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এদের লক্ষ্য করে করে গুলি ছুঁড়ছে। একটি গুলিও বৃথা যাচ্ছে না। সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ হটগেল পড়ে গেল। তারা একটু সামলে নিয়ে আবার প্রবলভাবে গুলি বর্ষণ করে চলল। কিন্তু তাদের সামনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এই ভাবে কিছুক্ষণ দু'পক্ষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা চলল। ইতিমধ্যে সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলছে। অপর পক্ষে অদ্র্শ্য প্রতিপক্ষের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা বোবার কোন উপায় ছিল না।

অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সৈন্যরা। কিন্তু একটু আগে তাদের দালাল সেই লোকটি তাদের সাহায্য করবার জন্য এসে গেছে। সে অত্যন্ত চতুর লোক, চারিদিকে ভাল করে নজর করে সে এই রহস্যটা বুঝতে পারল। দূরবর্তী ইটের পাঁজাটার পেছনে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সে বলল, আমার সন্দেহ হয়, ওরা এ পাঁজাটির পেছনে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কথাইতো, এই সন্দেহটা সকলের মনেই জাগা উচিত ছিলো। কিন্তু এতক্ষণ এই কথাটা ওদের কারও মাথায় আসেনি।

এবার ওদের রাইফেলগুলি একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। সৈন্যরা তিনভাগে ভাগ হয়ে অতি সম্পর্কে তিনদিক দিয়ে এগিয়ে চলল। ইটের স্থুপটাকে ঘেরাও করে ফেলতে হবে। খুব সাবধান, ওদের একটাও যেন সরে পড়তে না পারে।

মুক্তিবাহিনীর জওয়ানরা ইটের পাঁজার আড়াল থেকে সবকিছুই দেখছিল। সৈন্যদের মতলব বুঝতে তাদের বাকী রইলো না।

আর এক মুহূর্ত দেরী করার সময় নেই। এখনই তাদের সরে পড়তে হবে। এই সংযর্থের মধ্যে দিয়ে তারা যতটা আশা করেছিল, তারচেয়ে অনেক বেশী কাজ হাসিল করতে পেরেছে। এবার তারা স্বচ্ছদে ছুটি নিতে পারে। একজন একজন করে সাতজন মুক্তিযোদ্ধা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদ্যশ্য হয়ে গেল। তার কিছুটা বাদে শিকার সন্ধানী সৈন্যরা এসে সাফল্যের সঙ্গে সেই ইটের স্তুপটাকে ঘেরাও করে ফেলল। কিন্তু কি দেখল এসে? দেখল, পাখিগুলি তাদের একদম বোকা বানিয়ে দিয়ে মুক্ত আকাশে উড়ে চলে গিয়েছে। ইটের পাঁজার পেছনে একটি জনপ্রাণী নেই। শুধু মাটির উপরে অনেকগুলি কার্তুজের খোল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেদিনকার যুদ্ধে সবসুন্দর ২৩ জন সৈন্য হতাহত হয়েছিল। আর মুক্তিবাহিনীর সাতটি জওয়ান সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। যে দেশদ্রোহী দালালটি শত্রুদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল, এর কয়েকদিন বাদেই মুক্তিযোদ্ধারা তাকে খতম করল।

সেইদিন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ঘা খেয়ে পাক সৈন্যদের চূড়ান্ত ভাবে নাকাল হতে হয়েছিল। চন্দ্রগঞ্জে লুটপাট করা দূরে থাক, হতাহত বন্দুদের নিয়ে গাড়ী বোঝাই করে ওরা মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এই অপমান আর লাঞ্ছনা ওরা ভুলে যেতে পারেনি। দিন কয়েক বাদে ওরা আবার নতুনভাবে তৈরী হয়ে চলল চন্দ্রগঞ্জের দিকে। তাদের মনের জ্বালাটা এবার ভাল করেই মিটিয়ে নেবে।

পাক-সৈন্যরা আবার হামলা করতে আসছে। এই খবরটা পৌছে গিয়েছিল চন্দ্রগঞ্জে। সুবেদার লুৎফুর রহমান এখন সেইখানে নেই, অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও কেউ নেই। এবার কে তাদের প্রতিরোধ করবে? ওরা সেদিন আচ্ছামত ঘা খেয়ে ঘরে ফিরে গেছে, এবার ভাল করেই তার প্রতিশোধ তুলবে। চন্দ্রগঞ্জকে এবার ওরা ধ্বনসন্তুপে পরিণত না করে ছাড়বেনা। যাকে পাবে তাকেই মারবে। ওদের হাতে কেউ কি রেহাই পাবে? সারা অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। চন্দ্রগঞ্জের মানুষ ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালাতে লাগল। ওরা ওদের যা করবার বিনা বাধায় করে যাবে। কিন্তু চন্দ্রগঞ্জের একটি মানুষ এই কথাটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। যাত্র সেদিন এই চন্দ্রগঞ্জের বুকে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দিয়ে দুর্দান্ত পাক-সৈন্যদের দুর্দশার চূড়ান্ত করে ছেড়ে দিয়েছে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধারা এই অঞ্চলেরই মানুষ, এই মাটিতেই মানুষ হয়ে উঠছে। এখানকার মানুষ, শুধু এখানকার নয়, সারা নোয়াখালী জিলার মানুষ তাদের জন্য গৌরববোধ করে। রাস্তার ধারে সেই ইটের স্তুপটি এখনও সেই যুদ্ধের স্মৃতিস্তুপ রংপে

বিরাজ করছে। এর মধ্যে তার কথা কি আমরা ভুলে যেতে পারি? আজ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কেউ এখানে নেই বলে ওরা অবাধে যা খুশি তাই করে চলে যাবে। না, কিছুতেই না, গর্জে উঠলেন তিনি, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। আর যদি কেউ না যায়, আমি একাই যাবো, একাই গিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করবো।

কে এই লোকটি? কি তাঁর নাম? না, তার নাম আমার জানা নেই। কোন খ্যাতনামা লোক নন তিনি। একজন প্রাক্তন সৈনিক। আর দশজন বৃন্দের মত তিনিও তাঁর জীবনের শেষদিনগুলি 'আল্লাহ আল্লাহ' করে কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন সাধারণ মানুষ। কেউ কোনদিন তাঁর কোন অসাধারণত্বের পরিচয় পাননি। কিন্তু আজ দেশের এক বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ অনুকূল মুহূর্ত তাঁর ভেতরকার সুপ্ত আগুনকে জাগিয়ে তুলেছে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ ভয়ে অস্থির, সেখানে এই একটি মানুষ দৃঢ় নিষ্কম্প কঠে ঘোষণা করলেন, যদি একা যেতে হয়, আমি একাই যাবো, আমি একাই ওদের সঙ্গে লড়াই করব। মরবার আগে এই হিংস্র পশুগুলির মধ্যে একটাকেও যদি মেরে যেতে পারি, তবে আমার জীবন সার্থক হবে।

যারা তার হিতেবী, তারা তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, তুমি একা মানুষ, তার উপর বুঢ়ো হয়েছে। তুমি কি করে ওদের সঙ্গে লড়াই করবে? কিন্তু কারও কোন বাধা তিনি মানলেন না, দৃঢ়-মুষ্টিতে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। তাঁর এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর তরঙ্গ ছেলে তাঁকে ডেকে বলল, দাঁড়াও আববা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমার মত আমিও ওদের সঙ্গে লড়াই করব। ছেলের কথা শুনে বাপের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুঁজনের হাতে দুটি রাইফেল, পিতা-পুত্র পাশাপাশি প্রতিরোধ সংগ্রামে যাত্রা করল।

আজও ওরা সেই ইটের পাঁজার পেছনে আশ্রয় নিল। ওরা পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসে শত্রুদের আগমনের জন্য অধীর চিন্তে প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে দূর থেকে মোটর ভ্যানের গর্জন শোনা গেল। হ্যাঁ ওরা আসছে। দেখতে দেখতে সৈন্যবাহী গাড়ী একেবারেই কাছে এসে পড়ল। সৈন্যদের মধ্যে অনেকের কাছেই ইটের পাঁজাটি সুপরিচিত। ঐটিকে ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়, কিন্তু আজও যে কেউ তাদের আক্রমণ করার জন্য এর আড়ালে ওত পেতে বসে থাকতে পারে, এটা তারা ভাবতে পারেন। ভাবতে না পারা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু ওরা এই স্তুপটার বরাবর আসতেই পরপর তিনজন সৈন্য গুলিবিন্দ হয়ে পড়ে গেল। সবাই দেখতে পেল, কে বা কারা তাদের লক্ষ্য করে স্তুপটার আড়াল থেকে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যরা এর পাল্টা জবাব দিল। ইটের পাঁজাটাকে

লক্ষ্য করে বাঁকে বাঁকে গুলি বর্ষণ চলল।

এরপর সেই স্তুপের পেছন থেকে আর কোন গুলির শব্দ শোনা গেল না। সৈন্যরা একটু সময় অপেক্ষা করল, তারপর ছুটে গেল স্তুপটার সামনে। উদ্যত রাইফেল বাগিয়ে ধরে যখন তারা পায়ে পায়ে সেই স্তুপটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখতে পেল, সেইখানে এক বৃন্দের রক্তাত্ম মৃতদেহ পড়ে আছে।

কিন্তু অন্ত বলতে কোন কিছু সেখানে নাই, শুধু কয়েকটা কার্তুজের খোল পড়ে আছে। ওরা বুবাল, এই বৃন্দের সঙ্গে আরও যারা ছিল তারা অস্ত্রসহ পালিয়ে গিয়েছে। আমি ভাবছি, যেদিন বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে, স্বাধীন হবে, সে দিন পবিত্র এই জায়গাটিতে সেই গৌরবময় প্রতিরোধ সংগ্রামের স্মারক হিসাবে একটি স্মৃতিস্তুপ কি গড়ে উঠবে? চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধের পর সুবেদার লুৎফুর রহমান নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিকারের সন্ধানে ছুটে চলেছিলেন। তাঁর এক মুহূর্তও বিশ্বামের অবকাশ নেই। তিনি পাক সৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে দক্ষ শিকারীর মত তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ফিরেছিলেন। মুক্তিবাহিনীর গুণ্ঠচরেরা নিত্য নতুন সংবাদ নিয়ে আসছে। আর সেই সূত্র অনুসরণ করে তাদের মুক্তিবাহিনী যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেই শত্রুদের উপর ঘা দিয়ে চলেছে।

আঘাতের পর আঘাত হানো কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে, কখনও সামনে থেকে, কখনও বা পেছন থেকে। ওদের অস্থির আর পাগল করে তোল। ওদের কোন সময় স্বষ্টিতে বা শাস্তিতে থাকতে দিও না, ওদের প্রতিটি মুহূর্ত দূরভাবনায় কাটুক। ওরা যেন ঘূমের মধ্যেও দৃঃঃস্পন্দ দেখে আঁতকে উঠে। মুক্তিবাহিনী এই নীতি অনুসরণ করেই কাজ করে চলছিল। ওরা হামলাকারীদের নিশ্চিত মনে বিশ্বাম করতে দেবেনা, নিজেরাও বিশ্বাম নেবেনা।

এগ্রিলের শেষভাগ। খবর এল, একদল সৈন্য কুমিল্লার লাকসাম থেকে ট্রেনে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছুবে। লুক্ফর রহমান এই খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। স্থির হোল, ওদের বিনা বাধায় এগোতে দেওয়া হবেনা, সোনাইমুড়ি স্টেশনেই এই হামলাকারীদের উপর হামলা করতে হবে। রেলস্টেশনে চড়াও হয়ে আক্রমণ। হয়তো সেজন্য মুক্তিবাহিনীকে বেশ কিছুটা মূল্য দিতে হবে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে নিতে হবে। তা হোক, এই শিকারকে কিছুতেই ফসকে যেতে দেওয়া চলবে না।

কিন্তু এবার আর চন্দ্রগঞ্জের মত সাতজন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে চলবেনা। এবার আর আগেকার মত আড়াল থেকে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ চলবে প্রকাশ, মুখোমুখি। ওদের সৈন্য সংখ্যা বড় কর নয়,

আক্রমণ করতে হলে বেশ কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করে নিতে হবে। সেই অন্ত সময়ের মধ্যেই পথগুলিজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে সোনাইমুড়িতে এনে জড় করা গেল। অবশ্য যতদূর জানা গিয়েছে সৈন্যদের সংখ্যা এরচেয়েও অনেকটা বেশী, তা হোক, এই শক্তি নিয়েই ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে সৈন্যবাহী ট্রেন্টা সোনাইমুড়ি স্টেশনে এসে পৌছল। মুক্তিবাহিনী কাছেই কোন একটা জায়গায় লুকিয়ে ছিল। ট্রেন্টা এসে পৌছাবার সাথে সাথেই রাইফেলধারী মুক্তিযোদ্ধারা বিদ্যুতগতিতে ছুটে এসে ট্রেন্টাকে ঘেরাও করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ট্রেনের আরোহীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। ওরা গাড়ীর ইঞ্জিনটাকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। ড্রাইভারহীন ট্রেন্টা অচল হয়ে গেল।

প্রকাশ্য দিবালোকে ইহভাবে আক্রান্ত হতে হবে, পাক সৈন্যরা তা কল্পনাও করতে পারেন। তারপর ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, একটু সময় ওরা হতভম্ব আর স্কু হয়ে রইল। পর মুহূর্তেই তারা তাদের রাইফেল বাগিয়ে ধরে হত্তমুড় করে কামরা থেকে প্লাটফর্মের উপর নেমে পড়তে লাগল। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে কামরা থেকে নামবার আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ দিতে হল।

এবার দু'পক্ষে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। এবারকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রেলস্টেশনের উপর এ ধরনের লড়াই আর কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি রেলস্টেশন এজন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রায় তিনিশটা ধরে এ লড়াই চলল। এই যুদ্ধে পঁয়াশিজনের মত পাক সৈন্য নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের হয়জন শহীদ হলেন। ইতিমধ্যে খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর পেয়ে ঘন্টাতিনেক বাদে আক্রান্ত পাক-সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য চৌমুহনী থেকে সামরিক ভ্যানে করে একদল সৈন্য ঘটনাস্থলে এসে পৌছল। এবার পাক সৈন্যদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল আড়াইশতের উপরে। হতাহতের বাদ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা তখন আনুমানিক চলিশ এ এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর মাত্র। মুক্তিযোদ্ধারা এমন ভুল কখনও করেনো। তারা যেমন বিদ্যুৎগতিতে এসে আক্রমণ করেছিল, তেমনিভাবেই ঘটনাস্থল থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

রবিউল হোসেন কচি সম্পাদিত নোয়াখালী পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ “নোয়াখালী” থেকে লেখাটি ব্লগের পাতায় তুলে এনেছেন মুকুল।

## শ্রীপুরের গণহত্যা

ত. ম. ফারুক

সোনাপুর নোয়াখালী পৌরসভার সর্বদক্ষিণের একটি ছোট গ্রাম। এর চারপাশে মহৱতপুর, শ্রীপুর, জালিয়াল, করিমপুর, গোপাই ও পশ্চিম বদরীপুর। কবি বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতি বিজড়িত নোয়াখালী শহরটি এর দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে ছিল একদা। পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের গোটা সময়টা সোনাপুর ছিলো নোয়াখালীর প্রাণকেন্দ্র। এখানে জেনারেল আইয়ুবের প্রতি বিক্ষেপ হয়েছে, মেজর জেনারেল আজম খানের প্রতি ‘ফিরে যাও’ ধরনি উচ্চারিত হয়েছে, পাকিস্তান জাতার দালাল ফ.কা চৌধুরীর প্রতি ঘৃণামিশ্রিত কালো পতাকা উথিত হয়েছে। স্বৈরশাসকের দোসর এখানে জনগণের সম্মানসূচক রায় পায়নি। ২৩ মার্চ ১৯৭১ সনের পরবর্তী প্রথম দশ দিনের মধ্যে অগরিণত মুক্তিযোদ্ধাদের দল সংগঠিত হয়েছে। স্থানীয় মিশনারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বোমা বানাতে গিয়ে পশ্চিম বদরীপুর গ্রামের কৃতিস্তান বাহারঞ্জ আলম চৌধুরী আহত হয়েছেন। পরবর্তীকালে আহত অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে এই সোনাপুর এলাকার আধ কিলোমিটার দূরত্বে স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত হয় একটি হিন্দু সাধুর আখড়া ও একটি খ্রীস্টানদের গীর্জা। ৪০০ বর্গ কিমি বিন্যস্ত বিশাল চরের পশ্চাতে শাস্তিপূর্ণ জনপদ বেষ্টিত সোনাপুর বাজার ও সংলগ্ন শ্রীপুর গ্রামের উপর পাকিস্তানি আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ এক বিরল নির্ণয় গণহত্যা।

ইসলামপ্রীতির কথা বাদ দিলেও পাকিস্তানিদের একটা অহমিকা ছিলো তাদের সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা ও যোগ্যতা নিয়ে। ১৮ জুন ১৯৭১ সালের বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কারণ কি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের সাথে এই ধর্বস্যজ্ঞের সম্পর্ক কোথায়- তা নির্ণয় করা কঠিন। জাতিসংঘের সদস্যপদপ্রাপ্ত ইসলাম রক্ষার সংগঠন পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী নিঃসন্দেহে একটি সুশঙ্খল কাঠামোর ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ ক্ষমতাকে করেছে সুসংগঠিত। এরকম অহমিকায় প্রদীপ্ত দেশের সৈন্যবাহিনীর আচরণ ও শিক্ষার বাস্তব প্রকাশ ভাবার

বিষয়। যে কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব সংগঠন তার সৈন্যবাহিনী। হত্যা, ধর্স, আক্রমণ বা প্রতিরোধ যে কোন কাজেই তার উদ্দেশ্য থাকে। কারণহীন সামরিক এ্যাকশন সৈন্য, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালকদের ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার করা ছাড়া আর কোন অর্থ বহন করে না। সময়ে ভাড়াটিয়া বুদ্ধি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পোষাক মানবপ্রীতি, তথাকথিত মুসলিম দেশ পাকিস্তানের প্রতি মহত্বাবে ও ইসলামদরদী সেজে সাধারণ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারলেও ওদের আসল চরিত্র উন্মোচিত হতে সময় নেয়নি। অকারণে গণহত্যা, সম্পদ লুঠন ও গণতন্ত্র হত্যার কাজে পাকিস্তানি শাসক মহলের জুড়ি নেই। আজ স্মৃতিরোমান্ত্বন করে শিহরিত হচ্ছি- কেমন করে প্রতারক শোষকক্ষের খপ্পরে ছিল বাংলার মেহনতী সাধারণ মানুষ চরিবিশ্টি বছর।

এপ্রিলে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে শহর পতনের পর খিতিয়ে আসছিলো উভেজনা। নোয়াখালী শহরে জেঁকে বসে গেছে মুসলিম লীগ ও জামাতের পাকিস্তানি দালালদের প্রশাসন। গঠিত হয় শাস্তি কমিটি, ঘাপটি মারা নিরীহ সেজে থাকা পাকিস্তানি দোসরোরা বাঘ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের উপর। ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট লুট হয়ে ছারখার। শহরের হিন্দু বসতি প্রায় নিশ্চিহ্ন। সোনাপুর এলাকার খ্রীস্টান জনগোষ্ঠী নিশ্চিত কোনপক্ষই তাদের প্রতি বিরাগ হতে পারবে না। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে নানা সাহায্য সহানুভূতিতে আগুয়ান।

তখনকার নোয়াখালীর চালচিত্র অনেকটা শোকাহত মায়ের শোক সামলে ওঠার পর ধীর মহল গতিতে সংসারের হাঁল ধরার মত অবস্থা। স্বাধীনতার দীপ্তি আগুনের মতো বাংলা প্রেমিকদের হাদয়ে জ্বলছে। অসহায় মানুষেরা প্রত্যক্ষ করছে রাজাকার, মুসলিম লীগ, আর জামাতিদের জঘন্যতম কাজগুলো। মনে পড়ে এক হিন্দুর বাসা দখলের পর টাইটেল পাস জামাতের শহর নেতা স্বহস্তে গাছ কেটে সাফ করে ফেলছেন। বিস্ময়াভিভূত দর্শকের জিজ্ঞাসা, “গাছের

কি দোষ”? ইসলামপুরী মাওলানার সংক্ষিপ্ত জবাব- “হিন্দুর চিহ্ন ও রাখবো না, হিন্দু কাফের, হিন্দুর ফুল ও কাফের”। এই ছিলো পাকিস্তানিপ্রেমীদের মানসিকতা। শোনা যায় এই মাওলানা এখনও রাজনীতি করেন। এখনও বাংলাদেশে ইসলাম কায়েমের স্পন্দন দেখেন। আরেক কোরআনে হাফেজের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা নির্ধনের অজুহাতে খলিফারহাট এলাকায় তিনমাসের প্রসূতি মহিলাকে গণধর্ষণের পর তার গোপন অঙ্গে লবণ-মরিচ মেখে দিয়ে বীরের মতো যুদ্ধ জয় করে পাষণ্ডো। নাদির শাহীর কায়দায় লুঠিত দ্ব্য এরা পরস্পরের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করত। এ সবই পাকিস্তানের অখ তা বজায় রাখার লড়াইয়ের ইতিহাস। ইসলামের মহত্বকে কলিয়া লিপ্ত করার জন্য ধর্ষ্যবসায়ী ও ক্ষমতালিঙ্গ পিশাচেরা দায়ী। মুসলমান ও ইসলাম কখনও মানুষের মঙ্গল ছাড়া ক্ষতির চিন্তা করে না। কোন অত্যাচারী জুলুমবাজ শোষকের সাথে অস্তত আর যাই হোক মুসলমানদের সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সোনাপুর নামের অবতারণা দিয়ে এই টুকরো কথা লেখা শুরু করেছিলাম। সোনাপুরে সংগঠিত পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বর্থক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা কোথাও বিবৃত হয়নি। আগেই বলা হয়েছে বাংলার দক্ষিণে রেল আর পাকা সড়কের থমকে যাওয়া জনপদ ‘সোনাপুর’ সাহসী মানুষের সুখী ও অসাম্প্রদায়িক জীবন আর চিরদিন খেটে খাওয়া জনপ্রেমের এক আশ্র্য আশ্র্য। মাত্র এক বর্গকিলোমিটার এলাকাকে রিঙ্গার চারণভূমি বলা যাবে। মসজিদ মাদ্রাসার পীঠস্থান বলা যাবে। হিন্দু-খ্রিস্টানের মিলনস্থান বলা যাবে, আর বলা যাবে শিক্ষার কেন্দ্রভূমি।

১৯৭১ সালের ১৮ জুন। মাত্র ৪০০ গজ রাস্তার দুই ধারে ‘টি’ অক্ষরের মত সাজানো ছোট ছোট দোকানের পেসরা বসেছে। একগাশে অলসভাবে শুয়ে থাকা লাল রেলস্টেশন ঘর, তারের পুকুর, বকশির মসজিদ, দরিদ্রতম মানুষের গায়ে লাগা ঘরের চরিলাই, রাসিদ হিমাগার, কয়হাত পরেই বেড়ি বাঁধের কোলঘেঁষে নেমে গেছে দক্ষিণে বহুদূরে জেগে ওঠা চরের সমারোহ। সুপুরি চারা, নারিকেল ও কলার পাতার আড়ে ছোট ছোট ঘরের বিরল বসত। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়েছে, দুপুরের ঘূম শুরুতা ভেঙ্গে চাঁদোকানের কোলাহল- বিকাল নামছে ধীরে ধীরে। মসজিদ-মাদ্রাসার আজান আর বৈকালিক ট্রেনের শব্দে জেগে উঠছে মহবতপুর, শ্রীপুর, পশ্চিম বদরীপুর আর করিমপুর।

বেলা চারটায় উভরের পাকাসড়ক ধরে ছুটে এল শব্দময় দানব



বাস, ট্রাক, লরি। স্থানে স্থানে উগরে দিলো চাইনিজ অটোমেটিক হাতে পাকিস্তানি সেনাদের। সর্বদক্ষিণে ছুটে এসে একটি বাস থামঘলো। ‘টি’ - এর পশ্চিম বাহুতে ছুটে গেলো একদল। উত্তর দিকের শ্রীপুর ও করিমপুর গ্রামে ঢুকলো একদল সেনা। মোকারবাড়ীর চারপাশ ঘিরে ঘনবসতির মেরে ঢুকে গেলো পাকিস্তানি হানাদাররা। উত্তর সোনাপুর এলাকায় আগেই নেমে পড়েছিলো একদল। পাকিস্তানি সেনাদের কোন ঘোষণা নেই, অনুসন্ধান তৎপরতা নেই, নেই কোন প্রতিরোধের প্রতীক্ষা। ‘টি’ - এর পশ্চিমপ্রান্ত থেকে প্রথমগুলির সংকেত পাওয়া গেলো। সন্তুষ্ট ভীত দোকানে বসে-দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ, অসহায় ছোটাছুটি, নির্বিচারে লুট করছে। গুলি করছে আগুন লাগাচ্ছে তারা। মুহূর্তে চারঁশ গজ এলাকা নরকে পরিগত হলো। দাউ দাউ করে জলে উঠল আগুন, জেলে গেল দোকান, ঘর-বাড়ী, খুন হয়ে গেলো শতাধিক জন মানুষ। পুড়ে ছাই হয়ে গেলো অনেকেই দুঃখন্ত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ প্রতিরোধহীন সোনাপুর আর তার চারপাশের গ্রামে নেমে

এল এক শৃশানের নিষ্ঠন্তা। দোকানে লাশ, দোকানের সামনে লাশ, ডাঙ্গার, ডাঙ্গারের কাছে আসা রোগী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ কোন স্তরের মানুষই রেহাই পায়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই লাশ হয়ে যাওয়া নির্বিশেষ মানুষগুলোর কাছ থেকে বেঁচে থাকার আকৃতি ছাড়া পাকিস্তানি বীর সৈনিকরা কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। মুক্তিযোদ্ধার হতিয়ার দুরে থাকুক, চোর তাড়ানোর একটি লাঠি, বল্লম ও তাদের চেথে পড়েনি। তবুও তাদের জিঘাংসার আগুনে প্রাণ দিয়েছে একশ চরিবশ জন মুসলমান ও এক জন মুচি। রিঙ্গাচালক, মুটে মজুরের মা-বোনের ইজত লুঠিত হয়েছে অগণিত। প্রবীণা, যুবতী পর্দানশিন নারীর ঘোমটা উন্মোচিত হয়েছে পাকিস্তানি বর্বরদের কামনিষ্ঠুর ভয়ালথাবায়। এই অপমানের কথা কেউ কোনদিন জানবেনা। এই নিষ্ঠুর হত্যা, ধর্ষণ, লুঠনের ক্ষত কেবল তীব্র ঘণ্টা হয়ে জেগে আছে সেদিনের প্রত্যক্ষদশীদের মনে। বহু ছোট ব্যবসায়ি দোকান হারিয়ে চিরদিনের জন্য দরিদ্র হয়ে গেছে স্বাধীনতা পরবর্তী পুনর্বাসন তাদের জীবনে আর্থিক স্ফুল্প আর ফিরিয়ে দিতে পারেনি কোনদিন। দুঁশ পঁচিশটি ছোট-বড় দোকানে লুঠন চালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। পাঁচ-শটি পরিবারের প্রতিটি ঘরে চুকেছে হানাদার। এ লুঠন, ধর্ষণ আর পালিয়ে যেতে না পারা মানুষদের হত্যা, প্রতিটি পরিবারে এনেছে শোকের করণ ছায়া। পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থান ছিলো দু ঘট্টা পনের মিনিট মাত্র। বর্বরতার নিদারণ লজ্জা এদের স্পর্শ করেনি। ঝড়ের বেগে এসে ঝড়ের বেগে নিরাপদে ফিরেছে, বিশ্ববেহায়া নির্জন বীরপুস্তবেরা। পাকিস্তানি লীগ-জামাতের সেদিনের সাথীরা মানুষের দুর্দশায় হেসে বিজয়ীর বেশে কোলাকুলি করেছে। সৈন্যবাহিনীর যে কোন “এজল্ট” এ অন্তত শত্রুবাহিনীর কোন না কোন তৎপরতার নমুনা থাকে। সোনাপুর অপারেশন ছিল ঠাঁকা মাথার হত্যায়জড়। নিরীহ মানুষের রক্তে হোলিখেলার উৎসব। দেশেরক্ষা ও ইসলামের নামে ক্ষমতার মসনদে বসে থাকা পাকিস্তানি হায়েনা ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলাবদরদের নিষ্ঠুর হোলিখেলার জবাব একান্তরে মুক্তিযোদ্ধারা দিয়েছে। কিন্তু ধর্মের নামে এ ধরনের নিষ্ঠুরতার অবসান কি হয়েছে এদেশে?

●

রবিউল হোসেন কঢ়ি সম্পাদিত নোয়াখালী পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ “নোয়াখালী” থেকে লেখাটি রুগ্নের পাতায় তুলে এনেছেন মুকুল। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ২ জুলাই।

# শত্রুসেনার বিরুদ্ধে নোয়াখালীর চার যুদ্ধ

## সাইফুল আলম জাহাঙ্গীর

একান্তরের ২৫ মার্চ রাতে ১২টার পর পাকহানাদার বাহিনী শুধু নিরস্ত্র মানুষের উপরই আক্রমণ করেনি তারা একসঙ্গে রাজারবাগ পুলিশলাইন, পিলখানা (ইপিআর) ক্যাম্প ও ক্যান্টনমেন্টগুলোতে বাঙালী জওয়ানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নোয়াখালী'র কথায় আসি। ২৫ মার্চ গভীর রাতে (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) ঢাকা থেকে জেলা প্রশাসক জনাব মঙ্গুরুল করিম, বঙ্গবন্ধুর প্রথম সারির সহচর মরহুম আবদুল মালেক উকিল ও তখনকার দৈনিক পাকিস্তানের রিপোর্টার (বর্তমান জনকর্ষণের) জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদের কাছে গোপন মেসেজ আসে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং ঢাকায় জনতার সঙ্গে পাকহানাদারদের সম্মুখ যুদ্ধ চলছে। কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ সংযুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালী টাউন হল রূপ নিলো বৃহত্তর জেলার কট্টোল রহমে। পি.টি.আই ভবনে অবস্থান নিলো মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। যেখানে ছিলো অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনী, অবসরপ্রাপ্ত ই.পি.আর, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ, ও আনসার। জিলা স্কুলে অবস্থান নিলো ইউণিটিসি ও জেসিসি ট্রেনিংপ্রাপ্ত কলেজ ও স্কুলের ছাত্ররা। জিলা স্কুল ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলাম আমি নিজে। পিটিআই দায়িত্বে ছিলেন অ্যাডভোকেট লুৎফুর রহমান ও নেতীর কমান্ডার রফিক। উভয় কেন্দ্রে অস্ত্র সরবরাহ করেন ৭১ এ অবস্থানরত নোয়াখালী'র ডিসি-এসপি জেলা আনসার অ্যাডজুটেন্ট ও মহরুমা আনসার অ্যাড। টাউন হল কট্টোলরূমের দায়িত্বে ছিলেন মরহুম এম.এ. আজিজ। ১৯৭১ এর ১৫ মার্চ থেকে এক মাস নোয়াখালী শত্রুমুক্ত ছিলো। এর পর পাকবাহিনী আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নোয়াখালী তাদের দখলে নিয়ে যায়। আমরা সবাই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে যাই। ট্রেনিং নিয়ে (এ জেলার ছেলেরা দেশের প্রত্যেকটি জেলার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে) সকল মুক্তিযোদ্ধা ক্রমে ক্রমে ভারত থেকে দেশে প্রবেশ করে। কয়েকটি যুদ্ধের কাহিনী:

### রাজগঞ্জ যুদ্ধ

পুরোনো কলেজের পরে রাজগঞ্জ। ৭১ সনের ২১ সেপ্টেম্বর পুরোনো মুক্তিযোদ্ধাদের ৬ টি দল একত্রিত হয়ে পাকবাহিনীকে মোকাবেলা

করার জন্য রাজগঞ্জ বাজারের চতুর্দিকে অবস্থান করে। রাজগঞ্জ বাজার থেকে মাইজদীতে অবস্থানরত পাকবাহিনী'র কট্টোলরূমে বারবার টেলিফো করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং পাকবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানানো হয়।

২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর ৫টি দলকে প্রত্যাহার করে অন্য জায়গায় অপারেশনে পাঠানো হয়। শুধু ১টি দল রাজগঞ্জে রইলো। পাকবাহিনী এই তথ্য গোয়েন্দা মাধ্যমে জেনে এবিদিন রাত ৩:৩০ মি: রাজগঞ্জ বাজারের ৫ দিক থেকে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের রাজগঞ্জে অবস্থানরত হাশেম কমান্ডারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্র দলটি প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। পাকবাহিনীর মূল দলটি মাইজদী বাজার থেকে ছয়আনি রাস্তা দিয়ে অভিযান পরিচালনা করে। পুরনো নোয়াখালী কলেজের কাছ থেকে পাকবাহিনী ২ ইঞ্চি মাটির দিয়ে ফায়ার অব্যাহত রাখে। আর পাকবাহিনী ৪টি দল আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে মুক্তিবাহিনীর উপর বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাশেম দৃঢ়তার সাথে পাকবাহিনীর মোকাবেলা করতে থাকে। ২৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৭:৩০ মি: পর্যন্ত যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনী প্রায় ২০ জন পাকহানাদারকে হত্যা করে। ছয়আনি বাজার থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ১টি দল কমান্ডার হাশেমকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার চেষ্টা করলেও সম্মুখ যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায়। কমান্ডার হাশেম নীরব হয়ে প্রায় ৩০ মি: নিজ অবস্থানে ঢিকে ছিলেন। শত্রুপক্ষ এ নীরবতার কারণ বুবাতে পেরে মুক্তিবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেঁলে এবং কমান্ডার হাশেমকে গুলি করে হত্যা করে। এদিকে মুক্তিযোদ্ধা সবুজ ও রবি পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। তরুণ সবুজ (পিতা: মত সিদ্দিক উল্ল্যা। থানা: মান্দারী, জেলা: নোয়াখালী) ও রবি (পিতা: হরিমোহন সাহা, গ্রাম: ভবানিগঞ্জ, জেলা: লক্ষ্মীপুর) এই ছিলো দুইজনের ঠিকানা। অন্যদিকে পাকবাহিনীর যে দল রাজগঞ্জ আক্রমণ করেছিলো তাদের হাতে মুক্তিযোদ্ধা গোলাম হায়দার ও সফিক ধরা পড়ে। গোলাম হায়দারকে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করে এবং সফিককে মাইজদী কোটে নিয়ে যায়। পাক বাহিনী এই এলাকা থেকে আরো ৬ জনকে বন্দী করে নিয়ে যায়। পাক

হানাদার সবুজ, রবি, মানিক ও এই ৬ জন লোককে মাইজদী জেনারেল হাসপাতালের পূর্ব উভর কোনের বিল্ডিং এর কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে গণকবর দেয়।

### কোম্পানীগঞ্জের তালমোহাম্মদ হাটের যুদ্ধ

যুদ্ধটি শুরু হয় ২১ নভেম্বর' ৭১ রাত ৩টা থেকে সকাল ১০ টা পর্যন্ত। এই যুদ্ধের মূলপরিকল্পনা করেছিলেন জেলা বি.এল.এফ কমান্ডার মাহমুদুর রহমান বেলায়েত। তালমোহাম্মদের হাটের গোড়াটিনে ৩০/৪০ জন মিলিশিয়া ও রাজাকারের একটি ক্যাম্প ছিল। এরা সাধারণ লোকজনের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করতো। সদর ও বেগমগঞ্জে ২৭/৩০ জনের ১টি মুক্তিযোদ্ধাদের দল সংগঠিত হয়ে শত্রুর এই ক্যাম্পের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। যুদ্ধে সদর থানা কমান্ডার সাবেক ডাকসুর সমাজকল্যান বিষয়ক সম্পাদক অহিদুর রহমান (অদু) শহীদ হন। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের সদরে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডেপুটি কমান্ডার জনাব আবুল কাশেম। এই যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধা সোনাপুর এলাকার মাস্টনুদ্দিন জাহাঙ্গীর (সদর থানা) যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখায় পরবর্তী পর্যায়ে বীর প্রতীক পদকে ভূষিত হন।

### সদর থানা ও দায়িত্ব হাটের যুদ্ধ

দিন ও সময় হলো ৩০ অক্টোবর' ৭১ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। রমজান মাসের ৯ তারিখ দুপুর ১২টায় সি জোনের নেতৃত্বে ও দায়িত্ব পাকবাহিনীর দোসরদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে মতিন ও হাবিলদার খালেকের টীম সহ প্রায় ৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ ৪ ঘন্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রায় কয়েক হাজার রাউন্ড গুলি বিনিময় করে। বিকেল ৪টায় মুক্তিযোদ্ধাদের ১টি ছোট-দল কোশলে বিল্ডিং এর দেওয়ালের কাছে ক্রলিং করে পৌছে গ্রেনেড নিষেকের কথা জোরে বললে সঙ্গে সঙ্গে ২৬ জন রাজাকার অস্ত্র উপরে তুলে খোলাজায়গায় দাঁড়িয়ে আত্মসমর্পণ করে। এ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে ৫/৬ হাজার সাধারণ জনগণ অবস্থান নেয়। বন্দীকৃত ২৬ জন রাজাকারকে আবদুল্ল্য মিয়ার বাড়ীর সামনে এনে ৩ রাস্তার মোড়ে গুলি করে হত্যা করে লাইন ধরে ফেলে রাখে। এ খবর

মাইজদী পি.টি.আইতে অবস্থানরত পাকবাহিনীর নিকট পৌছলে পরদিন সকাল ১০টায় গাড়ীর বহর নিয়ে পাকবাহিনীর ঘটনাস্থলে পৌছায়। পাকবাহিনীর মেজর গাড়ী থেকে নেমে রাজাকারদের লাইন করা শুরু থাকা লাশ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কোন অপারেশন না করে মাইজদী চলে আসে।

### পিটিআই এলাকার যুদ্ধ

নোয়াখালী জেলার শেষ যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হয় ৬ ডিসেম্বর' ৭১। রাত্রি ৩.৩০ মি: থেকে ৭ ডিসেম্বর' ৭১ এর বিকেল ৩.১০ মি: পর্যন্ত। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ৪ ও ৫ ডিসেম্বর পাকসেনা ও মিলিশিয়ারা আস্তে আস্তে স্থান ত্যাগ করে কুমিল্লা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এ ব্যাপারটি রাজাকাররাও বুঝতে পারে নি। এদিকে নোয়াখালী জেলা বি.এল.এফ কমান্ডার (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে) জনাব মাহমুদুর রহমান বেলায়েত ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতি নোয়াখালী জেলার প্রত্যেকটি থানা কমান্ডারদের (বি.এল.এফ/এফএফ/এমএফ/বিডি এফ) কে নির্দেশ দেন প্রত্যেক থানা সদর দপ্তর আক্রমণ করে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করতে। যে কথা সেই কাজ। সকল থানায় যুদ্ধের সাজ সাজ রব পড়ে যায়। জেলা সদরের পি.টি.আই দখলের দায়িত্ব পড়ে সদরের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের উপর। পি.টি.আই আক্রমণ করতে এসে মুক্তিযোদ্ধারা শহরের প্রবেশ পথে (১) নাহার বিল্ডিং রাজাকার ক্যাম্প (২) মাইজদী কোর্ট স্টেশন রাজাকার ক্যাম্প (৩) দন্তের হাট রাজাকার ক্যাম্প গুড়িয়ে দেয়। ক্যাম্প আক্রমণ করতে সদর পঞ্চিম অঞ্চল থেকে সি জোনের কমান্ডার আদমজীর শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ উল্ল্য ও আদমজী চটকলের বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী সফি নেতা নেতৃত্ব দেন। এই যুদ্ধে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনী/আনসার/ মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাসহ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা সি জোনের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তারা জামে মসজিদের পক্ষে অবস্থিত রেনুমিয়া কন্ট্রাটরের বাড়ী থেকে বর্তমান নতুন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পুরো এলাকা ধিরে

ফেলে। উভর দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চল থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধা শহরে উঠে বাকী তিনি দিক ধিরে ফেলে। ৬ ডিসেম্বর রাত্রি ৩টা থেকে ফায়ার চালু করে। রাতের অন্ধকারে কিছু রাজাকার পালিয়ে যায়। পি.টি.আই স্থানটি সংরক্ষিত এলাকা। রাজাকাররা থেকে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের জবাব দেয় ৩০৩ রাইফেল থেকে।

এদিকে ফেনীতে ২২ং সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার কর্গেল জাফর ইমাম মাইজদী পি.টি.আই যুদ্ধের খবর পেয়ে তার একটি সেকশন নিয়ে দুপুরে এসে মাইজদী অবস্থান নেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সকল অবস্থান ও শত্রুর অবস্থান জেনে নিয়ে শত্রুর আস্তানায় ২টি ২ ইঞ্জিং মটর সেল নিক্ষেপ করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজাকাররা ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করে। এরপর ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলা পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। এই যুদ্ধে ২ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। তাঁরা হচ্ছেন- (১) আমিনুল হক, গ্রাম-দামাদর, ২ নং দাদপুর ইউনিয়ন, সদর। তার গলায় গুলি লাগলে তিনি কঠস্বর হারিয়ে ফেলেন। দেশ স্বাধীনের পর মরহম আবদুল মালেক উকিল কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতা প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা। (২) অন্যজন হচ্ছে- আদমজীর শ্রমিক গোলাম মোস্তফা। গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, ৩ নং নোয়াখালী, সদর। তার পেটে গুলি লাগে। চিকিৎসার পর সে ভালো হয়। তিনি জীবিত। তিনিও কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতা প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা।

নোয়াখালী পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে নানা জায়গায় অবস্থান নেয়। বৃহৎ আকারে ছিলো (১) নোয়াখালী জিলা স্কুল। (২) হরিনারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (৩) আহমদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাপুর।

২০০৩ সালের মার্চে রবিউল হোসেন কচি সম্পাদিত নোয়াখালী পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ “নোয়াখালী” থেকে লেখাটি ব্লগের পাতায় তুলে এনেছেন মুকুল।

## স্মৃতিতে নোয়াখালীর মুক্তিযুদ্ধ

### অ্যাডভোকেট সারওয়ার-ই-দীন

১৯৬৯ সাল। ৬ দফা ও ১ দফার সংগ্রাম তুঙ্গে। স্বেরাচার আইয়ুবের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা জনতার দাবীতে পরিগত হয়েছে। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) এর নোয়াখালী জেলা শাখার সেক্রেটারী। ছাত্র রাজনীতির পাশা-পাশি আমি শ্রমিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি। নোয়াখালী জেলা রিআ শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে আমি তখন কাজ করছিলাম। সারা দেশে পাড়া মহল্লায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে।

মাইজদী বাজারে আঞ্চলিক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। মরহুম সফিকুর রহমান হলেন উক্ত সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি এবং আমাকে করা হলো সেক্রেটারী। অরুণ স্কুলের একটি কক্ষে মাইজদী বালিকা বিদ্যানিকেতনের অফিস ছিল। সেই অফিসেই আমরা সংগ্রাম পরিষদের অফিসের কাজ করতাম। মাইজদী শহরে মিছিলের শহরে পরিগত হয়েছে। এক দিন অরুণ স্কুলের ক্ষাউটের ডামি রাইফেল হাতে মাইজদী বাজার থেকে শহরের দিকে এক ঐতিহাসিক মিছিল বের হয়। ডামি রাইফেল কাঁধে নিয়ে আমরা একদল ছাত্র/যুবক মিছিলের পুরো ভাগে শোগান তুললাম, “বীর বাঙালী অস্ত ধূরু বাংলাদেশ স্বাধীন কর”। “জাগো জাগো - বাঙালী জাগো”। “জয় বাংলা-জয় বাংলা।”

১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে সেনবাগ পাক সেনারা ছাত্র/জনতার মিছিলে গুলি ছুঁড়লে ২ জন বাঙালী নিহত হয়েছিলেন। সেনবাগে সেনাবাহিনীর গুলিতে ২জন নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে বিক্ষোভের আগুন দাঁড় দাঁড় করে জুলে উঠে। সেনবাগে গণহত্যার প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারী সারা জেলায় হরতালের ডাক দেয় নোয়াখালী জেলা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। সেনবাগে গণহত্যার প্রতিবাদে মাইজদী শহরে সর্বাত্মক হরতাল চলছিল। আমরা মাইজদী বাজারের প্রধান সড়কের উপর ইটের স্তুপ দিয়ে বিরাট ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছি। পাক সেনাবাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে এসেই ব্যারিকেডে বাঁধাগ্রস্থ হয়। আমি সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেনের জিপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিলাম এবং চি? খ্রকার করে বলতে লাগলাম সেনবাগে গুলি করে যাদের হত্যা করা হয়েছে আমরা তাদের লাশ চাই।

সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন হঠাতে জিপ থেকে বাজ পাখির মত লাফিয়ে পড়ে আমাকে তার জিপে তুলে নিয়ে ছুটলো দক্ষিণ দিক থেকে শত ছাত্র-জনতা তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। জিপটি দক্ষিণে বর্তমান বাস টার্মিনাল পর্যন্ত গিয়ে আবার আমাকে নিয়ে ছুটলো মাইজদী বাজারের উপর দিয়ে উভর দিকে। বর্তমান টি.ভি সেক্টারের সম্মুখে গিয়ে ক্যাপ্টেনের জিপ থেকে সেনাবাহিনীর ট্রাকে আমাকে ছুড়ে ফেলল।

শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে আমাকে আর্মিরা মেরে ফেলেছে। এদিকে

সেনাবাহিনীর গাড়ী বহর চৌমুহনী রেল ব্রিসিংয়ের গেট বন্ধ থাকায় সেখানে থেমে যায়। পাশের পুলিশ ফাঁড়ি থেকে কর্তব্যরত ও.সি রববানী সাহেব বেরিয়ে এসে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আমাকে পুলিশ ফাঁড়িতে রেখে দেন। চৌমুহনী কলেজের ছাত্রদের বিরাট মিছিল আসতে দেখে সেনাবাহিনীর বহরটি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে যায়।

“আমাকে আর্মিরা নিয়ে গেছে” এ খবরে মাইজদী শহরে উভাল জনতার ঝোত রাস্তায় নেমে আসে এবং ঐদিন বিকেল ৪টায় তৎকালীন ব্যারাক মাঠে (বর্তমান পাবলিক হলেখের অফিস) বিরাট জন সমাবেশে আমার মুক্তির দাবী উঠে। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের হেড লাইনে নোয়াখালীর এ খবর ছাপা হয়।

৬ দফা ও ১১ দফার গণঅভ্যন্তরে স্বেরাচার প্রেসিডেন্ট আইনুর খানের পতন ঘটে। সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়।

১৯৭০ সাল। সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন হলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ারীগীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কেন্দ্রে এবং প্রদেশে জয়লাভ করলো। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জাতো নির্বাচনের ফল মেনে নেয়নি। তারা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে গোল টেবিল বৈঠকের নামে বাংলালী জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

২৬ মার্চ ১৯৭১। নোয়াখালী জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক মঙ্গেরুল করিয়ে সাহেবে টেলিগ্রামে মেসেজ পেলেন বঙ্গবন্ধু আনন্দানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধু জনগণের নির্বাচিত নেতা হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ২৬ মার্চ পঞ্চিবীর মানচিত্রে “বাংলাদেশ” নামক একটি দেশের অভ্যন্তর ঘটে।

২৭ মার্চ ১৯৭১ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। একজন বাংলালী সামরিক অফিসারের কষ্ট থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা তখনকার সময় স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছিল।

নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। প্রথমে ফেনীতে পাক সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ যুদ্ধ হলো। মাইজদী থেকে আমরা শত শত ছাত্র-জনতা ফেনীতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সহযোগিতা করেছিলাম।

২৬ মার্চ থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত নোয়াখালী জেলা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সংবাদপত্র বিহীন নোয়াখালীতে

পৌরসভার সাইক্লোষ্টাইল মেশিন দিয়ে আমরা গোপনে “বুলেটিন” ছাপিয়ে খবর প্রচার করতাম। পঞ্চিম মাইজদীর চক্রবর্তী বাড়ীতে ছিল আমাদের “বুলেটিন” ছাপানোর গোপন স্থান। সেজন্য রাজাকার বাহিনী অভয় চক্রবর্তীকে ধরে সেনাবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিলে তাঁকে নৃশংসভাবে চৌমুহনী টেকনিক্যাল স্কুলে এনে হত্যা করে।

২৩ এপ্রিল ১৯৭১ পাক হানাদার বাহিনী লাকসাম থেকে সড়ক পথে নোয়াখালীতে প্রবেশ করে। আমরা একদল যুবক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের ত্রিপুরা চলে যাই। আগরতলায় ফাস্টম হোস্টেল নামক ক্যাম্পে ন্যাপ (মোঃ) ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিষ্ট পার্টির যৌথ



উদ্যোগে যৌথ গেরিলা বাহিনীর প্রশিক্ষণ সংগঠিত করার কাজ চলে। আমরা কমান্ডে প্রথমেই ২৪ জনের একটি গ্রুপ নিয়ে আমি আগরতলা থেকে আসামের তেজপুরে প্রশিক্ষণে চলে যাই। প্রশিক্ষণ শেষে আমি ২৪ জনের ১০২ নং গেরিলা গ্রুপ নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। এবং গেরিলা রিস্কুট করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দিতে থাকি। তৎকালীন নোয়াখালী সদর মহকুমা বর্তমান নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর জেলার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে আমি যৌথ গেরিলা বাহিনী পরিচালনা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমার বাহিনীর মোট ১০ জন গেরিলা শহীদ

হয়েছেন। ১১ নভেম্বর বেতিয়ারায় শহীদ হন ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা।

১ ডিসেম্বর ১৯৭১। আমি চাটখিলের দৌলতপুর থেকে ৮০ জনের গেরিলা বাহিনী সোমপাড়ায় আবদুল্যার বাড়ীতে যাত্রা বিরতি করে ভোর রাতে মান্দারী শত্রুক্যাম্পে এককভাবে আক্রমণ চালাই এবং যুদ্ধ করে মান্দারী মুক্ত করি।

৩ ডিসেম্বর মান্দারী বাজারের চতুর্দিক ঘেরাও করে মান্দারী হাই স্কুল মাঠে এক বিরাট সমাবেশ করি। ১ ডিসেম্বর মান্দারী মুক্ত করে আমরা যখন দস্তপাড়া হাই স্কুল মাঠে বিশ্রাম নিছিলাম তখন ঐ এলাকার ৬ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল সাহাবুদ্দিনের কমান্ডে

মান্দারী অভিযুক্তে যাওয়ার সময় পাক মিলিশিয়া বাহিনীর গুলিতে ১ জন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করলাম। ৩ জানুয়ারী ১৯৭২ নোয়াখালী কোর্ট বিল্ডিং এর সম্মুখে পেঙ্গেল তৈরি করে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশাসনের নিকট আমাদের যৌথ গেরিলা বাহিনীর অস্ত্র জমা দিয়েছি। ঐদিন অস্ত্র জমা দেয়ার সময় তৎকালীন জেলা প্রশাসক জে. এল. দাসের অনুরোধে কোর্ট বিল্ডিং এ উপস্থিতি থাকা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং ভারত থেকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের যৌথ গেরিলা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃহত্তর নোয়াখালীতে ৪৫০ জনে উন্নিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে ভিয়েতনামের কলাকোশলে আমাদের গেরিলা বাহিনী মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

৯ মাস সশস্ত্র লড়াইয়ের পর ৭ ডিসেম্বর বীর বেশে যুদ্ধ করতে করতে মুক্তিযোদ্ধারা নোয়াখালী শহর মুক্ত করলেন। মাইজদী ভোকেশনাল ইনসিটিউটে ক্যাম্প স্থাপন করলেন কমান্ডার মোশারফ হোসেন। মাইজদী পি.টি.আইতে স্থাপিত হয়েছিল আমার কমান্ডের ন্যাপ কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর ক্যাম্প। আমাদের আরেকটি ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল চৌমুহনী বিসিক বিল্ডিং এ। পি.টি.আই গেইটে “মুক্ত নোয়াখালী” নামে যে সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে এটি ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী মুক্ত হওয়ার স্বাক্ষর বহন করে। নোয়াখালী মুক্ত দিবস হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্মত প্রজন্মের প্রেরণার উৎস।

•  
২০০৩ সালের মার্চে নোয়াখালী পৌরসভা কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ “নোয়াখালী” থেকে লেখাটি রংগের পাতায় তুলে এনেছেন মুকুল।

# একজন পাকিস্তানির দৃষ্টিতে একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ

শওকত হোসেন মাসুম

একজন পাকিস্তানির দৃষ্টিতে বইটি অনেকেই পড়েছেন। সিদ্দিক সালিকের উইটেনেস টু সারেন্ডার। সিদ্দিক সালিক একজন মেজর ছিলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা ছিলেন, ১৬ ডিসেম্বর আন্তসমর্পণের পর যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারত যান।

মুক্তি পেয়ে এই বইটি লিখেছিলেন। এই বইটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

একজন পাকিস্তানীর লেখা এই বইটি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বই হিসাবে গণ্য। বলে রাখি সিদ্দিক সালিক বিশ্বেতার থাকা অবস্থায় ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান, প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সফরসঙ্গী ছিলেন তিনি।

বলা যায় বইটি একজন পাকিস্তানীর দৃষ্টি দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে দেখা। অনেকেই বলে থাকেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চাননি বা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন ইত্যাদি। কিংবা জামায়াতের ভূমিকা নিয়েও অনেকে অনেক কিছু বলেন। বলেন আল বদর-রাজাকার নিয়ে অনেক কথা। অনেক প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যাবে বইটি থেকে।

শুরুটা এরকম। এক অবঙ্গালি সাংবাদিক শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাতকার নিয়েছেন। তাঁর অজান্তেই সাক্ষাতকার রেকর্ড করা হয়। সেই রেকর্ড পরে শোনানো হয় অনেককেই। গোয়েন্দা সংস্থারা বঙ্গবন্ধুর কথাবার্তার আরো একটি গোপন রেকর্ড সংগ্রহ করে। দলের কিছু নেতৃদের উদ্দেশ্যে বলা তার এই রেকর্ড চলে যায় গোয়েন্দাদের হাতে।

কী বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু? ‘আমার লক্ষ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন শেষ হতেই ইয়াহিয়ার করা লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার আমি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে দেবো। নির্বাচন একবার শেষ হলে কে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে?’

ইয়াহিয়া এই রেকর্ড শোনার পর ক্ষিণ হয়ে বলেছিলেন, ‘সে যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে আমি তাকে ফাঁসিতে বুলাবো।’

সিদ্দিক সালিক একাধিকবার বলেছেন যে, যখনই বঙ্গবন্ধুকে ৬ দফা নিয়ে কথা বলতে না করা হতো তখনই তিনি বলতেন যে, ‘আমাকে গ্রেঞ্জ করে নিয়ে যান। আর যদি আমি ৬ দফা নিয়ে না বলি তাহলে আমার দলের লোকেরাই আমাকে মেরে ফেলবে।’

সিদ্দিক সালিক বলেছেন, এটা ছিল শেখ মুজিবের এক ধরণের কৌশল। এই কৌশল অনেকবারই করতেন তিনি।

৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে সিদ্দিক সালিক কী লিখেছেন সেটা দেখা যাক। তিনি লিখেছেন, সামরিক সরকার জানতে পারলো যে ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন মুজিব। এটা নিয়ে প্রবল উৎকর্ষ তৈরি হলো। ৬ মার্চ আওয়ামী লীগ গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। ইয়াহিয়া কোনো ঘোষণা না দেওয়ার জন্য মুজিবকে চিঠি লেখেন। একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে সশস্ত্র অবস্থা প্রস্তুত থাকার জন্য বলে দেওয়া হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের জিওসি আওয়ামী লীগের দুনেতাকে ডেকে বলে দেন যদি মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় তাহলে রক্তগঙ্গা বইবে এবং এই দেশে শাসন করার লোকও থাকবে না, শাসকও থাকবে না। এইদিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড মুজিবের সঙ্গে দেখা করে বলে দেয় মুজিব যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো সহায়তাই পাবে না।

এসব কারণেই এইদিন মুজিব স্বাধীনতার কোনো ঘোষণা দিতে পারেননি।

মেজর সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, বেশিরভাগ বাসান্তই বিশ্বাস করতো যে মুজিব বের হয়ে আসবে এবং দেশ স্বাধীন হবে। এর বিপরীতে কিছু ডানপন্থী পাকিস্তানিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। যেমন, কাউপিল মুসলীম লীগের খাজা খায়ারুদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলীম লীদের খান সবুর এ খান, জামাতে ইসলামির অধ্যাপক গোলাম আজম এবং নিজাম-ই-ইসলামি পার্টির মৌলবী ফরিদ আহমেদ।

সিদ্দিক সালিকের ভাষায়, এরা সবাই ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কাছে প্রারজিত হয়েছিল এবং বাসান্তিদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল খুবই কম। মানুষ সাধারণ ভাবে মনে করতো এরা সবাই অচল মুদ্রা যাদের পাক আর্মি নতুন করে চালাতে চেষ্টা করছে। পাকি আর্মি তাদের গুরুত্ব দিত এবং তাদের প্রারম্ভ শুনতো।

বইটিতে বলা হয়েছে, এ সমস্ত দেশপ্রেমিক পাকিস্তানিদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় অভিযানও চালানো হতো। কেউ কেউ পাকিস্তানের অভিযান রাখতেই সঞ্চারিতা দিয়েছে আবার কেউ কেউ নিজেদের শক্তি হিসাবে আওয়ামীপন্থীদের ধ্বনি করতে পাক আর্মিদের ব্যবহার করেছে। সিদ্দিক সালিক উদাহরণ দিয়ে

বলেছেন, একজন ডানপন্থী রাজনীতিবিদ একটি কিশোর ছেলেকে নিয়ে এসেছিল মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে। সে জানায় যে তার কাছে বিদ্রোহীদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য আছে। সিদ্দিক সালিকই তাকে নিয়ে যায় একজন নির্দিষ্ট আর্মি অফিসারের কাছে। সেখানে সেই রাজনীতিবিদ জানায় যে, বুড়িগঙ্গা পার হয়ে কেরানিগঞ্জে মুক্তিবাহিনী আশ্রয় নিয়ে আছে এবং তারা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে খবর দিতে। সাথে সাথে বিশাল বাহিনী নিয়ে পাক আর্মি অভিযান চালায় এবং সবাইকে গুলি করে মারা হয়। অভিযান শেষে দেখা গেল, ওখানে কোনো বিদ্রোহীই ছিল না, ছিল কেবল নারী ও শিশু। সিদ্দিক সালিক এই ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন।

সিদ্দিক সালিক আরো লিখেছেন, তাদের পক্ষে সে সময় কোনো গণসমর্থন ছিল না। ইসলাম ও পাকিস্তানের নাম নিয়ে কিছু লোক জীবনের বুঁকি নিয়ে তাদের সমর্থন দিয়েছিল। এই দেশপ্রেমিকদের (তার ভাষায়) ছিল মূলত দুই ভাগ। এর মধ্যে বয়স্করা ছিল শাস্তি কর্মটির সদস্য এবং অন্য বয়স্করা রাজাকার। এরা পাক আর্মি ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সংযোগ হিসাবে কাজ করতো। রাজাকারদের সশস্ত্র আকার দেওয়া হচ্ছিল।

তবে সেটেবারে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অভিযোগ আসে যে, পাক আর্মি মূলত জামায়াত ইসলামীদেরই প্রতিপোষকতা করছে। এই অভিযোগ পাওয়ার পর সিদ্দিক সালিক লিখেছেন যে, লে. জে. নিয়াজি তাকে একদিন ডাকলেন। ডেকে বললেন যে, এখন থেকে রাজাকারদের আল বদর ও আল শামস বলেও ডাকবে। যাতে বোঝা না যায় যে, সবাই একটি দলেরই সদস্য। তিনি লিখেছেন এই আল বদর ও আল শামস তাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছিল।

কিছু বাড়তি তথ্য-

জামাতিরা বলার চেষ্টা করে যে আল বদর তাদের সৃষ্টি না। আসুন দেখি এর ইতিহাস। আল বদর প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল জামালপুর শহরে। প্রতিষ্ঠাতা ছিল মোমেনশাহী জেলার ইসলামি ছাত্র সংঘের (এরাই পরে ছাত্র শিবির) সভাপতি আশরাফ হোসাইন। পরে জামায়াতিরা এর নেতৃত্ব কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ে নেয়। আল বদর কেন্দ্রীয় হাই কমান্ডের সারা পাকিস্তান প্রধান ছিল মতিউর রহমান নিজামী, পূর্ব পাকিস্তান প্রধান ছিল আলী আহসান মুজাহিদ এবং তাদের সদস্য ছিল মীর কাশেম আলী।

# কখনও স্মৃতি পাহারা দেবার সময় আসে

## মাহবুব মোর্শেদ

‘চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির’ জীবনানন্দ দাশের ‘ধূসুর পাভুলিপি’ থেকে ডায়েরিতে প্রিয় কিছু লাইন, কিছু স্মৃতি টুকে রেখেছেন আনন্দায়ার পাশা। একের পর এক লাইনগুলো পড়ে যেতে থাকি- ‘এই পথিকীর ভালো প্রিয় রোদের মতোন তোমার শরীর’। দিনক্ষণ লেখা নেই, বাঁকা নদীর মতো নীল আর জাদুঘরের স্বচ্ছ কাচের সংগ্রহের ভেতর থেকে কথা বলে। হয়তো কোথাও লেখা আছে- বাংলার মুখ আমি আমি দেখিয়াছি...। কিংবা তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও- আমি এই বাংলার পারে / রয়ে যাব; তিনি রয়ে গিয়েছিলেন, বাংলায়, ঢাকায়। ‘রাইফেল রোটি আওরাতে’র লেখক তার স্বপ্নের স্বাধীনতার সাধ ঢাকায় বসেই কি পেতে চেয়েছিলেন? কেন দেশান্তরী হননি, বেছে নেননি প্রবাসের উদ্বাস্তু জীবন? তিনি তো স্পষ্ট জানতেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে আর এ জন্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে রক্ত দিয়ে। তিনিই তো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উত্থানকে বিজয়েরই বার্তা বলে নিজেরই উপন্যাসে উল্লেখ করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন কেন তাকে মারবে পাকিস্তানিরা। তিনি তো আর যুদ্ধে যাননি! কেন বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে শাসক-শোষকরা? কেন লোরকাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মাথায় গুলি করে করে পথের ধূলায় লুটিয়ে দেয় ঝাক্কের গুভারা, খাক ক্ষেয়াড যাদের সরকারি নাম। স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের সময় ফ্যাসিস্টরা আওয়াজ তোলে- বুদ্ধিজীবীদের খতম করো। পঁচিশে মার্চের প্রথম আঘাতের অন্যতম লক্ষ্য ছিল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিচার্স লাউঞ্জ, শিক্ষকদের বাসা, সংবাদপত্রের অফিস। তন্ত্রজ্ঞ করে খোঁজা হয়েছিল লেখক-শিল্পীদের। গোবিন্দ চন্দ দেব, জ্যোতিম্য গুহ্ঠাকুরতা, মেহেরমেসা, এনএম মুনীরজামান প্রথম রাতেই ঘাতকের বুলেটে লুটিয়ে পড়েন। চিচার্স লাউঞ্জের রক্তাক্ত কার্পেট জাতীয় জাদুঘরের আলো- আঁধারির মধ্যে এখনও সেই রক্তাক্ত রাতের কথা বলছে। আমরা কি প্রস্তুত সে কথা শুনতে? আমরা না জানি, সেই রক্তমাত্র স্মৃতিচিহ্নগুলো স্পষ্ট জানে কেন খুন হন বুদ্ধিজীবীরা। জাদুঘরে সংরক্ষিত বস্তুগুলো আমাদের সরাসরি

ইতিহাসের মখোমুখি দাঁড় করায়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লিখিত ইতিহাসে যে বিকরি, সত্যের অপলাপের সম্ভাবনা থাকে তা এই বস্তুগত ইতিহাসে ঘটানো কঠিন। তাই শুধু স্মৃতিচিহ্ন নয়, অতীতকে পাঠ করার ক্ষেত্রে এই বস্তুগুলো অমূল্য।

হয়তো জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহ সামান্য। একে সমৃদ্ধ করার অনেক সুযোগ আছে। কিন্তু যা আছে তা কি চেতনায় শিহরণ বইয়ে দেয়ার মতো যথেষ্ট নয়?

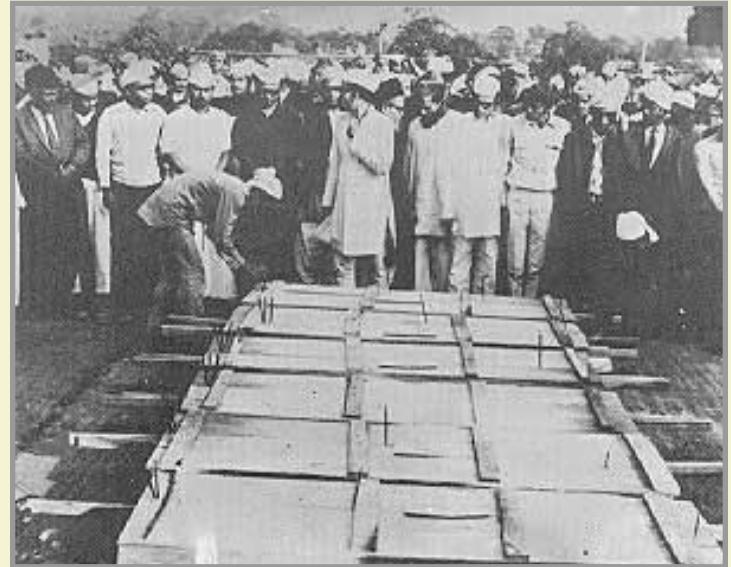
জ্যোতিম্য গুহ্ঠাকুরতার ঘড়ির কাঁটা পঁচিশে মার্চের রাত দশটা একচল্লিশ মিনিটে স্থগিত হয়ে আছে। তার ক্ল্যাসিকাল মিথস ইন দ্য প্লেস অব সুইনবার্নের পাশে রাখা টাই। আর রাতে খাওয়ার জন্য কেনা এক প্যাকেট ক্যাপেস্টান।

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদের কলম, পাইপ, চশমা, গানের খাতা, হারমো-নয়াম। গানের খাতায় চোখ স্থির হয়ে পড়ে- ওগো টুনটুনি/ ও যোর খঙ্গনি/ তুমি আমার জানের জান/ ও ধ্রাণ, শুধু একটু হাসো না।

লেখক শামসুন্নাহার মাহমুদের ছেলে মামুন মাহমুদ।

শিশুকালে রাবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৩৪ সালে। বড় হয়ে হয়েছিলেন পুলিশ অফিসার। তাকে রাজশাহীতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ২৬ মার্চ তারিখে। তার সেই চিঠি, কচিকাঁচার আসরে প্রকাশিত লেখা সাজানো রয়েছে ঘন কাচের আড়ালে।

যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়নের সংবাদ বাইরের মিডিয়ায় পাঠাবার অপরাধে ৬ আগস্ট গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে পাঠানো হয় সাংবাদিক সৈয়দ নজরুল হককে, কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরেন নভেম্বরে। কিন্তু ১১ ডিসেম্বর আবার তাকে ধরে নিয়ে যায় আলবদর বাহিনী। তখন রাত সাড়ে তিনটা। এই সাংবাদিকের লাশও ফেরত দেয়নি ঘাতকরা। নজরুল হকের পাইপ, তামাকের কোটা, স্ট্যাপলার, মেমপ্রেট ( চিফ রিপোর্টার, পিপিআই), ডায়েরি, বিফকেস পর পর সাজানো।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের কফিন

‘ ’

১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বরের মর্মভেদী রাতে কতটা শীত পড়েছিল বাংলাদেশে? রাতে কি কুয়াশা ছিল? পথ কি অন্ধকার ছিল নাকি মুদু জ্যোৎস্না মুখ বাড়াবার চেষ্টা করছিল? শিল্পাল্পি পত্রিকার সম্পাদক সেলিনা পারভীন কী একবার শীতে কেঁপে উঠেছিলেন।

‘ ’

সেই সময়ের একজন সাংবাদিকের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । মুনির চৌধুরীর স্মৃতিচিহ্ন অপটিমা মুনির । সাহিত্যের অধ্যাপকের আবিক্ষার- প্রথম বাংলা টাইপরাইটার । পাশে ইস্ট পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ভূমিক পত্র- 'ইউ উইল নট ইনডালজ ইন দ্য এন্টি-স্টেট অ্যাকটিভিটিজ ইন ফিউচার ।' ১৪ ডিসেম্বর কিছুক্ষণের জন্য তাকে ডেকে নিয়ে যায় আল বদর কমান্ডার । লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি গায়, মাথায় না আঁচড়ানো ছুল নিয়ে বাসার বাইরে যান তিনি । কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বের হলেন, কিন্তু ফিরে এলেন না আজও । জ্যোতির্ময় গুহ্যাকুরুতার ঘড়ির ১০টা একচলিশের মতো স্থির হয়ে আছে ওই কিছু সময় । ওই কিছুক্ষণের ভেতর দিয়ে চলে গেছে ৩৪টি দীর্ঘ বৎসর ।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. আলীম চৌধুরীর স্মৃতিলিপির পাশে সাজানো তার চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, অনুবীক্ষণ যন্ত্র । অধ্যাপকের কলম, কবির ডায়েরি, ভূত্বিদের গবেষণাগ্রন্থ সবই স্থির গেছে ১৪ ডিসেম্বরে ।

আমরা লাশ খুঁজছি । বাংলাদেশ জুড়ে আমরা আজও খুঁজে ফিরছি শহীদদের লাশ । রায়ের বাজার বধ্যভূমি, মিরপুর বধ্যভূমি আরও অসংখ্য জানা-অজানা বধ্যভূমিতে । হঠাৎ একদিন পেয়ে যাই ডা. ফজলে রাবিবর চোখবঁধা, পচা গলা লাশ । পেয়ে যাই জহির রায়হানের কংকাল । জাদুঘরে রাখা আছে শহীদের কংকাল । ছবিতে করোটির চোখে চোখ রেখে ভাবতে চাই, বুবাতে চাই এটাই মুনীর চৌধুরীর করোটি কি না । যেখানে প্রথম জন্ম হয়েছিল কবর নাটকের?

ঘাতক স্পষ্ট জানে লিস্ট করে কাদের এক এক করে বাসা থেকে বের করে আনা হবে । কাদের পাঠিয়ে দিতে হবে অনন্ত নিরবেশের উদ্দেশে । কে কে নিখোঁজ হবেন চিরদিনের মতো । কার লাশও আর পাওয়া যাবে না । আমাদের যুদ্ধের এই এক সত্য যে, হত্যার মচুব শুরু হয় বুদ্ধিজীবীদের দিয়েই ।

যুদ্ধ যে কত রকমের হতে পারে! যে প্রজন্ম সর্বব্যাপী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তাদের পক্ষে বোঝাও কঠিন । গৃহিণীর যুদ্ধ সম্মুখ সমরের যোদ্ধার মতো নয়, লেখকের যুদ্ধ কৃষকের মতো নয়, শ্রমিকের মতো নয় কিশোরের যুদ্ধ । তবু একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, সর্বব্যাপী মুক্তির লড়াই তখনই যুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে যখন এতে যুক্ত হন সকলে । সে জনযুদ্ধে লেখক লিখে, চিকিৎসক চিকিৎসা করে, অধ্যাপক গবেষণা করে অংশ নেন । কলম হয়ে ওঠে স্টেনগান, স্টেথিস্কোপ রূপান্তরিত হয়ে যায় এসএমজিতে । অতএব অস্ত্র যে হাতে নিয়েছে তাকে শক্ত অন্ত্রের মুখে দাঁড়াতেই হবে একদিন । অস্ত্র অসম হলে প্রাণও দিতে হবে । 'নিরীহ

বুদ্ধিজীবীদের শাহাদৎ' কোনো কাজের কথা নয় । সশস্ত্র বুদ্ধিজীবীদের চেহারা যারা দেখেছেন তাদের সেটা মনে করিয়ে দিতে হয় না । কে বলে সংশ্লিষ্টকের লেখক, স্টপ জেনোসাইডের পরিচালক, কবরের নাট্যকার সশস্ত্র ছিলেন না? হয়তো তাদের মৃত্যুবৰ্ষ ছিল না । হয়তো তারা দেশত্যাগ করতে চাননি । ঢাকায় বসে পাহারা দিতে চেয়েছিলেন মৃত্যুময় বিভীষিকাগুলো । আবারও ফেরেরিকো গার্সিয়া লোরকার কথা । লোরকা জানতেন ফাক্স

আর তার গুণবাহিনীর চক্ষুশূল তিনি । তার নাটক, গাঁথা আর কবিতাকে বড় ভয় তাদের । যে কোনো মুহূর্তে তাকে মুখোমুখি হতে হবে ঘাতকের । তবু ফিরেছিলেন প্রিয় শহর গ্রানাদায় । না ঘাতকরা ভুল করেনি । ঠিকই তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চিরনিরবেশের পথে পাঠিয়ে দিয়েছিল । ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বরের মর্মভেদী রাতে কতটা শীত পড়েছিল বাংলাদেশে? রাতে কি কুয়াশা ছিল? পথ কি অন্ধকার ছিল নাকি মৃদু জ্যোৎস্না মুখ বাড়াবার চেষ্টা করছিল?

শিলালিপি পত্রিকার সম্পাদক সেলিনা পারভীন কী একবার শীতে কেঁপে উঠেছিলেন । তার পত্রিকার জুলজুলে প্রছদের দিকে তাকিয়ে ভাবার চেষ্টা করি । এক শীতের সকালে কোথায় নীরবে কাঁপছিল প্রথ্যাত লেখক, সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের লাশ? আগের সন্ধ্যায় ঘাতকরা তাকে জিজেস করছে, আপনি কি শহীদুল্লাহ কায়সার? তিনি উন্নত দিয়েছিলেন, হাঁ । তার আত্মপরিচয়ের এই দৃঢ়তায় কি ভয় পেয়ে গিয়েছিল ঘাতকদের কেউ?

শহীদদের স্মৃতিলিপিতে কার কথা না লিখে পারা যায়? রণদাপ্রাসাদ সাহা, যোগেশ চন্দ্ৰ ঘোষ, নৃতন চন্দ্ৰ সিংহ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুহম্মদ আখতার, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা একাডেমীর শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষাগ্রহে পাই মাত্র ১৭৫ জনের বিবরণ । কিন্তু একটি জাতির চিন্তাকে হত্যা করার জন্য এই সংখ্যাটিই যথেষ্ট । ঘাতকরা আরও রক্ত চেয়েছিল । অনেককে যথাস্থানে খুঁজে পায়নি । আমরাও খোঁজ করতে ব্যর্থ হয়েছি অনেকের লাশ । স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের সময় যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমরা শহীদদের স্মৃতিকে পাহারা দিয়ে রাখব । প্রথিবীতে কোনো সময় এমন নির্মম হয়ে আসে যখন স্মৃতিকেও সতর্ক পাহারা দিয়ে রাখতে হয় । কিন্তু আমরা কি স্মৃতি পাহারা দিতেও ব্যর্থ হচ্ছি? আমাদের অনেকে শহীদেরই স্মৃতিচিহ্ন নেই । জাদুঘরের ষষ্ঠায়তনে অনেকেরই স্থান হয়নি । বাংলা একাডেমী একবার শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিচিহ্নের প্রদর্শনী করেছিল । কিন্তু ওই প্রদর্শনীর কোনো কিছুই সংরক্ষিত হয়নি । কে জানে কোথায় আছে সংশ্লিষ্টক বা রাইফেল রোটি আওরাতের পাড়ুলিপি, আলতাফ মাহমুদের কঠে গোওয়া গানের রেকর্ড । কে খুঁজে বের করবে? রাষ্ট্র কি কেবল ডাকটিকেট ছাপিয়েই দায়িত্বে ইষ্টফা দিতে চায়? আমরা বিস্মিতির অতলে ডুবে যাই ক্রমশ । কিন্তু ঘাতক আজও তার উদ্যত অস্ত্র বাড়িয়ে রেখেছে । হত্যার তালিকাটি পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত তারা । হৃষায়ন আজাদের রক্তাঙ্গ মুখ কি সেকথাই মনে করিয়ে দিল না?

নতুন বাংলাদেশের চিন্তাচর্চাকে খুন করতে চেয়েছিল ঘাতকরা । কিন্তু চিন্তা তো অজেয় । মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায় । লোরকার মৃত্যুর পরও তার অত্যাহসি থেকে রেহাই পায়নি ফ্যাসিস্টরা । বাংলাদেশের ফ্যাসিস্টরাও বাঁচতে পারেনি চিন্তার আক্রমণ থেকে । শহীদের চিন্তা বরং আরও তাজা । চিরজাগ্রত । লোরকার মৃত্যুর পর কবি রাফায়েল আলবের্তি লিখেছেন: "রাইনার মারিয়া রিলকে লিখেছেন যে, 'কিছু মানুষ অন্যের মৃত্যুবরণ করে, তাদের যা প্রাপ্য মৃত্যু তা তাদের ঘটে না' । তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল আমার । অথচ তোমাকে হত্যা করা হল । আমি পালাতে পেরেছিলাম । কিন্তু তোমার রক্ত এখনও তাজা । অনেকদিন তোমার রক্ত তাজা থাকবে ।" শহীদদের রক্ত তাজা থাকবে । আর যারা রক্ত দিয়ে চিন্তা করেছেন তাদের চিন্তার চির জাগরণকে হত্যা করবে এমন ক্ষমতা কার?

# কী করেছিলেন আর কী পেয়েছেন- ঝুলন্ত প্রশ্ন থেকে অক্ষপতনের শব্দ শুনি

## সিহাব চৌধুরী

সে রাত ছিল চাঁদনী পসর। প্রথমীর বিভিন্ন জায়গায় যে স্থানগুলোতে রাত্রি জেগে ছিল সে সব জায়গায়, অনেক উজাগর নিশিপাওয়া করি হয়তো নিখেছিলেন মহৎ কোন কাব্য, প্রেমিকা-প্রেমিকের হৃদয়তেজা কাঁধে মাথা রেখে হয়তো শুনছিল কোন অনাগত ভবিষ্যতের সুখপূর্ণ মিথুন জীবনের গল্প, কোন মা তার নিরাপদ বুকে সন্তানটিকে নিয়ে হয়তো শোনাচ্ছিল লাল পরী আর নীল পরীর কোন রূপকথা...

সেই রাতেই পূর্ণিমার চেতনাবিনাশী সৌন্দর্যকে অগ্রাহ্য করে শীর্ষ দেহের ছেলেটি অনেকগুলো গুলি করলো ভারি মর্টার থেকে পাকিস্তানি শত্রুশিবরে। প্রতিবার গুলি করার আগে ভাবছিল এইবার ঐ শুয়োর পাকিস্তানি হানাদারের পালের একটা নিশ্চয় ছিন্নবিছিন্ন হবে। না, প্রতিবারই লক্ষ্যভূষ্ট হচ্ছিল তার অপার্থিব মায়াময় ক্রোধ গায়ে মাথা নির্বোধ মর্টারের গুলিগুলো। লক্ষ্যে পৌঁছার অনেক আগেই গুলিগুলো দুর্বল হয়ে পরে যাচ্ছিল অথব মাটিতে। অদ্দেষ্টের তামশায় বড়ই বিরক্ত ছেলেটি। উপায় একটা আছে। যদি গাছপালার আড়াল থেকে বের হয়ে ৩০০-৪০০ গজের মত এগিয়ে গিয়ে গুলি করা যায়, তবে কিছু কাজ হতে পারে। লক্ষ্যে আঘাত হানবে গর্ব গুলিগুলো। কিন্তু সমস্যা হলো ৩০০-৪০০ গজ দূরে শুধুই ধানক্ষেত! শত্রুশিবরের আরো কাছে! পূর্ণিমার আলোতে নরপিশাচের চোখ, মুক্তির মহান আলো জ্বলা চোখ দেখতে পাবে ঠিকই। নির্জনতায় ঠিকই শুনতে পাবে হৃৎপিন্ডের ধূকপুক - "স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!!" মারা পরতে হবে বেয়েরো। ছেলেটি ছুটল তার কমান্ডারের কাছে। ৪০০ গজ সামনে এগিয়ে যাবার অনুমতি চায়। মৃত্যুর অনুমতি চায়! শহীদ হবার অনুমতি চায়!! কমান্ডার যেতে দ্বিতীয়ে চাইলেন না। নাহাড়বান্দার অনুরোধের পর কমান্ডার অনেক আশংকা নিয়ে অনুমতি দিলেন, মনে মনে দোয়া করতে লাগলেন, যেন ছেলেটা বেঁচে ফিরতে পারে। অসীম সাহসের সাথে ছেলেটি এগিয়ে গেল। মৃত্যু যেন ভর বিকালের দস্য মেয়ের কুতুকুত খেলতে যেয়ে হোচ্চট পাওয়ার মতই সাধারণ, অগুরুত্বপূর্ণ!! এগিয়ে গেল সে!!!

সে কিন্তু মরেনি সে রাতে। দেশ স্বাধীন হবার সাথে ছেলেটির

কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল না। অশিক্ষিত ছেলেটির মধ্যে কোন উচ্চমার্গের নীতিবোধ থাকারও কথা নয়। কি জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল ছেলেটি বোকার মত নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে? দেশপ্রেম ছিল ছেলেটির আত্মার শরীরে মিশে যাওয়া চামড়া। দেশপ্রেম তাকে অকুতোভয় করে তুলেছিল। অনেক অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, অনেক যুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজেদের নাজুক অবস্থায় পশ্চাদপসারণের আদেশ সত্ত্বেও, পিছু না হটে চালিয়ে গিয়েছিল শুধু - মৃত্যুকে হেলাফেলায় বরণ করেছিল দুর্দমনীয় সাহসে।

দেশ স্বাধীন হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পশুদের নেতা নিয়াজী আত্মসমর্পণ করল দলবলসহ। বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হল-ভারতীয় সৈনিকদের বীরত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমাদের ক্ষেত্রখামারে কাজ করা অসামরিক নিরক্ষরূপ, আমাদের মহামানবরা, আমাদের নক্ষত্ররা, আমাদের আসল বীরেরা,



জানতেও পারলেন না, তারা মুক্তিযুদ্ধের অনুবন্ধী হিসাবেও পরিচিত নন, বিষ্ণের ইতিহাসে। ভারতীয় জেনারেলদের লেখনীতে তাদের কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। আমরা স্বাধীনতাবে নিঃখাস নিতে শুরু করলাম। বড় হতে লাগলাম। আমাদের চাষা যোদ্ধারা, আমাদের শ্রমিক যোদ্ধারা, আমাদের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত যোদ্ধারা অবহেলিত হয়ে রইলেন।

তাজুল, আখাউড়ার তাজুল- যে যুদ্ধের আগে চোরাকারবার করতেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার নতুন জন্মের পর তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনর্বাসিত হতে পারেননি। সরকার, বেসরকার- সবাই নিস্পত্তি। টেনে যে মানুষটা পিক-পকেট করতেন, সেই মুক্তিযোদ্ধা ফজলু- যুদ্ধের পর গৌরীপুর রেলস্টেশনে ছোট চা বিস্কুটের দোকান করে আধপেটা হয়ে বেঁচে আছেন। এর চেয়ে উন্নততর জীবন কি তার প্রাপ্য ছিল না? তাহের- ফেনীর বীর আহত যোদ্ধা তাহের যুদ্ধের পর বাড়ি ফিরে দেখেন ঘর উজাড়, পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলেছে রাজাকারেরা, তার বাড়িঘরও দখল করেছে এই কুলাসারেরাই! নিঃস্তার হতাশায় পিজি হাসপাতালের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। এরকম আরো হাজারটা লজ্জা খুঁজতে গেলে বেরিয়ে পড়বে।

যুদ্ধপরাধের বিচার হয়নি। এটাও লজ্জার। এটার চেয়ে বড় লজ্জা আমাদের আসল বীরদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞমিতি কর্তব্যহীনতা। এইসব দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই বেঁচে নেই। অনেকেই হয়তো আল্ল কিছুদিন পরে হয়তো আর থাকবেন না। আমাদের মুক্তির নিরাহ, অসামরিক অসীম সাহসী যোদ্ধারা- কী করেছিলেন আর কী পেয়েছেন? ঝুলন্ত প্রশ্নটি থেকে আমি অক্ষপতনের শব্দ শুনতে পাই। এখনো সময় আছে, এই বীরদের জন্য, বাধ্যতদের জন্য কিছু করার। ঋণ কিছু তো শোধ করি! প্রশ্নটি থেকে অক্ষপতনের শব্দ বড় অসহ্য ঠেকছে!

[জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা / মেজর কামরুল হাসান ভূঁয়া - থেকে অনুপ্রাণিত]

# একাত্তরে মহান আল্লাহ কি পাকিস্তানীদের পক্ষে ছিলেন না?

সামী মিয়াদাদ

‘ইসলাম’ শব্দের অর্থ শান্তি। যুগে যুগে ইসলাম শান্তির বাহিনীই প্রচার করে গিয়েছে। পৃথিবীব্যাপী তাই লাখে লাখে মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ইসলামের মর্মবাণী অনুধাবন করেই মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। ইসলাম ধর্ম সবসময় শান্তির কথাই বলে আসছে।

তবুও আমরা ইসলামের ইতিহাস ঘাটাঘাটি করলে দেখতে পারিয়ে, এই ইতিহাসেও অনেক রক্ত লেগে রয়েছে। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবতকালেও যুদ্ধ হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে আমাদের মহানবীও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিধর্মী, কাফেরদের বিরুদ্ধে। কোন কোন সময় যুদ্ধটি অবশ্যস্থাবী হয়ে পড়ে। আল্লাহ মহান কোরআনেও এইসব যুদ্ধ সম্পর্কে বাণী দিয়েছেন। শিষ্টের প্রচারের জন্য, দুষ্টের দমনের জন্য কখনো কখনো অস্ত্রেই কথা বলতে হয়। মহান আল্লাহ তা-আলা সবসময় দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের প্রচারেই চান। তাই যুদ্ধ অনেক সময় সমাজ গঠনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ

You Have to be Cruel Only to be Kind.

সমাজ পরিবর্তনের জন্য অনেক সময় চাই সশস্ত্র বিপ্লব। আল্লাহর নির্দেশে তাই আমাদের রাসূলও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধগুলো ছিল অবশ্যস্থাবী ঘটনা।

আমাদের বাঙালীদের জীবনেও যুদ্ধ এসেছে বারেবারে। আমাদের ইতিহাস বিপ্লবের ইতিহাস, আদ্দোলনের ইতিহাস। আমরা কোন কিছুই খুব সহজে অর্জন করতে পারিনি। মুখের ভাষা থেকে শুরু করে ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার সবই আমাদের আদ্দোলন করে, বিপ্লব করে অর্জন করতে হয়েছে। ১৯৭১ এ আমরা স্বাধীনতাও অর্জন করেছি এক সশস্ত্র যুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে। কাদের বিরুদ্ধে আমরা বাঙালীরা যুদ্ধ করেছি?

আমরা যুদ্ধ করেছি পৃথিবীর অন্যতম সুসংগঠিত একটি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী। সে সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ছিল পৃথিবীর নামকরা সব সামরিক বাহিনীর

অন্যতম। গুর্ধা বাহিনী আর পাকিস্তান আর্মি ছিল পৃথিবীতে কঠোরতম। এহেন এক বাহিনীর বিরুদ্ধে কারা যুদ্ধ করেছে? বাংলার একবাঁক দামাল সন্তান। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যেখানে ছিল সামরিক বাহিনীর লোক থেকে স্টেশনের কুলি পর্যন্ত। ছাত্র, চাকরিজীবি, মজুর, কৃষক, যুবক, বৃদ্ধ, কে ছিলনা সেই মুক্তিযুদ্ধে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সবাই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সে যুদ্ধ ছিল বাঙালীর প্রাণের যুদ্ধ।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা একটুখানি জানেন, তারাও বদরের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, এবং আরও নানা যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা হলেও বলতে পারবেন। বদরের যুদ্ধে খোদার সৈনিকদের সংখ্যা মাত্র ছিল ৩১৩। আর যুদ্ধের ফলাফলও নিশ্চই কারো অজানা নয়? মাত্র ৩১৩ জন বিশ্বাসী সৈনিক নিয়েই আমাদের মহানবী (সাঃ) হাজার হাজার বিধর্মীদের সাথে সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন।

কোরআনে সুরা আনফাল এ বদরের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস, রাসূলের উপর আস্থাই তাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেছিল। এরপর কালে কালে আরও অনেক যুদ্ধই সংঘটিত হয় কাফের, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে। সেই সকল যুদ্ধে বিশ্বাসীরা অল্প কিছু সৈনিক নিয়েই হাজার হাজার সৈন্য সম্মিলিত কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। কারণ মহান আল্লাহ সুবহানাতো-আলা বিশ্বাসীদের সমর্থন করেছিলেন। মুসলমানদের সমর্থনে ছিলেন। সে সব যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

এখন আসি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে। পাকিস্তানীরা যুদ্ধ করেছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের জন্য। আর বাঙালীরা যুদ্ধ করেছিল বাংলাদেশের সর্বাত্মক স্বাধীনতার জন্য। ৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত এই দীর্ঘদিন সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন দিক থেকে নিপত্তি হতে হতে বাঙালী আর সহ্য করেনি। ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিং হামলা চালায় বাঙালীদের উপর। বাঙালীও গড়ে তোলে প্রতিরোধ- সে

সময়ের সবচেয়ে কঠোর সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানীদের সাথে আমাদের দেশের কতিপয় মানুষও নিজেদের মা-ভাই-বোনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কারণ হিসেবে তারা অবিভক্ত পাকিস্তানের সাথে সাথে ইসলাম ধর্মকেও জড়িত করেছেন। যদিও ৪৭ এ ধর্মীয় দিজাতিত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল, কিন্তু কায়েদে-এ-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইসলাম চর্চা নিয়ে কিন্তু যুগ যুগ ধরেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। পাকিস্তান ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল, পাকিস্তান ইসলাম চর্চার পীঠকেত্তু, পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে গেলে আমাদের এই প্রবাংলা হয়ে উঠে হিন্দুদের-মালাউন্দের-বিধর্মীদের পীঠস্থান। তাই যুদ্ধে পাকিস্তানীদের সহায়তা করে ইসলামকে রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু এটি যদি বাস্তবিকই ইসলাম রক্ষা বা ইসলাম প্রচারের যুদ্ধ হতো তবে আমার বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, এর ফলাফলটা উল্লেখ হতো। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব যুদ্ধ যুগে যুগে সংঘটিত হয়েছে তার ইতিহাস ঘাটলেই এ বিষয়ে আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ থাকবো। মহান আল্লাহ স্বয়ং যেখানে খাতি মুসলমানদের সমর্থক সেখানে তাদের পরাজয় কোনভাবেই রোধ হতে পারে না। বিজয় মুসলমানদের অবশ্যস্থাবী। কিন্তু তা হতে হবে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন ফলাফলকেই নিমিষে বদলে দিতে পারেন, তিনি পারেন পাথরেও ফুল ফোটাতে।

তাই আমার মনে বার বার একটি প্রশ্নই জাগে, এতিহাসিক যুদ্ধগুলোতে যেখানে বিধর্মীদের তুলনায় খুবই অল্পসংখ্যক সৈমান্দার বিশ্বাসী নিয়ে হাজার হাজার বিধর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করা গেল, সেখানে আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত পৃথিবীর অন্যতম সামরিক বাহিনী নিয়েও পাকিস্তানী ইসলাম রক্ষাকর্তারা কেন আমাদের মতো ৩০৩ রাইফেলধারী ‘বিধর্মী’ বাঙালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করতে পারলেন না। তবে কি একাত্তরে মহান আল্লাহ কি পাকিস্তানীদের পক্ষে ছিলেন না? তবে কেন ‘বিধর্মী’ বাঙালীর বিরুদ্ধে ‘ইসলাম রক্ষাকর্তারীদের’ এই পরাজয়?

# ত্রিশ লক্ষ শহীদ : মিথ নাকি বাস্তবতা?

## যুক্তিযু

১

একান্তর সালে পাকিস্তানের জঙ্গি সদরে রিয়াসৎ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সদস্তে কইছিলেন, “ওদের ত্রিশ লক্ষ হত্যা কর, বাকীরা আমাদের থাবার মধ্যে থেকেই নিঃশেষ হবে।” (১)

কিছু বিতর্ক আছে ইচ্ছা কৈরা টিকায় রাখা হয়। আসলে বিতর্ক ফিতর্ক কিছু নাই, হৃদাত্মা একটা গ্যানজাম লাগায় রাখন আর কি। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও একখান বিতর্ক ইদানিংকালে নয়া পাকিস্তানী রাজাকার-আলবদর গো মৈদে দানা বাঁধে আর তা তৈল, মুক্তিযুদ্ধে নাকি ত্রিশ লক্ষ লোক শহীদ হয় নাই, ব্যাপারটি নাকি হৃদাই চাপাবাজি।

কয়েকটা পাতা রাজাকার আবার কৈতে চায় যে, ত্রিশ পয়ত্রিশ লক্ষ ত দূরের কথা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ গো সংখ্যাড়া নাকি কয়েক হাজার, খুব বেশি হৈলে কয়েকশ হাজারের হৈব। কেন্ত আংকা হালারা শহীদ গো সংখ্যা লৈয়া হৃদাই ফাল পারন শুরু কোরছে? যুক্তিড়া কি? হেগো যুক্তি হৈল, নববই হাজার পাক বাহিনীর পক্ষে নাকি একান্তুরের নয় মাসে ত্রিশ লক্ষ (বা প্রি মিলিয়ন) বাংগালী গো মাইরা ফালানো সন্তু না। হাছাই নাকি? আসেন আমরা কিছু অংক-সংক কৈরা দেহি হ্যাগো কথায় কতটুকুন লজিক আছে!

অংকের কথা হইনা ডরাইয়েন না ভাইজানেরা। এই অংক করতে আপনেগো ফিবেনকি সিরিজও জানোন লাগব না, যাদবের তৈলান্ত বাঁশের উপরে দিয়া বান্দরের উড়া-নামাও ছলভ করতে হৈব না। প্রাইমারী স্কুল লেভেলের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের জ্ঞান, আর কিছুড়া কমন সেন্স থাকলেই সারব। অংক করন শ্যাম হৈলে আমরা আমগো বিশ্লেষণড়া আরেকডা জেনোসাইডের ভিকটিম কঢ়েড়িয়ার লগে তুলনা কৈরা দেখুম ত্রিশ লাখ শহীদের ব্যাপারডা অযৌক্তিক কিনা!

বাংলাদেশের গণহত্যা : ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস

১৯৮১ সালে ইউ এন ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটসের

ডিকলারেশনে কৈছে (২) :

মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের

১৯৭১' এর গণহত্যায় স্বল্পতম সময়ে এই সংখ্যা সর্ববৃহৎ। গড়ে প্রতিদিন ৬,০০০ - ১২,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ... .. এটি হচ্ছে গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্বোচ্চ নিধনের হার।

তার মানে দাঁড়াইতাছে, পাক বাহিনী এই নাপাক কামডা (দিনপ্রতি ৬০০০-১২০০০ বাংগালী নিধন) করছে মোটামুটি ২৬০দিনে (একান্তুরের ২৫-এ মার্চ থেইক্যা শুরু কৈরা ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত)। আওয়ামী বাকশালী ভারতের দালাল গো দেওয়া তথ্য না, ইউ এন এর নিরপেক্ষ ডাটা লৈয়া একটু হিসাব করণ যাক। আহেন ভাইসব, একটু ক্যালকুলেটর লৈয়া বসিঃ বাংগালী নিধনের লোওয়ার লিমিট: ৬০০০  $\times$  ২৬০ = ১৫,৬০,০০০ (১৫ লক্ষ ৬০ হাজার)। আর নিধনের আপার লিমিট: ১২০০০  $\times$  ২৬০ = ৩১,২০,০০০ (৩১ লক্ষ ২০ হাজার)। যদি আমরা “হ্যার মারামারি” লৈয়া হিসাব করি, তাইলে সংখ্যাড়া দাঁড়ায়: ২৩,৪০,০০০ (তেইশ লাখ চল্লিশ হাজার)। একান্তুরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা আছিল মোটামুটি সাত কোটি পঞ্চাশ লাখ। গড়ে প্রত্যেক পরিবারে ৫জন কৈরা সদস্য আছিল। সাত কোটি পঞ্চাশ লাখের ৫ দিয়া ভাগ কোরলে খাড়ায় - ১ কোটি পঞ্চাশ লাখ। অর্থাৎ, ১ কোটি পঞ্চাশ লাখ পরিবার আছিল তখন দেশে। প্রত্যেক পরিবারে মারা গেছে: ০.১৬ জন। অর্থাৎ, একান্তুরে গড়ে একশটা পরিবার খুঁজলে এর মৈদ্যে ঘোলডা পরিবার পাওন যাইত যারা পাক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হৈছে। ১৬টা পরিবার-এইডা তা এমন আহামরি কোন বড় সংখ্যা না যে ঘটবার পারব না।

তার মানে অন্তত ১৬% বাংগালী পরিবার একান্তুরে আছিল যাগো কেউ না কেউ না-পাক বাহিনীর হাতে শহীদ হৈছিল। ‘অন্তত’ শব্দডা ইচ্ছা কৈরাই এইখানে বসাইছি কারণ হাজার হাজার পরিবারের উদাহরণ আমরা জানি যারা মুক্তিযুদ্ধে একাধিক সদস্য হারাইছে। পুরা পরিবার হৃদা নিশ্চিহ্ন হৈয়া গেছে এইরকম উদাহরণও আছে তো! আমরা না হয় নিও-রাজাকারগো একটু ছার দিয়া মর্মান্তিক উদাহরণগুলা এই ক্যালকুলেশনে না আনি। পাক বাহিনীর সংখ্যা আছিল নববই হাজার। একান্তুরে ২৬০ দিনে একেক জন পাকি আর্মির হাতে ২৬ জন কৈরা বাংগালী মারা

গেছে (তেইশ লাখ চল্লিশ হাজার'রে নববই হাজার দিয়া ভাগ করেন)। মনে রাইখেন, আমি এইখানে পাকবাহিনীর দোসর রাজাকার আলবদর গো সংখ্যা গোনায় লৈ নাই। প্রায় লাখখানেক রাজাকার গো সংখ্যা যোগ করলে একেক পাকির হাতে শহীদের সংখ্যা দশ-বারোর মৈদাদে নাইম্যা আইব। আমরা আপাতত ছাবিবশ ধৈরাই আগাইয়া যাই।

কাজেই একেক পাকিস্তানীর হাতে প্রতি দিনে খুন হৈছে শূণ্য দশমিক এক জন কৈরা (২৬ রে ২৬০ দিয়া ভাগ করেন)।

কাজেই বুবা যাইতাছে, (০.১) শূণ্য দশমিক এক-মানে একেক পাক-বাহিনীর হাতে প্রতি দশ দিনে একজন কৈরা বাংগালী মারা গ্যাছে এই সময়। এইডা যুদ্ধের সময় কোন “মিশন ইম্পসিবল” জব নাকি? আইজক্যা ফকরদিন ছাবের আর্মি ব্যাকড গর্ভমেন্ট যে দ্যাশডারে “শাস্তির নীড়” বানায় রাখছে, সেই “শাস্তির নীড়ে” ও তো পেপার খুললেই দিনে বিশ পঁচাশটা কৈরা খুনের খবর পাওন যায়। আর সেইখানে একান্তুরে যখন পাক-বাহিনী প্ল্যান প্রোগ্রাম কৈরা গণহত্যা করতে নামছে, তখন দশ দিনে মারছে একজন কৈরা।

কাজেই বুবা জাইতাছে ত্রিশ লাখ শহীদের ব্যাপারটা কোন অতিরঞ্জন না, কোন “আবাস্তব ফিগার” না। আসলেই ত্রিশ লাখ লোক শহীদ এই যুদ্ধে। আরো এক কোটির মতন হৈছে শরণার্থী। আপনেগো যদি স্মরণে থাকে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের ১৯৭২-এর ইস্যুতে লেখা হৈছিল বাংলাদেশে একান্তুরে তিন মিলিয়ন (বা ত্রিশ লাখ)-এর বেশি লোক মারা গ্যাছে (৩)। আরও অনেক নিরপেক্ষ ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতেই তখন “প্রি মিলিয়ন” উল্লেখ করা হৈছিল। যেহেতু যুদ্ধের দুই-তিন বছরের মৈদাদে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ায় যে তথ্যগুলান নিরপেক্ষভাবে উইঠা আইছিল সেইগুলান যে স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছর পরে নিও-রাজাকার গো “গবেষণাধৰ্মী” প্রোগ্রাম্বার চাইতে অনেক বেশি অথেন্টিক, তা বোধ হয় কওনের অপেক্ষা রাখে না। জেনোসাইড ডট অরগে'ও (<http://www.genocide.org>) সেই সত্যের উচ্চারণ শুনি (৪) :

একান্তুরের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেলরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আওয়ামী জীগ ও তার

সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। প্রথম থেকেই স্থির করা হয় যে (এদের) হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনকে নির্মূল করতে হলে সামরিক গণহত্যার অভিযান শুরু করতে হবে : ‘ওদের ত্রিশ লক্ষকে হত্যা কর’, ফেরুয়ারী সম্মেলনে নির্দেশ দিয়েছিলেন সদরে রিয়াসৎ ইয়াহিয়া খান, ‘এবং বাকীরা আমাদের থাবার মধ্যে থেকেই নিঃশেষ হবে’ (রবার্ট পেইন, ম্যাসাকার, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৫০)। ২৫শে মার্চ তারিখে গণহত্যার রকেট উৎক্ষিপ্ত হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হল এবং শত শত ছাত্রকে নির্মূল করা হল (পাকিস্তানী বর্বর সেনাদের হাতে)। দলে দলে এই নৃশংস হত্যাকারীরা সারা ঢাকা শহরের রাজপথ অলি গলি চষে বেড়িয়ে একই রাতে কম করেও ৭,০০০ নিরীহ মানুষকে হত্যা করল। কিন্তু এটা তো ‘শুরু’ মাত্র। এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যার অর্ধেক পালিয়ে বাঁচল, এবং অন্তত ৩০,০০০ মানুষ এর মধ্যে পাক বাহিনীর হতে নিহত হল। চট্টগ্রামেও জনসংখ্যার অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হল। সারা পূর্ব পাকিস্তানে জনগণ পালিয়ে বেড়েছিল, এবং হিসাব থেকে দেখা গেছে এপ্রিলেই সারা পূর্ব পাকিস্তানে অন্তত তিন কোটি মানুষ সামরিক নরপিশাচদের হাত রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রাম-গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়িয়েছে (রবার্ট পেইন, ম্যাসাকার, পৃ ৪৮)। এক কোটিরও ওপর পূর্ব পাকিস্তানবাসী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল- যা তাদের অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে পরিণামে উত্তৃত পরিস্থিতি ভারতকে সামরিক হস্তক্ষেপে বাধ্য করেছিল (গণহত্যার শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৭.৫ কোটি)।

আমি পরের অংশে কম্বোডিয়া নামের রাষ্ট্রের আরেকখান গণহত্যার শিকার খতিয়ান দিয়া দেখায় যে খেমার়জেরা সেখানে যেই গণহত্যা চালাইছিল সেই তুলনায় বাংলাদেশের গণহত্যার ফিগার (ত্রিশ লাখ) অনেক রিয়ালিস্টিক। কম্বোডিয়ায় চার বছরের (১৯৭৫-১৯৭৯) গণহত্যায় খেমার়জেরা প্রতিদিন মারছিল একজনের উপরে, আর বাংলাদেশে পাক বাহিনী প্রতি দশ দিনে মারছে একজন কৈরা। বাংলাদেশের গণহত্যায় শূন্য দশমিক ছয় জন ফ্যামিলি ভিকটিমাইজড হৈছে, সেখানে কম্বোডিয়ায় হৈছে এক দশমিক এক আট জন। তারপরও নিও-রাজাকার আবালেরা ফাল পারে - “থ্রি মিলিয়ন” নাকি আনরিয়ালিস্টিক ফিগার!

২

আমরা এখন অন্য একটা রাষ্ট্রের গণহত্যার খতিয়ান হাজির করমু। এইভাব উদ্দেশ্য হৈল, যে গাণিতিক যুক্তি আগে হাজির করা হৈছে ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে সেই দাবিটা

পর্যালোচনা করা। এইভাব প্রকৃত গবেষণার পদ্ধতি। যারা বিজ্ঞানের জার্নালে দুই-চাইরটা পেপার পাবলিশ করছে তারা সবাই এই পদ্ধতির কতাড়া জানে। খেমার়জ বাহিনী ক্ষমতায় আছিল ১৯৭৫ থিকা ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত, চাইর বছর। এর মৈদে নিজস্ব আদর্শের নামে মাইরা সাফা করছে প্রায় ১৭ লাখ থিকা ৩০ লাখ লোক (৫.৬)। ভাবতাছেন, কৈ এইভাব তা বাংলাদেশের গণহত্যারে সংখ্যায় অন্ত অতিরিক্ত কৈরা যায় নাই। হাছাই ধৰচেন, তয় খাড়ান, কথা আছে! কম্বোডিয়ার জনসংখ্যা বাংলাদেশের একাত্তুরের লাহান সাড়ে সাত কোটি আছিল না। খেমার়জেরা ক্ষমতায় যাওনের সময় কম্বোডিয়ার জনসংখ্যা আছিল মোটামুটি ৭৬ লাখ (৭)। তাইলে চিন্তা করেন, ছিয়াত্তুর লাখের মৈদে ১৭-৩০ লাখ মাইরা সাফা কৈরা ফালাইছে। আমরা ১৭ লাখ মারছে এইভাব ধৈরাই হিসাব করি আপাতত: কাজেই খেমার়জেরা মূল জনসংখ্যার ২২ ভাগের বেশি মাইরা সাফা করছে। আর অন্যদিকে পাকবাহিনী সাফা করতে পারছে আমগো জনসংখ্যার ৪ ভাগ (৩০ লাখের ৭.৫ কোটি দিয়া ভাগ কইরা ১০০ দিয়া গুণ দিলে পাওন যায়)। আমার অবশ্য কম্বোডিয়ার ফ্যামিলি সাইজ সমন্বে কোন ধারণা নাই। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা আগে ধরছি (প্রত্যেক পরিবারে পাঁচ জন সদস্য) তা ধৈরাই আগাইয়া যাই। হেই হিসাবে ১৯৭৪ সালে কম্বোডিয়ায় পরিবারের সংখ্যা আছিল মোটামুটি ১৫ লাখ ২০ হাজার। কাজেই প্রত্যেক পরিবারে মারা গেছে: এক দশমিক এক আট (১.১৮) জন কৈরা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হিসাবড়া আছিল শূণ্য দশমিক ছয় (০.৬)। সাধারণ বাংলায় কৈলে কৈতে হয়, কম্বোডিয়ার গণহত্যায় এভারেজে প্রত্যেক পরিবারই কাউরে না কাউরে হারাইছে, যা বাংলাদেশে ঘটে নাই। বাংলাদেশে একাত্তুরে একশটা পরিবার থুঁজলে ঘোলড়া পরিবার পাওন জাহাত যাগো কেউ না কেউ পাকবাহিনীর হাতে মরছে। কাজেই বাংলাদেশের পরিসংখ্যান আনরিয়ালিস্টিক কিছু না।

এইখানে একটা ব্যাপার আছে। খেমার়জেরা গণহত্যা করছে চার বছর ধৈরা। আর পাক বাহিনী করছে নয়মাসে। হের লাইগ্যাপ পাকিরা আমগো জনসংখ্যার বাইশ তেইশ ভাগ সাফা কৈরা দেওনের সময় পায় নাই, যা খেমার়জেরা করবার পারছে। এখন যদি খেমার়জেরা চাইর বছরে না মাইরা পাকবাহিনীর মতৈ ২৬০ দিনে লোকগুলানের মারত, তাইলে দিনপ্রতি মারত প্রায় ৭০০০ জন কৈরা। এ সংখ্যাড়াও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইউএন-এর দেওয়া পরিসংখ্যানের সাথে খাপ খায় (৬,০০০ থেকে ১২,০০০)। কাজেই বাংলাদেশে শহীদের সংখ্যাটা হুদাই

বানাইন্যা না। ব্যাপারডারে আরেকটু ঘুরায়া দেখন যায়। আমরা ছেট বেলায় স্কুলে শিখা ঐকিক নিয়মে হিসাব করণের চেষ্টা করি, জনসংখ্যার ২২ ভাগ সাফা করতে খেমার়জেরা চার বছর (৪৮ মাস) সময় নিছিল। তাইলে জনসংখ্যার ৪ ভাগ সাফা করতে (যা পাকিস্তানীরা করছিল) তারা কয় মাস সময় নিত? এইভাব তা সোজা ঐকিক নিয়ম, রাম, রহিম, যদু, মদু হঞ্জলতেরই পারন উচিত। হের জন্য ৪৮ রে ২২ দিয়া ভাগ করেন, তারপর ৪ দিয়া গুণ করেন। কি বাইর হৈল? সাড়ে আট মাসের কিছু বেশি। তাইলে আবারও দেখা যাইতাছে নাপাক কামড়া পাক বাহিনী নয় মাসে করছে, খেমার়জেরা হয়ত সেইটা সাড়ে আট মাসেই কম্পলিট করতে পারত। কাজেই নয় মাসে ত্রিশ লাখ মারণটা আকাশ কুসুম কল্পনা না, কোন আনরিয়ালিস্টিক ফিগারও না। আর কতভাবে প্রমাণ করমু? “থ্রি মিলিয়ন” বা ত্রিশ লাখের ব্যাপারটা কোন হাওয়া থেইকা পাওয়া না। আমার মতে এইভাব খুবৈ রিয়ালিস্টিক একটা ফিগার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর বেশ কয়েক বারই যুদ্ধে শহীদগো সংখ্যা “থ্রি মিলিয়ন” বা ত্রিশ লক্ষ উল্লেখ করছিলেন (তথ্যসূত্র ৮)। অহন কোন কোন নিও-রাজাকার কৈবার লাগছে যে “অশিখিয়ত” শেখ মুজিব নাকি মিলিয়ন আর লক্ষের পার্থক্য বুজত না, হের লাইগ্যাপ নাকি গুবলেট কৈরা ফেলাইছিল। হেগো (কু) যুক্তি হুনলে হাসুম না কান্দুম বুজবার পারি না। আমি তো আগেই কৈছিলাম অনেক ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতেই তিন মিলিয়ন বা ত্রিশ লাখ মারা যাওনের পরিসংখ্যান ছাপা হৈছিল। যেমন, ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকের ১৯৭২ ইস্যু। এছাড়াও The Portsmouth Herald (Monday, January 17, 1972), Y C Rossiter Curriculum as Destiny: Forging National Identity in India, Pakistan, and Bangladesh সহ অনেক ম্যাগাজিন আর পত্র প্রতিক্রিয়েই “থ্রি মিলিয়ন” কতাড়া বাইর হৈছিল (৮)। এ ছাড়াও সেসময় লিখা অনেক ইংরেজী বই-পত্রে ত্রিশ লক্ষ শহীদের উল্লেখ আছে (৯)। ছাগ গো কথা হুইনা মনে হয় ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক, পোর্টসমাউথ হেরাল্ডসহ হঞ্জলতেই বুজি শেখ মুজিবের লাহান “অশিখিয়ত” বৈনা গোছিল না! যুক্তির বলিহারি!

আবারও পরিসংখ্যানে ফির্যা যাই। তুলনামূলক বিচারে কম্বোডিয়ার গণহত্যা, পাকবাহিনীর গণহত্যার চাইতে অনেক বেশি ন্যশংস আছিল। আগেই কৈছি কম্বোডিয়ার গণহত্যায় পরিবারে মারা গেছে এক দশমিক এক আট (১.১৮)

জন কৈরা । বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হিসাবটা আছিল শূন্য দশমিক ছয় (০.৬) । কাজেই ভাগ দিলে পাওন যায় যে কম্বোডিয়ার গণহত্যার ভয়াবহতা বাংলাদেশের তুলনায় অন্তত: সাত গুণ বেশি আছিল । কিন্তু কম্বোডিয়ার কেউ গণহত্যার ভয়াবহতা লৈয়া চিক্কুর পাড়তাছে না, কিংবা গণহত্যার ফিগার লৈয়া জল ঘোলা করতাছে না, অন্তত: আমার ত চোখে পড়ে নাই ।

আরও একখান বিষয়ে বোধ হোয় পার্থক্য আছে হেগো সাথে আমগো চরিত্রের । পলপটের জামানার পরিবর্তনের পর পলপটের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিচারের আয়োজন করা হৈছিল । এই আছিল ইউ এন-এর পলিসির উপর ভিত্তি কৈরা প্রথম গণহত্যার বিচার । যদিও বিচার শুরুর আগেই পলপট পটল তুলছিল (কেউ কেউ কয় আত্মহত্যা), কিন্তু বিচারের আয়োজনের ব্যাপারটা শুরুত্বপূর্ণ । আমরা রাজাকার আলবদরগো বিচার কোরতে পারি নাই । পাকি'গো কাছ থাইক্যা কোন খেতিপূরণও আদায় করবার পারি নাই । জাহানারা ইমাম একসময় অসুস্থ শরীর লৈয়া শুর করছিল একড়া আন্দোলন, মাগার শেষ কৈরা জাইতে পারে নাই । বিচার কোরতে পারি আর না পারি, অন্তত: এইডা যেন আমরা ভুলো না যাই যে, পাক বাহিনীর গণহত্যাড়া ইতিহাসের অন্যতম বৰুৱা হত্যাকাল । ত্রিশ লাখ লোক আমগো স্বাধীনতার লাইগ্য প্রাণ দিছে । এই ব্যাপারডা লৈয়া এরপৰ খেইক্যা কোন নিও-রাজাকার জানি এই লৈয়া জল ঘোলা করবার না পারে । আমার প্রবক্ষের উদ্দেশ্য এইডা না যে বাংলাদেশের গণহত্যার তুলনায় কম্বোডিয়ার গণহত্যা কত বড় বা ছোট হৈইডা দেখানো, বৱং ইতিহাস ঘাইটা এইডা ও অক্ষের হিসাবে দেখানো নয় মাসে পাক বাহিনী যে ত্রিশ লাখ লোকৰে মাইরছে- এইডা কোন “মিশন ইম্পেসিবল” জৰ আছিল না, তাগো কাছে ।

মুক্তমনার সৌজন্যে ব্লগার লাইটহাউজ-এর পোস্ট থেকে লেখাটি সংগৃহীত



## সংখ্যা ব্লগ : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

### মিরাজুর রহমান

২৬৭	দিন স্থায়ী হয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ
২৬	২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে
৩০,০০,০০০	শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা
২০০,০০০	নারী ও শিশু ধর্ষিত হয় মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে
১১১১	জন বুদ্ধিজীবিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়
১	টি মাত্র মামলা দায়ের করা হয়েছিল পাক বাহিনীর যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে, যেটি পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয় ।
১০০,০০০	জন সংগঠিত মুক্তিযোদ্ধা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন । অসংগঠিত ও সহযোগী যোদ্ধার সংখ্যা এর কয়েকগুণ ।
১৭	১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় ।
১১	১১ই জুলাই ১৯৭১, এই দিনে আনন্দানিকভাবে কর্ণেল ওসমানীর (পরবর্তীকালে জেনারেল) নেতৃত্বে নিয়মিত বাহিনী হিসাবে মুক্তিবাহিনীর যাত্রা শুর হয় ।
৫,০০০	জন (অন্যন্য) যুদ্ধ শিশু (পাক বাহিনীর ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া) মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করে ।
২১	২১শে নভেম্বর, প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী (মুক্তিবাহিনী) যৌথভাবে হানাদার পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে
৪৫	জন নৌসেনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী গঠিত হয়
৬৭	জন বিমানসেনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয়
৩	ডিসেম্বর, ভারত সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা ঘোষণা করে
২৫০,০০০	মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (৬ - ১৫ ডিসেম্বর) ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা
১২৫,০০০	হানাদার পাকবাহিনীর সংখ্যা যারা ৯ মাস ব্যাপী হত্যা ও ধর্ষন চালিয়েছে । এর মধ্যে ২৫,০০০ জন প্যারা মিলিটারী, বাকিটা নিয়মিত সেনাবাহিনী ।
১৪২৬	মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী ভারতীয় সেনা সদস্যের সংখ্যা
৮.০০০	যৌথবাহিনী (মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী) এর হাতে নিহত হানাদার পাকবাহিনীর সংখ্যা
৭	জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসাবে বীরউত্তম খেতাব প্রদান করা হয় ।
২২	জন মুক্তিযোদ্ধাকে ২য় সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসাবে বীরউত্তম খেতাব প্রদান করা হয় ।
১১	১১টি সেস্টেরে বাংলাদেশকে বিভক্ত করে মুক্তিবাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে ।
১৬	১৬ই ডিসেম্বর লক্ষ প্রাণের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় মুক্তিযুদ্ধের বিজয়, স্বন্দের স্বাধীনতা

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, বিভিন্ন ওয়েবসাইট, গবেষণাপত্র এবং মার্কিন তথ্য আর্কাইভ



# মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য বই

ফারহান দাউদ

একটা সময়ে আমরা, বন্ধুমহল, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করেছিলাম। গবেষক না কেউ, ঐরকম বৈদ্যুতিন নেই, কাজেই বিষয়টা নিয়ে কাজের বাইরে আর এগোনো হয়নি। কিন্তু কাগজপত্রগুলো থেকে গেছে, ১টা পুরানো খামে, পুরানো, বিবর্ণ কিছু কাগজ। মাঝে মাঝে বের করি, দেখি, হাত বুলাই, আবার রেখে দিই। কিন্তু পোকা কেটে ফেলছে, ঝাপসা হয়ে গেছে অনেকগুলো হাতের লেখা, তাই মনে হচ্ছে, যা-ই থাকুক, যতই কম হোক গুরুত্ব প্রামাণ্য দলিল হিসেবে, এইবেলা ক্লাগে তুলে ফেলি, ২-১ জনেরও যদি কাজে লাগে, মন্দ কি? আজ দিলাম মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা কিছু বইয়ের তালিকা, বন্ধু শোভনের সংগ্রহীত, বইগুলো কোথায় পাওয়া যাবে জানি না তবে যতদূর মনে পড়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে তালিকাটা বানানো, আগ্রহীরা খোঁজ করে দেখতে পারেন সেখানেই।

- ১। আমি বিজয় দেখেছি : এম আর আখতার মুকুল; (সাগর পাবলিশার্স)
- ২। একান্তরের দিনগুলি : জাহানারা ইমাম; (সন্ধানী প্রকাশনী)
- ৩। Bangladesh a Legacy of Blood : Anthony Mascarenhas
- ৪। The Rape of Bangladesh : Anthony Mascarenhas
- ৫। The cruel Birth of Bangladesh : Archer K. Blood; University Press Limited
- ৬। মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস : আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
- ৭। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ : অধ্যাপক আবু সায়ীদ
- ৮। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি : আবু সাঈদ চৌধুরী
- ৯। একান্তর-নির্যাতনের কড়চা : আতাউর রহমান
- ১০। মুক্তিযুদ্ধের অপ্রকাশিত কথা : আতিকুর রহমান
- ১১। ১৯৭১ সালে উত্তর রংগাঙ্গনে বিজয় : আখতারজ্জামান (সাহিত্য প্রকাশনী)
- ১২। আমি বিজয় দেখতে চাই : আজিজ মেসের
- ১৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী : আবদুল মতিন
- ১৪। মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা : আবুল হাসনান্ত
- ১৫। স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর কৃষ্ণিয়া : মোঃ আবদুল হান্নান
- ১৬। মানবতা ও গণমুক্তি : আহমদ শরীফ
- ১৭। জাগ্রত বাংলাদেশ : আহমদ মুসা
- ১৮। মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ছবি : এনারেত মাওলা
- ১৯। জীবনের যুদ্ধ যুদ্ধের জীবন : কর্নেল নুরুল্লাহী খান
- ২০। স্বাধীনতা '৭১ (১ম ও ২য় খ) : কাদের সিদ্দিকী
- ২১। যখন পলাতক: মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি : গোলাম মুরশিদ
- ২২। স্বাধীন বাংলার অভ্যন্তর এবং অতঃপর : কামরুল্লাহ আহমদ
- ২৩। যুদ্ধদিনের কথা : জিম ম্যাকিনলে
- ২৪। সিলেটে গণহত্যা : তাজুল মোহাম্মদ

- ২৫। সিলেটের যুদ্ধকথা : তাজুল মোহাম্মদ; (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩)
- ২৬। মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু : নূরুল ইসলাম মঞ্জুর
- ২৭। স্বাধীনতা সংগ্রাম : কিশোরচন্দ্র/বরং দে/অমলেশ ত্রিপাঠী
- ২৮। একান্তরের স্মৃতি : বাসন্তি গুহষ্টাকুরতা; (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ২৯। সংগ্রামমুখর দিনগুলি : বারীণ দত্ত
- ৩০। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : বেলাল মোহাম্মদ; (অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩)
- ৩১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পাকিস্তান : বোরহানউদ্দিন খান
- ৩২। একান্তর কথা বলে : মনজুর আহমদ
- ৩৩। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : মাহবুব কামাল
- ৩৪। গেরিলা থেকে সমুখ যুদ্ধে : মাহবুব আলম (সাহিত্যপ্রকাশ)
- ৩৫। ২৫ অক্ষ্যাত মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকথা : মারফ রায়হান
- ৩৬। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম : মোঃ ওয়ালিউল্লাহ
- ৩৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা ১৯৭১ : রতনলাল চক্রবর্তী
- ৩৮। বাংলাদেশ-গণহত্যার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায় : গোলাম হিলালী
- ৩৯। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে : মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম
- ৪০। বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ : বীর উত্তম রফিকুল ইসলাম
- ৪১। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে : মেজর(অবঃ) রফিকুল ইসলাম
- ৪২। স্মৃতি ১৯৭১ : রশীদ হায়দার
- ৪৩। অসহযোগ আন্দোলন '৭১ : রশীদ হায়দার
- ৪৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : লুৎফুর রহমান রিটন
- ৪৫। স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকায় গেরিলা অপারেশন : হেদায়েত হোসেন
- ৪৬। একান্তর করতলে ছিন্নমাথা : হাসান আজিজুল হক; (সাহিত্য প্রকাশ)
- ৪৭। একান্তরের ঢাকা : সেলিনা হোসেন; (আহমদ পাবলিশিং হাউজ)
- ৪৮। মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা : হারুন হাবীব

- ৪৯ | একান্তরের ঘাতক দালাল যা বলেছে যা করেছে : সংকলক- নূরুল ইসলাম; (মুক্তিযোদ্ধা সহতি পরিষদ)
- ৫০ | জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা : মেজর (অবঃ) কামরুল হাসান ভুঁইয়া
- ৫১ | Dhacca : Sarif Uddin Ahmed
- ৫২ | আমরা স্বাধীন হলাম : কাজী শামসুজ্জামান
- ৫৩ | এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম : গাজীউল হক
- ৫৪ | একান্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায় : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র
- ৫৫ | বাংলাদেশের সঞ্চানে : মোবাস্ত্রের আলী
- ৫৬ | প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ : সত্যেন সেন
- ৫৭ | জয় বাংলা, মুক্তিফৌজ ও শেখ মুজিব : কলহন
- ৫৮ | মূলধারা '৭১ : মঙ্গলুল হাসান; (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ৫৯ | আমার দেখা রাজনীতির পথগুশ বছর : আবুল মনসুর আহমদ
- ৬০ | বাংলাদেশের ইতিহাস : সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত
- ৬১ | Daktar : Viggo Olsen
- ৬২ | যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ : বদরুদ্দীন ওমর
- ৬৩ | যুদ্ধোন্তর বাংলাদেশ : বদরুদ্দীন ওমর
- ৬৪ | বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : মাহবুব কামাল অনুদিত (তাজমহল বুক ডিপো, অনন্যা, ১৯৯৫)
- ৬৫ | চিত্রসাংবাদিকদের ক্যামেরায় মুক্তিযুদ্ধ: রবিন সেনগুপ্ত
- ৬৬ | চরমপত্র : এম আর আখতার মুকুল
- ৬৭ | একান্তরের ডায়েরী: বেগম সুফিয়া কামাল
- ৬৮ | রাজাকারের মন (১ম ও ২য় খন্দ) : মুনতাসীর মামুন
- ৬৯ | ভিনকোরেস্ট জেনারেল : মুনতাসীর মামুন
- ৭০ | মুক্তিযুদ্ধ কোষ (১-৫ খন্দ) : মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত (মূল্য দেড় হাজার টাকা, প্রাণিস্থান সাগর পাবলিশার্স, বেইলী রোড)
- ৭১ | মুক্তিযুদ্ধ কোষ (১-৪ খন্দ) : আফসান চৌধুরী সম্পাদিত (মূল্য ২৮০০ টাকা, প্রাণিস্থান মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর এবং সাগর পাবলিশার্স)
- ৭২ | ঘাতকের দিনলিপি : রমেন বিশ্বাস
- ৭৩ | স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর কৃষ্ণিয়া, মোঃ আব্দুল হান্নান, পুর্বা প্রকাশনী
- ৭৪ | স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি, সংকলন ও সম্পাদনা ফরিদ কবির, মাওলা ব্রাদার্স
- ৭৫ | স্বাধীনতার বাইশ বছর, মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, কাকলী প্রকাশনী
- ৭৬ | স্মৃতি ১৯৭১, সম্পাদনাঃ রশীদ হায়দার, বাংলা একাডেমী
- ৭৭ | স্মৃতি অন্ম ১৯৭১, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, সাহিত্য প্রকাশ
- ৭৮ | স্মৃতিময় '৭১, হেনা দাস, সাহিত্য প্রকাশ
- ৭৯ | Contribution of India in The War of Liberation of Bangladesh, Salam Azad, Ankur Prakashani
- ৮০ | Mujibnagar Government Documents 1971, For: Prof. Salahuddin Ahmed

- ed. Dr. Sukumar Biswas, Maola Brothers
- ৮১ | ৭১ এর দশ মাস- রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী; (কাকলী প্রকাশনী)
- ৮২ | মুক্তিযুদ্ধের দুশো রণাঙ্গন- মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি সম্পাদিত (অনন্যা)
- ৮৩ | মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয়- সুফিয়া কামাল
- ৮৪ | মুক্তিযুদ্ধ আগে ও পরে- পান্না কায়সার
- ৮৫ | রক্তভেজা একান্তর- মেজর (অব) হাফিজ উদ্দন আহমেদ।
- ৮৬ | বুকের ভিত্তির আগুন : জাহানারা ইমাম
- ৮৭ | বিদায় দে মা ঘুরে আসি : জাহানারা ইমাম
- ৮৮ | অফ রোড অ্যান্ড ফায়ার : জাহানারা ইমাম
- ৮৯ | ইতিহাসের রক্ত পলাশ : আবদুল গাফফার চৌধুরী
- ৯০ | আমরা বাংলাদেশী না বাঙলী : আবদুল গাফফার চৌধুরী
- ৯১ | বাংলাদেশ কথা কয় : আবদুল গাফফার চৌধুরী
- ৯২ | যাপিত জীবন : সেলিনা হোসেন
- ৯৩ | মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে : পান্না কায়সার
- ৯৪ | হাদয়ে বাংলাদেশ : পান্না কায়সার
- ৯৫ | সেই সব পাকিস্তানি : মুনতাসীর মামুন
- ৯৬ | এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম : গাজীউল হক
- ৯৭ | বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস : আহমদ মজহার
- ৯৮ | মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য : আহমেদ মাওলা
- ৯৯ | আমি বীরাঙ্গনা বলছি : নীলিমা ইব্রাহীম
- ১০০ | অপহত বাংলাদেশ : আনিসুর রহমান
- ১০১ | অসহযোগ আন্দোলন-৭১, পূর্বাপর : রশীদ হায়দার
- ১০২ | বাঙালি কাকে বলে : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
- ১০৩ | বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ : রামেন্দু মজুমদার
- ১০৪ | স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি : আসাদুজ্জামান
- ১০৫ | Bangladesh At War : এস এম শফিউল্লাহ
- ১০৬ | Witness to Surrender : সাদিক সালিক
- ১০৭ | Genocide 71 : আহমদ শরীফ
- ১০৮ | ১৯৭১ : চুক্কনগরে গনহত্যা : মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ১০৯ | ১৯৭১ : ভয়াবহ অভিযোগ : সম্পাদনা- রশীদ হায়দার (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১১০ | অখন্দ পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি : জি ডলিউ চৌধুরী (হককথা প্রকাশনী)
- ১১১ | অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জাত্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা : সুকুমার বিশ্বাস (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১১২ | অসহযোগের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব : আতাউর রহমান (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১১৩ | আমার একান্তর : মোহাম্মদ নূর কাদের (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১১৪ | উত্তাল মার্চ : ১৯৭১ : আহমেদ ফারুক হাসান (আগামী প্রকাশনী)
- ১১৫ | একান্তর : নির্যাতনের কড়চা: আতোয়ার রহমান (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)

- ১১৬ | একান্তরে গাইবান্ধা : মোঃ মাহবুবুর রহমান (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ১১৭ | একান্তরে পাকবর্বরতার সংবাদ ভাষ্য : আহমদ রফিক (সময় প্রকাশন)
- ১১৮ | একান্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরায়ণীদের বিচার: শাহরিয়ার কবির (সময় প্রকাশন)
- ১১৯ | একান্তরের ঘাতক ও দালালদের বিচার : মোস্তাক হোসেন (অবয়ব প্রকাশন)
- ১২০ | একান্তরের নয় মাস : রাবেয়া খাতুন (আগামী প্রকাশনী)
- ১২১ | একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ : ঐতিহাসিক ভাষণ ইশতিহার ও চিঠি : মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসি সম্পাদিত (আহমদ পাবলিশিং হাউস)
- ১২২ | একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা : এম আর আখতার মুকুল (আগামী প্রকাশনী)
- ১২৩ | একান্তরের স্মৃতিগুচ্ছ : তাজুল মোহাম্মদ সম্পাদিত (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১২৪ | একান্তরের স্মৃতিচারণ : আহমেদ রেজা (পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স)
- ১২৫ | একান্তরের রণাঙ্গন : শামসুল হুদা চৌধুরী (আহমদ পাবলিশিং হাউস)
- ১২৬ | গৌরবাঙ্গনে : মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন আহমদ (কাকলী প্রকাশনী)
- ১২৭ | ছহি মুক্তিযুদ্ধানামা : বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাববানী (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১২৮ | দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন ১৯৭১ : মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসি (সূচয়নী পাবলিশার্স)
- ১২৯ | দিনলিপি একান্তর : কাজী ফজলুর রহমান (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১৩০ | দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ : অ্যাসুনি মাসকারেনহাস, রন্ধি অনুদিত (পপুলার পাবলিশার্স)
- ১৩১ | ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইটিন সেভেন্টি ওয়ান : সিডনি শনবার্গ, মফিদুল হক অনুদিত (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৩২ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণহত্যা : ১৯৭১ জগন্নাথ হল (আগামী প্রকাশনী)
- ১৩৩ | পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দ্রষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ : মুনতাসীর মামুন (সময় প্রকাশনী)
- ১৩৪ | বন্দিশালা পাকিস্তান : সৈয়দ নাজিমুদ্দিন হাশেম (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৩৫ | পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন : আহমেদ সালিম অনুবাদ : মফিদুল হক (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৩৬ | বাংলালীর সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সালাহউদ্দীন আহমদ (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৩৭ | বার বার ফিরে যাই : আখতার আহমেদ বীর প্রতীক (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ১৩৮ | বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রের উত্তর : আবুল মাল আব্দুল মুহিত (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৩৯ | বাংলাদেশ ও বাংলালি রেনেসাঁস স্বাধীনতা চিন্তা ও আত্মনুসন্ধান : অনুপম সেন (অবসর)
- ১৪০ | বাংলাদেশ রক্তের ঝণ : অ্যাসুনি মাসকারেনহাস (হাক্কানী পাবলিশার্স)
- ১৪১ | বাংলাদেশের অভ্যন্তর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য : রেহমান সোবহান (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১৪২ | বাংলাদেশের তারিখ : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১৪৩ | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভারত, রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসি (আহমদ পাবলিশিং হাউস)
- ১৪৪ | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধ গবেষনা কেন্দ্র
- ১৪৫ | বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা : সম্পাদনা- সোহরাব হোসেন
- ১৪৬ | বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : সম্পাদকঃ হাসান হাফিজুর রহমান, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- ১৪৭ | ময়মনসিংহে একান্তর : মুহাম্মদ আব্দুশ শাকুর (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ১৪৮ | মুক্তিযুদ্ধ : সিদ্দিকুর রহমান (আগামী প্রকাশনী)
- ১৪৯ | মুক্তিযুদ্ধ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে : ছদ্মরংদীন (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ১৫০ | মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাংলালি সমাজ : তাজুল মোহাম্মদ (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৫১ | মুক্তিযুদ্ধ ও রাইফেলস : সম্পাদনা সুকুমার বিশ্বাস (বাংলাদেশ রাইফেলস)
- ১৫২ | মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল : ড. কামাল হোসেন (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১৫৩ | মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত : আতাউর রহমান (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৫৪ | মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা : হারুন হাবিব (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৫৫ | মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয় : সুফিয়া কামাল (সময় প্রকাশন)
- ১৫৬ | মুক্তিযুদ্ধে চূয়াডাঙ্গা ও খুলনা : ড. সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১৫৭ | মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর : ড. সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১৫৮ | মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস : মেজর জেনারেল এম এস এ ভুইয়া (আহমদ পাবলিশিং হাউস)
- ১৫৯ | মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল : ড. সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১৬০ | মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ : মেজর জেনারেল কেএম শফিউল্লাহ বীর উত্তর (আগামী প্রকাশনী)
- ১৬১ | মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক : দীপক্ষক মোহাস্ত (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৬২ | মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর : শামসুল হুদা চৌধুরী (বিজয় প্রকাশনী)
- ১৬৩ | মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ, সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আলী ইউনুচ
- ১৬৪ | মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস : আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৬৫ | মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা পাবনা জেলা : আবুল কালাম আজাদ (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী)
- ১৬৬ | মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ : হারুন হাবিব (অন্যপ্রকাশ)
- ১৬৭ | মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান : এ এস এম শামসুল আরেফিন (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ১৬৮ | মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ছবি চট্টগ্রামের কাকলী : এনায়েত মাওলা (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৬৯ | মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি : মোহাম্মদ বদরজ্জামান মিয়া বীর প্রতীক (কাশবন প্রকাশনী)
- ১৭০ | মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান : সম্পাদনা সেলিম রেজা (বাংলা একাডেমী)
- ১৭১ | যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা : মেজর নাসির উদ্দিন (অনুপম প্রকাশনী)
- ১৭২ | রজভেজা একান্তর : মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৭৩ | শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ : বাংলা একাডেমী
- ১৭৪ | সন্তান বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ : আলমগীর সান্তার (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৭৫ | সেষ্টের কমান্ডাররা বলছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা, গ্রন্থনা: আশরাফ কায়সার, সম্পাদকঃ শাহরিয়ার কবির (মাওলা ব্রাদার্স)
- ১৭৬ | স্বাধীনতা '৭১ : কাদের সিদ্দিকী (বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী)
- ১৭৭ | স্বাধীনতা আমার রক্ত বারা দিন : বেগম মুশতারী শফি (অনুপম প্রকাশনী)
- ১৭৮ | স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা : মোঃ আব্দুল হাফ্জান (পুর্বা প্রকাশনী)
- ১৭৯ | স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর কুষ্টিয়া : মোঃ আব্দুল হাফ্জান (পুর্বা প্রকাশনী)

- ১৮০ | স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি : সংকলন ও সম্পাদনা ফরিদ কবির (মাওলা আদার্স)
- ১৮১ | স্বাধীনতার বাইশ বছর : মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি (কাকলী প্রকাশনী)
- ১৮২ | স্মৃতি ১৯৭১ : সম্পাদনাঃ রশীদ হায়দার (বাংলা একাডেমী)
- ১৮৩ | স্মৃতি অল্মান ১৯৭১ : আবুল মাল আব্দুল মুহিত (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৮৪ | স্মৃতিময় '৭১ : হেনো দাস (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৮৫ | প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি : আবু সাঈদ চৌধুরী (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
- ১৮৬ | দুশো ছেষটি দিনে স্বাধীনতা : মুহাম্মদ নুরুল কাদির (মুক্ত প্রকাশনী)
- ১৮৭ | অপারেশন জ্যাকপট : সেজান মাহমুদ (প্রতীক প্রকাশনী)
- ১৮৮ | বিশ বছর পর : সম্পাদনা-- মুহম্মদ জাফর ইকবাল (অনন্যা)
- ১৮৯ | অপারেশন ফুলপুর : শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী
- ১৯০ | অমি বীরাঙ্গনা বলছি : ড. নীলিমা ইব্রাহিম
- ১৯১ | মুক্তিযুদ্ধ: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : আতিকুস সামাদ
- ১৯২ | কালরাত্রির খন্দচিত্র : শওকত ওসমান
- ১৯৩ | মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা : আবুল হাসনাত
- ১৯৪ | মুক্তিযুদ্ধের পাঁচালী : আবুল হাসনাত
- ১৯৫ | হাজার বছরের বাংলাদেশ- ইতিহাসের অ্যালবাম : ড. মোহাম্মদ হাননান (সাহিত্য প্রকাশ)
- ১৯৬ | কালো পঁচিশের আগে ও পরে : আবুল আসাদ
- ১৯৭ | মুক্তিযুদ্ধ ফরিদপুর : মোঃ সোলায়মান
- ১৯৮ | বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ছবি : মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংকলন; (পিআইবি)
- ১৯৯ | বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৬ খ) : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত (তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২)
- ২০০ | স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী (বাংলাদেশ : ১৯৭১) : আবদুল মতিন; (রেডিকেল এশিয়া পাব. ল্যন্ড, ১৯৯১)
- ২০১ | বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম : ডা. মাহফুজুর রহমান ; ১৯৯৩
- ২০২ | বাংলাদেশের জন্য : রাও ফরমান আলী : (শাহ আহমদ রেজা অনুদিত); (ইউপিএল, ১৯৯৬)
- ২০৩ | মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী : বেগম মুশতারী শফি; (প্রিয়ম প্রকাশনী, ১৯৯২)
- ২০৪ | মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান : এ. এস. এম. সামুতুল আরেফিন; (ইউপিএল, ১৯৯৫)
- ২০৫ | আমাদের একান্তর : মহিউদ্দিন আহমদ (সিডিএল, ২০০৬)
- ২০৬ | রণাঙ্গনে সূর্য সৈনিক : সাখাওয়াত হোসেন মজনু (চট্টগ্রাম, ১৯৯২)
- ২০৭ | মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজ : তপন কুমার দে (নিউ এজ, ১৯৯৮)
- ২০৮ | অঞ্জলি লাহিড়ি (শাহীন আখতার সম্পাদিত) : স্মৃতি ও কথা (আইন সালিশ কেন্দ্র, ১৯৯৯)
- ২০৯ | মহিলা মুক্তিযোদ্ধা : ফরিদা আখতার সম্পাদিত; (নারীগ্রহ প্রবর্তনা, ১৯৯১)
- ২১০ | একান্তরের দুঃসহ স্মৃতি : শাহরিয়ার কবীর সম্পাদিত; (ঘাতক দালাল নির্মল কমিটি, ১৯৯৯)
- ২১১ | একান্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন : আসাদুজ্জামান আসাদ (সময়, ১৯৯৬)
- ২১২ | মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায় : প্রণবকুমার বড়ুয়া (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)

- ২১৩ | মুক্তিযুদ্ধের পত্র-পত্রিকা এবং জন্মানুষ প্রসঙ্গ : ফজলুল বারী সম্পাদিত (সংযোগ, ১৯৯০)
- ২১৪ | মুক্তির সোপানতলে : রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম; (আগামী, ২০০১)
- ২১৫ | মুক্তিযুদ্ধ ও নারী : রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী; (আইইডি, ২০০৬)
- ২১৬ | হায়নার খাঁচায় অদম্য জীবন : মন্তু খান
- ২১৭ | ম্যাসাকার : রবার্ট পেইন
- ২১৮ | জীবন সংগ্রাম : কমরেড মণি সিং
- ২১৯ | রণাঙ্গনে একান্তর : নিজামউদ্দীন লক্ষ্মণ; (ঐতিহ্য)
- ২২০ | Witness to Surrender : Siddiq Salik  
ISBN: 984 05 1373 7; (The University Press Limited)
- ২২১ | Surrender at Dacca : Birth of a Nation : Lt. Gen. JFR Jacob  
ISBN: 984 05 1395 8; (The University Press Limited)
- ২২২ | Bangladesh at War : Maj. Gen. K. M. Safiullah, psc., Bir Uttam  
ISBN: 984-08-0109-0; (Academic Publishers)
- ২২৩ | Of Blood and Fire : The Untold Story of Bangladesh's War of Independence : Jahanara Imam; translated by Mustafizur Rahman; (Academic Publishers)
- ২২৪ | A Tale of Millions : Bangladesh Liberation War-1971 : Maj. Rafiqul Islam, Bir Uttam; (Ananna)
- ২২৫ | War and Secession : Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh : Richard Sisson, Leo Rose  
ISBN: 0520076656; (Univ California Press)
- ২২৬ | BANGLADESH, THE UNFINISHED REVOLUTION  
Author: Lawrence Lifschultz  
Publisher: ZED Press , London
- ২২৭ | THE BANGLADESH REVOLUTION & AFTERMATH g: Talukder Maniruzzaman; (Bangladesh Book Internationa)
- ২২৮ | DISCOVERY OF BANGLADESH : Stephen M. Gill  
Publisher: The Uffington Press  
Address: Melksham, Wiltshire, U. K.
- ২২৯ | India and South Asia: A Short History : David Ludden  
ISBN 1851682376; (Oxford oneworld)
- ২৩০ | এক জেনারেলের নীরব সাক্ষী (স্বাধীনতার প্রথম দশক)- মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী
- ২৩১ | আমার ছেটিবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ : সিমিন হোসেন রিমি
- ২৩২ | আত্মকথা ১৯৭১- নির্মলেন্দু গুণ
- ২৩৩ | বিজয়ী হয়ে ফিরব না হয় ফিরবই না-মেজর কামরুল হাসান তুঁইয়া
- ২৩৪ | খুঁজে ফিরি (১৯৭১ এর পিতৃস্মৃতিহীন সত্ত্বানদের কথা)-সংকলন



# ମୁଦ୍ରିଯୁକ୍ତଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଲ୍ଲ ଓ କବିତା ସଂକଳନ

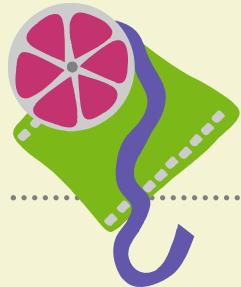
## ফারহান দাউদ

ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଲ୍ଲ ଓ କବିତା  
ସଂକଳନେର ତାଲିକା, ବେଶିରଭାଗଟାଇ  
ସାମହୋଯ୍ୟରାଇନେର ରୂପାରଦେର ଦେୟା  
ତାଲିକା ଥେକେ ନେଇଯା, ଏକଟି ବଡ଼ ଅଂଶ  
ନେଇଯା ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଥେକେ ରାଗିବ  
ହାସାନେର ଦେୟା ତାଲିକା ଥେକେ ।

- ১ | রাইফেল-রোটি-আওরাত  
 ২ | আমার বক্স রাশেদ  
 ৩ | আকাশ বাড়িয়ে দাও  
 ৪ | ১৯৭১  
 ৫ | জোছনা ও জননীর গল্ল  
 ৬ | অনিল বাগচীর একদিন  
 ৭ | আগুনের পরশমণি  
 ৮ | শ্যামল ছায়া  
 ৯ | জয়বাংলার দেশে (গল্ল)  
 ১০ | ফিডম  
 ১১ | একান্তরের পথের ধারে  
 ১২ | একান্তরের যীশু  
 ১৩ | কালো ঘোড়া  
 ১৪ | ঘেরাও  
 ১৫ | মা  
 ১৬ | বাংলাদেশ কথা কয়  
 ১৭ | প্রেক্ষাপট ৭১  
 ১৮ | প্রতিবিম্বের প্রতিধ্বনি  
 ১৯ | মুক্তিযুদ্ধের গল্ল  
 ২০ | জয় বাংলার জয়  
 ২১ | জলাসী  
 ২২ | জাহানাম হইতে বিদায়  
 ২৩ | জন্ম যদি তব বঙ্গে  
 ২৪ | দুই সৈনিক  
 ২৫ | নেকড়ে অরণ্য  
 ২৬ | শেখের সম্ভরা  
 ২৭ | একান্তরের বর্ণমালা  
 ২৮ | ওরা চারজন  
 ২৯ | জয়বাংলা  
 ৩০ | একান্তর  
 ৩১ | বিজয়  
 ৩২ | ফেরারী সূর্য  
 ৩৩ | একান্তরের নিশান  
 ৩৪ | সাত ঘাটের কানাকড়ি  
 ৩৫ | বকুল পুরের স্বাধীনতা  
 ৩৬ | নিযিন্দ লোবান  
 ৩৭ | একান্তরের কথামালা  
 ৩৮ | তোমরাই  
 ৩৯ | বাংলার মুখ

- ଆନୋୟାର ପାଶ  
ମୁହମ୍ମଦ ଜାଫର ଇକବାଲ  
ମୁହମ୍ମଦ ଜାଫର ଇକବାଲ  
ହୃମାୟନ ଆହମେଦ  
ହୃମାୟନ ଆହମେଦ  
ହୃମାୟନ ଆହମେଦ  
ହୃମାୟନ ଆହମେଦ  
ମଞ୍ଜୁ ସରକାର  
ଆଲୀ ମାହମେଦ  
ଶାହରିଆର କବୀର  
ଶାହରିଆର କବୀର  
ଇମଦାଦୁଲ ହକ ମିଳନ  
ଇମଦାଦୁଲ ହକ ମିଳନ  
ଆନିସୁଲ ହକ  
ଛୋଟଗନ୍ଧ ସନ୍ଧଳନ  
ଛୋଟଗନ୍ଧ ସନ୍ଧଳନ  
ଛୋଟଗନ୍ଧ ସନ୍ଧଳନ  
ଶ୍ଵେତକତ ଓସମାନ  
ଶ୍ଵେତକତ ଓସମାନ  
ଶ୍ଵେତକତ ଓସମାନ  
ଶ୍ଵେତକତ ଓସମାନ  
ଶ୍ଵେତକତ ଓସମାନ  
ଶ୍ଵେତକତ ଓସମାନ  
ଏମ. ଆର. ଆଖତାର ମୁକୁଲ  
ରାବେଯା ଖାତୁନ  
ରାବେଯା ଖାତୁନ  
ମମତାଜ ଉଦ୍ଦିନ ଆହମ୍ମଦ  
ମମତାଜ ଉଦ୍ଦିନ ଆହମ୍ମଦ  
ସୈୟଦ ଶାମୁସୁଲ ହକ  
ବେଗମ ନୂରଜାହାନ  
ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଆଲ ମାମୁନ  
ଆଶରାଫ ସିଦ୍ଧିକୀ

- |    |                                      |                    |
|----|--------------------------------------|--------------------|
| ৪০ | । মুক্তিযুদ্ধ হন্দয়ে মম             | মুসা সাদিক         |
| ৪১ | । যখন সময় এল                        | সৈয়দ আলী আহসান    |
| ৪২ | । যুদ্ধজয়ের গল্প                    | রবীন্দ্র গোপ       |
| ৪৩ | । আবার আসিব ফিরে                     | শিরীন মজিদ         |
| ৪৪ | । লোরিয়                             | আলী ইয়াম          |
| ৪৫ | । যুদ্ধ জয়ের গল্প                   | বিপ্রদাশ বড়ুয়া   |
| ৪৬ | । যুদ্ধে যাবার সময়                  | মঞ্জু সরকার        |
| ৪৭ | । রাজপুত্র                           | দাউদ হায়দার       |
| ৪৮ | । বাতাসে বারুদ রক্তে উল্লাস          | জুবাইদা গুলশান আরা |
| ৪৯ | । মুক্তিযোদ্ধা হতেম যদি              | আবু হানিফ          |
| ৫০ | । সংগ্রামী বাংলা                     | আবুল কালাম আজাদ    |
| ৫১ | । একান্তর কথা বলে                    | মঞ্জুর আহমদ        |
| ৫২ | । জয় জয়ন্তী                        | মামুনুর রশীদ       |
| ৫৩ | । মুরগ ও তার নেট বই (গল্প সংকলন)     | মুহম্মদ জাফর ইকবাল |
| ৫৪ | । সূর্যের দিন                        | হুমায়ুন আহমেদ     |
| ৫৫ | । A Golden Age                       | Tahmima Anam       |
| ৫৬ | । কিশোর মুক্তিযোদ্ধারের সত্যি গল্প   | আমীরুল ইসলাম       |
| ৫৭ | । বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ                | সৈয়দ শামসুল হক    |
| ৫৮ | । মনের ঘূড়ি লাটাই                   |                    |
| ৫৯ | । কালা কুরুরি                        |                    |
| ৬০ | । মুক্তিযুদ্ধ : নির্বাচিত কবিতা      |                    |
| ৬১ | । রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রবন্ধ       |                    |
| ৬২ | । একজন দুর্বল মানুষ (গল্প সংকলন)     |                    |
| ৬৩ | । পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (নাটক)   |                    |
| ৬৪ | । উত্তরকা মুজিবনগর                   |                    |
| ৬৫ | । তরঢ়কু                             |                    |
| ৬৬ | । তালাশ                              |                    |
| ৬৭ | । যুদ্ধ                              |                    |
| ৬৮ | । আবুকে মনে পড়ে                     |                    |
| ৬৯ | । নামহীন গোত্রহীন (গল্পঘন্ট)         |                    |
| ৭০ | । দ্বিতীয় দিনের কাহিনী (উপন্যাস)    |                    |
| ৭১ | । এখন দুঃসময় (মঞ্চনাটক)             |                    |
| ৭২ | । মেরাজ ফরিয়ের মা (মঞ্চনাটক)        |                    |
| ৭৩ | । কেরামতমঙ্গল (মঞ্চনাটক)             |                    |
| ৭৪ | । জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (উপন্যাস) |                    |
| ৭৫ | । হাঙ্গর নদী ছেনেড (উপন্যাস)         |                    |
| ৭৬ | । ক্যাম্প (উপন্যাস)                  |                    |
| ৭৭ | । মুক্তিযুদ্ধের গল্প (সংকলন)         |                    |
| ৭৮ | । আরেকে ফাল্লুন                      |                    |



# মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের তালিকা

## ফারহান দাউদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের তালিকা তৈরির কাজ করতে গিয়ে বুবলাম, এ বিষয়ে আমার নিজের জ্ঞান বেশি দূর না। সব কাজের ভরসা আমার বন্ধুদের শরণাপন্ন হলাম। সহপাঠী শিশির বিশ্বাস সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল নিজের স্মৃতি থেকে এবং জমানো শখের খবরের কাগজের কাটিং থেঁটে বের করে দিল অনেকগুলো চলচ্চিত্রের নাম। তালিকাটা করে একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, সেই ১৯৭১ এর অব্যবহিত পরের সময়টায় কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি করে, এরপর বিশাল শূন্যতা, ফাঁকা, কিছুই নেই। প্রায় ১৫ বছরের বিরতির পর টুকটাক করে ২-১টি ছবি নির্মাণ করা শুরু হল, তাও সংখ্যায় যে খুব বেশি, তা নয়। হয়তো অনেক ছবি আমাদের চোখ এবং স্মৃতিকে এড়িয়ে গেছে। তাও বলবো, সংখ্যাটা খুবই কম। মুক্তিযুদ্ধের মত একটি বাস্তব এপিক নিয়ে আরো অনেকগুণ বেশি চলচ্চিত্র বানানো যেত। তালিকায় ছবির নামের পাশে পরিচালকের নাম এবং কোথাও কোথাও মুক্তির বছর ও অভিনয়শিল্পীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

- অরণগোদয়ের অগ্নিসাক্ষী
- ওরা ১১ জন
- আবার তোরা মানুষ হ
- রক্তাঙ্গ বাংলা
- বাঘা বাঙালি
- একান্তরের ঘীণ
- ধীরে বহে মেঘনা
- আগুনের পরশমনি
- শ্যামল ছায়া
- মুক্তির গান
- মুক্তির কথা
- জয়যাত্রা
- মাটির ময়না
- সেই রাতের কথা বলতে এসেছি
- Stop Genocide
- Let There Be Light
- জীবন থেকে নেয়া
- সংগ্রাম
- আলোর মিছিল
- কলমীলতা
- হাস্র নদী গ্রেনেড
- শিলালিপি(শর্টফিল্ম)
- হৃদয়ে আমার দেশ
- Nine Months to Freedom: The Story of Bangladesh
- War Crimes File

- সুভাষ দত্ত (১৯৭৪)  
চায়ী নজরল ইসলাম (১৯৭২)  
খান আতাউর রহমান (ফারুক, বিবিতা অভিনীত)  
কবরী, বিশ্বজিৎ অভিনীত  
আনন্দ  
নাসিরুল্লাহ ইউসুফ (১৯৯৫); শাহরিয়ার কবিরের উপন্যাস থেকে  
আলমগীর কবির (১৯৭৩)  
হৃমায়ুন আহমেদ (১৯৯৫)  
হৃমায়ুন আহমেদ (২০০৬)  
তারেক মাসুদ  
তারেক মাসুদ  
তৌকির আহমেদ  
তারেক মাসুদ (২০০২)  
কাওসার আহমেদ চৌধুরী (২০০৮)  
জহির রায়হান (১৯৭১)  
জহির রায়হান (১৯৭১)  
জহির রায়হান  
চায়ী নজরল ইসলাম (খালেদ মোশাররফের ডায়েরি অবলম্বনে)  
সোহেল রানা, কাজুরী অভিনীত  
চায়ী নজরল ইসলাম (১৯৯৭); সেলিনা হোসেনের উপন্যাস থেকে  
শামীম আখতার (শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের জীবনী অবলম্বনে  
বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জীবনীভিত্তিক  
এস সুখদেব; ডকুমেন্টারি  
গীতা সায়গল ও ডেভিড বার্গম্যান;  
বিবিসি ডকুমেন্টারি (ব্রিটেন প্রবাসী তিন কুখ্যাত রাজাকারের ওপর)

- Liberation Fighters
- Innocent Millions
- আগামী
- শরৎ ১৯৭১
- নদীর নাম মধুমতি
- নিঃসঙ্গ সারবী
- তানভীর মোকাম্বেল (২০০৭); তাজউদ্দীন আহমদের জীবনীভিত্তিক  
শর্ট ফিল্ম; মোরশেদুল ইসলাম (২০০০); শিশু একাডেমী  
তানভীর মোকাম্বেল (১৯৭০)
- সূচনা
- খেলাধূর
- A State is Born
- স্বাধীনতা
- জয়বাংলা
- ভুলিয়া তানভীর মোকাম্বেল; (নির্মলেন্দু গুপ্তের 'ভুলিয়া' কবিতা অবলম্বনে শর্টফিল্ম)
- ইতিহাসকন্যা
- মেঘের অনেক রঙ
- আমরা তোমাদের ভুলবো না
- দুর্জয়
- বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
- শোভনের একান্তর
- একান্তরের রঙপেপিল
- একান্তরের মিছিল
- জয় বাংলাদেশ
- জয় বাংলা
- দুরত পদ্মা
- ডেটলাইন বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ স্টেরি
- রহমান: দি ফাদার অফ দি নেশন
- মেজর খালেদ'স ওয়ার
- ডকুমেন্টারি; আলমগীর কবির (১৯৭১)
- ডকুমেন্টারি; বাবুল চৌধুরী (১৯৭১)
- মোরশেদুল ইসলাম (১৯৮৪)
- শর্ট ফিল্ম; মোরশেদুল ইসলাম (২০০০); শিশু একাডেমী  
তানভীর মোকাম্বেল (১৯৭০)
- মোরশেদুল ইসলাম
- মোরশেদুল ইসলাম
- ডকুমেন্টারি (১৯৭১)
- ইয়াসমিন কবির  
জাপান সরকারের সহায়তায় নির্মিত
- হারানুর রশীদ (মাথিন); (১৯৭৯)
- হারানুর রশীদ (শিশু একাডেমী)
- জানেসার ওসমান (শিশু একাডেমী)
- রফিকুল বারী চৌধুরী (শিশু একাডেমী)
- দেবাশীষ সরকার (শিশু একাডেমী)
- মাল্লান হীরা (শিশু একাডেমী)
- কবরী সারোয়ার (শিশু একাডেমী)
- আই এস জোহের  
উমা প্রসাদ
- দুর্গাপ্রসাদ
- গীতা মেহতা
- নগিসা ওশিমা
- নগিসা ওশিমা
- গ্রানাডা টেলিভিশন

## মুক্তিযুদ্ধের নাটক

# মাটির কান্না

শাহজাহান শামীম

স্থান : কোন এক অখ্যাত স্মৃতিসৌধ  
সময় : ভোর বা যে কোন মেঘলা দিন।

(দীর্ঘলয়ে বিলাপ ও তার সাথে করুণ রাখালিয়া বাঁশী ভেসে আসে। কান্না ও বিলাপের মধ্যে কোন একটা গল্প বা কাহিনী বলা হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু কান্নার দমকে ও বিলাপের ধাক্কায় সেই কাহিনী অস্পষ্ট করুণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। করুণ সুর ও বিলাপ ছাপিয়ে ভেসে আসে একটি কঠস্বর।  
কঠস্বর : মাটির কান্না কি শুনতে পাও ? কান পেতে শোন মাটির কোটরে ফেনিয়ে ওঠা সেই কান্নার সুর। এখানে বাতাস মানে দীর্ঘশ্বাস, এখানে পানি মানে অশুভজল, এখানে মাটি মানে কান্নার সুর। শুনতে কি পাও?  
(দূর থেকে ভেসে আসে গানের ও কান্নার সুর)

কোরাস : পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে  
রক্তলাল, রক্তলাল, রক্তলাল।

সময় এসেছে মহাযুদ্ধের  
রক্তলাল, রক্তলাল, রক্তলাল।

(গানের শুরুতে চারজন মানুষ একটি পুষ্পস্তবক হাতে মধ্যে আসে। তারা ধীর ধীরে হেঁটে যায়। গান শেষ হওয়ার আগেই তারা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ দামামা বেজে ওঠে। লাফ দিয়ে মধ্যে আসে কাফনের কাপড় পরা এক ব্যক্তি। পুষ্পস্তবকটি হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।)

ব্যক্তি (১) : বেয়াদবগুলো কী মনে করে আমাদের ? সামান্য ফুল দিয়ে করুণা করলেই আমরা খুশিতে বগল বাজাব ?  
বছর শেষে স্মৃতিসৌধে ফুল দেয়ার জন্যই কী আমরা এদেশটা স্বাধীন করেছিলাম ?

(পেছনে অন্য এক ব্যক্তি চিৎকার করে ওঠে )

ব্যক্তি (২) : এই চুপ কর ! একদম কথা বলবি না। তোর মত মৃত মানুষের কথা কে শুনবে ?

ব্যক্তি (১) : কে মৃত ? আমরা না ওরা ? আমরা জীবন দিয়ে অমর হয়ে গেছি। আর ওরা এক মৃত জীবন বয়ে নিয়ে চলছে। বোকার মত এ জীবন বয়ে চলার কোন মানে নেই, কোন ল্য নেই, কোন পথ নেই। - কেবলই জীবনকে বয়ে নিয়ে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করা।

ব্যক্তি (৩) : ওই যে, আবার প্যাচাল পারবার লাগছে। আরে তুই ব্যাটা মইরা গেছস, তর তো মাথাই নাই। সেইটা কিনা

এত ঘামাস। তর কথা কেঠা শুনবে ?

ব্যক্তি (১) : (ব্যক্তি ৩ কে) এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ তোমার মতো। আগেই ভাবে কে তোমার কথা শুনবে, আর কে তোমার কথা শুনবে না। এসব ভেবে উচিত কথাটা বলে না। তাহলে কি এদেশে বাস করতে পারবে ?  
ব্যক্তি (৩) : তুমি ভাগ্যবান যে তুমি মইরা গেছিলা। অনেক দুর্ভাগ্য অহনও বাইচ্যা আছে। শুধু বাইচ্যা আছে তাই না, গায় গায় পোলাপানও পয়দা করছে। তাগো সবাই মিল্যা এই দেশে থাকতে হইব। মরণ ছাড়া তাগো যাওনের জায়গা নাই।

### তথ্যকণা

#### মাটির কান্না

রচনা : শাহজাহান শামীম

নির্দেশনা : জিকু আহমেদ

প্রথম প্রদর্শনী : ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭

স্থান : নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় পৌর শহীদ মিনার

নাটকের দল : নাটুয়া

ব্যক্তি (১) : এভাবে বিবেকহীন বেঁচে থাকার চেয়ে তো মৃত্যুই ভাল। এ জীবন মানে বন্দিত্ব। তার চেয়ে মৃত্যুই অনেক স্বাধীন।

ব্যক্তি (২) : আবারও বাজে কথা বলছ ? একই ঘ্যানঘ্যান আর কতদিন করবে ?

ব্যক্তি (৩) : এই কথাই তো কইতে লাগছি, বেহুদা প্যাচাল পাইড্ডা মাথার সাকিঁট গরম কইরা লাভ আছে ?  
(একটি মেয়েলি বিলাপ ভেসে আসে)

ব্যক্তি (৩) : (উৎকর্ণ হয়ে শোনে ) কেঠায় কান্দে ?

ব্যক্তি (১) : চিনতে পারছ না, তোমাদের সবার বিবেক কাঁদে। বিচারের বাণী কাঁদে। শহীদের আত্মা কাঁদে।

( ব্যক্তি ২ উৎসাহিত হয়ে খুঁজতে থাকে )

ব্যক্তি (১) : খুঁজো না। ও তোমার ভেতরের কান্না - যা হারিয়েছ তার জন্য কান্না, যা চেয়েছ তার জন্য কান্না।

ব্যক্তি (৩) : থাকো তোমার কান্না ফান্না লইয়া । আমি এই সবে নাই । বন্দুক ধরছি, যুদ্ধ করছি, দ্যাশ স্বাধীন করছি । আমার জীবনের বিনিময়ে এই দ্যাশ স্বাধীন, এইটা ভাবলেই শরীরের কঙ্কালটা মড়মড় কইরা উঠে । আজকে একটা বিশেষ দিন । পুলাপান যদি একটু স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়া মজা লুটে, লুটুক না, আমার কী ? নিজের জানটা দিয়া দ্যাশটা বানায়া দিছি, সেইটা দিয়া ওরা কি করব, সেইটা ওরা ভাবব ? আমরা ক্যান মাথা ধামামু ?

ব্যক্তি ১ : দৃঢ়ঘৃত গণতান্ত্রিক নিয়মে আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না । আপনার ব্যক্তিগত কবরকে ফুলশয়া বানিয়ে সুখবিন্দি দিন । আপন্তি নেই । কিন্তু আমার দাবি থেকে এক পা পিছিয়ে আসব না । এই কান্না আমি থামাবই ।

ব্যক্তি ২ : পারবে না । এ কাজ কোন মৃত মানুষের নয় । তুমি তো মৃত । ১৯৭১ সালে তোমার জীবন থেকে রূপরসগঞ্জ কেড়ে নিয়েছে ।

ব্যক্তি ৩ : আমি যাই, তোমাগো ফালতু প্যাচালে আমি নাই । আবার একটা লম্বা ঘুম দিমু । খাওয়া পরার চিন্তা তো আর নাই । দয়া কইরা কবরের শাস্তি নষ্ট কইর না তো ।

(ব্যক্তি ৩ চলে যায় )

ব্যক্তি ১ : কাপুরুষ ।

ব্যক্তি ২ : কাকে তুমি কাপুরুষ বলছ, ও একজন বীর ।

ব্যক্তি ১ : আমিও একজন বীর উত্তম । অবশ্য আমি তা মনে করি না । পুরো যুদ্ধটা শেষ করতে পারিনি । সিকিভাগ হওয়ার আগেই সরে পড়তে হয়েছে । তবু ওরা মানে এই জীবিত মানুষেরা আমাকে বীর বানিয়ে দিয়েছে ।

ব্যক্তি ২ : ভালো করেছে । ওরা আপনাকে সম্মানিত করেছে । আমার ভাগ্যে তো কোন পদবি জোটেনি ।

ব্যক্তি ১ : ( হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে) মরে গিয়েও পদবীর লোভ যায়নি ।

ব্যক্তি ২ : (কিছুটা লজ্জা পায় ) সম্মান পেতে কে না চায় ? তুমি চাও না ?

ব্যক্তি ১ : চাই । কিন্তু তার আগে সম্মান পাওয়ার যোগ্য হতে চাই এবং যাদের কাছ থেকে সম্মান পাচ্ছি তারাও সংলোক হওয়া চাই ।

ব্যক্তি ২ : তুমি এক ছাত্র হয়ে একজন অধ্যাপককে জ্ঞান দিচ্ছ ?

ব্যক্তি ১ : মৃত্যুরাজ্যের এই তো মজা । এখানে সবাই সমান ।

মৃত্যু সবাইকে সমান করে দেয় ।

(ব্যক্তি ৪ আসে )

ব্যক্তি ৪ : সমান আর হতে পারলাম কোথায় ? তুমি যেমন করে ভাবতে পার আমি কি তেমন করে ভাবতে পারি ? মৃত্যুরাজ্যে তো বটেই, জীবিত রাজ্যেও লোকেরা কি ভাবতে পারে তোমার মতো ?

ব্যক্তি ২ : তাতে ওর লাভটা কি হলো ? মাথাটা গরম হওয়া

ছাড়া ?

ব্যক্তি ৪ : শোনেন অধ্যাপক যেই বয়সে আপনি মরেছেন মানে শহীদ হয়েছেন সেই বয়সে আসতে আসতে অনেক নোংরা বুদ্ধির খেলা আপনি দেখেছেন । কিন্তু এই মাথা গরম লোকটি, যে কিনা আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে আপনারই ছাত্র হতো, সে তখনও জীবনের এসব নোংরা খেলা দেখেনি ।

ব্যক্তি ১ : আপনার সাথে একমত নই । নোংরা খেলা জানা আর নোংরা খেলায় মেতে ওঠা এক কথা নয় ।

ব্যক্তি ২ : কী বলতে চাও তুমি ?

ব্যক্তি ১ : আমি বলতে চাই, জীবনের সব নোংরা খেলা জানি । এজন্যই এসব নোংরা খেলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে চাই ।

ব্যক্তি ৪ : কী করবে তুমি ?

ব্যক্তি ১ : এই স্মৃতিসৌধে আর কখনও ওদের ফুল দিতে দেব না ।

ব্যক্তি ২ : পাগল হয়েছ ?

ব্যক্তি ১ : পাগল কে ? আমি নাকি ওরা ? ওরা যে হতে ফুল

দেয়, সেই হাতেই তো ব্যালট পেপারে সিল মারে । যে হাতে ফুল দেয়, সেই হাতে যুদ্ধাপর-ধীকে মালা পরায় । যে হতে ফুল দেয়, সেই হাতেই রাজাকারকে

সালাম দেয় । যে হাতে ফুল দেয়, সেই হাতে আলবদরের হাতে হাত মেলায় । যে হাতে ফুল দেয়, সেই হাতেই স্বাধীনতা বিরোধীকে জড়িয়ে ধরে । তারপরও আমিই পাগল, ওরা নয় ? (দীর্ঘ বিলাপের সুর ভেসে আসে । ওরা কান পেতে শোনে )

ব্যক্তি ১ : শোনেন এই কান্না, যতদিন স্বাধীনতা বিরোধীর মার্কায় ভোট পড়বে, ততদিন এ কান্না থামবে না । যতদিন এদেশের মানুষ প্রতারককে নেতা মানবে, ততদিন এ কান্না থামবে না । যতদিন মানুষ

দুর্নীতিবাজদের ভোট দেবে, ততদিন এ কান্না থামবে না ।

ব্যক্তি ২ : আমরা জানি সেটা । এদেশের মানুষ বার বার ভুল করে । ১৯৭১ এর ফসল ঘরে তুলতে গিয়ে ভুল করেছে, ১৯৯০ এর ফসল ঘরে তুলতে গিয়ে ভুল করেছে এবং ২০০৮ এও ভুল করবে । জনগণের

বিজয়ের ফসল বার বার তারা তুলে দিয়েছে দুর্নীতিবাজদের হাতে, ভঙ্গের হাতে, প্রতারকের হাতে । ভীষণ রকম বোকা এদেশের লোক । সমাজের সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে জঘন্য, সবচেয়ে নোংরা, সবচেয়ে টাউট লোকটাকে ভোট দিয়ে নেতা বানিয়ে দেয় ।

ব্যক্তি ৪ : দুঃখে বুকটা ফেটে যায় । এই জন্য বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছিলাম ? ভাবতে পারেন, এই দেশের লোক এক যুদ্ধাপর-ধীকে ভোট দিয়েছে, এদেশের লোকের ভোটে একজন ধর্ম ব্যবসায়ী, স্বাধীনতা বিরোধী সংসদে বসেছে । মন্ত্রী হয়েছে ।

স্বাধীন দেশের পতাকা উঠেছে একজন রাজাকারের গাড়িতে ।

(ব্যক্তি ১ পাগলের মত হাসতে থাকে । দীর্ঘলয়ে বিলাপের সুর ভেসে আসে ।)

ব্যক্তি ৪ : ভেবেছিলাম ওটা সাময়িক ভুল । অল্প কিছু লোকের বোকামি । কিন্তু যে দিন রাজাকারের গাড়িতে এ দেশের পতাকা উঠল, একটা আগুন মিছিল নামল না রাজপথে, কোন বজ্জবল্পে প্রতিবাদ ধ্বনি উঠল না, একটা বজ্যুষ্ঠি বাতাসে জেগে উঠল না । লজ্জায়, অপমানে আমার হাড়ে হাড়ে কিলবিল করে উঠল । হায় আমাদের স্বাধীনতার কী জঘন্য অপম্বত্যু !

(নেপথ্যে থেকে নারীকঠের বিলাপ ভেসে আসে । একজন নারী আসে ।)

মহিলা ১ : ওরা ভুলে গেছে ওদের জীবনে কোন্তু ছিল । ওরা

প্রথমে ওরা বলল, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র । যারা পাকিস্তানের পক্ষে নয় তারা মুসলমান নয় । '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বুরালাম, ধর্ম কায়েম নয়, শোষণ কায়েমই ওদের লক্ষ্য । '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা সেই বেড়াজাল ভাঙ্গলাম । কিন্তু ইসলাম নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ হল না

ভুলে গেছে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা । ওরা ভুলে গেছে ২ লক্ষ বীরাঙ্গনার কথা । ওরা ভুলে গেছে সংবিধানের ৪টি মুক্তি সনদের কথা । ওরা এখন অঙ্ক, ওরা এখন বোবা, ওরা এখন কালা । ওরা এখন মৃতের চেয়েও বেশি মৃত । প্রথিবীতে এত বোকা জাতি একটিও নেই । বিজয়ী হয়ে পরাজিতের শাসন মেনে নেয়ার এমন নজীর প্রথিবীতে আর একটিও নেই । আমরা মরে গিয়ে যতটুকু জীবিত আছি, ওরা বেঁচে থেকে তার চেয়ে বেশি মরেছে । ওদের বিবেক মরেছে । ওদের সততা মরেছে । ওদের দেশেমে মরেছে । ওরা একটি মৃত জাতি ।

ব্যক্তি ১ : প্রথমে ওরা বলল, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র । যারা পাকিস্তানের পক্ষে নয় তারা মুসলমান নয় । '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝলাম, ধর্ম কায়েম নয়, শোষণ কায়েমই ওদের লক্ষ্য । '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা সেই বেড়াজাল ভাঙলাম । কিন্তু ইসলাম নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ হল না । ইসলাম কায়েমের নামে তারা গণতন্ত্রকে তুলোধূনো করল । কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার স্বাদ নেয়ার জন্য তারা ভোল পাল্টাল । নারী শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলল । কিন্তু ক্ষমতার স্বাদ নেয়ার জন্য নারীর পদলেহন করল । ইসলাম কায়েম এদের কাছে মূল বিষয় না । ক্ষমতায় গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ানোই এদের টার্গেট । যে কোন দুর্নীতিবাজের মতো এদেরও লক্ষ্য নগদ সম্পদ । তাই তারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েও ইসলামের পক্ষে একটি কথাও বলেনি ।

(ব্যক্তি ৩ আসে । বিরক্ত ।)

ব্যক্তি ৩ : কবরের শাস্তি নষ্ট করবার লাগছ ক্যান? দ্যাশটা স্বাধীন কইরা কি বিরাট কাম কইরা ফালাইছ নাকি?

ব্যক্তি ১ : জোর করে শাস্তি বজায় রাখার মতো অশাস্তি আর নেই । সমুদ্রের উপরটা শাস্তি থাকলেও ভেতরের স্থোত কিন্তু থেমে থাকে না ।

মহিলা ০১ : তাই তো ইসলাম কায়েমের নামে আমরা পেলাম আত্মাতী বোমা । ইসলাম কায়েমের নামে দেশ ভরে গেল ভয়ঙ্কর জঙ্গীবাদে । ইসলাম কায়েমের নামে মরে গেল কত নির-প্রাধ মানুষ । ইসলাম কায়েমের নামে কত মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেল । ইসলাম - এই পুরোনো অস্ত্রে এ দেশের মানুষ বার বার ঘায়েল হয়েছে । এই পুরোনো অস্ত্রে এদেশে বারে বারে অশাস্তি এসেছে । অথচ ইসলাম মানে তো শাস্তি । আহ, শাস্তি, তুমি কোথায়?

কোরাস : পূর্ব - দিগন্তে সূর্য উঠেছে

রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল ।

যেদিন দেশ রাজাকারমুক্ত হবে,  
যুদ্ধাপরাধীমুক্ত হবে, সেদিন এদেশ  
প্রকৃত স্বাধীন হবে । সেদিন থেমে  
যাবে মাটির কানা, বাংলা মায়ের  
দীর্ঘশ্বাস । সেদিন তোমরা ফুলের  
ডালি নিয়ে এসো, আমরা হাততালি  
দিয়ে তোমাদের স্বাগত জানাব ।

সময় এসেছে মহাযুদ্ধের  
রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল ।

ব্যক্তি ৪ : ওই যে, ওরা আবার আসছে । ওদের হাতে পুস্পত  
বক ।

ব্যক্তি ১ : ওদের এই করণা আর অপয়ান আমরা মেনে নেব না ।  
ওদের নোরা হাতের ফুল নেব না ।

ব্যক্তি ২ : কী করবে তুমি?

ব্যক্তি ১ : কিছুই যদি না করতে পারি কমপক্ষে তো ঘৃণায় থু থু  
ছিটাতে পারব ।

ব্যক্তি ৩ : ( লাফ দিয়ে হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে ) যার শহিলে  
রক্ত মাংসই নাই, তার আবার থু থু ।

ব্যক্তি ৪ : আমার হাড়ের ভেতর যেটুকু আগুন আছে, সেটুকু  
আগুন ওদের রক্তেও নেই ।

(ব্যক্তি ২ চলে যেতে থাকে )

ব্যক্তি ১ : কোথায় যাচ্ছেন?

ব্যক্তি ২ : তোমাদের এই হাঙামার মধ্যে আমি নেই ।

ব্যক্তি ৩ : উনি জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবি মানুষ, কুলি কামলার মতো  
পাছড়া পাছড়ি করব নাকি?

( দাঁত কেলিয়ে হাসতে থাকে ব্যক্তি ৩ )

ব্যক্তি ২ : অসহ্য একটা লোক ।

(ব্যক্তি ২ চলে যায় )

মহিলা ১ : এই যে ওরা আসছে ।

কোরাস : পূর্ব - দিগন্তে সূর্য উঠেছে

রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল ।

সময় এসেছে মহাযুদ্ধের

রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল ।

(গান গাইতে গাইতে পুস্পতবক হাতে ঢোকে ৩ জন পুরুষ ও  
একজন নারী । পুরুষদের গায়ে পাঞ্জাবি ও নারীটির পরনে শাড়ি ।  
তারা সবাই গান গাইতে গাইতে পুস্পতবক নিয়ে এগিয়ে যায় ।  
মৃত ৪ জন তাদের ঘিরে একটি বৃন্ত রচনা করে । বাজনার তালে  
তালে তারা ৪ জন শুরু করে তা ব নৃত্য । তা ব নৃত্যের বাজনার  
তালে জীবিত ৪ জনের গান হারিয়ে যায় । ওরা যখন পুস্পতবক  
বেদীতে দিতে যায়, সেই মুহূর্তে ৪ জন মৃত মুক্তিযোদ্ধা পুস্পতবক  
ধরে ফেলে । ওরা চেষ্টা করে পুস্পতবক বেদীতে রাখতে । পারে  
না । মৃত ৪ মুক্তিযোদ্ধার সাথে ওরা কিছুতেই পেরে ওঠে না । ওরা  
ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় । )

নারী ১ : (ভয় পেয়ে) ও মাগো !

পুরুষ ১ : অবাক কা !

পুরুষ ২ : ওটা ঐভাবে শূন্যে ঝুলে আছে কেন ?

পুরুষ ৩ : এরকম অস্ত্রুত কা তো কখনো দেখিনি !

নারী ১ : চল, আমরা চলে যাই ।

পুরুষ ১ : ওটা কি ওভাবেই ঝুলে থাকবে ?

পুরুষ ৩ : থাক না, সমস্যা কী ?

পুরুষ ২ : দাঁড়াও, ওটাকে আমি স্মৃতিসৌধে নামিয়ে রাখব ।

নারী ১ : ওখানে যেও না

(পুরুষ ২ পুস্পতবকের কাছে যায় । ওটাকে ধরার চেষ্টা করে ।

পুস্পতবকটি সরে যায় । পুরুষ ২ ভয় পেয়ে যায় । )

কোরাস :

ব্যক্তি ১ : আমরা ফুল নেব না ।

ব্যক্তি ৩ : আমরা ভুল নেব না ।

ব্যক্তি ৪ : আমরা ফুল নেব না ।

মহিলা ১ : আমরা ভুল নেব না ।

(তিনি পুরুষ ও এক নারী ভয়ে কুকড়ে যায় । ব্যক্তি ১,৩,৪ ও  
মহিলা ১ পুস্পতবক তুলে ধরে ।)

কোরাস : আমরা চাই না করুণার ফুল

আমরা চাই না নোংরা হাতের ফুল

আমরা চাই না অপমানের ফুল

আমরা চাই না ভুল লোকের ফুল

পুরুষ ২ : তোমরা কারা?

ব্যক্তি ১ : আমরা মুক্তিযোদ্ধা ।

পুরুষ ২ : আমরা তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

ব্যাক্তি ১ : কারণ তোমাদের দ্রষ্টিতে আমরা মৃত্যুবরণ করেছি ।  
তোমরা আমাদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বল ।

পুরুষ ১ : আপনারা কি মৃত ?

ব্যাক্তি ৪ : আমরা অমর । প্রতিটি মুক্তিপাগল মানুষের বুকে  
রয়েছে আমাদের নাম ।

নারী ১ : ফুলটা ওরকম ঝুলে আছে কেন ?

মহিলা ১ : আমরা ফুল নেব না । তোমাদের দেয়া এই ফুল  
সম্মানের নয়, তা মির ।

পুরুষ ৩ : আমরা আপনাদের সম্মান জানাতে চাই ।

(ব্যাক্তি ১ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে ।)

ব্যাক্তি ১ : গত ছত্রিশ বছর ধরে সবাই সম্মান জানাতে গিয়ে  
আরও অপমানিত করেছে । আমাদের স্বপ্ন, সংগ্রাম, অগ্নিযুগের  
কথা সবাই ভুলে গেছে ।

ব্যাক্তি ৩ : মানে ব্যাপারটা হইল গিয়া আপনেরা আমাগো  
একদিকে ফুল দ্যান, অন্যদিকে রাজাকারণে ভোট দ্যান - এইটা  
তো হইবার পারব না ।

পুরুষ ২ : আমরা তো রাজাকারকে ভোট দেই না ।

ব্যাক্তি ৩ : তাইলে রাজাকারের সংসদে গিয়া ত্রি জয়গাটা  
অপবিত্র করল ক্যামনে ? মন্ত্রী হয়া দেশের পতাকার অপমান  
করল ক্যামনে ? তারা কি জীন ভুতের ভোটে পাস করছে ?  
আপনেরা কি ভোট দ্যান নাই ?

(ওরা চারজন পরম্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে)

ব্যাক্তি ৩ : তারপর ধরেন গিয়া, শান্তি কমিটির লোকগুলানরে  
ভোট দিয়া চেয়ারম্যান মেম্বার বানাইছে ক্যাডা ? আপনেরা না ?  
এইসব হালুয়াকাটির লোভী লোকজনরে বার বার ভোট দিয়া  
দ্যাশ্টারে দুর্নীতিতে চ্যাপ্সিয়ন বানাইছে ক্যাডা ? আপনেরা না ?  
আপনেরা কি কোনদিন সংলোকেরে ভোট দিছেন ? পাশ  
করাইছেন তাগো ?

নারী ১ : এসব বিষয় নিয়ে নেতারা ভাববে । আমরা তো সাধারণ  
জনগণ ।

ব্যক্তি ৩ : এই তো ভুল বললেন । নেতা বানানোর যাদুমন্ত্র  
আপনের হাতে । আপনের ভোট ছাড়া কেউ নেতা হইবার পারব  
না । আপনের ভোট ছাড়া কেউ কোনদিন সংসদে বসতে পারব  
না ।

ব্যাক্তি ১ : এই সব কথা ওরা জানে । এবার আসল কথাটা  
বলেন ।

ব্যাক্তি ৩ : আসল কথা, আসল কথা আবার কেনডা ?

ব্যাক্তি ১ : আসল কথা হল যতদিন পর্যন্ত এই দেশে একটা  
যুদ্ধাপরাধী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা ফুল নেব না ।

আমাদেরকে বার বার অপমান করতে দেব না । নিয়ে যান  
আপনাদের ফুল ।

(ব্যাক্তি ১ ফুলটা ছুড়ে মারে । ধরে পুরুষ ২ )

ব্যাক্তি ৪ : যেই সব রাজাকারদের নেতা বানিয়েছেন, এ ফুল  
নিয়ে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিন, আপনি নেই । কিন্তু ওদের  
সাথে সম্পর্ক রেখে আমাদের সম্মান জানানোর ভাগ্য আর  
করবেন না ।

ব্যাক্তি ৩ : আমরা সাড়ে তিন হাত করবে শুইয়া মাটির কানা  
শুনি । আমাগো কবরের শান্তি নষ্ট হইয়া যায় ।

ব্যাক্তি ১ : কান পেতে শুনুন বাংলা মায়ের কান্না । তার সন্তান  
হত্যার বিচার আজও হয়নি । খুনীদের বিষাক্ত নিষ্পাসে বাতাসে  
গুমোট হাহাকার ।

(ভেসে আসে দূরাগত বিলাপ ধ্বনি)

ব্যাক্তি ১ : ওই যে মা কাঁদছে । বিচারহীনতার লজ্জায় তার এই  
বিলাপ । তবু আপনারা খুনীদের বিচার করবেন না । যুদ্ধাপর-  
াধীদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না ?

ব্যাক্তি ৪ : আর কত অপেক্ষা করবেন ? আমাদের ঠা । হাড়ে  
বিছোহের আগুন জলে অথচ আপনাদের সতেজ রক্তে কোন  
বিশেষণ নেই । কী হয়েছে আপনাদের ? বিবেক মরে গেছে ?  
সত্য ভুলে গেছেন ? অঙ্গের চেয়েও বেশি অঙ্গ, বোবার চেয়ে  
বেশি বোবা, কালার চেয়ে বেশি কালা । কী হয়েছে আপনাদের ?  
পুরুষ ২ : আমরা ভুল করেছি । আগাছা পরিষ্কার না করলে  
ফসল মরে যায় । পঁচা অঙ্গ না ফেললে মানুষ মরে যায় ।  
আমাদের সমাজের সেই পঁচা মানুষগুলোকে ভাল মানুষের দল  
থেকে বের করে দিতে হবে, নইলে তারা গোটা সমাজটাকে  
পঁচিয়ে ফেলবে ।

ব্যাক্তি ১ : সাবাশ । আপনি এই প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা । আমরা  
দেশকে স্বাধীন করেছি, আপনারা দেশকে রাজাকারমুক্ত করুন ।  
নইলে এ দেশে শান্তিতে থাকতে পারবেন না । আস্তিনের সাপ  
আপনাকে ছোবল দেবেই ।

মহিলা ১ : যেদিন দেশ রাজাকারমুক্ত হবে, যুদ্ধাপরাধীমুক্ত হবে,  
সেদিন এদেশ প্রকৃত স্বাধীন হবে । সেদিন থেমে যাবে মাটির  
কান্না, বাংলা মায়ের দীর্ঘশ্বাস । সেদিন তোমরা ফুলের ডালি নিয়ে  
এসো, আমরা হাততালি দিয়ে তোমাদের স্বাগত জানাব । ফুলে  
ফুলে ছেয়ে যাবে এই পবিত্র স্মৃতিসৌধ ।

নারী ১ : আমরা কথা দিচ্ছি, যেদিন দেশ যুদ্ধাপরাধী মুক্ত হবে,  
এই স্মৃতিসৌধে সেদিন ফুল নিয়ে আসব । সেই ফুল হবে শ্রদ্ধার,  
সম্মানের ; তা মির নয় ।

পুরুষ ১ : আজ থেকে শুরু হল যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ।

শান্তির জন্য যুদ্ধ ।

ব্যাক্তি ৪ : প্রথমীর সব সভ্য দেশে যুদ্ধাপর-  
াধীদের বিচার হয়েছে । জার্মানীতে, যুগোস্লাভিয়ায়,  
কম্বোডিয়ায় - যুদ্ধাপরাধীরা কখনো মুক্তি পায়নি । কক্ষনো নয় ।  
আমরা কি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করব না ? আমরা কি সভ্য জাতি  
নই ?

পুরুষ ৩ : আমরা কথা দিচ্ছি, দেশকে যুদ্ধাপরাধীর কবল থেকে  
মুক্ত করব । সারা প্রথমীকে জানিয়ে দেব, আমরাও সভ্য জাতি ।  
ব্যাক্তি ১ : আমরা বিশ্বাস করলাম, আপনারা আমাদের স্বপ্ন,  
সংগ্রাম ও দিন বদলের সাধনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ।  
আজকের প্রজন্মের আপনারা আমাদের প্রতিনিধি । আসুন আমরা  
সেই স্বপ্ন, সংগ্রাম ও দিন বদলের সাধনায় একাত্ম হই ।

(ব্যাক্তি ১, পুরুষ ২কে, ব্যাক্তি ৩ পুরুষ ১কে, ব্যাক্তি ৪ পুরুষ ৩  
কে এবং নারী ১ মহিলা ১কে জড়িয়ে ধরবে । তারা পরম্পরাকে  
জড়িয়ে ধরে এমন এক ভঙ্গ করে যাতে বোবা যায় শহীদ  
মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা এ প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধাদের দেহে চুকে  
গেল । তারপর শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা চলে যায় ।

এখন পুরুষ ২ ব্যাক্তি ১ এর মত করে, পুরুষ ১ ব্যাক্তি ৩ এর  
মতো করে, পুরুষ ৩ ব্যাক্তি ৪ এর মতো করে এবং নারী ১  
মহিলা ১ এর মত করে কথা বলবে । )

পুরুষ ২ : এই মৃত পঁচা জীবন আমরা চাই না ।

পুরুষ ১ : আবার যুদ্ধ করুন । এইবার আগাছা সাফ করার যুদ্ধ ।  
রাজাকার মুক্ত করার যুদ্ধ ।

পুরুষ ৩ : হাড়ের মধ্যে যে আগুন আছে, সেই আগুনে পুড়িয়ে  
মারব ওদের ।

নারী ১ : আমরা ভুলিনি ৫২, ৭১, ৯০ । আবার এক ভোট বিপ্লবে  
ভেসে যাবে সকল ধান্দাবাজ, দুর্নীতিবাজ ও যুদ্ধাপরাধী । প্রতিটি  
ভোট আমাদের জন্য একটি বিপ্লব । এই বিপ্লবে মতায় আসবে  
সৎ, কর্মী ও দেশপ্রেমিক নেতা ।

পুরুষ ২ : দুর্নীতিবাজ, যুদ্ধাপরাধী ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি  
চাই ।

পুরুষ ১ : আগাছামুক্ত জমিতে আমরা সোনালি ফসল ফলামু ।  
গোলা ভইরা উঠব সুখ আর শান্তিতে ।

পুরুষ ৩ : একটি ভোট বিপ্লবের আগুনে পুড়ে সোনার মত খাঁটি  
হয়ে উঠবে এই দেশ ।

নারী ১ : আমাদের ভোট বিপ্লব অরাজকতার বিরুদ্ধে, দুর্নীতির  
বিরুদ্ধে, ভাৰ্মিৰ বিরুদ্ধে, যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে । এসো আমরা  
সবাই এই বিপ্লবে হাতে হাত রাখি ।  
(ওরা সবাই হাতে হাত রাখে)

# লেখক তালিকা

অ

অমি রহমান পিয়াল

আ

আবুল বাহার  
আরিফ জেবতিক  
আহমেদ শারফুদ্দীন

ই

ইরতেজা

এ

একরামুল হক শামীম  
এম এম আর জালাল  
এক্সিমো

ক

কুপ থাঙ্গ

জ

জামাল ভাক্ষর

ঝ

ঝড়ো হাওয়া

ত

তীরন্দাজ

ধ

ধুসর গোধূলি

ন

নামহীন মানব  
নাদান

প

প্রচেত্য

ফ

ফরহাদ উদ্দিন স্বপন  
ফরিদ  
ফারহান দাউদ  
ফাহমিদুল হক

ব

বিপ্লব রহমান

ত

ভাক্ষর চৌধুরী

ম

মাহবুব মোরশেদ  
মাহবুব সুমন  
মিরাজ  
মেহরাব শাহরিয়ার  
মুকুল  
মো. তারিক মাহমুদ

র

রত্নিম  
রাগিব  
রাশেদ  
রাহা  
রিয়াজ শাহেদ

ল

লাইটহাউজ  
লেখাজোকা শামীম  
লোকালটক

শ

শওকত হোসেন মাসুম  
শেরিফ আল সায়ার

স

সাজেদ  
সামী মিয়াদাদ  
সিহাব চৌধুরী  
সু-শান্ত

হ

হাসান মোরশেদ  
হাসান বিপুল